অচলপত্র সংকলন

অচলপত্র সংকলন

সম্পাদনা ▯ জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ।। কলকাতা-৭০০০৭৩

Published by
Samir Kumar Nath
NATH PUBLISHING
26B, Panditia Place, Calcutta 700029

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারী ২০০০।। মাঘ ১৪০৭

প্রচ্ছদপট।। গৌতম রায়

নাথ পাবলিশিং-এর পক্ষে সমীরকুমার নাথ
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস কলকাতা-৭০০০২৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি ডক্টর সুরেশ সরকার রোড কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত

অচলপত্র এবং দীপ্তেন্দ্রকুমার

১৯৪৮ সালের গোড়ায় কলকাতায় একটি নতুন মাসিক পত্রিকা বেরোল—'বড়োদের পড়বার, ছোটদের দুধ গরম করবার একমাত্র মাসিক', এই অভিনব বিজ্ঞাপনে শোভিত হয়ে 'অচলপত্র' চমকিত করল সবাইকে। প্রথম সংখ্যার এই ঘোষণা সব সংখ্যাতেই থাকত। তবে দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিল আর একটি অদ্বিতীয় ঘোষণা—'অনেকেই প্রথম সংখ্যা বাজারে দেখাই যায়নি, এ অভিযোগও করেছেন। ক্রমশ আমাদের এ সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে যে অচলপত্রের প্রথম সংখ্যা আদৌ কোনদিন বেরিয়েছিল কিনা।' এই সূত্রেই অচলপত্র প্রকাশনা দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের 'এলেবেলে' বইটির যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল, সেটি মনে পড়বে—সেই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল—'প্রথমেই পঞ্চম সংস্করণ বেরোচ্ছে। পরে চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম সংস্করণ বেরোতে থাকবে।' পাঠক মুহূর্তমধ্যে বুঝতে পারেন যে একজন সম্পূর্ণ নতুন সম্পাদক, একটি নতুন পত্রিকা এবং এক নতুন রসিক এসে গিয়েছেন।

'অচলপত্র' পত্রিকার এই শক্তিশালী সম্পাদক এবং অন্যতম শক্তিমান লেখক ছিলেন দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল। ১৯৪৭-এর বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা যখন কারো প্রত্যাশাই মেটায়নি, অখণ্ড ভারতের খণ্ডিত পরিণাম যখন দুর্গতিতে পরিণত হল, তখন মানুষ সব কিছুকেই চাইছিল আঘাত করতে। নিজে আহত হচ্ছে, তাই সে বিব্রত, আশাহত। 'অচলপত্র' সেই ইচ্ছাপূরণের ইশারা নিয়ে এসেছিল। বিদ্রূপের চেহারায় সেই আঘাত হয়ে উঠল উজ্জ্বল, উন্মুখ হয়ে উঠল পাঠক। সবার বুক ভেঙে গেছে, চাবুক মারার জন্য দীপ্তেন্দ্রকুমার যে অস্ত্রটি তুলে নিলেন তার নাম উইট। ক্ষুরধার pun, ভাষার মধ্যে অপ্রত্যাশিত মোচড় এসব ছিল তাঁর সহজাত ক্ষমতা।

আজকের পাঠক 'অচলপত্র' দেখেননি। আক্রমণকে খরতর করার মতো আকর্ষক ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই। রসিকতা করার যে দুর্বার প্রবণতা এবং দুর্দম ক্ষমতা 'অচলপত্র'কে সর্বদাই শাণিত করে রাখত, তার সংবাদ এ যুগের পাঠকদের জানার কথা নয়। এ যুগ, অচলপত্রের ভাষায়, হুজুগ মাত্র। এ সংকলনের প্রয়োজন ছিল সেইজন্যই। যে রসিকতা হারিয়ে গিয়েছে, যে দিন চলে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনার কাজটা প্রকৃতই জরুরি হয়ে উঠেছিল। সংকলন সম্পাদিকা যে শ্রম স্বীকার করেছেন সেজন্য তাঁকে সাধুবাদ দেবেন পাঠকেরা।

১৯৪৮ সালে এই পত্রিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৫২ পর্যন্ত মাসিক পত্রিকা হিসেবেই বেরোত। আগেই বলেছি, পত্রিকাটির বিশেষত্ব ছিল বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ। বিদ্রূপ, কিন্তু নির্দোষ নয়, ভাষায় ভঙ্গিতে এর তীক্ষ্ণতা তীব্র হয়ে উঠছিল। সবসময়ে এই তীব্রতা সীমা মেনে চলেনি। আসলে, দীপ্তেন্দ্রকুমার চারপাশে দৃষ্টি ফেলতেন তির্যকভাবে। একসময়ে Attack নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা তিনি অল্পদিনের জন্য চালিয়েছেলেন। তার শ্লোগান ছিল—Attack is the best policy for defence। এই আক্রমণ যেমন

তাঁকে পপুলার করেছিল, তেমনি পাল্টা সমালোচনার মুখেও ফেলেছিল। পদে পদে বিপদে পড়েছেন, তবু আপসের পথে যাননি। একটি চলচ্চিত্রের সমালোচনায় তিনি ছবিটিকে পরিচালকের 'অবিমৃষ্যকারিতা' বলেছিলেন। পরিচালক তাঁর বিরুদ্ধে এজন্য মামলা করেন। লিয়াকৎ আলির বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমাহীন রচনা যেদিন প্রকাশ হয়, ঘটনাচক্রে সেইদিনই লিয়াকৎ আলির মৃত্যু হয়েছে। ঐ মুহূর্তে বিদেশি রাষ্ট্রনায়কের সমালোচনা সময়োচিত হয়নি, এই অভিযোগে স্বদেশি সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েছিলেন। এইরকম সব অসুবিধের মুখে ১৯৫২তে তাঁর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

দীপ্তেন্দ্রকুমার হাল ছাড়েননি। ১৯৬১তে পুনরায় এটিকে 'সাপ্তাহিক' হিসেবে প্রকাশ করতে থাকেন। ততদিনে তাঁর দল ভেঙে গেছে, যে লেখকগোষ্ঠী তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁরা তখন ভিন্ন জমিতে নোঙর ফেলেছেন। কিন্তু তাতে কোনো বাধা ঘটলো না। মনেই হল না যে দলে খেলোয়াড় কমে গেছে, কারণ Coach তো আছেন। তিনি আবার নতুন Team গড়ে নিলেন। সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার আরেকবার উদ্ভাসিত হতে লাগলেন। নতুন লেখকদের টেনে আনলেন, নিজে একাধিক রচনা লিখতে শুরু করলেন পত্রিকার পাতায় পাতায়। এক এক সংখ্যায় প্রায় প্রতিটি সমাচার তাঁরই দর্পণ হয়ে উঠেছিল। ট্যাবলয়েড আকৃতির সেই পত্রিকায় আগের মতোই সবরকম সুস্বাদু রস পরিবেশিত হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৬৬তে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু পত্রিকার পক্ষে সামলানো সম্ভব হল না। এস-এস-কে-এম হাসপাতালে শেষ শয্যায় শুয়েও তিনি পত্রিকার জন্য চিঠিপত্রের উত্তর লিখেছেন সরস ভাষায়—নিয়তি তখনই তাঁর সঙ্গে শেষ রসিকতাটা করল, যার জবাব দেবার সুযোগ তিনি পেলেন না। ১৯৭১ পর্যন্ত পত্রিকাটি তার পরেও চালানো হয়েছিল বটে, তবে ক্রমশ এটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে।

পত্রিকাটির ব্যঙ্গ ছিল প্রায়শই নিষ্ঠুর, নির্মম। অথচ সেইসঙ্গে উপভোগ্য। বা, হয়তো সেইজন্যই সুস্বাদু হতো। কাগজের চরিত্রটাই ছিল বেপরোয়া। কাউকে পরোয়া করতেন না দীপ্তেন্দ্রকুমার। রাজনীতিতে নয়, সাহিত্যে নয়। জহরলাল নেহরু যেমন নয়, তেমনি তারাশঙ্করও নয়। নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে চোরাকারবারিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে--নেহরুর এই উক্তির ব্যর্থতা নিয়ে তামাশা করে তিনি লিখেছিলেন, এজন্য রাস্তা থেকে ল্যাম্পপোস্টই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে এমন দাবি কেউ করতে না পারে। তারাশঙ্করের সাহিত্য নিয়ে লিখলেন, 'কেনে' লিখলেই সে বই লোকে কেনে। তারাশঙ্করের বইও তাই বিক্রি হয়।

বুঝতেই পারা যায়, দীপেন্দ্রকুমার যুক্তি দিচ্ছেন না, নিজের প্রযুক্তিতে শান দিচ্ছেন। তাঁর লেখা তাই বিচিত্র স্বাদ এনেছিল। না, শুধু অন্যের নিন্দা শোনার যে তৃপ্তি বাঙালির মজ্জাগত, এটি কেবল তাই ছিল না--সেই নিন্দার পরিবেশন-কৌশলকে দীপেন্দ্রকুমার কলায় বিবর্তিত করতে পেরেছিলেন। সব কথা যে তিনি ঠিক বলছেন এমন নয়, সে চেষ্টাও তিনি সর্বদা করতেন এমনও নয়--কিন্তু ঠিক বলতে হলে যে ঠিক এইভাবেই বলতে হবে, সেটা তিনি প্রতিমুহূর্তে বুঝতে দিয়েছেন। সাহিত্য, রাজনীতি, বেতার, চলচ্চিত্র—কোনো বিষয়ের কাউকেই রেয়াৎ করত না পত্রিকাটি, দীপ্তেন্দ্রকুমার তো একেবারেই নয়, পারলে

তিনি নিজেকেও হয়তো এক হাত নিতে পারতেন। অন্তত তাতে তাঁর দ্বিধা থাকত না। যেমন একবার লিখেছিলেন, ভালুকের হাঁ-মুখ দেখানো ছবিটাই নাকি দী-কু-সা'র, অর্থাৎ তাঁর। তেমন অবকাশ তিনি সেভাবে পাননি, তার আগেই তিনি অনেক বিপদ টেনে এনেছিলেন। তবে বুঝতে হবে যে ওইটাই তিনি, তিনি অন্য কেউ নন। অন্য কেউ হতেও তিনি চাননি। সবচেয়ে বড়ো কথা, ব্যঙ্গ করতে গিয়ে স্পষ্ট কথা বলতে পারতেন তিনি। যেমন, '৪২' ছবির আলোচনায় তিনি একটি সংলাপ তুলে ধরেছিলেন এইভাবে--Two men have been killed to death—বলেছিলেন, এতেই বোঝা গেছে ইংরেজ না হোক, ইংরেজি ভাষা Quit করেছে দেশ থেকে।

পত্রিকাটিতে নিয়মিত ফিচার যেগুলো বেরোত, সেগুলোর শীর্ষনাম একবার জেনে নেওয়া যাক—

সাহিত্য দুঃসংবাদ
৩৭০-৪ মিটার
তিনটে ছটা নটা
চিঠিপত্রের জঞ্জাল
পড়বার সময় পাঁচ মিনিট

কোনটা কি, তা নামেই পরিষ্কার। নামেই রয়েছে তিরস্কারের আগাম ইঙ্গিত। তাছাড়া থাকত অজস্র কার্টুন, জোক্‌স। একটি কার্টুন মনে পড়ছে আমার--অন্ধকার গলিতে এক মুশ্‌কো লোক আরেকজনের বুকে ছোরা ঠেকিয়েছে, তলায় ক্যাপশান—বল্‌ শালা অহিংসায় বিশ্বাস করিস কিনা।

কার্টুন আঁকতেন প্রমথনাথ, ভাদুভাই, শৈল চক্রবর্তী ইত্যাদি আরো অনেকে। নানা লেখা লিখতেন বারীন্দ্রনাথ দাশ, নারায়ণ দাশশর্মা, রমাপদ চৌধুরী, জ্যোতিপ্রসাদ বসু, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মূল শক্তি ছিলেন দীপ্তেন্দ্রকুমার। এক পাঠক একবার প্রশ্ন করেছিলেন-- এঁরা যদি ছেড়ে দেন তো অচলপত্রের কি হবে? জবাবে সম্পাদক বলেছিলেন--এঁরা তো নিজেরাও কাগজ করে দেখেছেন, সে কাগজ তো চলে না। অচলপত্র যার জন্য চলে সে আমার কলম।

অহংকার মনে হচ্ছে? আসলে ঐটিই ছিল তাঁর অলংকার। এই সবাইকে নস্যাৎ করে দেওয়ার অপূর্ব ভঙ্গিটিই ছিল অতুলনীয়।

আর একটি চিঠি—আপনি সজনীকান্ত দাসকে পাত্তাই দিতে চান না...কিন্তু তিনি একটা কাগজের সম্পাদক তো বটে।

জবাবে দীপ্তেন্দ্রকুমার লিখলেন—সম্পাদক হলেই যদি সাহিত্যিক হওয়া যেতো, তবে তো নামের শেষে মিঞা আছে বলে ডালমিয়াকেও মুসলমান বলতে হয়।

পাঠক বুঝবেন, এ জবাবে Logic নেই, তবে Wit আছে। এই Witয়ের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যই এই সংকলন বেরোচ্ছে।

ক্রমশ দীপ্তেন্দ্রকুমার এতটাই বিতর্কিত হয়েছিলেন যে তখন তাঁকে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হচ্ছে। 'নীলকণ্ঠ' ছদ্মনামে সমাজের হলাহলের বিরুদ্ধে কোলাহল করে চলেছেন, বিনিময়ে গরল নিয়েছেন জীবনে। বার্নার্ড শ' বলেছিলেন স্যাটায়ারিস্ট বা হিউমারিস্ট হলেন ডেন্টিস্ট। সমাজের খারাপ দাঁতগুলো উপড়ে ফেলে দেন তিনি। নীলকণ্ঠ অনেক অপ্রিয় সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন এবং নিজেও অপ্রিয় হয়েছেন। প্রিয় নয়, শ্রেয় হওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। নীলকণ্ঠকে সাহস জুগিয়ে গিয়েছেন দীপ্তেন্দ্রকুমার। তাঁর রচনায় অনেক এপিগ্রাম তৈরি হয়েছে যেগুলো মুখে মুখে ফিরেছে। 'বসুন্ধরা বীরভোগ্যা নয়, তদ্বিরভোগ্যা', এই এপিগ্রামের আপাত-মজার মধ্যেই ধরা আছে মানুষকে মজানোর সমস্ত রেসিপি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য নয়, সবার উপরে যা সত্য তা হল মনুষ্যত্ব'—এই উক্তিটি খুব সহজেই একটি কঠিন কথা বলে নিয়েছে, বুঝিয়ে দিয়েছে সভ্যতার কোন পথে যাওয়া প্রয়োজন। 'বৌয়ের চেয়ে বড়ো গোয়েন্দা আর নেই', এই কথায় হেসে ওঠার পরেই আমাদের পড়তে হয় তাঁর পরের কথাটি—'বৌ কেবল গোয়েন্দা নয়, সবচেয়ে বড় রহস্যও সে। ইস্তিরির চেয়ে বড় Mystery আর নেই।...পুরনো কাগজ বেচে, একবেলা খেয়ে, ছেঁড়া শাড়ি তালি দিয়ে, মধ্যবিত্ত সংসারের চাকা চালু রেখেছে সেই মধ্যবিত্ত বৌ...অপরাজিত মনুষ্যত্বের তারা সব দেশে সব কালে সবচেয়ে বড় সহায়—তারাই সত্যিকারের বিজয়লক্ষ্মী'।

মনোরম রসিকতা এবং পরম সহানুভূতি, এই দুয়ে মিলেমিশেই ভুয়ো সভ্যতাকে দুয়ো দিয়েছেন তিনি অচলপত্রের পাতায় পাতায়, সচল করে তুলতে চেয়েছেন জীবনচক্রের আবেগময় বেগকে। যে কেরানীটি স্বপ্ন দেখছে চলচ্চিত্রের নায়ক হওয়ার, অথচ জীবনচিত্রে যে বিদ্ধ হয়েছে শায়কে, তার কথাও হাসির সুরে পরম মমতায় বলেছেন দীপ্তেন্দ্রকুমার—'আজকে' ক্লার্ক, কিন্তু ক্লার্ক গেব্‌ল হতেই বা কতক্ষণ।'

আজকের পাঠক অচলপত্র পড়েনি, ক্লার্ক গেব্‌লকেও সে চেনে কিনা জানি না, কিন্তু এই সংকলনটি হাতে তুলে নিলে এবং পাতা উল্টোতে গেলে সে যে এই পত্রিকাটির প্রতি আকৃষ্ট হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন এক আশ্চর্য কাগজের খবর পেয়ে তাকে অবাক হতেই হবে। এমনটি কখনো ছিল না, সম্ভবত আর কখনো হবে না। মেজাজ এবং মর্জির, বুদ্ধি এবং বিবেচনার, রস এবং রসজ্ঞের এমন মজার সমন্বয় চট্‌ করে ঘটে না। এমনটি করা যায় না, এমনটি হয়ে যায়। 'অচলপত্র' একটাই হয়েছিল যতদিন সচল ছিল, আবার যখন সত্যিই অচল হল তখন আর একটাও হল না। মানুষের হিত করেছে বলা চলে না, তবে অচলপত্র মানুষের হিতাহিতজ্ঞান উল্টিয়ে দিয়েছে, এমনটি ভাবা চলে।

প্রকাশক এই মূল্যহীনতার বাজারে একটি দুর্মূল্য সংগ্রহ ছাপছেন, এটা কম কথা নয়। কৃতঘ্ন সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবেন। আজকের পাঠক এই সংকলনের প্রতিটি রোমকূপ উপভোগ করে রোমাঞ্চিত হবেন, এমন আশাই করতে পারি—যদিও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ মানুষের মজা পাবার শক্তি, হাসতে পারার ক্ষমতা এতটাই কমে যাচ্ছে যে জোর করে হাসার জন্য লাফিং ক্লাব খুলতে হয় এখন।

অথচ 'অচলপত্র' নিজেই ছিল লাফিং গ্যাস।

দীপ্তেন্দ্রকুমার স্বল্পায়ু ছিলেন। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে অকস্মাৎ তাঁর জীবনাবসান হয়ে যায়। যেহেতু 'অচলপত্র' এবং দীপ্তেন্দ্রকুমার পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ছিলেন, তাই পত্রিকাটিও বেশিদিন বাঁচেনি। এই সংকলনটি আদ্যোপান্ত পাঠের পরে আজকের পাঠক সেজন্য বিষণ্ণ হবেন। কারণ তিনি বুঝবেন যে আরো পরিণত হবার অবকাশ পেলে 'অচলপত্র'কে সম্পাদক অনেক দূর নিয়ে যেতে পারতেন। অনেক দূর গতি হতো তার-- (দীপ্তেন্দ্রকুমার থাকলে বলতেন 'অনেক দুর্গতি') ; তা হতে পারেনি।

কিন্তু যা হয়নি, তার জন্য দুঃখ করার কোন মানে হয় না, কারণ না-হওয়ার কোন শেষ নেই। তবে হওয়ার অনেক 'বিশেষ' আছে। 'অচলপত্র' সেই 'বিশেষে'র একটি। দীপ্তেন্দ্রকুমারের একটি কবিতার দুই পঙ্‌ক্তি দিয়ে একটি অশেষ বাক্য এখানে উচ্চারণ করে নিই--

আমরা যারা এলাম গেলাম
কেউ কখনো দিইনি সেলাম
শুধুই বিউটিফুলকে ছাড়া।।

পিনাকী ভাদুড়ী

সম্পাদকের বক্তব্য

দীর্ঘ ২৮ বছর পরে শেষ পর্যন্ত 'অচলপত্র সংকলন' প্রকাশ করা সম্ভব হল। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে শেষ সংখ্যাটি বেরোনোর পর থেকে এই ২৮ বছর ধরে নানাভাবে নানাবার চেষ্টা করা হয়েছে এই বই প্রকাশ করার এবং প্রতিবারই অচিন্তিতপূর্ব সব বাধায় তা বানচাল হয়ে গেছে বার বার। অবশেষে যে তা বেরোতে পারল, তার জন্য সর্বপ্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই নাথ পাবলিশিং-এর সমীর নাথকে। এবারেও তীরে এসে তরণী প্রায় ডুবু-ডুবু হয়েছিল ; শেষে যে না ডুবে পারে পৌঁছতে পারল, তার সবটা না হোক, অনেকটা সম্ভব হয়েছে তিনি লেগে ছিলেন বলেই।

১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতীপুজোর দিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল 'অচলপত্র' ; প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ সবেমাত্র-পেরোনো ২৪ বছরের সেই যুবক নিশ্চিন্ত চাকরির বাঁধা পথ ছেড়ে পা রেখেছিলেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঢালু পথে। কেন? অবশ্যই নিজের কথা নিজের মত করে বলবার সুযোগ ও স্বাধীনতার আশায়। কি কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি? সমাজে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে—এককথায় জীবনের সর্বত্র--যে সব কথা আমরা বুঝতে পারি, দেখতে পাই, কিন্তু কাউকে জানতে দিই না ; যে সব কথার সঙ্গে আপোষ করে মুখোশের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখি—সেই সব কথাকে সোজাসুজি, স্পষ্ট করে জানানোর বাসনা ছিল তাঁর। অবশ্যই এর তলায় লুকিয়ে ছিল, আরেকটি গভীরতর উদ্দেশ্য—সেটি হল, কোন্‌টি যথার্থ সত্য, মহৎ, সুন্দর, তা দেখিয়ে দেওয়া। এই সাহস, প্রতিবাদ-প্রবণতা ঝড় তুলল সঙ্গে সঙ্গেই, 'অচলপত্র' হয়ে দাঁড়াল সর্বাধিক বিক্রীত পত্রিকা।

এর পরে নানা বাধাবিঘ্নে-ভরা পথ দিয়ে চলতে হল 'অচলপত্র'-কে। মাত্র ৪ বছর পরেই সরকারী ও বেসরকারী চাপে বন্ধ হয়ে গেল তার প্রকাশ। আবার ১০ বছর পরে ১৯৬১-তে তার পুনরাবির্ভাব সাপ্তাহিক পত্রিকা হয়ে। ১৯৬৬-তে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের মৃত্যু পর্যন্ত এবং তার পরে ১৯৭১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর সম্পাদনায় অব্যাহত ছিল সে।

আমাদের এই সংকলনে শুধু শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সম্পাদিত 'অচলপত্র' (অর্থাৎ ১৯৬৬ পর্যন্ত) থেকে বিভিন্ন লেখা সংকলিত হয়েছে। দীপ্তেন্দ্রকুমারের লেখাই ছিল এই পত্রিকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ; সুতরাং স্বভাবতঃই এই সংকলনের সিংহভাগ জুড়ে আছে তাঁর লেখা। এছাড়া, 'অচলপত্র'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল যে লেখকগোষ্ঠী, যার কয়েকজন 'অচলপত্র'-এর নিয়মিত লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন এবং অনেকে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক হয়েছিলেন, তাঁদেরও নির্বাচিত লেখা এ বইতে আছে। তখনকার প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন লেখক-লেখিকার লেখাও দেখা যাবে এ বইতে। অর্থাৎ, 'অচলপত্র'-এ তার নিজস্ব গোষ্ঠী ছাড়াও বাইরের খ্যাতনামারা লিখেছেন--এ তথ্য হয়ত অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে।

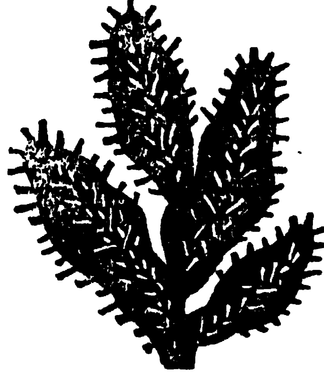
এবারে জানাই, কিভাবে এই সংকলন সাজানো হয়েছে। 'অচলপত্র'-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় বিভাগ ছিল 'চিঠিপত্তরের জঞ্জাল' ; এখানে সম্পাদক নিজে চিঠির উত্তর দিতেন। এই বিভাগের উপভোগ্যতা যে আজো সমান, সে কথা মাথায় রেখে অনেক চিঠির উত্তর—

অবশ্যই নির্বাচিত--দেওয়া হয়েছে। আরেকটি জনপ্রিয় বিষয় ছিল কার্টুন। এত বেশী, এত ভাল কার্টুন বোধ হয় বাংলা আর কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি ('যষ্ঠিমধু' ও 'সচিত্র ভারত'-এর কথা মনে রেখেই বলছি)। যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে ভাল কিছু কার্টুন দেওয়ার--যা পুরনো ও নতুন পাঠক--দুদলকেই আনন্দ দেওয়ার উপযুক্ত। কার্টুনও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পাতায় ; এভাবে রয়েছে কিছু চুটকিও। 'অচলপত্র'-এর নিয়মিত বিভাগগুলির শিরোনাম নিয়মিত ছবিসহ দেওয়া হয়েছে ঐ সব বিভাগে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার নিজস্ব নামের সঙ্গে। সুতরাং ঐ সব শিরোনামের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পাঠকের চোখে পড়বে, কোনো কোনো লেখায় লেখকের নাম নেই। এ সব নাম উদ্ধার করা যায়নি। তবে কোনো কোনো লেখার ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সেটি সম্পাদকের লেখা। লেখাগুলির নীচে যথাসম্ভব তারিখের ও পত্রিকা সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। সাপ্তাহিক 'অচলপত্র'-এ তারিখ বাংলার বদলে ইংরিজী ছাপা হয়েছে এবং আমরাও সেই তারিখ ব্যবহার করেছি।

এই সংকলনের অনেক লেখা আজকের দিনে 'dated'--অর্থাৎ, সে সব লেখা আজ আর প্রাসঙ্গিক নয়। তবু সেগুলি দেওয়া হয়েছে, 'অচলপত্র' এবং সম্পাদকের বিশিষ্ট ভঙ্গির রস পাঠককে যোগানোর জন্য। সে সব ক্ষেত্রে বিষয় নয়, বলার গুণই আসল।

'অচলপত্র'-এর নিজস্বতা কি ও কেমন, সে কথা আলাদা একটি ভূমিকায় বলেছেন 'অচলপত্র'-এর অন্যতম লেখক শ্রীপিনাকী ভাদুড়ী। সুতরাং এ বিষয়ে আলাদা করে এখানে কিছু বলা অনাবশ্যক। শেষ করার আগে যা বলতে চাই তা হল ঃ 'অচলপত্র'-এর যে সব প্রবীণ পাঠক-পাঠিকা আজো রয়েছেন, তাঁরা খুশি হবেন হয়ত পুরনো দিনের সেই সব লেখা আবার পড়বার সুযোগ পেয়ে ; আর, যাঁরা আজকের নতুন পাঠক-পাঠিকা, যাঁরা 'অচলপত্র' ও দীপ্তেন্দ্রকুমারের নাম ও রচনার সঙ্গে পরিচিত নন, যাঁরা জানেন না, এই দীপ্তেন্দ্রকুমারই পরবর্তীকালে 'নীলকণ্ঠ' ছদ্মনামে বহু অসাধারণ বই-এর লেখক, তাঁরা--আশা করি--আবাক হবেন, আনন্দ পাবেন, উত্তেজিত হবেন এবং জানতে পারবেন, দীপ্তেন্দ্রকুমার তথা 'অচলপত্র'-এর মূলধন ভাঙিয়ে আজকের বহু সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁদের পণ্যের সওদা করছেন।

মাত্র ৪২ বছর বয়সে বৈশাখের এক সকালবেলা বিদায় নিয়েছিলেন দীপ্তেন্দ্র। তারপর এই দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে তাঁর স্মৃতিতে জমেছে যে বিস্মৃতির ধূসর আবরণ, আশা করি, প্রবীণ ও নবীন পাঠকদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর সমাদরের খেয়ায় সেই বিস্মৃতির জগৎ থেকে একালের তীরে এসে উত্তীর্ণ হবেন আমার বাবা দীপ্তেন্দ্রকুমার তাঁর সেই চিরপ্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে--যে মূর্তি অন্যায়ের প্রতিবাদে বজ্রের চেয়ে কঠোর আর মানবিকতায় ফুলের চেয়েও কোমল।



অচল পত্র

বড়দের পড়বার এবং

ছেলেদের

দুধ গরম করবার

একমাত্র মাসিক

সম্পাদক

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

'অচলপত্র' নিয়মিত বেরুবার কোন প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি না।

'অচলপত্র'-এর জন্য কোন কার্টুন, গল্প বা কবিতা আমরা আমন্ত্রণ করি না। বাইরে থেকে আমরা যা চাই তা শুধু বিজ্ঞাপন।

'অচলপত্র' নিছক ব্যঙ্গ বা হাসির পত্রিকা নয়। এর সঙ্গে যথেষ্ট চিন্তার খোরাকও আছে। সে চিন্তা হল কি করে যথেষ্ট বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়।

'অচলপত্র' আপনি যত কম ছাপা হচ্ছে ভাবছেন তা নয় ; শুধু তাই নয়—আপনি ভাবছেন, অন্য আর পাঁচজনের মত আমরাও বাড়িয়ে বলছি ; তাও সত্যি নয়। আসলে আপনারা যা ভাবছেন তার চেয়েও অনেক কম ছাপা হচ্ছে।

খোলা চিঠি

আমাদের দেশে আর কিছু হোক না হোক একটা বিষয়ে যে স্বাধীনতা অবাধ হয়ে উঠেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। সে স্বাধীনতা যথেচ্ছ কাগজ প্রকাশের।

এখন আর তাই--বিনা নোটিশে অথবা বিনা ঘোষণায় যখন তখন নতুন নতুন কাগজের আবির্ভাবে বিস্মিত হই না মোটেই। বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক, মাসিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, আকস্মিক সংকলন, সঞ্চয়ন- কতো কাণ্ড!

এতো কাগজ পড়ে কারা, কেনে কারা, সত্যিই সবগুলো বিক্রী হয় কি না, হলেও কে লাভবান হয়, ঈশ্বর জানেন। তবে কাগজব্যাপারীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনার সুযোগ হলেই শুনি "কি ঝক্‌মারী!"

অর্থাৎ, কেবলমাত্র ঝকমারী পোহাবার জন্যেই তাঁদের এই প্রচেষ্টা।

এমনি এক ঝকমারীর নমুনা হঠাৎ হাতে এলো একখানা--নামটা কৌতূহলোদ্দীপক। "অচল" কথাটার অর্থ বোঝা যায়--আজকের দিনে তো হাড়েহাড়েই বুঝতে হচ্ছে। 'সূতপুত্রের' রথচক্রের মতো সকলের রথের চাকাই আজ অচল হয়ে পাঁকে পুঁতে যাচ্ছে। কিন্তু 'অচলপত্র' মানে কি?

কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর শব্দের বিন্যাস? না সত্যিই কোনো অর্থ আছে? হয়তো বা আছে। উল্টে পাল্টে দেখে মনে হল--'অচল' বলে যতটা বিনয় প্রকাশ করেছেন এঁরা, ঠিক ততটা অচল বলা চলে না। কিছুটা নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য আছে। সেটা কতকটা ছেলেমানুষী হলেও উপভোগ্য। হাল্কাহাসির খোরাকও যে মাঝে মাঝে দরকার হয় এটা অনস্বীকার্য।

গতানুগতিক ভাবে--"সংস্কৃতি এবং প্রগতিমূলক", "স্বাধীন বাংলার একমাত্র মুখপত্র" ছাপ মেরে যে সম্পাদক মশাই দয়া করে মেয়েদের "পদ্মলতা" আলপনা কাটতে, "কচিপাতা প্যাটার্ণ" উলবুনতে অথবা "পেঁয়াজকলির পায়েস" রাঁধতে শেখাবার ভার নেননি, কিম্বা বড়দের কাগজে 'ছোটদের দপ্তর' খুলে ছোটদের পক্ষে বইটা ছেঁড়বার--আর 'ভাই রাঙাদির' খোলা চিঠির আসর খুলে যথেচ্ছ ঢং শেখবার সুযোগ করে দেননি এর জন্য অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।

হাল আমলের সম্পাদকরা যদি প্রতিজ্ঞা করে একঘেয়েমী ঘোচাবার ভার নেন বাস্তবিকই সুখের হয়!

তবে নির্দোষ হাস্যরসাত্মক পত্রিকা প্রকাশ করতে পারা সহজ নয়। বোধ করি সবচেয়ে শক্তই। কারণ, রঙ্গ এবং ব্যঙ্গের, পরিহাস এবং উপহাসের সীমারেখাটা এত সূক্ষ্ম যে, লঙ্ঘন হয়ে যেতে দেরী হয় না।

'অচলপত্র' সম্পাদনার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা যদি এই প্রায় অনিবার্য পরিণামটা ঠেকিয়ে রেখে নির্মলহাস্য পরিবেশনের আদর্শটা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন তাহলে 'অচলপত্র' চলমান হয়েই থাকবে আশা করছি।

রসালো এবং ঝাঁজালো ভাষায় পরনিন্দায় পঞ্চমুখ হবার মধ্যে আর যাই হোক কৃতিত্ব নেই। ওছাড়াও যে হাসা চলে--অপরকে ঘুষি না মেরেও যে খুসি হওয়া যায়, 'অচলপত্র'--এর কাছে তার নমুনা আশা করছি আর দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করছি নবজাতকের।

আশাপূর্ণা দেবী

×

খোলা চিঠিতে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী খোলাখুলিভাবেই কোন কিছু না রেখে-ঢেকে আলোচনা করেছেন, এর জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তবে আমাদেরও সামান্য একটু বক্তব্য আছে। যে নির্দোষ আনন্দের কথা তিনি বলেছেন তা শিশুপাঠ্য বই ছাড়া আর কোথাও নেই। লরেল-হার্ডির রসিকতা নির্দোষ বটে তবে তা ভাঁড়ামোরই নামান্তরমাত্র। চার্লি চ্যাপলিনের সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যবিহীন নয়। যে-হাসির পেছনে গভীর বেদনা প্রচ্ছন্ন নেই, নেই কোন সুতীক্ষ্ণ বিচিত্র বিদ্রূপ, তা শুধুই হাস্যকর।

আরো একটি কথা, তিনি 'ছেলেমানুষী' বলে যে কটাক্ষ করেছেন আমাদের প্রতি তাও আমরা স্বীকার করে নিলুম। এই ছেলেমানুষীকেই ওদের দেশের লোকেরা 'ভীগর' আখ্যা দেয়। রবীন্দ্রনাথের আশি বছর বয়সেও এই শিশুসুলভ প্রাণপ্রাচুর্য ছিল বলেই তিনি অত বড় হতে পেরেছিলেন। ছেলেমানুষী যেন আমাদের জীবন থেকে কখনও না ছুটি নেয়। মজে, ধ্বসে ও বুজে যাওয়া প্রাচীনদের কাছে আমরা যেন চিরকালই ছেলেমানুষই থাকি আর 'অচলপত্র' যেন প্রাণ-রসবঞ্চিত এই রামগরুড়ের ছানাদের দেশে অতি সিরিয়াসদের কাছে চিরদিনই অচল থাকে।

সম্পাদক, 'অচলপত্র'

[১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫৪]



—বাবা! এই সেই ভদ্রলোক যে রোজ আমাকে ফলো করে—
আজ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি—শিগ্‌গির একটা পুরুত ডাকো...

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প

কালোবাজার

রজনী স্খলিত পায়ে মই বেয়ে উঠছিল। সিদ্ধিলাভের পর অবিচলিত থাকা সকলের পক্ষে সহজ নয়। তখন পদে পদেই পতনের সম্ভাবনা।

সিদ্ধির মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গেছল বুঝি। ভারতের স্বাধীনতা আর পাকিস্তানলাভের পর এই প্রথম বিজয়া-ঈদ্-সম্মিলনী। বিজয়ীদের শুভ সংঘটন। নতুন নেশাদের নতুন নেশা--তাই আর সব কিছুর মত এদিকটাতেও একটু মাত্রা ছাড়াবে বিচিত্র কি?

কিন্তু বাঁশের সিঁড়ি ধরে ওঠা সহজ নয়। এমন কি, পনেরই আগস্টের পরেও কাজটা সহজ হয়নি। স্বাধীনতা পাবার পর দেশের যত কিছুই অদলবদল হয়ে থাক, বাঁশ এবং বংশধারার বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

পড়তে পড়তে বার কয়েক টাল সামলাতে হয়েছে রজনীকে। ধীরে রজনী, ধীরে! অধোগতির পথে সুড়ুৎ করে নামা গেলেও উন্নতির সোপান--জীবনের যে কোনো দিকেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমান টলায়মান।

রাত হয়েছে বেশ। উপনগরীর পথ এমনিতেই একটু নিরালা, তার ওপর এদিকটা আবার নিরালাও মনে হয়। লক্ষ্মীপূজো পেরিয়ে, প্রায় কালীপুজোর কাছ ঘেঁষেই ওদের বৈঠকটা বসেছিল, তাই অমায়িক রজনীকে এই মুহূর্তে অমারজনীর হাত ধরে এগুতে হয়েছে। নির্জ্যোৎস্না রাত্রি, দূরে দূরে এক একটা গ্যাসবাতি জ্বলছে--মাঝের গুলো হয় জ্বালা হয়নি, নয়তো কেউ দয়া করে নিবিয়ে দিয়েছে। এই আলো আঁধারের আবছায়া পথে একলা চলতে চলতে হঠাৎ সে এই সিঁড়ির সামনে এসে হাজির। কাছেই একটা গ্যাস জ্বলছিল বলে জিনিসটা তার নজরে ঠেকলো। একখানা ফ্ল্যাট ফাইল বাড়ির দোতলার একধারের একানে এক অলিন্দের সঙ্গে লাগানো বাঁশের মইটা একটু অদ্ভুত দৃশ্যই বলতে হবে।

রজনীকে থমকে দাঁড়াতে হলো। কলকাতা এবং সহরতলীর সব লোকচরিত্র তার নখদর্পণে নয় তা সত্যি, কিন্তু তাহলেও যদ্দুর তার ধারণা, এ ধারের নাগরিকদের গৃহপ্রবেশের ধরণটা ঠিক এরকম নয়। ইঞ্জিনীয়াররা পারতপক্ষে বাড়ির যত সর্বনাশই করুক, সিঁড়ির একটা ব্যবস্থা রাখেই। নিশ্চয়ই তার বাসিন্দাদের সপরিবারে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে যাতায়াত করতে হয় না।

রজনী গভীর। রজনীমাত্রই যেমন হয়ে থাকে। আমাদের রজনীও তার ব্যতিক্রম নয়। কাজেই এই গভীর রজনীতে, গভীরভাবে তলিয়ে এটাকে কোনো বদলোকের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই তার মনে হয় না। দেশটা বিলেত এবং সিঁড়িটা দড়ির হলে ব্যাপারটাকে ইলোপমেণ্ট বলেই সে ঠাওরাতে পারত ; কিন্তু এই বিদঘুটে বংশপরম্পরার সামনে খাড়া হয়ে খুনখারাপী ছাড়া আর কিছু যেন ভাবতেই পারা যায় না। হয়তো বা চুরি-চামারিও হতে পারে।

রজনী নিজের মহল্লার পীসকমিটির একজন। অশান্তির গন্ধ পেলে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। নিসপিস করতে থাকে। রজনী বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো।

সিঁড়িটা অলিন্দের গায়ে-পড়া। অলিন্দ দোতলার সঙ্গে লাগানো। অলিন্দ ও ঘরের মাঝে কালো রঙের পর্দা ঝুলছে। বারান্দা উতরে রজনী পর্দার কাছে পৌছলো। ঘরের ভেতরটা

অন্ধকার। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। একটু সঙ্কুচিত হয়েই ঘরের মধ্যে পা বাড়ালো সে। হিমশীতল শবদেহটা কোন্‌খানে পড়ে আছে কে জানে! প্রতিপদক্ষেপেই তার স্পর্শলাভের প্রত্যাশা করছিলো সে। কিন্তু বেশ কয়েক পা এগিয়ে তেমন-কিছুর ওপর তাকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হলো না দেখে শেষ পর্যন্ত হয়তো সে একটু যেন হতাশই হলো।

হঠাৎ টিক করে এক আওয়াজ—আলো জ্বলে উঠেছে! একটি রূপময়ী যুবতী বিভ্রান্ত বেশে আরো অপরূপ হয়ে বিছানার ওপরে বসে—সে-ই বেডসুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়েছে। সদ্য তার ঘুম ভেঙেছে দেখলেই বোঝা যায়। ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে সে রজনীর দিকে তাকিয়ে।

রজনীর অবিশ্যি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব ছিল না। তাছাড়া, ভাঙ খাবার পর উক্ত মতিগতি আরো বেশীমাত্রায় উৎপন্ন হতে থাকে। তখন লোকে ভাঙে তো মচকায় না।

রজনী মেয়েটাকে চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিয়েছে। আর বলেছে, "নমস্কার। বিজয়ার প্রীতি নমস্কার! আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভারী খুসি হলাম। কিছু মনে করবেন না।"

বলতে বলতে সে পর্দা-বরাবর পিছিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে আরেকবার সে ভালো করে আরেক নজর মেয়েটাকে দেখল। অপূর্ব রূপসী,—বেশহীনতার মধ্যে আরো বেশ, এত চমৎকার যে, মাথা ঘুরে যাবার মতোই। পর্দার সাহায্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে কোনরকমে দাঁড়িয়ে থাকল।

"আমার ঘরে আপনি কি করছেন?" রমণীর কণ্ঠস্বর মোটেই রমণীয় নয় ; "এ্যাতো রাত্রে?....আর—পর্দা ধরে—অমন করে ঝুলবেন না। ছিঁড়ে যাবে।"

রজনী পর্দানসীন হয়েছিল আগেই বলেছি। এইবার পর্দার আসক্তি ত্যাগ করে সরে দাঁড়ালো। আমতা আমতা করে তার আরম্ভ হয়—"...আমি ভাবলাম..."বলতে গিয়ে রজনী ঢোঁক গেলে। উপর্যুপরি গিলতে থাকে। "...ভাবলাম কি..."

মেয়েটি নিজের বেশবাস গুছিয়ে নিলো। বুঝতে পারলো তার অর্ধাবৃত দেহসুষমার জন্যেই আগন্তুক পার্ট্‌স্ অফ স্পীচ খুঁজে পাচ্ছে না। গরম চাদরটা নিজের চারদিকে জড়িয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো। "হ্যাঁ, কি ভাবলেন শুনি...?"

"আমি ভাবলাম যে চোর ছ্যাঁচোড় কেউ ঢুকে...এ রকম তো ঘটতেই আছে আকছার...কেউ ঢুকে হয়তো আপনার..."

তারপর ফের রজনীর আটকে যায়. কি বলবে ভেবে পায় না। মেয়েটির ধনরত্ন—তার চেয়েও মূল্যবান প্রাণরত্ন—ততোধিক মহার্ঘ অন্যান্য রত্নাদি অপহরণের কথা সবিস্তারে মেয়েটির মুখেব উপর উল্লেখ করা উচিত হবে কি না, ভাবতে থাকে। আদালতের বিচিত্র খবরে যে সব বার্তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলা হয়, একটি ভদ্রমহিলার মুখোমুখি সেগুলির উচ্চারণে একজন ভদ্রলোকের স্বভাবতঃই বাধে।

"আপনার তো খুব বুকের পাটা!..."মেয়েটি এবার ফেটে পড়ে।—"এত রাত্রে আপনি পরের ঘরে..."

"সিঁড়িটা দেখলাম কি না। আপনার ব্যালকনির সঙ্গে লাগোয়া বাঁশের মইটা দেখলাম যে। তাই আমার মনে হোলো..."

"যে সুবর্ণ সুযোগ? ঐটা ধরে একজন নিদ্রিত ভদ্রমহিলার শোবার ঘরে নিশুতি রাতে সেঁধিয়ে পড়ি। কেমন এই তো?"

"ঠিক বলেছেন!" আপনা থেকে রজনীর সব কেমন গুলিয়ে যায় ঃ "ঐ, ঐ সিঁড়ি! ঐ সিঁড়িটাই এজন্যে দায়ী। বাঁশের মই ধরে উঠতে আমার বড় ভালো লাগে। ভারী মজার ওঠা-নামা। যখন আমি ছোট্ট ছিলাম তখন আমি এন্‌তার উঠেছি। মই দেখলেই উঠতাম।"

"তুমি একটা পাগল!" মেয়েটি না বলে পারে না। "আস্ত পাগল।"

"শীলাও ঠিক ঐ কথাই বলে থাকে।"

"বুঝেছি।" মেয়েটি ফোঁস করে উঠলো : "শীলার ওখানেও বুঝি এমনি আন্‌কোরা পথেই যাতায়াত করা হয়?"

"না না। সে আমার বৌ।"

"চমৎকার! তাহলে এইবার আমি পুলিস ডাকি?"

এই বলে মেয়েটি আলোয়ানে ভালো করে নিজেকে মুড়ে নিয়ে শয্যা ত্যাগ করে দাঁড়ায়।

"রসিক নাগর! বদমাইস কোথাকার!...একনম্বরের...! শীলা যদি টের পায় যে রাত একটার সময়ে এইভাবে তুমি মেয়েদের শোবার ঘরে হানা দাও তাহলে সে কি বলে আমার জানতে ইচ্ছে করে।"

"রাত একটা!...না, না, নিশ্চয়ই এতরাত হয়নি..." "হয়নি! দেয়ালঘড়ির দিকে চেয়ে দেখছো?"

কথাটা মিথ্যে নয়। রজনীর অতদূর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করার পক্ষে একটি মেয়েই এত বেশী যথেষ্ট যে তা ছাড়িয়ে দেয়ালের দিকে তার চোখ পড়ার সুযোগ হবার কথা নয়। এতক্ষণে তাকিয়ে দেখল রজনীর মতো ঘড়িটারও তেরটা বেজেছে। সত্যিই।

"ঠিকই তো। তাহলে তো এখন আমার যাওয়াই উচিত।" রজনী পর্দা ফাঁক করে যাবার উদ্যোগ করে। এক পা তোলে।

কিন্তু হায়, রজনী তখনো বাকী। অন্ততঃ রজনীর তো বটেই।

"খবর্দার। নড়েছেন কি, অমনি আমি ডাক ছেড়ে আর সব ফ্ল্যাটের লোক জড়ো করেছি।" তারপরে টিপয়ের ওপরে টেলিফোনটার দিকেও সে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে : "দাঁড়াও, এখুনি আমি থানায় ফোন করছি।"

"কি সর্বনাশ...!" হেমন্তের রজনী বৈশাখের রাত্রির মতো ঘামতে থাকে।

"আপনার বাড়ির ফোন নম্বর কত? শীলাকেও কথাটা আমি জানাতে চাই। সে কি বলে শুনি একবার।"

"সর্বনাশ। তাহলে কিছু না বলে সে বাপের বাড়ী চলে যাবে..." রজনীর গলা যেন রজনীর গলা নয়।

"তাহলে আজকের রাত্রের মতো থানাতেই যাও। পুলিস ডাকি..." মেয়েটি পর্দা সরিয়ে অলিন্দের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।..."কি ভাগ্যি! গ্যাসবাতিটার কাছে একজন পুলিসের লোক দাঁড়িয়ে না? সার্জেণ্ট কিম্বা সাব্‌ইন্সপেক্টার কেউ হবে—দেখে তাই মনে হচ্ছে।"

সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে রজনীরও ঠিক সেই কথাই মনে হয়।

"আমাদের বরাত ভালো! নইলে এমন সময়ে একজন পুলিসকর্মচারী এই নিশুতি পাড়ার ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে! লোকটা সিগারেট টানছে--তাই না?"

"হ্যাঁ..." রজনী কম্পিত কণ্ঠে সায় দেয়। পুলিস কর্মচারীর চুরোটের মতো নিজেও যেন সে প্রতিমুহূর্তে নিঃশেষিত হয়ে আসছে। চোখের সামনে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এমনকি অমন সুন্দর মেয়েটিও কেমন ধোঁয়াটে।

"ডাকি তাহলে? নারীর শ্লীলতাহানি করার মজাটা কি—তোমার মতো লোকের সেটা শিক্ষা পাওয়া দরকার।"

"না, না। আমি সমস্ত খোলসা করে বলছি। প্রত্যেকটি কথা..."

"তোমার কৈফিয়ৎ শোনার আগ্রহ আমার চেয়ে ঐ লোকটারই বেশী হবার কথা। ওর জন্যেই জমা রাখো।"

"এই ব্যাপার যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে বেজায় কেলেঙ্কারি হবে।" রজনী আর্তনাদ করে ওঠে।

"এরকম কাজে কেলেঙ্কারি আছেই।"

"আর শীলার মতো মেয়েকে তাহলে আমি চিরদিনের মতো হারাবো।"

"সে তো আরো ভালো কথা।"

"আমার চাকরি বাকরি সব যাবে। আমি পথে বসবো।" রজনী আর বেশী বলতে পারে না। তার গলা দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

কাঁদলে কেবল মেয়েদেরই নয়, এক এক সময়ে এক একটি পুরুষকেও নেহাৎ মন্দ দেখায় না। মেয়েটি তার অশ্রুবর্ষণ লক্ষ্য করে।

"আমি একটা কথা বলব?..." কাঁদতে কাঁদতে রজনী আবেদন জানায় ঃ "তুমি যে ঐ বল্লে—তোমার শ্লীলতাহানি না কি—তার জন্য কি খেসারৎ দিতে হবে বলো আমায়। শাড়ি-ব্লাউস-গয়না-গাঁটি-মণি-মুক্তো,—হীরে-জহরৎ—চুনি-পান্না—যা চাও বলো—কেবল দোহাই তোমাব, ঐ পুলিস ডেকো না।"

মেয়েটির মেজাজে একটু যেন পরিবর্তন দেখা যায়। এমনকি, সে তার দেহাবরণের খানিকটা ফের স্খলিত হতে দিতেও বাধা দেয় না।

"বটে? কি আছে তোমার কাছে—দেখি।"

রজনী এ পকেট ও পকেট হাতড়ে কয়েকটা দস্তার টাকা আর কিছু খুচরো রেজকি বার করে। সেই সঙ্গে একটা চুলের কাঁটাও।

"এই তোমার সম্বল!" মেয়েটি হাসে।

"ভেতর পকেটে আমার চেক বই আছে। কখন কি হয় সেই জন্যে সবসময়ে সঙ্গে রাখি। ভাগ্যিস, আজ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম।"

"কতো টাকা আছে তোমার ব্যাঙ্কে শুনি।"

"হাজার দশেক হবে। আমার এতদিনের জমানো।"

"আচ্ছা, তোমার নিজের মত কিছু রেখে ন'হাজার টাকা আমার নামে লিখে দাও। নগদ হলেই ভালো হোতো। কিন্তু তা আর কি করে হচ্ছে? চেকই সই।"

"ন'হাজার!" রজনীর মন নানাকার করতে থাকে।

"তোমার একটু আগের দাক্ষিণ্যের কথা ভাবলে অনেক কমিয়ে সমিয়েই বলেছি—নয় কি? আজকালকার বাজারে মণি-মুক্তো. হীরে-জহরতের জড়োয়া গয়না লাখ টাকার কমে হয় না। কিন্তু তোমার অত নেই তো, কি করবে! ঐ ন' হাজারই দাও।"

চেকটা হাত বদলালো। অবশেষে মেয়েটি সদয় হয়ে বললে, "তোমাকে আর এই বিপদের মুখে মই দিয়ে নামতে দিতে পারি না। পুলিশের লোকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। চলো, তোমাকে সদরপথে বার করে দিয়ে আসি।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্যাসবাতিটার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে পুলিসের লোকটি কটমট করে তার দিকে তাকাল। কি বিচ্ছিরি তার গোঁফজোড়া! দেখলেই প্রাণ শিউরে ওঠে। তার চাউনির মতই ভয়াবহ।

"বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম।..." জড়িত কৈফিয়তের সুরে অকারণে আপনা থেকেই সে জানায়। জানিয়েই এগুতে থাকে। জবাবে পুলিসটির, একটুখানি বক্রহাসি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

পরদিন সাড়ে-দশটায় ঘুম ভেঙে উঠে দিনের আলোয় আগের রাত্রির ব্যাপারটা সমস্তই তার কাছে কেমন বেখাপ্পা লাগে। তার মনটা কর্‌কর্‌ করে। তার অতদিনের সঞ্চয়—করকরে অতগুলো টাকা! শীলা—এমনকি তক্ষশীলার খাতিরেও তা জলাঞ্জলি দেয়া যায় না। যা হয়

হোক—যে করে হোক—এই টাকা সে একটা সর্বনেশে মেয়ের খপ্পরে যেতে দেবে না—না, কিছুতেই না। সেই দণ্ডেই সে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে ব্যাঙ্কে যায়। গিয়ে শোনে, আধঘণ্টা আগে তারা এসে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

বেয়ারার চেক—ক' মিনিটের আর মামলা!

"তারা!—...তারা মানে?..."রজনী চেঁচিয়ে ওঠে..."মেয়েটির সঙ্গে কোনো পুরুষমানুষ ছিল না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরুষটার আবার বিচ্ছিরি, বদখৎ গোঁফ।" ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার মুখ বিকৃত করে।

[প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫৪]



স্ত্রী— তুমি এই সাতদিনের মধ্যে একদিনও আদর করনি!
বৈজ্ঞানিক— এ্যাঁ! কাল তাহলে কাকে আদর করলাম...

খোকার মা—খোকা এত কাঁদছে কেন গা?
খোকার বাবা—তোমার ছেলের উদ্ভট আব্দার! বলে গাধার পিঠে চড়ব।
খোকার মা—তা নিলেই বা একটু পিঠে!!



[রাণী থেকে কেরানী পর্যন্ত, রাঁচী থেকে করাচী অবধি, যে-কেউ যখন খুসী,--রাগের কিম্বা অনুরাগের, দরকারী অথবা অদরকারী, কাজের বা অকাজের, এক-পাতায় কিম্বা একশো পাতায় একই কথা একান্ন বার, অথবা একান্নটি সমস্যার একমাত্র উত্তর চেয়ে অথবা না চেয়ে, লিখিত বা অলিখিত উত্তর অথবা প্রশ্ন পাঠাবার কিম্বা না পাঠাবার ইচ্ছে বা অনিচ্ছে থাকলে এখানে চেষ্টা করে দেখতে পারেন!]

শশাঙ্কমোহন সেন ঃ বড়বাজার

আপনার লেখা কাদের সবচেয়ে ভালো লাগে, জানেন?

* হ্যাঁ, জানি--যারা আমার লেখা পড়ে না।

সনাতন গোস্বামী, টার্ফ রোড, ভবানীপুর

বাংলা ছবিতে কি আর্ট নেই, বলতে চান?

* হ্যাঁ আছে, যদি আর্ট মানে হয় কলা। আর্টের নামে এইভাবে কলা দেখানো বাংলা ছবি ছাড়া আর কোথায় সম্ভব, বলুন?

অসীম গুহ ঃ বেলেঘাটা

মহাত্মা গান্ধী যে বলতেন, "এ দেশে আজ সকলেই উন্মাদ হয়ে গেছে। তা না হলে এই অর্থহীন হানাহানি কেন?" এ বিষয়ে আপনিও কি একমত?

* না। বরং আমার মতে ভারতবর্ষে একমাত্র উন্মাদরাই প্রকৃতিস্থ আছে। দেখুন, আর সর্বত্রই গোলমাল হয়েছে--প্রদেশে-প্রদেশে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, সাদায়-কালোয় ; একমাত্র রাঁচীর পাগলা-গারদে হয়নি। এর থেকে কি প্রমাণ হয়?

তারাপদ সেন ঃ বালিগঞ্জ

বুঝেছি মশাই। গালাগালি দিতে দিতে একখানা ছবি পরিচালনা করার তাল আছে আপনার।

* ঠিক ধরেছেন। কোয়েশ্চেন পাঠাতে পাঠাতে আপনার যেমন আস্ত একখানা রচনা পাঠাবার তাল আছে একদিন।

মোহনলাল ঘোষ ঃ চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ

গত ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ যেভাবে স্বাধীনতা অর্জন করল আপনার মতে তা কি একটা ঐতিহাসিক ঘটনা নয়?

* না! ভারতের এই স্বাধীনতা, এ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা নয় ; বরং একে আপনি ভৌগোলিক দুর্ঘটনা বলতে পারেন। শোনা যায়, নাসিরুদ্দিনের কাছে একটি মেয়ে এসে দরবার জানায় যে, তার পেটের সন্তানকে অন্য আরেক নারী দাবী করেছে তার মেয়ে বলে। কলহরতা সেই দুজন স্ত্রীলোককেই নাসিরুদ্দিন বলেন, "বেশ। একে মেরে আমি আধখানা করে কেটে ভাগ করে দিচ্ছি।" এবং এই কথা বলতে না বলতেই অশ্রুলোচনে সন্তানের জননী জানায়, "না, না, ওকে আমি চাই না। আপনার আদেশে ও সন্তানকে দেওয়া হোক

দ্বিখণ্ডিত না করে এই মেয়েটিকেই।” এই সামান্য কটি কথা থেকে জানা গেল, সন্তানের জননী কে। নিজের ছেলেকে সে না পেলেও কাটতে দিতে পারে না। কিন্তু নাসিরুদ্দিনের কাছে বিচার প্রার্থিনী সেই অশিক্ষিতা মেয়েটির মধ্যে মাতৃত্ব যেভাবে নিজের সন্তানকে দ্বিখণ্ডিত করবার কল্পনাতেই কেঁদে উঠেছিল, আজকের দেশের নেতাদের (কিংবা অভিনেতাদের!) সেই দেশকে দুভাগে ভাগ করে স্বাধীনতার আনন্দে উল্লসিত হতে দেখা যাচ্ছে। কারণ, তারা কাউকে হত্যা না করেই যা পেয়েছে আর কখনো তা হয়নি। হয়নি তা ঠিক ; এঁরা কাউকে হত্যা করেননি তাও ঠিক। এঁরা যা করেছেন, তার নাম আত্মহত্যা।

নকুলেশ্বর চৌধুরী ঃ নাটোর

নাথুরাম গড্‌সেকে মারাঠী বলা হয়েছে, অথচ কিছুদিন আগে কাগজে এক বিবৃতিযোগে জানানো হয়েছে, যে, যাকে সত্যিকারের মহারাষ্ট্রবাসী বলে, নাথুরাম কখনই তা নয়। তাহলে নাথুরাম আসলে কি জাত?

* বজ্জাত।

রাধারাণী চৌধুরী ঃ লেকভিউ রোড

এরকম একখানা কাগজ বার করার অর্থ বলতে পারেন?

* ছিঃ। মেয়ে হয়ে এত sensible কথা বলতে নেই।

কুমুদ দে ঃ টালা।

মহাত্মাজীর প্রিয় ছাগলগুলির কি হল?

* ঠিক জানি না। তারা আজো বেঁচে থাকলে হয়ত আছে খাদি প্রতিষ্ঠানে, নয় অভয়াশ্রমে।

রমেশ বসু ঃ টালা

অচলপত্রের ভাবখানা এরকম যেন এর আগে কখনো এর মত কাগজ বেরোয়নি এবং এর পরে ভবিষ্যতেও আর বেরোবে না। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করেই নেওয়া যায় যে, এরকম কাগজ আগে বেরোয়নি, তবুও ভবিষ্যতে যে বেরোবে না, তা কেউ বলতে পারে? সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না!

* আপনি তাহলে সত্যি করেই জেনে রেখে দিন যে, অচলপত্রের বর্তমান সম্পাদকের কলম যতদিন সচল থাকছে ততদিন এর মত কাগজ এ দেশে আর বেরোবে না। যুক্তির কথা যদি বলেন, তাহলে বলব, সূর্য যে কাল সকালেও উঠবে সে কথা আজ রাত্তিরেই বলে দেওয়া যায় না কি? কাল সূর্য-ওঠার মতই নিশ্চিত জানবেন, অচলপত্রের মত কাগজ আর বেরোবে না।

চপলাকান্ত চৌধুরী ঃ দমদম

আপনার লেখায় এত তাপ কেন?

* অণুমাত্র নেই। আপনার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। যাকে তাপ বলছেন, সে আমার অনুতাপমাত্র। অনুতাপ এই কারণে যে, দেশের যে দিকে তাকান, দেখবেন 'ভেজাল' এবং 'মেকি'রাই দেশ চালাচ্ছে। সজনীকান্ত দাস হলেন আমাদের সমালোচক। জীবনে এককলম সাহিত্য সৃষ্টি না করেও তিনি নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র এই ভদ্রলোক। দুঃখ তার জন্য নয়, দুঃখ হয় যাঁরা সত্যি গুণী এবং জ্ঞানী তাঁরাও এঁকে সমর্থন করেন দেখে। আমার লেখায় কোথায়ও যদি তাপ পেয়ে থাকেন, সেও এই কারণেই। শুধু তাই নয়, 'সমালোচনা' কথাটার দুটো ভাগ—এক 'আলো', আর 'চোনা'। যে সমালোচনায় আলোর উত্তাপ নেই একটুও তার শুধু চোনাই সার।

মালতী মিত্র ঃ ল্যান্সডাউন রোড

আমি 'অচলপত্রের' গ্রাহক হতে পারি না?

* না, কোনোমতেই তা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাকে যদি কিছু হতেই হয় তো 'অচলপত্রের' গ্রাহিকা হতে হবে।

মল্লিকা মল্লিক ঃ বালিগঞ্জ

'Snob' বলতে আপনি কি বোঝেন?

* কিছু বুঝি নে। যে সব জিনিস সারাজীবন নাড়াচাড়া করেও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাই যারা চট করে বুঝে ফেলে তারাই কি snob? না, গোটা দুয়েক ডিগ্রী পাবার পর, দুশো ডিগ্রী যাদের চাল বাড়ে, 'বাপ-মা ভারী সেকেলে', 'পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঠিক চালাতে পাচ্ছেন না', অথবা 'প্রফেসর আবার আমাকে কি বোঝাবে,' এই ধরনের ভাবখানা হয় যাদের, তারাই snob? অথচ মুখ দেখে এদের বোঝবার কিছু উপায় নেই। মানে snob তারাই, মুখে বৈষ্ণব বিনয় এবং মনে যাদের সকলের প্রতি তুচ্ছ ধারণা সেই বৈsnob-বিনয়ী বই snob আর কে বলুন?

আলোক রায় ঃ রাজা বসন্ত রায় রোড

মিঃ নন্দী আসবার পরও কলকাতা বেতারকেন্দ্রের তেমন উন্নতি কিছু হল না তো?

শুধু নন্দী-তে কি হবে? ভৃঙ্গীরা এখনো রয়েছে যে।

কেশব দাস ঃ টালিগঞ্জ

এ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি কি?

* গত কয়েকবছর যাবৎ বাংলায় সত্যিকারের ছবি যাকে বলে তা হয়নি। সবচেয়ে ভালো ছবি তাই কিছু নেই। তবে খারাপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ ছবি কি যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলব 'স্বয়ংসিদ্ধা'। এ ছবিব অসাধারণ জনপ্রিয়তা থেকে এই প্রমাণিত হয় যে আমরা 'সিনেমা'র এখনো কিছুই বুঝি নে। স্বয়ংসিদ্ধার কাহিনী শিশুশ্রাব্য,—এর চিত্রনাট্য বলে কিছুই নেই, অভিনয় একমাত্র দীপ্তি রায় ছাড়া আর সকলেরই অসহ্য। ফটোগ্রাফীর জন্য এ-ছবি যে পরিমাণে অশ্রুসজল, সেই পরিমাণেই হৃদয়বিদারক। সবচেয়ে খারাপ হল I.N.A. Pictures-এর ছবি—এই বিজ্ঞাপন। গুহমশাই প্রতিষ্ঠানের অন্য কোনো নামকরণ করলেই পারতেন। I.N.A. এমনকি খারাপ কাজ করেছে যার জন্যে 'স্বয়ংসিদ্ধা'র মত ছবি তোলবার কৃতিত্ব এই নামের কোনো প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে না দিলেই চলছিল না?

অনুতোষ রায় ঃ রাঁচী

আমাদের বাংলা দেশের মাটির কি গুণ বলুন তো?

* সব মাটি করে দেওয়াই এর বিশেষত্ব। যতই জোরালো কিছু এ মাটিতে গেড়ে বসবার চেষ্টা করুক, দুদিনেই তা জোলো হয়ে হাওয়ায় উড়ে যাবে। ধরুন 'মগেদের' কথা। কি দুর্ধর্ষ এই মগ—এদের ভয়ে সকলেই জুজুবুড়ি, অথচ বাংলাদেশে এসে এই 'মগ' সেই যে গোসলখানায় ঢুকেছে, আর ভয়ে বেরোবার নাম নেই।

রেবন্ত দে ঃ সাঁত্রাগাছি

আপনার কাগজের দ্বিতীয় সংখ্যাতেও দেখলাম 'এক' থেকে পত্রসংখ্যা শুরু—কিন্তু হওয়া উচিত প্রথম সংখ্যার পত্রসংখ্যা যেখানে শেষ তারপর থেকে আরম্ভ হওয়া। সকলেই issueগুলোর এমনি করেই নাম্বার করে।

* সকলেই করে বলে আমরা করিনে। আমাদের প্রতিসংখ্যাই নতুন সৃষ্টি, পুরাতনের জাবরকাটা নয়। আর তাছাড়া, ধরুন চল্লিশ বছর বয়সে যদি কারুর সন্তান হয় তো সন্তানের বয়স কি একচল্লিশ থেকে শুরু হয়, না, আবার সেই 'এক' থেকেই গণনা আরম্ভ হয়। সন্তানকেও তো 'issue'-ই বলা হয়ে থাকে না?

ননীগোপাল মল্লিক ঃ ইছাপুর

আপনার কাগজে বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু থাকে না কেন বলুন তো?

* কারণ, বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই থাকে না বলে, কাগজ বার করবার পরও, আমাদের পকেটে কিছু থাকে তাই।

নীলিমা দত্ত ঃ বালিগঞ্জ

'অচলপত্র' কত বিক্রী হয়?

* এখনো গোপন রাখছি। তবে জেনে রাখুন ১৩৫৫ সাল পেরোবার আগেই বাংলা সমস্ত মাসিক মিলিয়ে যত বিক্রী হয়, সে সংখ্যাও বোধ হয় অতিক্রম করে যাবে।

'অচলপত্রের' একজন পাঠিকা (নাম দেননি) ঃ কলিকাতা

আমি রাণীও নই, কেরানীও নই এবং করাচীতেও থাকি না, রাঁচীতেও থাকি না—মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে নিম্নতম শ্রেণী, তারই অসংখ্য দুঃখ দারিদ্র্যক্লিষ্ট সদস্যদেব (কথাটা কি ঠিক হল?) মধ্যে আমিও একজন এবং থাকি কলকাতার একটি অখ্যাত গলির একখানি পুরোনো বাড়িতে ভাড়াটেদের সঙ্গে কলজল ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়া করে। এইটুকু পড়েই আপনার চিঠির বাকিটুকু পড়ার উৎসাহ জল হয়ে গেল কি না জানি না।....বেতারের বিলিব্যবস্থা এইটাই প্রমাণ করে যে, সুরুচিসম্পন্ন শ্রোতা অপেক্ষা কুরুচিসম্পন্ন শ্রোতার (যদি কেউ থাকেন) সেবা করতেই তাঁরা অধিক আগ্রহশীল। এইটুকু যদি জানিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই গোলমাল বেধে ওঠে। তাঁরা হলেন সবজান্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁদের কাজের ভুলত্রুটি ধরার স্পর্ধা প্রকাশ করুন, দেখবেন, হয় আপনার সেই স্পর্ধিত পত্রখানি পথের মাঝখান থেকে রহস্যময়ভাবে উধাও হয়েছে নয় 'লাউডস্পিকার' মশাইএর গাঁক গাঁক ধ্বনি আর এক পর্দা চড়েছে।

* আপনার মস্ত বড় চিঠির জন্য মস্ত বড় ধন্যবাদ। আমরা সাধারণতঃ যেধরনের চিঠি পাই তাতে একটা জিনিস লক্ষণীয়। প্রত্যেকেই রসিকতার চেষ্টা করে, কায়দা-করা বাংলাতে চিঠি শুরু হয় কিন্তু বেকায়দায় পড়ে সমস্ত চিঠিটি একটি অদ্ভুত রসে গড়ায়, এক হাস্যকর অপচেষ্টায় খতম হয় তাদের হাতের-লেখা-সাহিত্য-সাধনা। এর কারণ কি জানেন?—কারণ হল, 'অচলপত্রে'র স্বাক্ষরবিহীন রচনাগুলি একটি বিশেষ স্টাইলের বাহক। সে 'স্টাইল' নিয়ে জন্মাতে হয়, চেষ্টা করে হয় না। আমাদের সাহিত্যের আদিকাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত এ স্টাইলে হয়ত সেই 'একজনেরই' মাত্র অধিকার। আর সকলের পক্ষেই তা অনধিকারচর্চা। আপনার চিঠিতে আপনি আপনার নিজের ভাষাতেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন, এ জন্যে ধন্যবাদ। আপনার চিঠিটা এত ভালো, জোরের সঙ্গে এত যাদু তার ভাষার যে, সন্দেহ হয়, এ বোধ হয় কোনো মেয়ের লেখা নয়। ক্ষমা করবেন, আমাদের দেশের মেয়েরা কেউ কেউ হয়ত চমৎকার ইংরেজী লেখেন, কিন্তু ভালো বাংলার প্রমাণ তাঁদের হাতে অল্পই মেলে। রেডিও সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন ও সম্বন্ধে আমার কোনো মন্তব্য নেই। মন্তব্যযোগ্যই নয়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাস্য ঃ আপনি রেডিও শোনেন এখনও? অথচ বলছেন আপনি রাঁচীর লোক নন?—বুদ্ধির দীপ্তি আপনার শুধু চিঠিতে—আপনার ব্যবহারে নেই কেন? পাগল ছাড়া আর কেউ কলকাতাকেন্দ্রের বেতার-অনুষ্ঠান নিয়ে মাথা ঘামায়? আপনিই বলুন না কেন।

তারাপদ রায় ঃ জোড়াসাঁকো

আপনি কি কাউকেই ভয় পান না?

* পাই। ছুঁচোতে আমার ভারী ভয়। ছুঁচো আর সজনীকান্ত দাসকে। মারবারও উপায় নেই, হাতে গন্ধ হয়।

প্রিয়শঙ্কর নন্দী ঃ ওয়েলিংটন স্কোয়ার

আপনার 'অচলপত্র' খুব উৎসুক হয়েই পড়ি। এ কথাও সত্যি, 'অচলপত্র' বেরোবার পর সংবাদপত্রের বাজারে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আপনার সব মতের সঙ্গে এক হতে

পারি না। সবচেয়ে দুঃখ পেলাম দেখে Statesman-এর সমালোচনা উদ্ধৃত করে আপনি টীকা করেছেন—"তারাশঙ্কর কথাগুলি অনুধাবন করলে ভাল করতেন।" অথচ এই Statesman সম্বন্ধেই আপনি অন্য জায়গায় (পৃষ্ঠা ৫) বলেছেন, "....ইংরেজদের অন্যায় কাজে সমর্থন...স্টেট্স্ম্যানশিপ ইত্যাদি।" সেই Statesman-এর ক্রিটিসিজ্‌ম্‌কেই আপনি এত value দিলেন কি ক'রে ভেবে আশ্চর্য হই।

* Statesman-এর রাজনৈতিক মতের সঙ্গে একমত নই বলে তার সাহিত্য মতামতের মূল্য দিতে অক্ষম হব কেন? দুটো বিষয় যে আলাদা। এই যে আপনি চিঠি লিখেছেন, এই থেকেই বোঝা যায় যে, আপনি লেখক হলে অত্যন্ত অক্ষম বাংলা-লেখক হতেন। কিন্তু তা থেকে এ বলা যায় কি যে, চেষ্টা করলে আপনি ভাল পকেটমার হতে পারতেন না?

সতীশচন্দ্র সাধুখাঁ ঃ কলিকাতা ৭

আপনার সম্পাদিত পত্রিকায় মন্তব্য পড়ে খুব খুসী হয়েছি এই জন্যে যে সকলে যা করে আপনারা ঠিক তার উল্টো করেন। আপনারা জনৈক লেখকের সমালোচনা করিতে গিয়া তাহাকে পাঁঠা পর্যন্ত বলিয়া গালাগালি দিয়াছেন। আপনারা যদি সকলে যা করে তার উল্টো করেন তবে হঠাৎ ইতর লোকদের গালাগালিতে ব্যবহৃত পাঁঠা শব্দ ব্যবহার করে তার বৈপরীত্য ঘটালেন কেন?

* রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা সকলেই জানে তা যিনি জানেন না, শুধু জানেন না নয়, অন্য লোকের নামে ছেপে বসে থাকতে পারেন, তাকে 'পাঁঠা' বলায় ইতরজনোচিত কাজ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বৈপরীত্য ঘটানো হয়নি। নাকি আপনি বলতে চান, ভদ্রলোককে 'পাঁঠা' বলায় পাঁঠারাও লজ্জিত হয়েছে?

দিলীপকুমার চক্রবর্তী ঃ রিচি রোড

বহুদিন অবধি আপনাদের 'অচলপত্র' নামক পত্রিকাখানা পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ কবিয়াছি। সময় সময় ইহা আমার 'laughing gas'-এর কার্য করিয়াছে।

* আপনি 'অচলপত্রে'র স্থূলত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এর হুলত্বের দিকটা বিস্মৃত হয়েছেন। না হলে দেখতে পেতেন, শুধু laughing নয়, 'অচলপত্রে'র কিছুটা bluffing-ও বটে ; কিছুটা চোখের জলও আছে! হাসি থেকে লাফ দিয়ে চোখের জলে গড়াতে তার একটুও তর সয় না। Laughing gas বুঝি tear gas হয়ে দেখা দেয় কখনো!

আনোয়ারউদ্দিন আহম্মদ ঃ এ্যাসিস্টেন্ট, সেন্ট্রাল এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ, ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাণ্ডারসন হাউস, কলিকাতা

....সত্যকথা বলতে কি অফিসফেরতা বাড়ির পথে যদি 'অচলপত্র' নজরে পড়ে যায় আর পকেটে যদি একটিমাত্র সচল বা অচল সিকি থাকে তবে তাই আপনাদের পকেটস্থ করবার ব্যবস্থা করে ট্রামের মায়া ছেড়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়। আপনি কি 'গাধার খাটুনি" (অনেক ভাল ভাল কাজেও এ কথাটা বলা হয়) খেটে লেখা অভ্যাস করেছিলেন?

* আপনি আহম্মদ বলেই এতবড় কথাটা বলতে পারলেন ; আহম্মকদের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি আনোয়ার বলেই রক্ষে, জানোয়ার হলে রাগে কাগজখানা কুটি কুটি করে ফেলতেন। "গাধার খাটুনি" কথাটা ঠিকই প্রায় আঁচ করেছেন ; তবে ঠিক গাধার খাটুনি নয়, গাধাদের জন্যেই আমার যা কিছু খাটুনি! তারা কিছুতেই নিম্নশ্রেণীর স্থূল রসিকতা ছাড়া 'অচলপত্রে' আর কিছুই দেখতে চায় না। 'অচলপত্রে'র এই গাধাদের পিটিয়ে পুটিয়ে কবে ঘোড়া করতে পারব, তাই ভাবছি।

বিষ্ণু ভট্টাচার্য ঃ পাইকপাড়া

আপনাদের প্রকাশিত 'পত্র' বাঁদরামোর সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভাষাটাষাগুলো একটু ভদ্র ও সংযত করবার চেষ্টা করুন ; কারণ, আপনাদের লিখতে কিছু আটকাতে না পারলেও দু

চারজন ভদ্রলোকও ওগুলো পড়ে ; তাদের পড়তে আটকায়।

* বিষ্ণু ! বিষ্ণু ! এ আপনি কি লিখেছেন? আপনার তো আটকাবার কথা নয়। অল্প যে দু-চারজন ভদ্রলোক ক্বচিৎ কদাচিৎ 'অচলপত্র' পড়েন তারা পাইকপাড়া, গোঁদলপাড়া, সোঁদরবন, কি পৃথিবীর কোথাও থেকে অকারণ চিঠি লেখেন না।

রবীন্দ্রনাথ কমল কর ঃ বড়বাজার

'চিঠিপত্রের জঞ্জাল' বিভাগটির ঠিক নীচেই লেখা উচিত ছিল পরিচালনা ঃ ঝাড়ুদার। কারণ, জঞ্জাল তো ওরাই পরিচালনা বা পরিষ্কার করে। আর, সেটি আপনি হোন বা আর যে কেউ হোক না কেন, তাতে কোনো ভয় নেই। কেননা অস্পৃশ্যতা তো উঠেই যাচ্ছে।

* ভাল কথা মনে করিয়েছেন ; সত্যি একজন ঝাড়ুদারের দরকার—এখন আপনি ঝাড়ুহাতে এসে দাঁড়াতে রাজি হলেই হয়।

এম. এন. দাস ঃ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট

কারণে অকারণে যে কাউকে খোঁচা দেওয়ার মধ্যে আত্মতৃপ্তি যতই থাক, ধরাকে সরাজ্ঞান করার মনোবৃত্তি অর্থাৎ নিরর্থক দাম্ভিকতার পরিচয়টাও কম প্রকাশ পায় না।

* সার্থকতমের দম্ভ সহনীয়। দেখুন, আপনার এই দীর্ঘ চিঠিটিও তার অন্যতম প্রমাণ। কোনো নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ামাত্র বাজারে এরকম সাড়া পড়তে দেখেছেন? দম্ভ যদি দুর্বলের হত, তাহলে আপনিই বলুন না, আপনি কি এই তিনপাতা চিঠি লিখতে বসতেন? আর, আপনার এই চিঠির মত ৩,০০০ চিঠি প্রতিমাসে আমরা পাচ্ছি। এগুলি কি প্রমাণ করে? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রথম উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র ; প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' দ্বিতীয় স্মরণীয় পত্রিকা। পত্রিকাজগতে শেষ চাঞ্চল্য এনেছিল 'কল্লোল'। দীর্ঘযুগ বাদে সাময়িকপত্রের সাম্প্রতিকতম হৈ হৈ 'অচলপত্র'কে নিয়ে। আগামী ১০ বৎসরে প্রমাণ হয়ে যাবে এর সম্পাদক সার্থকতম বাংলার স্রষ্টা। দম্ভ কি তবুও নিরর্থক বলতে চান?

দীপালী ঘোষ ঃ হুজুরীমল লেন

ভালবাসা যদি তুষের অনল, বলতে পারেন, বিবাহটা তবে কি?

* পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, যা একদিন সেই আগুন স্বেচ্ছায় ধরিয়েছিল।

অরুণকুমার সিংহ ঃ রক্তা খাঁ পাড়া, মজিলপুর

আজ, বাংলার ও বাঙালীর যেরকম বিপদ এর থেকে তারা কি পরিত্রাণ পাবে?

* না, পাবে না। কারণ, আজ আমরা যারা বাংলায় বাস করি—আমাদের চেয়ে অবাঙালী ভারতবর্ষে আর কোথায়? নিজেদের যত ক্ষতি আমরা নিজেরা করছি, অবাঙালীরা তার সিকিও করেনি। দলাদলির অভাব নেই ভারতবর্ষে কিন্তু বাঙালীই তার পথপ্রদর্শক—এ বিষয়ে সত্যি What Bengal thinks today, India thinks tomorrow ;—দেখুন না এইটুকু এই দেশে—এর মধ্যেই আবার ঘটি-বাঙাল বিরোধ নিয়ে আমরা উন্মত্ত। 'বাংলা' এখনো আছে, কিন্তু বাঙালী কোথায়?

খুকুমণি ভৌমিক ঃ লেক এ্যাভিনিউ

(চিঠির একদম শেষে লিখেছেন) ঃ (আপনার অসুবিধা যদি না হয়) তবে কি প্রয়োজন এই চিঠি ছাপার হরফে প্রকাশ করার?

* প্রয়োজন সামান্যই। যে কারণে 'শিশুসাথী', 'মৌচাকে' ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম ছাপতে হয় ; যে কারণে 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'বসুমতী'র ছোটদের পাতায় সভ্য-সভ্যাদের চিঠি ছাপতে হয় ; যে কারণে রেডিওতে অনুরোধের আসরে অনুরোধদাতাদের নাম প্রকাশ করতে হয়—অর্থাৎ, ঐ নামটুকু ছাপার অক্ষরে দেখবার জন্যেই তো এত পণ্ডশ্রম?—ও রোগ থেকে যে ধেড়ে খোকাখুকুরাও মুক্ত নন, চিঠিপত্তরের জঞ্জালই তার প্রমাণ।

বিজয় গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ব্যারাকপুর

"অচলপত্র" এত বিক্রী হচ্ছে কেমন করে?

* দুরকম করে ; এক হচ্ছে, যাদের এ কাগজখানা ভাল লেগেছে (সংখ্যায় যারা অত্যন্ত অল্প) তারা সকলেই এককপি করে কিনছে!—আর যাদের এ কাগজকে জঘন্য মনে হয়েছে (সংখ্যায় যাদের শেষ নেই) তারা কিনছে দু কপি করে (এক কপি বোধ হয় অন্যদের পড়াবার জন্যে)—লেখাগুলো খুবই জঘন্য লেগেছে কি না, তাই!

—কাজেই শত্রু যত বাড়ছে বিক্রী বাড়ছে ততই!

তপোব্রত সেনগুপ্ত ঃ কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

আপনার লেখা কার বিরুদ্ধে বেরোবে, শুধু কি সজনীকান্ত দাস আর তারাশঙ্করের বিরুদ্ধে, না, সমাজের যত কলঙ্ক, ঘৃণ্য পশু, শয়তানদের বিরুদ্ধে?

* সমাজের সমস্ত ঘৃণ্য পশু আর শয়তানদের বিরুদ্ধে লিখতে হলে নিজের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে লিখতে হয় বলে, তা করব না। আমি হচ্ছি সুবিধাবাদী প্রথমে, তারপর অবশ্য মহৎ আদর্শবাদী, কাজেই ঝোপ বুঝেই তবে কোপ মারব, নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

নির্মলেন্দু মান্না ঃ বড়বাজার

আমার চিঠির সবটাই ছাপাবেন।

* সবটা ছাপতে কমিশন বাদ দিয়েও পড়বে সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা এক পাতা বিজ্ঞাপনের দাম। দিতে পারবেন কি?

জনৈক পাঠক ঃ যাদবপুর কলেজ হোস্টেল

আপনি কুকুর না পাঁঠা?

* এর মধ্যে কোনটি হলে আপনার নিকট-আত্মীয় হওয়া যাবে?

গোপাল শিকদার ঃ ঘোষ লেন

ভারতের (পাকিস্তানেরও) মধ্যে সবচেয়ে বড় আহাম্মক কে? "পত্রের" মারফৎ জবাব পেলে সুখী হব।

* "অচলপত্র" প্রকাশ করার আগে ছিলাম আমি। 'অচলপত্র' প্রকাশ করবার পর তার পাঠকরা।

শ্রীবিশ্বম্ভর দয়াল মৌলিক ঃ বৌবাজার

জানি, এ চিঠির জবাব দেওয়ার মত সাহস হবে না।

* কি করে হবে—আমার তো আরো দু পা, একটা ল্যাজ ও একজোড়া শিং নেই আর!

মণিকা কব ঃ বেলগাছিয়া

সমালোচক হিসাবে আপনাকে বিশেষ তারিফ করতে পারলাম না।

* নাই বা করলেন। অন্যভাবেও তো তারিফ হতে পারে।

প্রতিবছর তিনটাকা দশানা পাঠিয়ে দেবেন—তাহলেই হবে। সেটাই 'অচলপত্রে'র যথার্থ Tariff কি না!

পী. ব. (ঠিকানা নেই)

কেনবার মত পয়সা নেই। আমি তাই ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েই অচলপত্র আর Foreign Affairs (মঁসিয়ে ভার্দু) যতদূর পারলুম, দেখলুম। বিশেষ করে 'অচলপত্র' পঞ্চম সংখ্যার বঙ্কিম কটাক্ষ। আপনি মানুষ, আপনি ভাই, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

* এ ক'মাসের মধ্যে গালাগালি আর প্রশংসা জুটলো সুপ্রচুর। আপনার মত আর কারুর চিঠি এমনভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। মনে হল, যেন চিঠির মধ্যে দিয়ে আরেকজনকে স্পর্শ করলুম। শরৎচন্দ্র বলেছেন, হৃদয়কে ছুঁতে হয় হৃদয় দিয়ে—তার অন্য আর কোনো

ভাষা নেই। আপনি আমার প্রীতি গ্রহণ করুন।

৮৯নং রাসবিহারী এ্যাভেনিউ থেকে

আপনার কলমটি কিসের দ্বারা তৈরী বলবেন কি?

* এই কলম এবং এটি যার হাতে শোভা পায় তারা দুজনেই 'Steel'-এর তৈরী।

ইন্দ্রাণী গুপ্তা ঃ মেদিনীপুর

প্রত্যেকের সমালোচনা করাই কি আপনাদের উদ্দেশ্য?

* না, কোনো কোনো লোকের সমালোচনা না করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যেমন, মহাত্মাজী (সমালোচনার বাইরে বলে), সুভাষচন্দ্র (সমালোচনার উর্ধ্বে বলে) এবং কোটি কোটি জনগণের স্বাস্থ্য, আচার-ব্যবহার এবং শিক্ষার সমালোচনা যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ তাদের না দেওয়া পর্যন্ত অর্থহীন বলে—এরাও আমাদের সমালোচ্য নয়।

দি. কু. সে ঃ হরিশ মুখার্জি রোড

(একটি লেখা পাঠাবার কিছুদিন পর পাঠিয়েছেন—"?")

* (আমার জবাব)—"Know"

বিনয়েন্দ্র সান্যাল ঃ চেতলা

...তাই অনুরোধ, প্রতি মাসে ছেলের দুধ গরম করার জন্য একটা করিয়া সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

* আমার নাতির কান্না ঠাণ্ডা করবার জন্য বার্ষিক তিনটাকা দশানা পাঠিয়ে আগে বাধিত করলেই আপনার অনুরোধও রক্ষিত হবে।

প্রীতিরাণী মিত্র ঃ জোড়াসাঁকো

'অচলপত্রে'র সাফল্যের পেছনে সম্পাদকরূপে যে ব্যক্তি আছেন তাঁকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

* এর পেছনে কোনো ব্যক্তি নেই—আছে একটি ব্যক্তিত্ব। দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালই সেই অধম যার মধ্যে দিয়ে এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত এই ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর আগে আর কেউ দেখা দেয়নি।

নিত্যপ্রসবিনী দেবী ঃ বনহুগলী

আমার নতুন বাড়ি, গৃহপ্রবেশ উৎসব হবে আগামী জানুয়ারীতে। বাড়ির একটা নামকরণ করে দিতে পারেন?

* আপনার বাড়ির নাম দিতে পারেন "আঁতুড় ঘর"।

আলোক দে সরকার ঃ হাতিবাগান

ভারতবর্ষে কি এত কম পাগল যে, মাত্র রাঁচীর একটা পাগলা গারদেই কাজ চলে যায়?

* একটা পাগলাগারদ আপনাকে কে বললে? অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতাকেন্দ্র, অ্যান্টিকরাপশান বিভাগ, ফিল্মসেন্সরবোর্ড—এগুলি তাহলে কি?

পৃথিবীর মধ্যে কোথাকার পাগলাগারদ সবচেয়ে বড়?

* পৃথিবীর বৃহত্তম বাতুলালয়ের নামটি খুবই ছোট ঃ U.N.O.

মনোতোষ বসু ঃ বর্ধমান

যাদের আপনি গালাগালি দিয়ে নীচু করতে চাইছেন, জেনে রেখে দিন, তাঁরা আপনার চেয়ে অনেক ওপরে আছেন।

* স্বভাবতঃই। কয়েকশো জন্ম আগে আমিও তাই ছিলাম। এখন গাছ থেকে আমি নেমে এসেছি, ওঁরা নামেননি। নেমেই, এখনো ওপরে আছেন দেখে কোনোরকমে ওদের নামানো যায় কি না দেখছিলাম। দেখলাম—না, গাছের ওপরে থাকাই ওঁদের বাঞ্ছনীয় এবং আপনাদেরও ওদেরকে ওপরে রাখাই অভিপ্রেত। আমি একা আর কি করি বলুন?

নকুল দে ঃ ঢাকা

সকলকে জুতো মেরেই কি আপনার কর্তব্য শেষ?

* না, গরুদান করে তবেই নিষ্কৃতি।

ভবপ্রসাদ মল্লিক ঃ বাঁকুড়া

আপনার লেখা পড়লে বেশ বোঝা যায় মানসিক অসুস্থ আপনি।

* ঠিক ধরেছেন। আপনি তো ধরবেনই, একজাতীয় লোক কি না?

মিনতি সেন ঃ বরাহনগর

'অচলপত্রে'র মত আর কয়েকখানা কাগজ বেরোতে পারে না?

* না। একখানাই মাত্র সম্ভব, কারণ, এখন একজনই দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল আছেন।

কেতকী সরকার ঃ বেহালা

শুনেছি আপনার কথাবার্তা আপনার লেখারই মত। আপনি নাকি কখনো অখুশী নন। এরকম লোক এখনো এ যুগে আছে তা'লে?

* সাবা সপ্তাহে আধঘণ্টা আমার মেজাজ খারাপ হয়।—কিচ্ছু করতে পারি না আমি সেই সময়টাতে। রবিবার সকালে পঙ্কজ মল্লিকের গান শেখাবার সময়টুকুর কথা বলছি।

প্রতুল দে সরকার ঃ আলিপুর

গাঁজা, চরস, চণ্ডু, সিগারেট, বিড়ি—কি ফুঁকতে বাকী আছে আপনার এখনো?

* শিঙে!

ললিত গাঙ্গুলী ঃ সিমলা স্ট্রিট

অধিকাংশ বাঙালীর রোগটা কি বলতে পারেন?

* বর্তমানে একমাত্র রোগ হচ্ছে, অচলপত্রের সম্পাদককে অকারণে চিঠি লেখা!

অশ্বিনী সুকুল ঃ হ্যারিসন রোড

আপনি কি Professor D. K. Sanyal?

* আমার লেখা পড়ে কি আমায় Professor হওয়ার মত বোকা মনে হয়?

মালবিকা সেন ঃ যশোহর

কংগ্রেসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কি বলতে পারেন?

* Founded—১৮৮৫ খ্রীঃ। ১৯৪৮ খ্রীঃ—Dumbfounded।

তরুণ ঘোষ ঃ শালকিয়া

পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য সমস্ত দেশের মানুষকেই খেতে হয় এমন কোনো খাবারের নাম জানেন?

* আজ্ঞে হ্যাঁ জানি। ধোঁকা!

মহেন্দ্র পাগল ঃ হরিপুর

সজনীকান্ত দাসকে তো আপনি পাত্তাই দিতে চান না। তা আর কিছুর জন্য না হোক, একটা কাগজের সম্পাদক তো তিনি বটে। এবং সে কাগজ অনেকদিনের এবং আপনার কাগজের চেয়ে অনেক বেশী তার কাটতি।

* সম্পাদক হলেই যদি সাহিত্যিক হয়, তাহলে নামের শেষে মিঞা আছে বলে ডালমিয়াকেও মুসলমান বলতে হয়।

নলিন মিত্তির ঃ ঢাকা

মানুষের জীবনের সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় চর্চা কি? রুটি? আর্ট। না, ধর্ম?

* রুটি। আগে ব্রেড, তারপরে বাটার, তারপর বাটারফ্লাই।

চন্দ্রশেখর রায় ঃ কলিকাতা

আপনার পত্রিকার নাম 'অচলপত্র' না দিয়ে 'বাচালপত্র' দিলেই ভালো হত।

* ঠিক। আপনার নাম 'চন্দ্র' হওয়া সত্ত্বেও, আপনাকে যেমন অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করা ছাড়া উপায় নেই আর।

হরিভূষণ মাইতি ঃ হবিগঞ্জ

আপনি 'ন্যাশনালিজম্' না 'ইণ্টারন্যাশনালিজম্'—কিসে বিশ্বাসী?

* 'ন্যাশনাল', 'ইণ্টারন্যাশনাল' কি আর কোনো 'আল' নয়—আমি হচ্ছি আদি এবং অকৃত্রিম সান্‌আল্। আমি প্রথমতঃ প্রধানতঃ ও শেষতঃ বাঙালী। আমি প্রাদেশিকতায় বিশ্বাসী এবং তার জন্যে নগরপাল, প্রদেশপাল, দেশপাল কি মেষপাল কারুর ভয়েই ভীত নই, লজ্জিত নই, সঙ্কুচিত নই। বাঙালীকে মেরে ভারত বাঁচবে না। নিজেরই মারণাস্ত্রে ঘায়েল হবে। শরীরের কোনো অংশে পচ ধরলে সেটাকে না সারিয়ে শরীর সারাবার জন্য যারা ভিটামিনের স্বপ্ন দেখে, তারা অসুস্থ। সেই মানসিক অসুস্থতায় সমস্ত অবাঙালীসম্প্রদায় এখন ভুগছে।

আলোময়ী দে ঃ বেহালা

নির্ভীক সাংবাদিকতা কি জিনিস?

* অচলপত্র।

কল্যাণ বসু ঃ হালদারপাড়া

রাস্তায় পথিকদের গুঁতোবার জন্যে প্রস্তুত 'ষাঁড়'গুলিকে সরাবার কোনো বন্দোবস্তই সরকার করতে পারেন না?

* পাগল নাকি? ওরা যে ধর্মের ষাঁড়। আর তাছাড়া, ষাঁড়দের মেরে ফেলতে শুরু করলে শেষকালে হয়ত ডোমিনিয়ন গভর্মেণ্টের কয়েকটি মন্ত্রী ছাড়া আর একটিও ষাঁড় এ দেশে থাকবে না। সেটা ভালো হবে কি?

প্র. কু. রা ঃ মেডিকাল কলেজ

মুচির জল খেলে ব্রাহ্মণ যায় মুচি হয়ে, কিন্তু ব্রাহ্মণের জল খেলে মুচি কেন ব্রাহ্মণ হবে না?

* যেহেতু কুকুরে মানুষকে কামড়ালে, মানুষের জলাতঙ্ক হতে পারে, কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে মানুষাতঙ্ক হয় বলে শোনা যায়নি।

শ্রীরাধা ও বিজয় পাল ঃ চেতলা

Love before marriage ও Love after marriage—কোন্‌টা ভালো?

* কোনোটাই নয়। আপনি যাকে Love ভাবছেন, আসলে তা লোকসান।

শ্রীঅরুণচন্দ্র বাগচী ঃ লেক রোড

বা. না. দা. লিখিয়াছেন, নেহরুর 'Discovery of India' তাঁহাকে হতাশ করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় একজন নগণ্যতম লোক হতাশ হইলে পণ্ডিত নেহরুর Morocco Leather-এর জুতা হইতে যদি এককণা ধূলিও ঝরিয়া পড়িত, তাহা হইলেও বুঝিতাম, তাঁহার বৈকুণ্ঠের পথ উন্মুক্ত হইল—কিন্তু সে সম্ভাবনাও নাই!

* নেহরুর জুতো মরোক্কো লেদারের এটা কি সুবাদে আপনি জানতে পারলেন, তা জানি নে, তবে যে কথাগুলি আপনি লিখেছেন সেগুলি অত্যন্ত হাস্যকর, অর্বাচীনোক্তির মত শুনিয়েছে। কারণ, আপনি art বা literature সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই লিখেছেন... "নগণ্যতম লোক হতাশ হইলে"...ইত্যাদি ; কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো নগণ্যতম লোক যদি সত্যি সত্যি হতাশ হয়, তাহলে তা সে বইয়ের লেখকের পক্ষে মোটেই এড়িয়ে যাবার নয়। শিল্পী কাউকে হতাশ করে না। সত্যকার যা ভালো লেখা তার আবেদন সর্বলোকে—কোনো লোকের কাছেই তা খর্ব হবার নয়। এরপর আবার একটি বোকার মত কথা বলেছেন আপনি, যে, "তাজমহলের সৌন্দর্য এবং পণ্ডিত নেহরুর ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের

সমালোচনা করিতে রাঁচীর পাগলাগারদের সর্বশ্রেষ্ঠ পাগলেও বোধ হয় সাহসী হইবে না।" কিন্তু ইতিমধ্যেই একজন হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর নাম নেহরুর চেয়ে বোধ করি কিছুদিন বেশীই টিকবে। টিকবে—পরস্পরের গা চাটাচাটিতে অভ্যস্ত বোদা পলিটিশিয়ান হিসেবে নয়, টিকবে পৃথিবীর প্রাজ্ঞ চিন্তানায়ক হিসেবেই। সেই ভদ্রলোকের নাম আপনি ছাড়া আর সব নগণ্যতম লোকেরাই শুনেছে। তাঁর নাম অলডাস হাক্সলি। তিনি তাজমহলের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কি লিখেছেন, পড়ে দেখবেন।

অপর্ণা ভট্টাচার্য ঃ স্বর্গদ্বার, পুরী

এ যুগে সাহিত্যিক হতে হলে কি একখানি হাতই যথেষ্ট?

* না, কিছু হাতানোও দরকার।

বাবলা দাঁ ঃ শ্যামবাজার

আমাদের সঙ্গে বেশী চালাকি করবেন না, আমরা আপনার সব হিস্ট্রি জানি।

* তবু রক্ষে যে, আমার জিওগ্রাফিটুকু জানেন না।

সত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ঃ (ঠিকানা দেননি)

আধুনিকা মেয়েদের প্রেম নিছক হুইল আর সুতোর খেলা জেনেও ছেলেরা কেন তাদের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে?

* কারণ, প্রাচীনা মেয়েদের প্রেম গঁদ এবং ডাকটিকিটের মত অবিচ্ছেদ্য হলেও তাদের সঙ্গে প্রেম করা অসম্ভব বলে।

পুষ্পেন্দু মুখার্জি ঃ স্কট লেন

প্রকৃত ভালবাসা ও ভাল বাসা—কোন্‌টা পাওয়া শক্ত?

* নরেন দেবকে চিঠি দিন।

অমর সান্যাল ঃ এলগিন রোড

'চন্দ্রলেখা' দেখে কি মনে হল আপনার?

* মনে হল এখনও যদি আমরা, আমরা মানে বাঙালী চিত্র প্রতিষ্ঠানেরা অবহিত না হই, তাহলে আর পাঁচবছরের মধ্যেই আমাদের কপালে অর্ধচন্দ্র লেখা।

লক্ষ্মী রায় ঃ রাঁচী

অন্যের কাছ থেকে কি পেলে আপনি খুসী হন,—শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না প্রীতিজ্ঞাপন?

* যা পেলে সত্যিই খুসী হই তার নাম "বিজ্ঞাপন"

নীহার চৌধুরী ঃ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট

ব্লিৎসের মত গালাগালিতে গালাগালিতে ক্যাপিটালিস্টদের ভূত করে দিতে পারেন না?

* পারি ; যদি না তাদের বিজ্ঞাপন চাইতুম তার পরেই! অতটা এখনো পারি নে—ভারী লজ্জা করে।

সুশীল বসু ঃ মহানির্বাণ রোড

C. S. P. C. A. —এর মানে কি?

'C' হল কংগ্রেস। S. P. হল Socialist Party। মাঝের 'S' বাদ দিয়ে C. P. হল Communist Party। সবটা মিলিয়ে ওর মানে Calcutta Society of Preventing Cruelty to Animals।

নীলিমা বসু ঃ শ্রীরামপুর

বিবাহের সংস্কৃত মন্ত্র অর্থ আজকের দিনে কেউ বোঝেও না, অথচ বলতে হয় প্রত্যেককেই বিয়ের সময়—এটা বাংলায় অনুবাদ করে বললে কি দোষ হয়?

* সংস্কৃত মন্ত্রটির পুরো সংস্কার হওয়া দরকার। শুধু ভাষার নয়, অর্থেরও। অর্থাৎ, আমার হৃদয় তোমার হোক, এ কথা আজকের দিনের বরবধূর মুখে উচ্চারিত হওয়ার মত

ছলনা আর কি হতে পারে? ওর চেয়ে বলা উচিত, "তোমার পার্স আমার হোক, আমার বাবার ব্যাঙ্কব্যালান্স তোমার হোক"...ইত্যাদি। তাই নয় কি?

প্রতিমা দে সরকার ঃ বাজে শিবপুর

সত্যিকারের পর্দানসীন মেয়ে আজকের দিনে কেউ আছে আমাদের দেশে?

* আছে ; সিনেমায় যে সমস্ত মেয়ে নামে এক হিসেবে তারা সবাই পর্দানসীন মেয়ে। তাই না?

শ্রীভৃগু ঃ শিবপুর

* আপনার চিঠির ভাষা ও মতামতের মধ্যে দিয়ে যে ক্লেদাক্ত আত্মগরিমা আপনি প্রকাশ করেছেন, তাতে "ভৃ" কথাটা আপনার নামের ক্ষেত্রে একটা অতিরিক্ত অক্ষর মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

ইন্দ্রভূষণ সাধু ঃ লাটুবাবু লেন, কলকাতা

পুঃ, আমার নামটা হয়ত আবার আপনার বিশেষ সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। আশঙ্কা কেবল সেইটাই!

* ছিঃ! আপনার সঙ্গে সাধু বা সাধুত্বের যা সম্বন্ধ তা শুধু ঐ নামেই শেষ। জীবনের আর কোথাও তার সঙ্গে কোনোই যোগ নেই, না?—কাজেই আশঙ্কার কি আছে?

সৌরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ ২৪ পরগণা

শীঘ্রই লোকগণনা হবে। তাতে কেবল মানুষদের গণনা হবে বলেই তো জানি। কিন্তু তাতে অহিংসপূজারী, অন্নদাতা, দেশহিতৈষী মন্ত্রীমণ্ডলীকে কি নেওয়া হবে?

* না। তাদের এবং বনমানুষদের বাদ দেওয়া হবে বলেই শুনেছি।

বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২৮, রাসবাগান লেন, বেলেঘাটা

...এককথায় চলতে গেলে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত 'অচলপত্র' একটা আঁস্তাকুড়, ডাস্টবিন, পচা নর্দমা...

* মিথ্যে কথা! তাই যদি সত্যি হবে, তাহলে 'অচলপত্রে'র ঠিকানা, ২৭ সি চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ না হয়ে ২৮, রাসবাগান লেন, বেলেঘাটা হত না কি?

মোহনলাল ঘোষাল ঃ গোপাল ব্যানার্জি স্ট্রিট

আপনার 'অচলপত্র' পড়ে আমার হাসি পায়নি!

* আপনার তো হাসি পায়নি, তবু রক্ষে! অনেকের আবার হাসি শুকিয়ে এসেছে 'অচলপত্র' পড়ে। 'অচলপত্র' হাসির কাগজ নয়। চার্লি চ্যাপলিনের ছবিকে যে গাধা হাসির ছবি বলে, 'অচলপত্র' পড়ে তারাই হাসবার চেষ্টা করে।

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ঃ রায়বাহাদুর রোড, বেহালা

বউ কাছে থাকলে বই পড়া যায় না, আর বউকে উপেক্ষা করে বই পড়ায় মন দিলে প্রথমা চটে ওঠেন। কি করি বলুন তো?

* কাজ কি হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে, তার চেয়ে বউ নিয়ে পড়ুন।

সাধনচন্দ্র পাত্র ঃ আসানসোল

আচ্ছা, ঠিক কোন্ বয়সে আধুনিক যুগে ছেলেদের ও মেয়েদের B.A. দেওয়া উচিত?

* (প্রে) M. A. পড়বার আগেই।

শেফালী ঃ বালিগঞ্জ

আপনার সঙ্গে পরিচয় হোক, এটা চাই না বলেই চিঠি লিখলাম, আপনার অহঙ্কারের মাত্রা বাড়াতে নয়। না হলে, সোজা গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আপনার কৈফিয়ৎ তলব করতাম।

* ছিঃ, মিথ্যে কথা লিখবেন না! আপনি বালিগঞ্জের মেয়ে নন কিছুতেই। বালিগঞ্জের

মেয়েরা এখনো সোজা হয়ে কারুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবতে পারে?

অকারণে চিঠি লিখবেন না। 'অচলপত্র' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমাদের কার্যালয়ে বেশ সুস্থমস্তিষ্কে কাজ করা চলত। এখন চিঠির ঠেলায় 'অচলপত্রে'র অফিস রূপান্তরিত হয়েছে পোস্টঅফিসে। কিন্তু যেহেতু দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালই এর একমাত্র লেখক, পাঠক, ম্যানেজার, হকার এবং পিওন, সেহেতু ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে একা সামলানো দায় হয়ে উঠেছে। কাজেই চিঠির মাত্রা দয়া করে কমান।

সম্পাদকের মন্তব্য (স.ম.) ঃ– 'চিঠিপত্তরের জঞ্জাল' অচলপত্রের জনপ্রিয়তম ফিচার। উত্তর দিতেন সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার স্বয়ং।



—তোমাকে ডিফেন্ড করতে হবে! বেশ তোমার টাকা কড়ি কিছু আছে?
—না স্যার! একটা গরু আর চারটে মুরগী মাত্র আছে...
—বেশ, বেশ, ওতেই হবে। তোমার বিরুদ্ধে কি চুরির অভিযোগ করা হয়েছে?
—একটা গরু আর চারটে মুরগী...

কবির অভাব!

মহাকবি কালিদাস বেরুচ্ছেন বাড়ি থেকে ; বউ সাংসারিক অভাবের কথা জানাতেই, কালিদাস বিগড়ে গেলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস সেদিন কথা বলছেন না দেখে রাজা প্রশ্ন করলেন ঃ কবির জিবে সরস্বতী আজ অবতীর্ণ হচ্ছেন না কেন? কবি উত্তর দিলেন ঃ জঠরের অগ্নিতে সরস্বতীর বস্ত্র ভস্মীভূত! নগ্না সরস্বতী তাই বেরুতে লজ্জা পাচ্ছেন।

'অচলপত্র' প্রথম সংখ্যা

অচলপত্রের প্রথম সংখ্যার জন্য লোকমুখে এবং পত্রাঘাত করে, অনেকে কাগজ আর পাওয়া যাবে কি না জানতে চাইছেন। কাগজ আর পাওয়া যাবে না। অনেকেই 'প্রথম সংখ্যা' বাজারে দেখাই যায় নি—এ অভিযোগও করেছেন। ক্রমশঃ আমাদের সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে যে, অচলপত্রের প্রথম সংখ্যা আদৌ কোনদিন বেরিয়েছিল কি না। তিনবার বেরোবার পরেও অচলপত্রের প্রথম সংখ্যা অদ্বিতীয় হয়েই রইল।

প্রথম সংখ্যা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হবার কারণ কিন্তু অসামান্য কাটতি নয়—অতি সামান্য ছাপাবার জন্যেই আমাদের এ অবস্থা। কেন বেশী ছাপাই নি, এ প্রশ্ন তোলা নিরর্থক, কারণ, দ্বিতীয় সংখ্যা ডবল ছাপাবার পর এখন দেখছি সিকিও কাটেনি।

আমরা শুধু আশা করে আছি কবে এমন দিন আসবে, যেদিন প্লেগ আর কলেরার মত 'অচলপত্র' পড়াটাও সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে দেখা দেবে। আর, 'অচলপত্র' পড়ার রোগ সারাবার টীকা দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল যতদিন আছেন ততদিন কেউ আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন না, তা জানি।

এটিকে 'অচলপত্রে'র বিজ্ঞাপন হিসেবে ধরে সব কথা বিশ্বাস না করলেই ভালো।



—তিনঘন্টা স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছ না, তাতেই এত উতলা? আমি ৩০ বছর ধরে একটা স্বামী পাচ্ছি না...

সে বেঁচে আছে না মরে গেছে

নিশীথ মজুমদার

[এ গল্প শেষ করবার পর বুঝবেন যে, এত ভালো গল্প নিশ্চয়ই অরিজিনাল হতে পারে না। আপনি ক্লেভর বাঙালী পাঠক, আপনি তো বুঝতে পারবেনই যে, বাংলায় ভালো লেখা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটা কোথা থেকে নেওয়া, তা লেখকের মনে নেই।]

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন এলাহাবাদে বৈজনাথের দোকানে আড্ডা মারতাম আর চা চালাতাম, গুলজারখানা ছিল সেটা—ছোট, মাঝারি এবং বড়র, বড় মানে বিত্তশালী অবস্থাপন্নর কথা বলছি। প্রভুদয়াল এইরকম একজন—সুপুরুষ দেখতে (আমার চেয়ে অনেক বড়—অবস্থায় তো বটেই, বয়সেও)—তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়।

একদিন দুজনে বসে আমরা চা খাচ্ছি...হঠাৎ প্রভুদয়াল আমার কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, "ঐ যে ভদ্রলোকটি বেরিয়ে যাচ্ছেন, ওঁকে ভালো করে দেখে নাও, খুব ভালো করে..."

"কেন?"

"জানো, ও কে?"

"হ্যাঁ, এর আগে ওকে এখানে কয়েকবার দেখেছি। শুনেছি বড় ব্যবসাদার। সিল্কের কারবার করেন। নাম কি Some সোম। মনে হয়, ভদ্রলোকটির কেউ নেই, কারণ চোখে মুখে কিরকম এক বিষাদভাব এবং দেখেছি কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না। তুমি ওকে চেনো না কি?"

ভাবলাম, প্রভুদয়াল এবার বেশ দরাজকণ্ঠে সোমগাথা গাইবে। কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একসময় বলে উঠল, "না, মনে পড়ছে না।"

"কার লেখা মনে নেই। তবে গল্পটা বড় সুন্দর"—প্রভুদয়াল চায়ে এক চুমুক দিয়ে বল্লেঃ "গল্পের একাংশ এইরকম ঃ এক বালক এক পাখী পুষতো, পাখীটাকে খুব ভালওবাসতো। কিন্তু বালক-সুলভ চপলতাবশতঃ, পাখীটাকে সে শেষে অবহেলা করতে লাগল। পাখীটা দিনমান গান গাইতো। কেউ শুনতো না, সেদিকে কানও দিতো না। শেষে এমন হল, পাখিটা নিয়মিত দানাপানি পেতো না। ক্রমশঃ তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, বেসুরো এবং নিস্তব্ধ হয়ে এল—

তারপর গেল মারা। বালকের তখন মনে আঘাত লাগলো। পাখীর শোকে চোখ দিয়ে জলও বেরোলো। তখন সে তার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বেশ সমারোহে পাখীটাকে সৎকার করলো...কিন্তু হতভাগারা জানে না যে, একমাত্র তারাই শুধু গুণীজনকে উপবাসে মেরে তার স্মৃতিকে অমর করবার জন্য অসীম সমারোহে তার সৎকার সমাধান করে নি। যাই হোক, কি বলছিলাম যেন। হ্যাঁ, আরেকটা গল্প শোন। বহুবছর ধরে আমার কাছে এবং আরো তিনজনের কাছে এ কথা গোপন ছিল। কিন্তু আজ আমি সেই গোপন কথা প্রকাশ করছি।"

তারপর প্রভুদয়াল যা বললো তা এইরকম ঃ

বহুবছর আগে আমি একজন তরুণ শিল্পী ছিলাম—নাবালক বলতে পার—ঘুরে ঘুরে ছবি

আঁকতাম। এইভাবে আমার মত ঘুরে ঘুরে ছবি-আঁকা দুজন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে আমার মোলাকাৎ ঘটলো। এই তিন তরুণ আমরা যেরকম সুখী ছিলাম, ঠিক সেইরকম গরীব ছিলাম, অথবা যেরকম গরীব ছিলাম, ঠিক সেইরকম সুখী ছিলাম—কথাটা যেভাবে পছন্দ হয় তুমি সাজিয়ে নাও। তাদের একজনের নাম বাদল...অন্যজনের নাম ভৈরব...চমৎকার ছেলে তারা, অভাবঅনটনকে ভ্রূক্ষেপ করে নি কোনোদিন, সমস্ত অবস্থাতে তারা দিল খুলে হাসত। এইভারে ঘুরে ঘুরে একখানে এসে আমরা এমন অভাবের তাড়নায় পড়লাম যে, তখন আমাদের মতই গরীব আরেকজন শিল্পী রবিপ্রসাদ সে যাত্রায় আমাদের বাঁচায়—"

"কে? রবিপ্রসাদ? শিল্পী..."

"নামী? তখন আমাদের চেয়ে কোনো অংশে নামী সে ছিল না। দেশের লোক তখন তাকে পুঁছতো না। এবং সে তখন এতই গরীব ছিল যে, আমরা এই চারপ্রাণীতে মিলে বহুদিন শুধু ভিগুি আর অমরুদ খেয়ে দিন কাটিয়েছি, তাও অনেকদিন জুটতো না। দেখতে দেখতে আমরা এই চার শিল্পী অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। বিরাট উৎসাহ এবং শক্তি নিয়ে তখন আমরা ছবির পর ছবি এঁকেছি, কখনো কখনো দু একখানা বিক্রী করতেও সক্ষম হয়েছি, একসঙ্গে আমরা সুখেই ছিলাম, তবে সময় সময় যে আমরা অতিষ্ঠ না হয়েছি এমন নয়।

এইভাবে প্রায় দুটি বছর আমরা কাটালাম; শেষে একদিন বাদল বল্লে, "নাঃ! গুঁড়ো হয়ে গেলাম। বুঝতে পারছো, তার অর্থ কি? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব এবার। এখানে সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মের ঘট তুলে ধরেছে। সাফ সাফ বলে দিয়েছে, এবার ধার চাইতে গেলে হাতের ধার দেখিয়ে ছাড়ব। ধরণ বোঝ এবার।"

শুনে কাঠ হয়ে গিয়ে ভাবলাম, ধরা কি আর আমাদের ধরে রাখতে পারবে না! অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না। অবশেষে রবিপ্রসাদ একটা শ্বাস নিয়ে বল্লে, "এতে আমার কিছু এসে যায় না—স্রেফ কিছু না। অন্য কিছু যদি বাতলাবার থাকে তবে তাই বাতলাও।" উত্তর নেই, তবে যদি গুমোট নিস্তব্ধতাকে উত্তর বলো, সে কথা আলাদা।

"লজ্জার কথা!" ভৈরব উঠে দাঁড়ালো, বার কয়েক পায়চারী করে নিয়ে বল্লে, "কাগজ ক্যানভাসগুলির দিকে একবার চেয়ে দেখো—বিলিতি ছবির চেয়ে কোনো অংশে কি এগুলি খারাপ?...আজ্ঞে না, যারা এগুলি দেখেছে তারা সবাই একবাক্যে এগুলির প্রশংসা করেছে।"

"কিন্তু কেনে নি"—রবিপ্রসাদ বলে উঠলো।

"না কিনলো, প্রশংসা করেছে তো। এবং তা তো সত্যিও। তোমার ঐ 'মা হারা' ছবিটাই ধরো না। আমাকে যদি কেউ বলে—"

"হুঁঃ, আমার 'মাহারা' ছবি! ও ছবির জন্য আমাকে ত্রিশটাকা দিতে চেয়েছিল।"

"কখন?"

"কে চেয়েছিল?"

"কোথায় সে?"

"কেন নিলে না?"

"আরে—একসঙ্গে সবাই চেঁচিও না। আমি ভেবেছিলাম, সে আরো বেশী দেবে—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম—কারণ, ছবিটা সে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল—তাই আমি পঞ্চাশ টাকা চেয়ে বসেছিলাম।"

"বেশ—তারপর?"

"বললে, ভেবে দেখতে হবে তাহলে।"

"লে হালুয়া! কেন তুমি—"

"জানি, জানি। ভুল করে আমি বোকা বনে গেছি। কিন্তু, আমি ভালোর জন্যেই

চেয়েছিলাম। তবে তোমরা যদি বলো তাহলে আমি--"

"নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে! সুমতি হোক তোমার, আর কিন্তু বোকামি করো না।"

"আমি? আরে! এবার যদি কেউ এসে বলে ঐ ছবিটার জন্যে তোমাকে আমি হালুয়া দেবো তাহলে..."

"হালুয়া! ও কথা মুখে এনো না—হালুয়ার নামে মুখে আমার জল এসে যায়। শক্ত কিছু একটা বলো যাতে দাঁত ভেঙে যায়।"

"দেখো"—ভৈরব এবার বল্লে, "আমার একটা কথার উত্তর দাও। এইসব ছবি কি বাজে ছবি?"

"না।"

"এসব ছবি কি খুব উচ্চাঙ্গের ছবি নয়? আমার কথার উত্তর দাও।"

"হাঁ।"

"এতই উচ্চাঙ্গের যে, এসব ছবির নীচে যদি কোনো নামী শিল্পীর নাম জুড়ে দেয়া যায়, তাহলে অসম্ভব দামে তা বিকোবে। তাই নয় কি?"

"নিশ্চয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

"আমি ঠাট্টা করছি না।"

"নিশ্চয়—এবং ঠাট্টা আমরাও করছি না। কিন্তু তাতে হয়েছে কি? আর, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই বা কি?"

"সম্পর্ক এই—ও সব ছবিতে আমরা একজন নামী শিল্পীর নাম জুড়ে দিতে চাই।"

উপভোগ্য বিতণ্ডা বন্ধ হয়ে গেলো, অবাক হয়ে সবাই ভৈরবের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, এটা কোন্ জাতের মস্করা হতে পারে? নামী শিল্পীর নাম কোথা থেকে পাব? কে তা ধার দেবে?

ভৈরব বসে পড়লো, তারপর বল্লে, "এবার আমি একটা সাঙঘাতিক কথা বলতে চাই। আমার মনে হয় এবং আমার বিশ্বাস, এটাই একমাত্র পথ, যদি আমরা বাঁচতে চাই। মানব-ইতিহাসের অগণিত সুপ্রতিষ্ঠিত নজিরের উপর নির্ভর করে আমি এ কথাগুলি বলছি। আমি বিশ্বাস করি, এই পথেই আমরা বড়লোক হব।

"বড়লোক! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

"না। মাথা খারাপ হয় নি।"

"নিশ্চয় হয়েছে—তুমি পাগল হয়ে গেছ ভৈরব। বড়লোক বলতে কি বোঝো তুমি?"

"এক একটা ছবি আমরা পাঁচশো টাকায় বিকোব"।

"এই রে, ছেলেটা সত্যি পাগল হয়ে গেলো।"

"আলবাত। না খেতে পেয়ে পেয়ে তোমার আজ এই অবস্থা ভৈরব, এবার—"

"তোমার দাওয়াই দরকার ভৈরব। দাওয়াই গিলে শয্যাগ্রহণ তোমার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

"আগে ওর মাথায় পট্টি বেঁধে দাও, তারপর—"

"মাথায় না, পায়ে পট্টি বেঁধো আগে, আমি লক্ষ্য করছি, কয়েক সপ্তাহ থেকে মাথাটা ওর—"

"থামো"—গম্ভীরস্বরে এবার রবিপ্রসাদ বলে উঠলো, "ওর বক্তব্য ওকে আগে বলতে দাও। ভৈরব, তুমি কি বলতে চাইছ, বলো।"

'বেশ, তাহলে তোমাদের আমি ইতিহাসের নজির দেখতে বলছি। বহু গুণী শিল্পীর গুণ স্বীকৃত হয়েছে তখন, যখন অনাহারে উপবাসে তারা মরণকে বরণ করে নিয়েছে। এবং এসব ঘটনা এত ঘন ঘন ঘটছে যে, তাতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—অখ্যাত

এবং অবহেলিত প্রত্যেক গুণী শিল্পীর নাম এবং তার ছবির দাম অমূল্য হয়ে উঠতে বাধ্য তার মৃত্যুর পর। সুতরাং আমার বক্তব্য ঃ আমাদের একজনকে মরতে হবে। সেজন্য লটারী করো, যার নাম উঠবে তাকে মরতে হবে।"

কথাটা এত অপ্রত্যাশিত এবং এত আচমকাভাবে ভৈরব বলে বসল যে, আমরা প্রথমে থ হয়ে গেলাম। তারপর আবার উপদেশ—সেই ডাক্তারী উপদেশ বর্ষণ হতে আরম্ভ করলো ভৈরবের বিকৃত মস্তিষ্কের উপকারার্থে। উপদেশের হুল্লোড় শান্ত না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু ভৈরব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইলো, তারপর আবার বলতে শুরু করলো ঃ

"হ্যাঁ, আমাদের একজনকে মরতেই হবে, আমাদের অন্য তিনজনকে এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের একজনকে মরতে হবে। লটারী করো। যার নাম উঠবে সে হবে বিখ্যাত এবং আমরা সবাই বড়লোক হব। চুপ, আমাকে বাধা দিও না—আমি জানি, আমি কি বলছি। যাকে মরতে হবে, আমার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে আগামী তিনমাসের মধ্যে তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ছবি এঁকে যেতে হবে, গাদা গাদা ছবি আঁকতে হবে—না, ঠিক ছবি নয় ; স্কেচ, স্কেলিটন স্কেচ, মানে ডজনখানেক তুলির টান—রেখার সমষ্টি শুধু ; কিন্তু শিল্পীর নামটা ছবির নীচে, পাশে বা ওপরে প্রধান দ্রষ্টব্য হয়ে ফুটে থাকা চাই ; প্রতিদিন এইরকম ছবি পঞ্চাশটা করে সৃষ্টি করা চাই, প্রত্যেকটার মধ্যে একটা বিশেষত্ব বা ভঙ্গী থাকা চাই, যাতে দেখেই চেনা যায় যেন এটা একই শিল্পীর আঁকা—এসব ছবিই শিল্পীর মৃত্যুর পর অমূল্য দামে বিক্রী হয়ে নানা ম্যুজিয়মে কালে রক্ষিত হয়ে থাকবে, এইরকম একমণ ছবি আমাদের তৈরী করে নিয়ে রাখতে হবে—হ্যাঁ, একমণ। এই সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট আমরা এই মুমূর্ষু শিল্পীকে জিইয়ে রাখতে কর্মব্যস্ত হয়ে উঠব—এদেশ সেদেশ ঘুরে আগতপ্রায় দুর্ঘটনার পথ পরিষ্কার করে প্রস্তুত হয়ে থাকব। মানে, দেশ, কাল এবং পরিস্থিতি যখন গমগমে হয়ে উঠবে তখন আচমকা এই গুণীশিল্পীর অকালমৃত্যুর খবর দেশবাসীর কাছে তুলে ধরব এবং এক বিরাট শোকসৎকার সমাধান করব। আমার পরিকল্পনাটা এবার বুঝতে পারলে?"

"না, মানে ঠিক—"

"বুঝতে পারলে না, এই তো? না বোঝার কি আছে এতে শুনি? শিল্পী সত্যি সতিাই মরবে না। তাকে স্রেফ নাম ভাঁড়িয়ে পগার পাড়ি দিতে হবে। আর, আমরা তার একটা কৃত্রিম শবদেহ শুধু সৎকার করে দেশের এবং দশের সঙ্গে শোকপ্রকাশ করব মাত্র। আর, আমি..."

কিন্তু ভৈরবকে তার বক্তব্য শেষ করতে দেওয়া হল না। তখন আমরা সবাই অধীর আনন্দে অস্থির হয়ে ভেঙে পড়েছি। সে কি নাচানাচি,—সে কি হুল্লোড় তখন আমাদের। তারপর সেই বিরাট পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য আমরা আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্কবিতর্ক এবং গবেষণা করে সন্তোষজনক শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যখন, তখন ভাগ্যপরীক্ষায় লটারী করা হল। তাতে নাম উঠল রবিপ্রসাদের—মানে তাকেই মরতে হবে আর কি!

তারপর যার যা আমাদের বিক্রী করবার মত ছিল তা বেচেবুচে দিয়ে পথের পাথেয় রেখে এবং রবিপ্রসাদের কিছুদিনের আহারসংস্থান করে রেখে বাদবাকিতে বেশ চমৎকার ফলাহারে ভোজ সমাধা করে পরদিন সকালে রবিপ্রসাদকে ভুবনবিখ্যাত করবার মানসে প্রত্যেকে আমরা তার ডজনখানেক ছোট বড় ছবি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দিগ্বিজয়ে। ভৈরব গেল কলকাতায়। আমি আর বাদল রওনা হলাম পশ্চিমে।

তুমি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, সে দিনগুলি আমাদের কি সহজ সুখে আর আরামে কেটেছে। আমরা কাজ শুরু করবার আগে আমি প্রথমে এই এলাহাবাদে আসি। এখানে

এসে প্রথমেই আমি এক বাগানবাড়ী আঁকতে শুরু করি—কারণ, বাড়ীর মালিককে আমি তার লনে পায়চারী করতে দেখি। খানিকবাদে তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন—আমি জানতাম যে, তিনি আসবেন। আমার প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করবার জন্য আমি তখন দ্রুত তুলির টান টেনে চললাম। ক্রমে ক্রমে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে আমায় বলে বসলেন, আমি নাকি একজন ওস্তাদ শিল্পী।

তুলি রেখে দিয়ে তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার ব্যাগের ভেতর থেকে রবিপ্রসাদের একখানা ছবি বের করে ছবির কোণে শিল্পীর নামের দিকে দেখিয়ে গর্বভরে বলে উঠলাম, "আমার মনে হয়, আপনি এই নামটা চিনতে পারছেন? ইনিই আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, ওঁর আশীর্বাদে আমি গুণী শিল্পী হয়ে উঠতে পারব।" ভদ্রলোক এবার কাঁচুমাচু মুখে চুপ করে গেলেন। আমি মলিনভাবে তখন বল্লাম, "আমার মনে হয়, আপনি রবিপ্রসাদের হস্তাক্ষর চিনতে পারছেন না!"

বাস্তবিক তিনি তা চেনেন না, কি করে চিনবেন? তবে ভদ্রলোকের মত অমন কৃতজ্ঞ পুরুষ তুমি কদাচিৎ দেখতে পাবে। তাই তিনি সেই অবস্থাতে নিজেকে খাটো করতে চাইলেন না। বললেন, "না। হ্যাঁ, নামটা রবিপ্রসাদের বলেই তো মনে হয়। প্রথমে আমি ধরতে পারি নি। এখন চিনতে পারছি বটে।"

তারপর তিনি ছবিটা কিনতে চাইলেন। কিন্তু আমি বললাম যে, আমি যদিও বড়লোক নই, তবু একান্ত গরীবও নই। যাই হোক, অবশেষে সেই ছবিটা আমি ভদ্রলোকের কাছে পাঁচশো টাকায় বিক্রীই করে দিলাম।

"পাঁচশো টাকায়?"

"হ্যাঁ। রবিপ্রসাদ সেটা হয়ত একপ্লেট হালুয়াতেই বেচে দিত। কিন্তু আমি ঐ ছোট ছবিটা পাঁচশো টাকায় ভদ্রলোককে দিয়ে দিলাম, পরে পেলে আমি হয়ত ওটাকে পাঁচহাজার টাকায় আবার কিনে নিতাম। কিন্তু সে দিন চলে গেছে। ভদ্রলোকের বাগান বাড়ীর ছবিটা আমি চমৎকার এঁকেছিলাম, সেটা তখন তাকে দশটাকায় দিয়ে দিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু অতবড় গুণী শিল্পীর শিষ্য হয়ে তা সঙ্গত বোধ না করায় মাত্র পঞ্চাশ টাকায় সেটাও ভদ্রলোককে বিক্রী করে দিলাম। তারপর সেখান থেকে সেই পাঁচশো টাকা সোজা রবিপ্রসাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে পরদিন আমি এলাহাবাদ ছাড়লাম।

এলাহাবাদে দুদিন মাত্র পায়ে হেঁটেছিলাম। কিন্তু তারপর আর পায়ে হাঁটি নি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি টাঙ্গা, ট্যাক্সি আর ট্রেনে করে বেড়াচ্ছি। প্রতিদিন একখানা করে ছবি বিক্রী করতাম, ভুলে কক্ষনো দুখানা ছবি বিক্রী করতে চেষ্টা করতাম না। এবং সব সময়েই আমরা খরিদ্দারদের বলতাম, "আমি নিতান্ত আহাম্মক তাই রবিপ্রসাদের ছবিখানা বিক্রী করলাম, কারণ, তিনি বোধ হয় আর তিনমাসও বাঁচবেন না, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আঁকা ছবি কি আর টাকার মূল্যে পাওয়া যাবে?—তা যাবে না।"

যতটা সম্ভব সাবধান হয়ে অল্প কথায় এই গল্প ছেড়ে ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করে চলতে লাগলাম।

ছবি বিক্রী করবার এই পরিকল্পনাটা একান্তভাবে আমার নিজের। এই পরিকল্পনানুযায়ী আমরা তিনজনে চমৎকার উৎরে যেতে লাগলাম।

কখনো কখনো আমরা খবরের কাগজে খবর ছাপাতে দিতাম, এই বলে নয় যে,—নতুন এক প্রতিভাবান শিল্পী আবিষ্কৃত হয়েছে, খবর পাঠাতাম এইভাবে যেন দেশের সবাই রবিপ্রসাদকে চেনে। তাকে কোনোরকম প্রশংসা করেও খবর ছাপাতাম না। কাগজে খবর থাকতো শুধু তার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে—কখনো কিছুটা ভাল, কখনো খারাপ, তবে সবসময়েই আশঙ্কার একটা ছাপ মেশানো থাকতো। খবরের কাগজের সেই খবর দাগ

দিয়ে দিয়ে সবসময়েই সেই সমস্ত লোকের কাছে পাঠিয়ে দিতাম যাদের কাছে আমরা রবিপ্রসাদের ছবি বিক্রী করতাম।

ভৈরব ছিল ডাহা ধুরন্ধর, দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রথম দিন সে শুধু একবেলা পায়ে হেঁটেছিল (বাদল হেঁটেছিল মাত্র দুদিন) ; তারপর সে রাজার হালে চলতো। ভৈরব কলকাতায় সমস্ত বড় বড় কাগজওয়ালাদের ধরে রবিপ্রসাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সারা দুনিয়ায় মহা ঘটা করে ছেড়ে দিতে লাগলো।

আমাদের কাজ শুরু করবার মাত্র ছয় সপ্তাহ পরে আমরা তিনজন কলকাতায় একত্র হয়ে রবিপ্রসাদকে আর ছবি পাঠাতে নিষেধ করে দিলাম। তখন পরিস্থিতি এত সরগরম হয়ে উঠেছিল যে, তখন তখন বন্ধ করে না দিলে ভয়ানক ভুল করে বসতাম। কাজেই রবিপ্রসাদকে দেরী না করে শয্যাগ্রহণ করতে চিঠি লিখে দিলাম এবং এও লিখলাম যে, যত তাড়াতাড়ি পারে মরতে চেষ্টা করে যেন, কারণ, আমরা চাই, সে যেন দশদিনের মধ্যেই খতম হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে।

তারপর আমরা তিনজনে হিসাব করে দেখলাম, ছোট-বড় মিলিয়ে পঁচাশীখানা ছবি বিক্রী করে আমরা তেতাল্লিশ হাজার টাকা মুনাফা করেছি। ভৈরব শেষ ছবি যেটা বিক্রী করেছে সেটাই সবচেয়ে ভাল ছবি ছিল। রবিপ্রসাদের 'মাহারা' ছবিখানা সে বাইশশো টাকায় বিক্রী করেছে। কি বলে যে তাকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছিলাম ! তখন একথা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি যে, এই 'মা-হারা'র জন্য কালে লোক পাগল হয়ে উঠবে এবং বাইশশোর জায়গায় বাইশহাজার দিয়ে তা কিনে নেবে!

পরদিন আমি আর বাদল মৃত্যুশয্যায় রবিপ্রসাদকে শুশ্রূষা করতে ফিরে চলে এলাম। এসে প্রতিদিন রবিপ্রসাদের স্বাস্থ্যের বুলেটিন কলকাতায় ভৈরবের কাছে পাঠাতে লাগলাম। ভৈরব সেখান থেকে সমস্ত খবরের কাগজ মারফৎ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে লাগলো। সবশেষে শোকাবহ নির্দিষ্ট দিনটি এসে গেলো এবং ভৈরবও ঠিক সময় এসে রবিপ্রসাদের সৎকারে আমাদের সাহায্য করলো। তোমার হয়তো মনে আছে, সেই বিরাট শোকসৎকারের কথা ; কি বিপুলভাবে তা দেশে দেশে সাড়া নিয়ে এসেছিলো। আমরা চারজনে--তখন অত্যন্ত অভিন্ন আত্মা ছিলাম,--সেই মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম, অন্য কাউকে তা স্পর্শ করতে দিই নি। কারণ, শবদেহটা ছিল মোম দিয়ে তৈরী, অন্য কেউ যদি তা বহন করতো, তাহলে ওজন বুঝেই সব ফাঁকি ধরা পড়ে যেতো। সেইজন্য সম্পূর্ণ সতর্ক হয়ে আমরা সেই চার বন্ধু মিলে যারা দুঃখ-দৈন্য-অভাবের মধ্যে এক হয়ে দিন কাটিয়ে এসেছি হাসিমুখে, সেই চারজন শবদেহ নিয়ে--"

"কোন্ চারজন?"

"আমরা চারজন--কারণ, রবিপ্রসাদকেও তো তার নিজের মৃতদেহকে বহন করতে হয়েছিল। অবশ্য ছদ্মবেশে--দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় হিসেবে।"

"সাঙ্ঘাতিক কথা বলছ তুমি!"

"সাঙ্ঘাতিকই, তবে সত্যি। তারপর তোমার মনে আছে হয়তো, রবিপ্রসাদের ছবিগুলো কি দামেই না বিক্রী হয়েছে! টাকা? আমরা জানি না, তা দিয়ে কি করব। এলাহাবাদেই একজনের কাছে রবিপ্রসাদের সত্তরখানা ছবি আছে। সেগুলোর জন্য তিনি আমাদের প্রায় তেত্রিশহাজার টাকা দিয়েছেন। তারপর আমরা ছয় সপ্তাহ ধরে যখন দেশে দেশে ঘুরে কাজ করেছি এবং সেইসময় রবিপ্রসাদ বাসায় বসে বসে ছবি এঁকেছে, যা নাকি অর্থহীন তুলির টান ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই ছবিগুলো এখন আমরা কত দামে বিক্রী করছি তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে--মানে, যদি একান্তই আমাদের তা বিক্রী করবার বাসনা হয়। বুঝলে তো?"

"বুঝেছি। গল্পটা অদ্ভুত বটে!"
"শুনলে তাই মনে হয়।"
"তারপর রবিপ্রসাদের কি হল?"
"একটা কথা গোপন রাখতে পারবে?"
"হ্যাঁ, পারব।"
ঐ যে কিছুক্ষণ আগে যে ভদ্রলোকটি এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন, উনিই রবিপ্রসাদ।"
"আ—চ্ছা!"

"অবাক হয়ে গেলে, না? অবাক হবারই কথা। এই হয়তো প্রথম একজন প্রতিভাবান শিল্পীকে অনাহারে উপবাসে মরতে দেওয়া হয় নি এবং যে বিপুল অর্থ এবং পুরস্কার তার একার প্রাপ্য ছিল তা অন্যদের মধ্যেও বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পাখীটাকে অবহেলিত হয়ে কণ্ঠকাকলি বৃথা অপচয় করে মরণ বরণ করতে হয় নি, তারপর তাকে মহাসমারোহে বৃথাই সৎকার করা হয় নি। আমরা তো এ-ই চেয়েছিলাম।

[১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৫৫ থেকে সংকলিত]



ওই জন্যে আমি অফিস অবস্ট্যাকল রেসে
নাম দিতে চাইনি.....

রুগী — ডাক্তারবাবু, অপারেশন করবেন নাকি?
ডাক্তার — না, না, ভয় নেই, দরকার না হলে করব কেন?
রুগী — দরকার কিনা কবে বুঝবেন?
ডাক্তার — আমার পকেট খালি হলে! টাকার দরকার না হলে আমি ছুরীতে হাতই দিই না!

বঙ্কিম কটাক্ষ

'অচলপত্রের' বার্ষিক মূল্য জমা দিয়ে বহুদিন আগে যাঁরা গ্রাহক হয়ে আছেন তাঁরা অনেকেই এখনো পর্যন্ত কাগজ পান নি ; অথচ গ্রাহক মূল্য তো নয়ই, এমনকি চারানা দিয়েও কাগজ যারা কেনে নি, এমন অনেকের হাতেই একখানা করে 'অচলপত্র' ঘুরতে দেখা গেছে। পয়সা না দিয়ে 'অচলপত্র' পড়াটাই যে এদের মধ্যে একমাত্র মিল তা নয়, লক্ষ্য করে দেখা গেছে বিভিন্ন জায়গার লোক হলেও এঁদের কর্মস্থল কিন্তু এক, এঁরা সকলেই পোস্টাপিসে চাকরী করেন।

*　　　*　　　*

'অচলপত্র' দুমাসেরও কম সময়ে প্রচুর মানে প্রায় দশবারো কপি বিক্রী হয়ে গেছে ; এইভাবে বিক্রী হতে থাকলে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের আগেই আমরা প্রায় একশো-দেড়শো করে বাজারে ছাড়তে পারব বলে আশা করছি।

*　　　*　　　*

"একটা ছোবি এসেছে, শুনেছিস? নাচ আছে ভালো ভালো, কিন্তু অডিনারী লোক একেবারে লিচ্ছে না ছবিটাকে। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে ওপরের কথাগুলো বললে একজন। যার উদ্দেশে কথাগুলো বলা, ঘোড়ার গাড়ীর মাথা থেকে সে জবাব দিলে, "আমি দেখে লিয়েছি রে। খুব হাইক্লাস পিকচার, কিন্তু লোকে বুঝছে না একেবারে।"

উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' সম্বন্ধে তাদের এই আলোচনা কি না জানি নে।

*　　　*　　　*

চারানা পয়সা জলে না দিয়ে 'অচলপত্র'কে দিন।

*　　　*　　　*

দাঙ্গা, আশ্রয়প্রার্থীসমস্যা, আজ খাবার নেই, কাল কাপড় নেই, মহামানবের মৃত্যু,--সারা চুয়ান্ন সালটাই যেন Unholy ; এরি মধ্যে একটি দিন গেছে গত ২৫শে মার্চ যেদিন ছিল শুধু হোলি।

*　　　*　　　*

লোকে খেতে পাচ্ছে না বলে যারা দেশের সরকারকে দোষ দেয়, তাদের কি অন্যায় বলুন তো? এখনো তো সিনেমায় যাবার পয়সার অভাব হয় নি।

*　　　*　　　*

সবচেয়ে পরিশুদ্ধ বাতাসেও কিছুটা দূষিত পদার্থ ভেসে আসবেই। বৈজ্ঞানিকের অভিমত হল এই।

আর কোথাও থেকে না আসুক, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের প্রোগাম চালু থাকলেই তো তা আর আটকানো যাবে না।

*　　　*　　　*

'স্টেট্সম্যান' পত্রিকা তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বার করে আমাদের কিনতে বলছেন। গত পঁচিশ বছর ধরে ইংরেজদের অন্যায় কাজের সমর্থন, আমাদের নেতাদের পঞ্চমবাহিনী প্রমাণ করা এবং সেইসব যুক্তিগুলো আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গলাধঃকরণ করানো, এই তো স্টেটসম্যানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস! সেই ইতিহাস আমাদের কাছেই বিক্রী করবার জন্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন রোজ। একেই বলে স্টেট্স্‌ম্যানশিপ।

*　　　*　　　*

অনেকে বলছেন, আমাদের কাগজের "অচলপত্র"—এই অদ্ভুত নামের জন্যেই এত বিক্রী

হচ্ছে! আমরা জানি, তা নয়। নামের জন্যে নয়, বদনামের জন্যেই হচ্ছে। স্টলে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখুন, কেউ কাগজটাকে বলছে, 'বেশ হয়েছে'—আবার আরেকজনের মন্তব্য তৎক্ষণাৎ, "জঘন্য"! কিন্তু কিনছে দুজনই। একজন কিনছে, ভালো লেগেছে বলে ; আরেকজন কিনছে, ভালো লাগে নি বলে। ফল একই অবশ্য ঃ অচলপত্রের বিক্রী বাড়ছে।

* * *

'অচলপত্র' প্রথম সংখ্যা নেই। অন্যান্য পত্রিকার কথা ভেবে কথাটাকে অবিশ্বাস করবেন না। সত্যিই নেই। লাইব্রেরী থেকে, ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে অনুরোধ আসছে দেবার জন্যে, অন্ততঃ এক কপি। কেউ যদি আমাদের এক কপি দিতে রাজী থাকেন তো আমরা বেশী দাম দিয়ে কিনতেও গররাজী হব না। আদালতে পত্রিকা এখনো জমা দেওয়া হয় নি। আমরা একটু শঙ্কা বোধ করছি সেই কারণে। আপনারা কেউ কাগজখানা ডাস্টবিনে ফেলে না দিয়ে পড়া হয়ে থাকলে এখানে পাঠিয়ে দিন না কেন।

* * *

আসাম-বাংলা বিরোধের আসল রহস্য জানা গেল এতদিনে এক অসমীয়া ভদ্রলোকের কথাবার্তায়। বাঙ্গালীরা যে অসমীয়াদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে তাদের দেশে এর মূলে নাকি বাঙ্গালীরাই আছে। বাংলায় নাকি চুরি-ডাকাতি, নারীহরণ, ধর্ষণ, যা কিছু কুকাজ সংঘটিত হয় সবই আমরা আসামীদের ঘাড়ে চাপাই। হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, বিহারী, যেই করুক দোষ, সাজা হয় আসামীর। এতকালের এই বিরূপ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই নাকি এই বাঙ্গালী নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে। সেই অসমীয়া ভদ্রলোককে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে, এ আসামী মানে culprit, আসাম-প্রদেশী কেউ নয়।

* * *

আমাদের এই পত্রিকা দেরীতে বেরোনোর জন্য অভিযোগের আর অন্ত নেই। এ অভিযোগ আমরা মানতে প্রস্তুত নই। উনিশশো আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীর এইরকম একটি পত্রিকার জন্য যখন অপেক্ষা করে থাকতে পেরেছে তখন আমাদের পাঠকরাও পনেরোদিন সবুর করতে পারবে।

* * *

"বন্দেমাতরম্" আর "জনগণমন'—এ দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাকে জাতীয় সঙ্গীত করা নিয়ে মতদ্বৈধতা হয়েছে। আমাদের মনে হয়, দুটোকেই বাদ দেওয়া উচিত। কারণ, ও সব বাঙালীর লেখা বাংলা গান। সারা ভারতের জন্যে চলবে কেন?

হিন্দুস্থানীর লেখা শ্রেষ্ঠ সর্বজনবোধ্য জাতীয় সঙ্গীত হল, "চানাচুর গরম বাবু, মোলায়েম মজেদার চানাচুর গরম।" এটাই হিন্দীসাহিত্যের একমাত্র সম্পদ যা বাংলা থেকে চুরি নয়।

* * *

বাঙালীরা বোকা, তারা কাঁঠাল খায়। অবাঙালীরা কাঁঠাল ভাঙ্গে বাঙালীদের মাথায়।

* * *

হার্ট ফেলিওরে মহম্মদ আলি জিন্নার মৃত্যু থেকে অনেকদিনের প্রকাশিত একটা মিথ্যা ধরা পড়ে গেল। হার্ট তাহলে ছিল তাঁর একটা?

একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে যে, মহম্মদ আলি জিন্না নিজেই টেবিল চাপড়ে বলতেন, "Faliure" বলে কোনো জিনিস কখনো তিনি জানেন নি!

শুধু Heart failure ছাড়া। এটা যোগ করে যাওয়ার সময় পান নি তিনি।

* * *

অনেকের যে ধারণা যে, 'এক নম্বর ডাস্টবিন প্লেস' এই ঠিকানা লিখে শহরের যে

কোনো আবর্জনা পাঠালেই তা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছবে, এটা একদমই ভুল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের ঠিকানা হল, এক নম্বর গার্স্টিন প্লেস।

* * *

সেন্ট্রালের বাজেটে ঘাটতি সহজেই পূরণ করবার উপায় ছিল। কিন্তু সরকার সেদিক দিয়ে যান নি। তার কারণ অবশ্য, দরকারী উপদেশ দেওয়ার মত লোকও আজ বেশী নেই। অথচ দেখুন, ডাক, সুপারী, কাগজ ইত্যাদির ওপর কর না বসিয়ে যদি কর বসানো হত—

(১) বক্তৃতার ওপর, তাহলে কত লাভবান হতেন সরকার। অবশ্য এ থেকে ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের বাদ দিলে চলত না। এ ব্যবস্থা সম্ভব হলে এক নেহরুই কত টাকা দিতে পারতেন সরকারকে। চাই কি, তেমন যুৎসই মঞ্চ সারা বছর পেলে পুরো মাইনেটাও দিতে গররাজী হতেন না। বিনে পয়সায় প্রধানমন্ত্রী পেতাম আমরা একজন।

(২) দ্বারোদঘাটন। ছবি বা মূর্তি উন্মোচন ইত্যাদির ওপর ; স্বাধীন ভারতে রোজ কত টাকা সরকার পেতে পারতেন এগুলির ওপর কর বসালে।

(৩) ধর্মঘটের ওপর। এতে রোজ টাকা পেতেন সরকার। টাকা না পেলে ধর্মঘটও কমে যেত।

(৪) জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশ্যে গীত হবার ওপর। এতে যত্র তত্র জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা কমে যেতেও পারত।

সরকারকে এগুলো ভেবে দেখতে বলি।

ডেফ এ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল

অনেকের যে ধারণা ডেফ এ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল এখন কলকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে উঠে এসেছে সেটা একদম ভুল। টেলিফোন অপারেটররা তাছাড়া পুরো বোবাও নয় ; ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করে তারা এখনো "নাম্বার প্লিস" এ দুটি কথা উচ্চারণ করতে পারে এবং তারপর "no reply" অথবা "engaged, sorry" বলতে একটুও সময় নেয় না।

পোস্টাপিসের ধর্মজ্ঞান

যত কাগজপত্তর বেরোয় তার সবই যে পোস্টপিসের গর্ভে খোয়া যায় এ সত্যি নয় ; কোনো ধর্মপত্রিকাই যথা Aryan Path, উদ্বোধন, গীতা—তাঁরা কখনো ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেন না। কাজেই এইসব কাগজের গ্রাহকদের কখনো অভিযোগ করতে শোনা যায় না যে, "এত তারিখ হইয়া গেল, অথচ আপনাদের কাগজ এখনো ইত্যাদি....."

[১ম বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যা থেকে সংকলিত]

স,মঃ—'বঙ্কিম কটাক্ষ' অচলপত্রের আরেকটি জনপ্রিয় ফিচার। এই বিভাগে সম্পাদক ছাড়াও আরো কেউ কেউ লিখতেন।



আধুনিক

অজিত দত্ত

সবচেয়ে অনায়াসে—বিন্দুমাত্র চেষ্টা, কণামাত্র কষ্টস্বীকার না করেও যাকে আয়ত্ত করা যায়, সেই চিরনতুন কিন্তু সবচেয়ে পুরোনো জিনিসটির প্রতি আমাদের মোহ আর ঘুচবার নয়। সেই বস্তুটি হচ্ছে আধুনিকতা। যারা আজ বর্তমান রয়েছি, ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় আমরা সকলেই যে আধুনিক কালের, আধুনিক সমাজের, আধুনিক জগতের মানুষ সে বিষয়ে আপত্তি করতে পারি না। যদিও, আপনি ভাবছেন, স্টালিনই মোক্ষদাতা, আমি ভাবছি গান্ধী আর আমার মাসতুতো ভাই হয়ত ভাবছে হিটলার। আপনি পরছেন রাশিয়ান কামিজ, আমার বন্ধু পরছেন মার্কিনী চামড়ার কুর্তা এবং আমি পরিধান করছি পাশে বোতাম দেওয়া কলিদার পাঞ্জাবী। আপনি রাখছেন বাবরি, আপনার বামপন্থী বন্ধুরা রাখছেন দাড়ি ও আমি রাখছি জুলপি। আপনি একদিন অন্তর উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' দেখতে যাচ্ছেন, আমার বন্ধুরা দেখছেন 'ক্ষুদিরাম' আর আমি সিনেমা দেখাই ছেড়ে দিয়েছি। আপনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পেরিয়ে হয়ত এসে পৌঁছেছেন অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব বসুতে, অপরে এসেছেন মঙ্গলাচরণ আর সুশীল জানায় আর আমি পৌঁছেছি জীবনানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রে। আমরা সকলেই স্থির জানি, আমরাই এবং আমাদের দেখবার ও বোঝাবার ভঙ্গীটাই চরমতম আধুনিক, আধুনিকতা বস্তুটি আমাদেরই একচেটে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, আধুনিকতা জিনিসটার কোনো মার্কা নেই। বেতার কর্তৃপক্ষ যখন "আধুনিক গান" শোনান, তখন তাঁরা ভাবেন যে, তাঁরা ভারি একটা আধুনিক জিনিস পরিবেশন করছেন। তাই যাকে আমারা রুচির পক্ষে লজ্জাকর এবং সঙ্গীতের পক্ষে অপমানকর বিকৃতি বলে মনে করি, তাকে অকুণ্ঠ গর্বে তাঁরা ছড়িয়ে দেন আধুনিকতার লেবেল এঁটে। আবার মন্ত্রীমহাশয়রা যখন বলেন যে, দেশের স্বার্থে জনসাধারণকে ক্রমশই বেশী করে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তবেই দেশের ও জাতির মঙ্গল হবে, তখন তাঁরা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে, খুব নতুন ধরনের কিছু বলা হয়েছে, যদিও আমাদের মনে হয়, কথাগুলো খুবই পুরনো এবং দেশের অকর্মণ্য শাসকরা চিরকালই মূর্খ জনগণকে এই ধরনের কথা শুনিয়ে এসেছে। আমরা ভাবছি আমরাই আধুনিক, মন্ত্রীরা ভাবছেন

আধুনিক যুগের তাঁরাই প্রতিনিধি ও মুখপাত্র।

স্পষ্টই বোঝা যায়, আধুনিকতা নামীয় ব্যভিচারী জিনিসটি সকলেরই অঙ্কশায়ী হতে সর্বদাই প্রস্তুত, যদিও কারুর কাছেই সে বেশীক্ষণ থাকে না। কাল যা আধুনিক ছিল, আজ তা-ই পুরনো, "প্রতিক্রিয়াশীল।" আবার, যদিও আমাদের অবচেতন মন সর্বদাই জানে যে, আজকের আধুনিকতাই কালকে সেকেলে হয়ে যাবে, তবু সচেতন মনে আমরা সর্বদাই গর্বিত যে, আমাদের মত আধুনিক আর "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।" এই জন্যেই দেখা যায়, বুদ্ধিমান লোকেরা আধুনিক হতে চান না, চিরন্তন হতে চান। তাঁরা থাকতে চান না ফ্যাশনের জলের আল্পনা হয়ে, বাঁচতে চান পাথরে খোদাই অনুশাসনের মত। কেন না সেটা পুরনো হলেও থাকে, চৈত্রের নতুন মেঘের মত মুহূর্তেই উড়ে যায় না, ছিঁড়ে যায় না।

যদিও আধুনিকতা জিনিসটা এমনি অনির্দিষ্ট, তর্ক-সাপেক্ষ ধরাছোঁয়ার বাইরে একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় বস্তু, তবু সাধারণতঃ লোকের ধারণা আছে যে, যা অদ্ভুত তাই আধুনিক: এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমরা রাশিয়ান কামিজ পরি এবং ছন্দ-মিল-দাঁড়ি-কমা ও মানে বর্জন করে কবিতা লিখি। এই বিশ্বাসের জোরেই আমরা থেমে থাকা ট্রাম-বাসে উঠি না, চলতি গাড়িতে লাফিয়ে উঠতে পছন্দ করি। এই ধারণার থেকেই আমরা বই পড়ে জ্ঞানসমুদ্রের কূলে নুড়ি কুড়োনো পছন্দ করি না, প্যাম্ফলেট পড়ে আধুনিকতম রাজনীতিতে বিশারদ বলে পরিচিত হতে চাই। আমরা যে আধুনিক, তাতে আর সন্দেহ কি? যেহেতু আমরা বর্তমান রয়েছি, এখনো ভূতগ্রস্ত হই নি, সেই হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজিও আধুনিকতা, কালোবাজারের মুনাফাশিকারও তাই।

অথচ সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, আধুনিক মানেই প্রশংসনীয়। আধুনিক গয়না, আধুনিক শাড়ি, আধুনিক গান, আধুনিক রাজনীতি—শুনেই মনে হয়, আমরা স্বর্গের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছি। এটাই যখন আধুনিকতম মতবাদ তখন এটাই সবচেয়ে ভাল; এটাই যখন আধুনিকতম ডিজাইনের অলঙ্কার, তখন এর চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে—এইরকম পথে চলে আমাদের চিন্তা। আধুনিক রুচি বললেই আমরা বুঝি উৎকৃষ্ট রুচি। যদিও আজকালকার বাংলা সিনেমা, রেডিওর গান এবং বাংলা "জনপ্রিয়" সাহিত্যের দিকে তাকালে মনে হয় না যে, আমাদের রুচি গর্ব করবার মত। আধুনিক কথাটার আর একটি অর্থ 'অর্বাচীন'। কিন্তু 'অর্বাচীন' বললে আমরা চটে যাই, আধুনিক বললে খুশী হই। অর্বাচীন বা আধুনিকের উল্টো হল প্রাচীন বা পুরনো। উপনিষদ ও মহাভারত আধুনিক নয়, দান্তে, শেক্সপিয়র, মপাসাঁ, শেখভও তাই। কিন্তু যাঁরা ও সব জিনিসে রস পান, তাঁরা ওগুলিকে অনাধুনিক মনে করেন না। "কি আশ্চর্য আধুনিক চিন্তা!" "How modern!" এ জাতীয় মন্তব্য প্রায়শই শোনা যায়। এই কথা দ্বারাই আমরা চূড়ান্ত সুখ্যাতি প্রকাশ করি। বোঝাতে চাই, যে সব চমৎকার চিন্তা আর ভাব আমাদেরই সমসাময়িক কালের পক্ষে স্বাভাবিক ও উপযোগী, অনেকদিন আগেই সেই সব চিন্তা ও ভাব আমদানী করে গ্রন্থকাররা খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একথা কখনোই ভাবি না যে, যা অসাধারণ, তা চিরকালই অসাধারণ; আমরা যে তার রস উপভোগ করতে পারছি, সেইটেই আমাদের পক্ষে সুখ্যাতির কথা।

যদিও আধুনিকতা এইরকম অস্পষ্ট বস্তু এবং এর গৌরবত্ব সন্দেহজনক, তবু সবাই আধুনিক হতে চায় এবং আধুনিক হয়েই চিরকাল থাকতে চায়। বকরূপী ধর্ম যে ভূতদের কথা বলেছিলেন—যারা "অহন্যহনি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্" আধুনিকতাও সেই ভূতদেরই অন্তর্গত। আমাদের জীবনে আমরা কয়েকটি আধুনিকতার অপমৃত্যু দেখেছি। কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরো দু একটি দেখব বলে আশা করছি।

কিন্তু আধুনিকতার একটি মহৎগুণের জন্যে তাকে প্রশংসা না করে পারি না। সে হচ্ছে

তার সাহস ও পরাক্রম। সর্বদাই সে 'যুদ্ধং দেহি' বলে মালকোঁচা মেরে আছে। জন্মেই অহিরাবণের মত সে যা দেখে তার দিকেই তেড়ে যায়। সবচেয়ে রাগ তার মহাকাল ও তার আশ্রিতদের ওপরে। পূর্ববর্তীদের সে অকুতোভয়ে আক্রমণ করে—বোঝাতে চায়, যা আধুনিক তাই সবচেয়ে ভাল ও শক্তিশালী। বলা বাহুল্য, যুদ্ধটা হয় একতরফা। এককালের আধুনিক কিন্তু আধুনিককালের প্রাচীনেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে স্থির থাকেন। এবং কালক্রমে, এই রকম একক সংগ্রামে আধুনিকতার মৃত্যু ঘটে। তার সমাধিস্তম্ভের স্মৃতিফলকটি হয় এইরকম ঃ

"Stranger, here lies the one
 time modern world,
That noble and courageous
 age which hurled
Its gauntlet in the very teeth
 of fate
And dared and died–what
 are you laughing at?"

[১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫৫—থেকে সংকলিত]

স, ম, ঃ—'পড়বার সময় পাঁচ মিনিট' রম্যরচনা বা personal essay জাতীয় লেখা নিয়ে নিয়মিত ফিচার।



বড়সাহেব—এই নতুন এ্যাপ্লিকাণ্টের 'সততা' সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই?

বড়বাবু—কি করে সন্দেহ করি বলুন! ছ'বার ক্যাস ভাঙ্গায় ধরা পড়েছে আর ছ'বারই কোর্ট থেকে প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়েছে.....

তিনটে, দুটো, নাটায়

কালিকায় 'যুগদেবতা' : শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে রূপক-নাট্য

তারকনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে রূপক নাট্য 'যুগ-দেবতা'য় স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। পাগড়ি পরিয়ে যাকে নামানো হয়েছিল তার চেহারার সঙ্গে পুরোদস্তুর মিল ছিল স্বামীজীর, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। গরমিল যেটুকু হয়েছে সেটুকু নাট্যকারের। সম্ভবতঃ তিনি শুনে থাকবেন যে, মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় জীবনে একদা যুগান্তর এনেছিলেন ভারতের অনাদিকালের ধর্মশিক্ষার প্রতি নবীন ভারতের বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে। এইটুকু মাত্র জেনেই বিবেকানন্দকে নাটকে উপস্থিত করতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন নাট্যকার। ফলে চেহারা মিললেও ব্যক্তিত্বের অভাবে মনে হয়েছে এ যেন সে বিবেকানন্দ নন যিনি যুগান্তর এনেছিলেন; এ যেন যুগান্তরের বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে দেখছি।

মহাপুরুষদের স্টেজে উপস্থিত করা চলে না, এ মতে আমার সায় নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে মহত্তর জীবন অকল্পনীয়। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন তথা বাণীকে দেশের লোকের কাছে নিবেদন করলে কোনো অপরাধ হয় না। আর তার জন্যে কালিকার কর্তৃপক্ষকে আমার অজস্র শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জানাচ্ছি। ত্রুটি যা হয়েছে তা এই মহৎ প্রচেষ্টার নয়, নাটকের। কোথায় এই ত্রুটি মর্মান্তিক হয়েছে একটি নজির টেনে সেইটে দেখিয়ে দিয়েই আমার দায় শেষ। নজির হল সেন্ট জোনের নাট্যকার শ'য়ের। অবশ্য শ'য়ের নজির টানায় বিপদ আছে। 'যুগদেবতা'র নাট্যকার তাতে নিজেকে জি. বি. এস.-এর সমগোত্রীয় ভাবতে পারেন; তা পারুন; প্রতিভা এবং উন্মাদ,—তফাৎ খুব বেশী নয়। কতটুকু—তাও আমাদের মত নগণ্য সাধারণ লোকেরা নয়, রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের মত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই বলতে পারেন।

সেন্ট জোন লেখবার পরেই শ'কে পৃথিবীর রসিকলোক চিন্তানায়ক বলে প্রথম স্বীকার করে নেন। শ' বলছেন যে, জিসাস ক্রাইস্টকে নিয়ে এই যে আমাদের উচ্ছ্বাসের উন্মত্ততা, এ এখনি খতম হয় যদি জিসাস আবার আসেন, শুধু তাই নয়, জিসাস যদি সত্যি সত্যি আবার আসেন তো তিনি ক্রসবিদ্ধ হবেন এই আমাদের মত খৃষ্টানদের হাতেই। তার কারণ, সত্যকে স্বীকার করতে আমরা আজো অপ্রস্তুত। এবং আমাদের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জিসাসরা এই পৃথিবীতে বারবারই লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিহত

হবেনই। জি. বি. এস এই যে কথাগুলো চিন্তা করেছেন, এর দামেই সেন্ট জোনের দাম।

এইরকম চিন্তা বা কোনো বক্তব্যের অভাবেই 'যুগদেবতা' নাটক হয়নি, যদি কিছু হয়ে থাকে তো হয়েছে ম্যাজিক। এবং পয়সা যা আসছে তা ম্যাজিকের জন্য আসছে, তার জন্যে নাট্যকারের কোনো কৃতিত্বই নেই, কৃতিত্ব সেট-তৈরী কারকের। মাটির দেবতা হাত বাড়িয়ে প্রসাদ খাচ্ছেন, সাদা ফুল, লাল ফুল একসঙ্গে একই ডালে ফুটছে, ফণী রায়ের পাপের জন্য তার চোখে অজাতের পুষ্পাঞ্জলি আগুন হয়ে ফাটছে,—এ সবের কোনো ইলিউশানই আমাদের কাছে নেই। কারণ আমরা জানি, এ সব কি করে হয়। এগুলো দেখিয়েও অন্ততঃ যদি কিছু চিন্তার দায় নিতেন নাট্যকার তাহলেও সার্থকতা বুঝতাম যুগদেবতার।

নাটকের চেয়ে যা অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হ'ল গুরুদাসের অভিনয়। বর্তমানে বাংলার পর্দায় এবং মঞ্চে প্রতিভার ছিটে-ফোঁটা আছে এরকম একজন অভিনেতা-অভিনেত্রীও নেই ; একমাত্র ব্যতিক্রম গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় নামা যে কত বড় দুঃসাহস তা আর কোথাও না হোক বাংলার রঙ্গমঞ্চে যাঁদের অভিনয় করতে হয়, তাঁরা সহজেই অনুভব করতে পারেন। গুরুদাসকে বাহবা দেব সেই দুঃসাহসের জন্য নয়, চরম রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির অসাধারণ এবং অবিস্মরণীয় দক্ষতার জন্যেই। সমস্ত জিনিস যা মাটি করেছে তা হল উচ্চস্বরে প্রম্প্‌টিং। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত এবং সেই আকস্মিকতার জন্যেই তাঁর কথাকে মন্ত্র মনে হয়, বিশ্বাস হয় দৈববাণী বলে। এই বিশ্বাস নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতে গিয়ে যদি প্রম্প্‌টারের গলা শুনতে হয় তো সেই মুহূর্তেই সমস্ত ইলিউশান ধূলিসাৎ হয় না কি?

কালিকার কর্তৃপক্ষের কাছে আর এক নিবেদন ; ভালো নাটক না হয় শক্তিসাপেক্ষ, সেই জন্যে সম্ভব নয় ; কিন্তু যা আয়ত্তের মধ্যে তার অবস্থাও এত দুঃস্থ দেখছি কেন? আমি রঙ্গালয়ের কথা বলছি। সাড়ে সাত টাকা খরচ করে যদি ধুলোর ওপর গিয়ে বসতে হয় তাহলে মনের মুড আর যার জন্যেই প্রস্তুত হোক এনটারটেনমেন্টের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতই থাকে হয়ত। স্মরণীয়দের মূর্তির মুখ উন্মোচনে অযথা ব্যয় ছাঁটাই করে যা প্রথম মোচন করা দরকার তা হল প্রেক্ষাগৃহের আসন, আলো, পানওয়ালাদের চীৎকার এবং তার বদলে চাই সত্যিকারের রস উপভোগে সাহায্যকারী একটি আবহাওয়ার জন্যে যা প্রয়োজন সেই রকম একটি ঘর। আর? আর,—আরেকজনকে বাদ দেওয়া দরকার। তিনি হলেন ফণী রায়।

দী. কু. সা.

[প্রথম বর্ষ, দশম ও একাদশ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৫৫ থেকে সংকলিত]

শালিমার রিপেন্টস

জোটে যদি মোটে একটি শ্যালিকা বউ-এর আড়ালে ডাকিও প্রিয়ে ;
দুটি যদি জোটে একটিকে তার বউ মারা গেলে করিও বিয়ে।

সুসমাচার

শেষের কবিতা

পুরনো বইয়ের নতুন করে সমালোচনা করাটা অনেকখানি অমিত রায়ের উত্তর-শিলং জীবনে কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রং ঘোচাতে উঠে পড়ে লেগে যাওয়ার মতন। কাজখানি মনের মত,—বর্ণান্তর করা। সে শুধু উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসানোর প্রত্যাশা, চরমে ফল ধরবে আশা করে। কেটি মিত্তির তার টার্গেট নয়। কেটি মিত্তিরের বাইরের পালিশ করা জৌলুষে যাদের চোখ ঝলসে মনটাও চকচকে পালিশ নেয় স্প্রে-পেন্ট করা ঝকঝকে পুরোনো মোটরের মত—ওরাই অমিত রায়ের এবং আমার টার্গেট। এই রং ঘোচানোর কাজে কেটি মিত্তিরের আপত্তি থাকে না। আপত্তি করে কেটি মিত্তিরের আশেপাশের কক্ষবিচ্যুত উপগ্রহের দল। 'শেষেব কবিতা'-র পুনরালোচনার আরম্ভেই ঐ কথাগুলো জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি সেই সব উপগ্রহদের, যাঁদের কলঙ্কশঙ্কিত অভিযোগ কেটি মিত্তির বা অমিত রায়কে বিচলিত করবে না—আমাকেও করবে না—এ কথাটি জানিয়ে রাখছি আগেই, কারণ এটুকু যাঁদের উপলব্ধির বাইরে, এই আলোচনাটি তাদের জন্যে নয়...

শেষের কবিতার গদ্যটা হল রবীন্দ্রনাথের মুখোশ, কবিতাগুলো তাঁর মুখশ্রী। বছর কুড়ি আগে যখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্ররচনার শারদস্নিগ্ধতার পর হাড়ে-কাঁপন-লাগা শীত আনল একদল খদ্যোতধর্মী লেখক (যাঁরা অনেকেই আজকাল দিকপাল বলে স্বীকৃত) ক্লান্তির লেপ টেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কলম নিশ্চল হয়ে গেল আরামের সুখস্বপ্নে বিলীন হয়ে। কিছুদিন কাটল। তারপর সন্দেহের কুয়াশা নামল গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে! শনিবারের অবেলায় নিষ্কর্মাদের কোলাহল শুরু হল। ঘুমটুকু হয়ত চিরনিদ্রাই, ওরা ভাবলে। এই কোলাহল বাংলা সাহিত্যের একটা আশ্চর্য উপকার করল, যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আরো বেশী উপলব্ধি করবে, আমরা যেটুকু করছি তার থেকে অনেক বেশী। আবার লেখনী ধরলেন রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রেরণা নিয়ে। কোনো এক নিদ্রাতুর দুর্বল মুহূর্তে আমাদের পূর্ববর্তীদের দিবাস্বপ্নে গড়া একটা জীবন ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। কলম কালিতে ভিজে উঠল। বারোয়ারী তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যবসাদার নাচওয়ালীর মুখে নামল বেনারসী ওড়নার ঘোমটা শুভদৃষ্টির ফাঁকিতে। আর সবাই ভাবল রবীন্দ্রনাথ শুভদৃষ্টির বধূকে ঘাঘরা পরিয়ে নাচতে নামিয়েছেন বারোয়ারীর আসরে। তাতে আপত্তি করল না কেউ। গোপন প্রেমের ব্যাপারে বাঙালী জাতটা চিরকালই অসামাজিক। ওদের ভাল লাগল—তবে যেটা ভাল লাগল সে বর্ণান্তরের মাধুর্য নয়, সে নূপুরের গুঞ্জন।

তখন শুরু হল গবেষণা। কে এই অমিত রায়? কাকে দেখে অমিত রায়ের পরিকল্পনা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ? কে সে—অপূর্ব চন্দ, না প্রশান্ত মহলানবীশ ; নীহার রায়, না অমিয় চক্রবর্তী ; কে ?...সবাই ভুলে গেল অমিত রায় কেউই নয়, হতে পারে না, হওয়া অসম্ভব —ওটা শুধু তখনকার প্রত্যেক তরুণের গোপনে লালিত একটি ব্যাপক স্বপ্নবিলাসী মনের একখানি অপূর্ব ক্যারিকেচার। রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতায় বিপুল ব্যঙ্গ করেছেন তাদের, বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন অকুণ্ঠ উল্লাসে, নির্দয় ঠাট্টায় ভরিয়ে তুলেছেন প্রত্যেক পাতা, প্রত্যেক লাইন, প্রত্যেকটি কবিতা। সেদিনের সেই তরুণেরা আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পার হয়ে গেছে যৌবনের ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে। তাদের কপালে সেই চাবুকের দাগ আজো মিলিয়ে

যায়নি। কিন্তু আজো তারা জানে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতম উপন্যাস শেষের কবিতা। এই যে আত্মপরিতৃপ্ত জানা, এর মধ্যে নিহিত যে বিপুল হাস্যরসখানি ছিল তাকে সেদিন একলা উপভোগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে, আর আজকাল উপভোগ করছি আমরা যাদের বয়স সেই বছর কুড়ি আগে ছিল তিন, চার কি পাঁচ। শেষের কবিতা ক্লাসিক নয়, মহান উপন্যাস নয়, গল্পত্ব বিশেষ কিছু নেই শেষের কবিতায়, annotate করা কবিতার একখানি সার্থক সংকলনও নয়। শেষের কবিতায় যা আছে সে অন্যকিছু। সে একটা সূক্ষ্ম হাস্যরস, শক্তিময়ের হাতে পড়লে যা শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। কে বলে বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের হাসির উপন্যাস নেই? একটি আছে। সে আজো অদ্বিতীয়। বাংলা সাহিত্যের সেই একমাত্র ক্ষমতাদৃপ্ত হাসির উপন্যাস হল 'শেষের কবিতা'। এবং এরকম অদ্ভুত হাসির উপন্যাস লেখবার মত একটি প্রতিভাই আজ পর্যন্ত জন্মেছেন—তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষের কবিতাকে একখানি ক্লাসিক উপন্যাস করে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করেননি। চেষ্টা করলে কতটা সক্ষম হতেন জানি না। রবীন্দ্রনাথ না হয়ে অন্য কেউ হলে বলতুম, 'পারতেন না।' রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-সচেতনতায় সেটুকু নিশ্চয়তা তাঁর সম্বন্ধে জোর গলায় বলা সম্ভব নয়। তবে একদল লোককে ঠাট্টা করব, ব্যঙ্গ করব, ঐ সব ভেবে লিখতে বসলে আর যাই বেরোক, গভীর মানবত্বের ছোঁয়াচলাগা উপন্যাস বেরোয় না। সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বেশ ভালো করে জানতেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সক্ষম উপন্যাস লেখবার ক্ষমতার উপর তাঁর সহচরদের যেরকম আস্থা আর বিশ্বাস ছিল, তার থেকে হয়ত কিছু কম ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের—কারণ, তিনি যত ভালো কবিতা আর যত ভালো ছোট গল্প লিখেছেন, তত ভাল উপন্যাস তিনি লেখেননি।

হাল্কা mood নিয়ে উচ্চাঙ্গের উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। আর রবীন্দ্রনাথ মোটেও Serious হয়ে শেষের কবিতা লেখেননি। এবং Serious mood-এ শেষের কবিতার ঢঙে উপন্যাস লিখলে শেষের কবিতা হয় না, শুধু বুদ্ধদেবের "যেদিন ফুটল কমল" হয়। রোমান্টিক উপন্যাসে দিনের আলোয় দেখা স্বাভাবিক মানুষকে একটুখানি রূপান্তরিত করে দেখা যায় তার মন-রঙিয়ে-ওঠা পরিবেশে, ফ্যান্সি ড্রেস বল-এ বিচিত্র পোশাকে বিচিত্রতর সুন্দরীর মত। কিন্তু যখনই দেখি রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক মানুষকে ক্লাউনে রূপান্তরিত করে তার নাম দিচ্ছেন অমিত রায়—আর তাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে তৎকালীন যৌবনধর্মীরা আর নির্বাক কৌতুকে নির্বিকার হয়ে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ তখনই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ একটি হৃদয়স্পর্শী উপন্যাস তৈরী করবার চেষ্টা করেননি শেষের কবিতায়। চেষ্টা যা করেছেন, সে অন্যকিছু।

এই বঙ্কিম দৃষ্টিকোণ থেকে এটা উপলব্ধি করতে না পারায় শেষের কবিতার অনুকরণ করে যাঁরা নতুন বই লিখবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের ব্যর্থতা ডঃ সীতারামায়ার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হওয়ার মত হাস্যকর হয়ে উঠেছে। কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে কয়েকবছর আগে শেষের কবিতা অভিনয় করানোর প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে ঠিক একই কারণে—কারণ, প্রমথেশ বড়ুয়া সবসময় একটি রোমান্টিক নায়কের চরিত্র ফোটানোর চেষ্টা করেছেন, আসল অমিত রায়কে বুঝতে চাননি ;—এই নিষ্ফলতার কৃতিত্ব সবটা সজনীকান্ত দাসের আরো হাস্যকর নাট্যরূপদান—প্রতিভার নয়, প্রমথেশ বড়ুয়ার শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করবার মত আবৃত্তিরও নয়। আর ঠিক অনুরূপ কারণেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং মর্মান্তিক রকম হাস্যকর হয়ে উঠেছে কৃষ্ণ কৃপালনীর শেষের কবিতার দুঃসহ অনুবাদ "The Last Poem." কৃষ্ণ কৃপালনীর কাঁচা ইংরেজী এবং ইংরেজীর উপর কোনো দখল না থাকা, তার উপর শেষের কবিতার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে না পারা, সব কিছু মিলিয়ে The Last Poem যা হয়েছে সেটা বিজয়লক্ষ্মীনন্দিনী চন্দ্রলেখার লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে Head of the Department of journalism হওয়ার মত।

বাংলায় হাসির গল্প লেখবার ভাষা পরশুরামের ভাষা নয়, সে কথা আমি গত সংখ্যাতেই জানিয়েছি। বাংলায় হাসির গল্প লেখবার ভাষা হল শেষের কবিতার ভাষা। বাংলায় এই নতুন পথটি দেখিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বও সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের একলার। "গঙ্গার ওপারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না," এরকম কথা মৃদু স্বরে কোনো লিলি গাঙ্গুলীকে বললে এবং আর কিছু না বললে সে কোনো স্বাভাবিক অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করবে না, শুধু একবার আড়ষ্ট বিস্ময়ে অদূরবর্তী অন্ধকার ঝোপঝাড়ের দিকে আড়চোখে তাকাবে আর নিজের অভিভাবককে মনে মনে অভিসম্পাত দিয়ে হতাশ হয়ে বলবে, "বেশ চাঁদ উঠেছে। তুমি Werewolf—এর গল্প শুনেছ?" সকালবেলা মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে স্বল্পপরিচিতা কোনো মেয়ের হাত চেপে ধরে তাকে যদি শোনানো হয়, "রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কি করে, যতক্ষণ চিনি নাই তোরে," তা হলে নিজেকে ভালো করে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার কৌশল যেটা প্রদর্শিত হবে সেটা "সূর্যমণ্ডলে....আগুনের ঝড়...লিরিক নয়,...নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।" কিন্তু এই ছাড়িয়ে নেওয়াটা একটু হাস্যরসাশ্রিত ভাষায় বোঝালে সত্যিকারের হাসির গল্প হয় না। ঐ দু'লাইন কবিতা শুনে কোনো অবনমিতা যদি অমিতের মুখের দিকে তাকায় আর কিছু না বলে, কোনো কথা বলবার কোনো দরকার মনে না করে, আর হাতের ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে যায়, তা হলেই গল্পটা সার্থক হাসির গল্প হয়ে ওঠে। শেষের কবিতার সংলাপে যে ভাষা আছে সেটা রোমান্সের ভাষা নয়, প্রেম করবার ভাষা নয়, সেটা মেয়েদের পা-মোচড়ানোর ভাষা। শেষের কবিতার ভাষায় কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য শেষের কবিতা অনুরাগীদের কোনোদিন হয়েছে কি না জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি নিশ্চিত বিশ্বাসে যে, এ ভাষায় কথা বললে যাকে বলা হয় সে মেয়েটি লাবণ্যই হোক বা যে বন্যই হোক, অমিত রায়কে বিতাড়িত করবার জন্যে "কালের যাত্রার ধ্বনি..." বলে আরম্ভ করে ছিয়াত্তর লাইনের একটি কবিতা লিখে পাঠানোর কষ্ট স্বীকার করবে না, অমিত রায় কোন্ ব্র্যাণ্ডের টুথপেস্ট ব্যবহার করে সেটুকু জিজ্ঞেস করে নেওয়াই যথেষ্ট মনে করবে। প্রেম করবার ভাষা যেটা, সে শেষের কবিতার ভাষা নয়। প্রেম করবার ভাষাটা একেবারে আটপৌরে। কথা বলবার প্রয়োজন সেখানে নিতান্ত কম, অবকাশ আরো কম। সুতরাং সমস্ত বইখানি জুড়ে অমিত রায় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "একরকমের উচ্চহাসি,...কিছু আলু-থালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজীতে যাকে বলে—ডিসটিঙ্গুইশ্‌ড়্।" অমিত রায়ের মত জীবনদার্শনিকতা যাদের মধ্যে আছে ওরা অনেকেই আজকাল বিদেশে আমাদের ambassador বা consul. আর অমিতের যে পোশাকের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, মাঝে মাঝে সেই বিচিত্র সাজে যে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্যক্তিকে পথে ঘাটে দেখা যায় সে রবীন্দ্রনাথের এক আর্টিস্ট নাতি—আর তাও যখন তার পকেটে পয়সা থাকে না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের ফাঁকি দেননি কোথাও। অমিত রায় সম্বন্ধে এই যে বিপুল সত্যি কথাটি সেটি রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতার প্রথম কবিতাতেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন অমিতের মুখে ঃ

পরিচিত জনতার সরণীতে
আমি আগন্তুক,
আমি জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।

শেষের কবিতাকে একখানি সার্থক মহান উপন্যাস করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও রবীন্দ্রনাথের যদি থাকত, তা হলে সমস্ত কাহিনীটাকে তিনি সম্পূর্ণ অন্যভাবে গড়ে তুলতেন। শেষের কবিতায় মাঝে মাঝে যে সুদূরপ্রসারী চিন্তামননতার হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখতে পাই বিষাদময় গাম্ভীর্যের আভাসে, সেটা গল্পের গতিতে এসে পড়েনি, এসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের

ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। জীবনের যে গভীর দর্শন এই কাহিনীতে আভাসে ইসারায় ছাপ রেখে গেছে সেটা ক্বচিৎকদাচিৎ চোখে পড়ে, যেখানে চোখে পড়ে সেখানে কাহিনীর সুর যায় বদলে। একজায়গায় অমিতের মন নিয়ে তিনি ভেবেছেন, "অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ বা করে জীবনে ; কেউ বা করে রচনায়। জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে অথচ তার থেকে সরতে সরতে—নদী যেমন কেবলি তীর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি। আমি কি কেবলি রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে যাব। এইখানেই কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ। পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন।" এ পর্যন্তই। তারপরই আবার শুরু যোগমায়া আর লাবণ্যের মধ্যে মেয়েলি বিতর্ক, ভালবাসা নিয়ে—যে জিনিসটি মেয়েরা কোনো কালেই বোঝে না, আর অমিত রায়ের চরিত্র নিয়ে, যে জিনিসটি সুস্পষ্টভাবে অমিতের মধ্যে নেই।

শেষের কবিতাকে যদি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস করতে হত তা হলে এই জীবনদর্শনকেই theme করে এগোতে হত, একটি পোশাকী প্রেম আর একটি আটপৌরে প্রেমকে theme করে নয়। দু ধরনের প্রেমকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো প্রথমোক্ত জীবনদর্শনের সঙ্গে কোনো ছাঁচেই ঠিক ঢালাই করা যায় না। একে রাখতে হলে প্রথমটাকে ছাড়তে হয়। শেষের কবিতায় ঐ ব্যাপারটিই হয়েছে—ফলে শেষের কবিতা সূক্ষ্ম শ্লেষ ও সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ পরিপূর্ণ সার্থক হাসির উপন্যাস হয়েছে, সত্যিকারের বড় উপন্যাস হয়নি। কারণ, কারো জন্য কোনো সত্যিকারের সহানুভূতি বা sympathy 'শেষের কবিতা'য় নেই। যা আছে সে শুধু ঠাট্টা আর ব্যঙ্গ। উপন্যাস হিসেবে সার্থক করতে গেলে দুটো খুব বিশিষ্ট চরিত্রকে নিস্পৃহ অবহেলায় একপাশে সরিয়ে রাখতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ—যোগমায়া আর শোভনলালকে—কারণ, ঐ দুটো চরিত্রের মধ্যে সত্যিকারের কিছু গড়ে তোলবার উপাদানও ছিল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতাও ছিল, যা ছিল না, সেটা ইচ্ছে। কারণ, তা হলেই প্রথমোক্ত জীবনদর্শনকে প্রাধান্য দিতে হয় তার ফলে শেষের কবিতায় অমিতকে সার্কাসের ক্লাউন থেকে সার্কাসের দর্শনকে রূপান্তরিত করে তাকে বসিয়ে দিতে হয় গ্যালারীতে, বেশ অনেকটা নিষ্ঠুর হতে হয় তার উপর আর তার জীবনে কেতকীর গোঁজামিলটা দেওয়া চলে না। একটা আকস্মিক চমক লাগানো যায় না ১৯২৮ সনের তরুণসমাজকে। কি একটা রহস্যময় মোহে পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পথটি ছেড়ে দ্বিতীয়টা বেছে নিলেন জানি না। কিন্তু তাতে বিপুল ক্ষতি হয়েছে বাংলা সাহিত্যের। আর শেষের কবিতায় বিপুল অপচয় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার। বাংলা সাহিত্যের একমাত্র হাসির উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে বটে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে যেই একটি মাত্র great novel-ও বেরোনোর সম্ভাবনাটুকু হঠাৎ তখন এসেছিল সেটা সম্ভব হতে পারল না। বাংলা সাহিত্যে মহান উপন্যাস খুবই কম। এবং এই আরেকটি হতে হতে না হওয়াটা ক্ষমার চোখে দেখতে পারবার মত যে সহৃদয়তা সেটা আমাদের মধ্যে আছে বলেই আজ আমরা শুধু মানুষ নই, আমরা বাঙালী।

ভেবে অবাক হই—যে প্রলোভনটা দমন করে ওদেশে বেশ কয়েকজন বড় লেখক সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেটা রবীন্দ্রনাথ পারলেন না কেন। সত্যিকারের great writerদের কথা ছেড়ে দিই, বড় হতে হতেও একটুর জন্যে সবটুকু এখনো হয়ে উঠতে পারেননি, এরকম একজন সুনিপুণ কথাশিল্পীও পূর্বোক্ত জীবনদর্শনটিকে theme করে বেশ কয়েকটি সার্থক উপন্যাস লিখেছেন। তাদের মধ্যে Cakes and Ale বইখানি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সেখানে Maugham-ও man, the artist আর woman, the mother-এর মধ্যে একটা চিরন্তন অসমাপ্ত সংঘর্ষ আলোচনা করেছেন—আরো সার্থক

পরিপূর্ণতায়। সেখানেও একজন সৃষ্টিধর্মীকে এগোতে হয়েছে আরেকজন রক্ষাধর্মীকে অবহেলা করে। আর তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রথমা স্ত্রী Rosie-কে হারাতে হয়েছে তাকে। কিন্তু সেখানে আবার যে Amy এসেছে Edward Driffield-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী হয়ে, সে কেতকীর মত এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে আসেনি, লাবণ্যের অমিতকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় অমিতের নিরুপায় খাপ খাইয়ে নেওয়ায় আসেনি, এসেছে "Nature abhors a vacuum" এই বস্তুতান্ত্রিক ধর্মে। অমিতের মধ্যে আছে জীবন থেকে হার-মেনে-নেওয়া পালানো, যাকে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্ন শ্লেষবিক্ষত করেছেন। Driffield-এর মধ্যে আছে বলিষ্ঠ জীবনসচেতনতা। কেতকী হল গোঁজামিল। Amy হল jig-saw puzzle-এর হারানো টুকরো। লাবণ্য অমিতকে ছেড়ে গেছে খানিকটা নিরুপায় নির্ভরহীনতার জন্য, তার তিলে তিলে দান করে দেওয়া আত্মসমর্পণ ভাববিলাসের করুণ মুহূর্তগুলিকে হৃদয়-অঞ্জলি থেকে গণ্ডূষভরে পান করে নেবে—এটুকু সান্ত্বনায় তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভরশীল নির্ঝঞ্ঝাট করে তুলবার প্রত্যাশায়। Rosie-র Edward Driffield-কে ছেড়ে চলে যাওয়ায় এ ধরনের শূন্যকে পূর্ণ করবার ব্রত বইবার ভাবপ্রবণতা নেই—আছে শুধু তার রক্ষাধর্মী মনের অটল আত্মপরায়ণতা, নিজের চরিত্রধর্মে অটল নিষ্ঠা, যার জন্যে প্রয়োজন হলে নিজের পথ একলাই চলতে হয়—সৃষ্টিধর্মীকে বাদ দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ কেন হঠাৎ সে সময়কার তরুণ সমাজকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন এ বইতে, আর কেন তার জন্যে একখানি অনন্য উপন্যাসের সম্ভাবনাকে অবহেলা করে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বিপুল অপচয় ঘটালেন এ বইখানিতে সেটা ভাবতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটা আরো অনেকখানি তলিয়ে দেখতে হয়। সামান্য সমালোচনায় বড় বেশীরকম বিচলিত হয়ে পড়া ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দুর্বলতা। রবীন্দ্রনাথের এই আত্মসজাগ দুর্বলতা শেষের কবিতার প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত খুবই সুস্পষ্ট এবং ১৫ পাতা থেকে ২৬ পাতাব্যাপী বালিগঞ্জের রবিবাসরীয় সাহিত্যসভার বিবরণ পড়ে মনে হয় যেন রেলগাড়ি চড়ে দূর দেশ যাওয়ার পথে জানলার ফাঁক দিয়ে দূরান্তের ক্রমশও সরে সরে যাওয়া সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করবার সময় হঠাৎ এককণা কয়লা ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় বেরিয়ে এসে চোখের ওপর পড়ল। এটুকু সহ্য হওয়ার কারণ, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, অমিত রায়ের বক্তৃতা নয়। এটা সত্যি যে এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ বড় মর্মান্তিকরকম নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভালো লাগে এই জন্যে যে সবার উপর অভিমান করে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সত্যিকথা বলেছেন, যেগুলো সাম্প্রতিক বহু সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে সমান প্রযোজ্য। কয়েকটা তুলে দিই ঃ

"ডিমক্রেসি আজ যেখানে সেখানে শত টুকরো এরিস্টক্রেসির পূজো বসিয়েছে, খুদে খুদে এরিস্টক্র্যাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল, কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। কবিমাত্রেই উচিত পাঁচবছরের মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্যকিছু চাই।...ওরা যদি মানে মানে নিজেরাই সরে না পড়ে আমাদের কর্তব্য সভা ছেড়ে, দল বেঁধে উঠে আসা।....কিছুকাল ভক্তরা দেবে মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তারপর আসবে তাঁকে বলি দেবার পুণ্য দিন।...ভালো লাগার এভলুশন আছে। পাঁচবছর পূর্বেকার ভালো লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারেনি যে সে মরে গেছে।...সেন্টিমেণ্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার করতে বিলম্ব করছিল...বোধ করি, উপযুক্ত উত্তরাধিরাকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে।...(যারা) ষাট বছর পর্যন্ত বাঁচতে এতটুকুও লজ্জা করে না, তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারদিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ

ভ্যাঙচাতে থাকে। তাদের চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বেকার লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসিভর্স অফ স্টোল্‌ন্ প্রপার্টি। সে স্থলে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই সব অতিপ্রবীণদের বাঁচতে না দেওয়া।" (পৃঃ ১৫-২০)

যে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আভাসে সে কথাগুলো সোজা ও স্পষ্ট ভাষায় Maugham বলেছেন Cakes and Ale-এ। এ কথাগুলো এত সত্যি যে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছিনে ঃ

"His (বিখ্যাত লেখক Driffield, মমের নায়ক) outstanding merit was not the realism that gave vigour to his work, nor the beauty..., his outstanding merit was his longevity. Reverence for old age is one of the most admirable traits of human race....The awe and love with which....nations regard old age is often....From the earliest times the ld have rubbed it into the young that they are wiser than they and before the young have discovered what nonsense this was they were too old and it profited them to carry on the imposture ; and besides, no one can have moved in the society of politicians without discovering that (if one may judge by results) it requires little mental ability to rule a nation. (কি অদ্ভুত সত্যি আমাদের দেশ সম্বন্ধে!) But why writers should be more esteemed the older they grew, has long perplexed me. At one time I thought that the praise awarded to them when they had ceased for twenty years to write anything of interest was largely due to the fact that younger men, having no longer to fear their competition, felt it safe to extol their merit ; and it is well-known that to praise someone whose rivalry you do not dread is often a very good way to putting a spoke in the wheel of someone whose rivalry you do. ("অমিত কেবলি ছোট লেখককে বড় করে, বড় লেখককে খাটো করবার জন্যে"—পৃঃ ৪) ...After mature consideration I have come to the conclusion that the real reason for the universal applause that comforts the declining years of the author who exceeds the common span of man is that intelligent people after thirty read nothing at all. As they grow older the books they read in the youth are lit with its glamour and with every year that passes they ascribe greater merit to the author that wrote them. Of course he must go on, he must keep in the public eye. It is no good thinking that it is enough to write one or two masterpieces; he must provide a pedestal of them of forty or fifty works of no particular consequence. This needs time. His production must be such that if he cannot captivate a reader by his charm, he can stun them by his weight. (ch.11).

Cakes and Ale একখানি দ্বিতীয় ক শ্রেণীর সার্থক উপন্যাস আর শেষের কবিতা একটি প্রথম ক শ্রেণীর ব্যঙ্গ রচনা। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা যেখানে নিষ্ফল হয়েছে, Cakes and Ale সেখানে সার্থক হয়ে উঠেছে। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আর Maugham-এর বক্তব্যে আশ্চর্য মিল।

[প্রথম বর্ষ, দশম ও একাদশ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৫৫ থেকে সংকলিত]

সাহিত্যদুঃসম্বাদ

বাংলাদেশে যত খবরের কাগজ, মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে, সেগুলোতে যা বেরোয় সবই বিদেশী পত্রিকা থেকে সবটা না হোক কিছু না কিছু চুরি। একমাত্র original পত্রিকা হল "শনিবারের চিঠি।" তাতে যা বেরোয় সবই original। এমনকি "শনিবারের চিঠি" নামটিও সম্পূর্ণ original। বিখ্যাত বিদেশী পত্রিকা The Saturday Evening Post-এর সঙ্গে "শনিবারের চিঠি" নামটির কিছুমাত্র সাদৃশ্যই নেই।

* * *

'পরিভাষা' ইয়ার্কিটি সাধারণের কাছে এতদিনে পৌঁছল। মুখবন্ধে বলা হয়েছে ঃ "The terms coined might be easily understandable. Words should be as easy and as short as possible from the standpoint of pronounciation and writing."

নমুনা ঃ মহপরিপালকন্যাসপাল, মহাপ্রৈষাধিকারিক, মহাআরক্ষাপরিদর্শক এবং এ ছাড়াও ঃ

"Those words that have already obtained a very large currency should not be replaced." অতএব, 'কেরাণী' বদলে হল করণিক, 'ভিখারী' হল চক্রচর, 'ছাড়পত্র' নিষ্ক্রম-পত্র, 'বিচারক' কথাটা যদি বুঝতে না পারে কেউ, তাই বদলে হয়েছে 'ন্যায়াধীশ।'

পরিভাষা তো নয়—পরীদের ভাষাও বোধ হয় এর থেকে বোঝা সহজ ;—তবে এর মধ্যেও এক পরী আছে, এই পরিভাষা-সমিতির মধ্যেও—সে এক গুঁফো-পরী, তার নাম শ্রীসজনীকান্ত দাস।

* * *

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিচলিত হয়েছেন।

তিনি যদি অস্বাভাবিকরকম খ্যাতি-পাগল না হতেন, তাহলে আমাদের কথাগুলি তাঁকে উপকৃতই করত। তবে গরীবের কথা বাসি না হওয়া পর্যন্ত আমরা ভালোবাসি না কি না? পাইকারী দরে তিনি লেখা শুরু করেছেন ; সারা করবার দশ বছরের মধ্যে তিনি দেখতে পাবেন বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কিঞ্চিৎ উপরে মাত্র। জীবনের প্রারম্ভের অখাদ্য রচনার জন্যে তাঁর কাছে কোনো অনুযোগ করা বৃথাই ; অপরিণত বয়সই তার জন্যে দায়ী। কিন্তু 'কবি' রচয়িতা যখন পরিণত বয়সে সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র মত হাস্যকর উপন্যাস লেখেন তখনই বলতে ইচ্ছে করে 'মা বসুমতী দ্বিধা হও।' তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কোনো ইলিউশানই নেই। তিনি যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছেন খাতির, তাই তা ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে সময়ে সাবধান না হলে। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কোনো দিন প্রেমেন্দ্র মিত্র কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবেন না। তবুও তিনি সাহিত্যিক ; মনে প্রাণে সাহিত্যিক। তাঁকে শ্রদ্ধা করি বলেই বলতে বাধ্য হই, তিনি অন্যলোকের বিরুদ্ধে যে 'আনহোলি এলায়েন্সের' অনুযোগ করেন নিজেও সেই অপকর্মে সহযোগিতা করে চলেছেন। 'ট্যারা' না হলে এ তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। 'শনিবারের চিঠি' গোড়ার যুগে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের বিরুদ্ধে যে ভাষায় কুৎসাপ্রচার করত, তা কি সহজে ভোলবার? সজনী দাসের সঙ্গ ছাড়ুন তিনি ; তারাশঙ্করের সঙ্গে সজনী দাসের

যোগাযোগের কথা ভাবলেই মনে পড়ে সরকার প্রচারিত বিজ্ঞাপন : "কুসুমে কীট"!

*　　　*　　　*

'মাসিক বসুমতী'তে ফটোর তলায় ক্যাপশান যিনি দেন, তিনি বাহাদুর লোক।

'যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে' একটি ছবির তলায় লেখা ; একটি পাপড়িও খসেনি কিন্তু সেই ছবিতে প্রদর্শিত এক গোছা ফুলের।

*　　　*　　　*

'জুন' মাসের মডার্ন রিভিউতে Dr. H.C. Mukherjee, M.A, ph.D, Vice-President, Constituent Assembly of India একটি প্রবন্ধ লিখেছেন : 'alcohol and intellectual efficiency'—যা পড়ে এতদিন বাদে স্বাধীন ভারতেব constitution নিয়ে মহারথীরা কেন বেসামাল হয়ে পড়ছেন এত, তার গোপন রহস্য জানা গেল।

*　　　*　　　*

'পলাতকা' শচীন্দ্র মজুমদারের নবতম উপন্যাস। শচীন্দ্র মজুমদার কে? কেন জানেন না? সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্তের মতে 'লীলা-মৃগয়া" লিখে যিনি 'রসিক সমাজের দুর্লভ সম্মান' লাভ করেছেন। তা সে যাই হোক, শচীন্দ্র মজুমদার তাঁর নতুন উপন্যাস 'পলাতকা'র আরম্ভেই এক দুর্লভ রসিকতা করেছেন। তিনি নিবেদনে লিখছেন : এই উপন্যাসের "নায়ক-নায়িকারা সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক!"

গম্ভীরভাবে ভাঁড়ামো করা বলে একেই ; জীবনকে বাঙালী লেখক আবার দেখল কবে যে, তার চরিত্র কাল্পনিক ব্যতিরেকে অন্য কিছু হবে। তার সমস্ত রচনাই তো জীবন থেকে পলাতকা কল্পনা-কাহিনীমাত্র !—তাই না?

*　　　*　　　*

'পূর্বাশা'-য় (পৌষ,' ৫৫) 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যবোধ' নামে এক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার নামে তারাশঙ্করকে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণবাবু লিখছেন :

'...কলকাতার ফ্যান-সুস্নিগ্ধ সোফার আশ্রয়ে বসে তিনি সাহিত্য বিলাস করেননি, এই কংগ্রেস কর্মীটি রাঢ়ের খররৌদ্রে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে দেশকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, মেলার বটগাছতলায় খড়ের বিছানায় শুয়ে জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন...।"

রাঢ়ে কিম্বা ভাগাড়ে তারাশঙ্করবাবু কোথায় ঘুরেছেন এবং কোথায় ঘোরেননি, তা আমরা জানি না, জানতে চাইও না। খররৌদ্রে মাইলের পর মাইল ঘুরলেই যদি সাহিত্যিক হওয়া যেত তাহলে তো প্রত্যেক জীবন-বীমার দালালরাই তা হত। সোফায় বসে সাহিত্য করলে যদি তা বিলাস হয়, তো অধুনা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বার্নার্ড শ তো লেখকই হতে পারতেন না। নারায়ণবাবু বাংলায় এম. এ. হবেন বলেই হয়ত ইংরেজী পড়েননি কিম্বা আমাদের দেশের বাইরেও যে সাহিত্য আছে--তার খবর রাখা দরকার মনে করেন না। তিনি শুনলে অবাক হবেন, শ'য়ের অনেক নাটকই বেশ মোটা সোফায় বসে আরো দুর্মূল্য সব আরামের মধ্যেই রচিত। পৃথিবীর অমর সাহিত্যস্রষ্টাদের অনেকেই তাঁদের ঘরের বাইরে যাওয়ারও দরকার মনে করেননি। সৃষ্টির জন্যে যা প্রয়োজন তা প্রতিভা, নর্দমার ধারে শুয়ে থাকা নয়। কোল-ভিল-সাঁওতালদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েও তাদের সম্বন্ধে কিচ্ছু জানে না, এমন লোকের অভাব নেই ; ওদের সঙ্গে কোলাকুলি না করেও ওদের জীবন একেকজনের চোখে ধরা পড়ে। এমনভাবে উদঘাটিত হয় তাদের রচনায়, যা নারায়ণবাবু শুনলে বিশ্বাস করবেন না, বিশ্বাস করলেও শুনতে চাইবেন না হয়ত।

এই প্রসঙ্গে গোর্কী সম্বন্ধে নারায়ণবাবুর ইয়ার্কি উপভোগ্য। গোর্কী তিনি পড়েননি; পড়লেও বুঝতে পারেননি। গোর্কীর রচনা-প্রতিভা দূরে থাক, তার ভালো অনুবাদ পর্যন্ত

তারাশঙ্করবাবুকে দিয়ে কোনোদিন সম্ভব হবে না। কারণ আজকের দিনের যে কোনো চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রের বাংলা রচনাও তারাশঙ্করের তৃতীয় শ্রেণীর গদ্যের চেয়ে অনেক পড়তে ভাল লাগবে। তারাশঙ্করবাবু জীবন বুঝতে না গিয়ে যদি ভাষাটাকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতেন, তাহলে তাঁর লেখা সুখপাঠ্য হত। আজকালকার লেখার সাফল্য রহস্য অবশ্য তিনি ধরে ফেলেছেন। 'কেনে' লিখলেই এখন বড় ঔপন্যাসিক হওয়া যায়—তাতেই লোকে বই কেনে ('কেন' লেখার যুগ চলে গেছে কি না!)

নারায়ণবাবু 'সোফার' লিখে বুদ্ধদেববাবুকে গালাগাল দিতে গিয়ে তারাশঙ্করবাবুকে ডুবিয়েছেন। বাড়ীতে তারাশঙ্কর কিসের ওপর বসে 'সাহিত্যশ্রম' (সোফার ওপর বসে লিখলেই তা বিলাস কি না) করেণ, খাটিয়া, চেয়ার কি ইঁট কিসে বসে তিনি লেখেন তা আমরা জানিনে, তবে ইদানিং তাঁকেও সোফারের আশ্রয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। তাই বলছিলুম, এ কথা বলে নারায়ণবাবু কি বোঝাতে চেয়েছেন যে, তারাশঙ্কর আর সাহিত্যিক নেই?—তবে বটগাছতলায় শুয়ে তারাশঙ্করবাবু যে জীবনকে দেখেছেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 'বটগাছতলা' থেকে 'গাছ' খসে গিয়ে তাঁর লেখা এখন বটতলার পর্যায়ভুক্ত হয়ে বসে আছে—তা আমরা জানি।

* * *

'সাহিত্য'কে আজ পর্যন্ত যতরকম নোংরামির হাতিয়ার করা সম্ভব হয়েছে তার শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে গেছে ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রকাশিত 'কথাশিল্প' গ্রন্থটি। সাহিত্য বোধহীনতা নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন, ত্রুটি ও ভ্রান্তিপূর্ণ পরিচয়, হাস্যকর মন্তব্যে 'কথাশিল্প' বাংলসাহিত্যে সত্যিকারের humour-এর একটা Landmark হয়ে রইবে। বিভূতি বন্দ্যোঃ, মানিক বন্দ্যোঃ এবং প্রবোধ সান্যালের সঙ্গেই সুবোধ বসুও একজন "বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরূপে পরিগণিত হয়েছেন। এ না হলে নরেন দেব হবেন কেন গল্পগ্রন্থের সম্পাদক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয়ে লেখা হয়েছে ঃ "লেখক এখনো অবিবাহিত।" নারায়ণবাবু যদি নিজে এই কথা জানিয়ে থাকেন, তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এর চেয়ে ভালো গল্প তিনি জীবনে বানাননি। শোনা যায়, তিনি একবার নয়, একাধিকবার বিবাহিত।

অন্নদাশঙ্কর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে ঃ "আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।" অন্নদাশঙ্কর প্রথম স্থান অধিকার করেন ঠিকই কিন্তু সে কেবল ভারতীয়দের মধ্যে।

আশাপূর্ণা দেবীর 'পেশা' সম্বন্ধে লেখা হয়েছে ঃ

"বিবাহিতা মহিলা।" বিবাহ কি একটা পেশা না কি? নাকি ভারতীয় বিবাহিতা মহিলাদের আজকের দিনে অন্য কোনো পেশা থাকা অসম্ভব। বহু বিবাহিতা মহিলাই তো চাকরী করেন আজকাল। লিখলেই হত কোনো পেশা নেই।

লেখক-পরিচয়ে 'বিশেষ গুণ' এই প্রসঙ্গে কারোর বেলায় দেওয়া হয়েছে সাঁতারে পটু, আবার কারোর বেলায় 'অভিনব দৃষ্টিকোণ'! একেই বলে সম্পাদনা!

যাই হোক, এ সব ত্রুটি কিছুই নয়। নরেন দেবকে সকলেই 'দাদা' বলে ভালবাসে। ভালবাসায় সব কিছুই ক্ষমা করা চলে। সে যাক। এখন আসল বক্তব্যে আসা যাক।

'কৈফিয়ৎ'-এ একজায়গায় সম্পাদকদ্বয় বলছেন, "...এই আবেদনপত্র থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা মাত্র নীরস বৈজ্ঞানিক ও নিছক ব্যবসায়ী নন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি এঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও দরদ আছে।"...

বাংলা সাহিত্যের প্রতি এঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও দরদের নমুনাটা একবার দেখুন।

বইয়ের শেষে তার উলঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বুড়ো হাজরা কথা কয়"—গল্পের জের টেনে দরদী

কর্তৃপক্ষ লিখছেন,—

"ঐ গল্পটিতে যে করুণ কাহিনীটি ব্যক্ত হয়েছে, সেই শোচনীয় অবস্থা এ দেশের বহু পরিবারকেই নিরানন্দ করে রেখেছে। শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানের অভাবে আমরা নিজেদের নিরুপায় মনে করে অবশেষে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দৈবের শরণাপন্ন হই, যেমন হয়েছিল উপরোক্ত কাহিনীর গ্রাম্য বধূটি। কিন্তু সে যদি জানত যে, নারীর বন্ধ্যাত্ব নানাকারণেই ঘটে থাকে তাহলে শুধু দৈবের মুখ্যপেক্ষী না হয়ে সে নিজের শারীরিক ত্রুটি সংশোধনেই সর্বাগ্রে যত্নবতী হত।

কয়েকটি বিশেষ স্ত্রীরোগ অনেকসময় নারীর বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে ওঠে। এইসব দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক স্ত্রীব্যাধি নিরসনের জন্য উলটকম্বল, অশোক এবং আরো কয়েকটি স্ত্রীরোগের প্রতিষেধক ভেষজ সংমিশ্রণে দুটি মহৌষধ প্রস্তুত হয়েছে ঃ ক্যাল-কেমিকোর অশোকারিষ্ট ও অশোকিনা।"

ঠিক এই একই উপায়ে অন্যসব গল্প থেকেও শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রতি দরদী ব্যবসায়ীরা নিংড়ে টেনে বার করেছেন এমন কিছু যার জন্যে ক্যালকাটা কেমিক্যালের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

পৃথিবার কোথাও নিজের দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিককে কেউ এভাবে অপমান করতে সক্ষম হয়েছে কি না, আমাদের জানা নেই। 'বুড়ো হাজরা কথা কয়'-এর মত গল্পের এই লেজুড় যিনি জুড়তে পেরেছেন, তার নিজের লেজ থাকা এমন কিছু অসম্ভব নয়। সেই লেজের মুখে আগুন লাগিয়ে তিনি কাদের মুখ পোড়াচ্ছেন—এটা একবার ভেবে দেখবেন কি?

* * *

'সুভাষচন্দ্র' নেতাজী হওয়ার পর এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ত্রিপুরা কংগ্রেসের পর মহাত্মা গান্ধী যাঁর সম্বন্ধে একদা একথা পর্যন্ত বলতে সাহস করেছিলেন,"After all, Subhas was not an enemy of the country"—পরে আই. এন. এ. পর্বের পর তাঁর চোখ হঠাৎ খুলে যায় এবং স্বীকার করেন, সুভাষের এরকম সংগঠনী শক্তির সঙ্গে তিনি আগে পরিচিত ছিলেন না। জহরলাল একদা বাঁশ নিয়ে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পরে ভোটের জন্য বংশীসহকারে আই. এন. এ.-র অভিনন্দন সভায় পোঁ ধরেন। এখন অবশ্য আবার আই. এন. এ.-র প্রতি বিমুখ হয়েছেন। এ ছাড়া, বাঙ্গালী কারোর কাছে তিনি ছিলেন ডার্ক ফোর্স, কারোর কাছে খোকাবাবু। এখন তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ লাইট দেখতে পাচ্ছে তাঁর মধ্যে। এমনি একজন সুভাষ সম্বন্ধে একখানা বই লিখে তার নামকরণ করেছেন 'আমার বন্ধু সুভাষ।' কেন না 'তাঁর' বন্ধু বলেই সুভাষের পরিচয়।

বইএর প্রচ্ছদপটে যাঁর আকৃতি অঙ্কিত হয়েছে, তিনি বুদ্ধদেব, কিংবা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কি কোনো চৈনিক বৌদ্ধ কিছু বোঝার উপায় নেই। শুধু একটি জিনিস বোঝা যায় তা থেকে ; সে হল যে, ওটি সুভাষচন্দ্রের আকৃতি নয় কিছুতেই।

প্রায় দেড়শো পাতার এই বইতে সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর সব কিছুই আলোচিত হয়েছে। যেমন, এ থেকে জানা যায়, এর লেখক দিলীপকুমার রায় ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা একই!—জানা যায়, লেখকের মাতামহের থিয়েটার রোডের প্রাসাদের কথা। জানা যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ দিলীপকুমারকে নির্বাচনীযুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য বলেন এবং দিলীপকুমার রাজী হন না—প্রতিপক্ষ নদীয়ার মহারাজা বলে নয়, এ পথে আসা তাঁর ঠিক হবে না বলে। আরো জানা যায়, সুভাষচন্দ্রের কথায় দিলীপ রায় জেলে যেতেও রাজী ছিলেন।—এবং এর ফাঁকে কোনো কোনো জায়গায় সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়। দিলীপকুমার লিখছেন ঃ

"আমার বলতে কষ্ট হয়, তবু বলব যে, সুভাষ শেষ পর্যন্ত তার সত্যপ্রীতিকে অম্লান রাখতে পারে নি।" (এ কথা না বললে, সুভাষের জীবনের আপসোসের দিকটা না দেখিয়ে দিলে তাঁর জীবনীকারের যে মস্ত ত্রুটি থেকে যাবে কি না?) তারপর সুভাষের রাজনৈতিক দৃষ্টি কেমন করে ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে--তাও দিলীপকুমারের অজানা নয়। এবং তারপর 'উচ্ছ্বসি'--উন্মাদ দিলীপকুমার লিখছেন, "সেই সেবারে ত্রিপুরীতে যেখানে সিংহের মত গর্জন করা তার স্বাভাবিক হত, সেখানে তার বদলে মহাত্মাজীর কাছে সে করুণকণ্ঠে জানালে আবেদন। এ আবেদনে সে বড়ই ক্ষীণ অজাপ্রকৃতির পরিচয় দিয়েছিল বোধ হয়।"

জন্মবাতুলেরও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। আজন্ম মেয়েলি ঢংএ অভ্যস্ত এই বৃহন্নলাটি সুভাষচন্দ্রকে বলছে 'অজাপ্রকৃতি।'

'শনিবারের চিঠি'-র একটি মতের সঙ্গে আমাদের এই কারণে কোনোদিন গরমিল হবে না। সে হল দিলীপকুমারকে 'পাগলা জগাই' বলা! 'পাগলা জগাই'-ই বটে, তবে পাগলামি সারাবার ওষুধও আমাদের জানা আছে। ভাবছি এবারে বোধ হয় তারই দরকার হবে শেষ পর্যন্ত!

* * *

পিতৃদেবের প্রতি ভক্তি খুবই ভালো জিনিস, কিন্তু সাহিত্য-মাধ্যমে তার প্রচার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। দিলীপকুমারের পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল স্বনামধন্য লোক। তৃতীয় শ্রেণীর কতকগুলি নাটকের জন্য নয়, অল্প কয়েকটি হাসির গানের জন্য বাংলাসাহিত্যে তাঁর আসন চিরস্থায়ী। দিলীপকুমার তাতে প্রীত নন। রবীন্দ্রনাথকে সুরকার হিসেবে ছোট করলে তবেই তাঁর বাবা বড় হবেন--দিলীপকুমারের এই ধারণা। বাপকে তুলতে গিয়ে বাপকে তিনি যে কোথায় বসাচ্ছেন--শুধু এইটুকু যদি তাঁর মগজে কেউ ঢোকাতে পরত! সে যাই হোক, 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথের গান অন্য সুরে গাওয়া প্রসঙ্গে বলছেন যে, নজরুল ইসলাম নাকি এ বিষয়ে অনেক উদার। দিলীপকুমার তাঁকে জানান যে, নজরুল যদি তাঁর গান গাইবার সময়ে গায়ককে সুরের স্বাধীনতা না দেন তবে তিনি (দিলীপকুমার) রবিবাবুর গান গাওয়া যেমন বন্ধ করে দিয়েছেন, তেমনি নজরুলের গানও আর গাইবেন না। দিলীপকুমারের মত একদল লোক আছে বড় বড় লোকদের বিরক্ত করাই যার কাজ। রোলাঁ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ এঁদের কাছে সকলের অবাধ প্রবেশ থাকায় দিলীপকুমার জাতীয় লোকরা এই ধরনের সুবিধে পায়। রবীন্দ্রনাথকে নানা রকম বোকা বোকা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং জবাব বুঝতে না পেরে আজ তাঁর এতদূর দুঃসাহস হয়েছে যে, কাজী কি বললেন তাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবিচার করবার চ্যাংড়ামো করছেন ছাপার অক্ষরে। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সেই চিরন্তন প্রতিভাধরদের অন্যতম যাঁরা কোন কথা কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলেন, তা শুধু তাঁরাই জানেন। তাঁর সুর বদল কেন করা যায় না গানে, তা বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথ হতে হয়। শকুন্তলাকে বুঝতে হলে হতে হয় কালিদাস। সেই যে প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ বলে থাকেন যে, Simple হওয়া খুব ভাল। কিন্তু সিম্প্লিসিটি এক টনের কম হওয়াই ভালো, তা না হলেই Simpleton হতে হয়। দিলীপকুমারের হয়েছে তাই।

* * *

অন্ধকে অন্ধ বলতে বিদ্যাসাগরের বারণ ছিল। কিন্তু অন্ধভক্তিকে সহানুভূতি দেখাবার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ এঁরা তাঁদের নিজেদের ক্ষেত্রে মস্ত লোক, কিন্তু এঁদের ভক্তরা প্রমাণ করবেই যে, রবীন্দ্রনাথ মস্ত চিকিৎসক ছিলেন এবং গান্ধীজী যেমন শিল্পবোদ্ধা এমন আর কেউ নয়। এতে যে রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীকে সত্যি সত্যিই লোকের কাছে কত ছোট করা হয় সেদিকে নজর দেবার মত ক্ষমতা থাকে না অন্ধ ভক্তদের স্বভাবতঃই। ফলে ব্যাপারটা আর সকলের কাছে দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে।

শারদীয়া বসুমতীতে নির্মলকুমার বসু গান্ধীজী সম্বন্ধে অরিজিনাল হতে গিয়ে সব্বনেশে হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি লিখছেনঃ "উপরে তালপাতার ছাউনি দিয়া প্রদর্শনীর স্থানটিকে ছাওয়া হইয়াছিল ; তাহার ফাঁকে প্রখর রৌদ্রের কিরণ ভেদ করিয়া মেঝের উপর আলোর রেখা দিয়া প্রাণবন্ত আলপনা অঙ্কন করিয়াছিল। গান্ধীজী নির্বাক বিস্ময়ে সেই দিকে চাহিয়া ছিলেন। সকালে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কয়েকমুহূর্ত পরে গান্ধীজী বলিলেন, "নন্দলাল, তুমি কি কখনো এমন ছবি আঁকিতে পার?"...নন্দবাবু হৃদয়ঙ্গম করিলেন, গান্ধাজী প্রকৃতিই শিল্পী..."এর মধ্যে নন্দবাবু যাই পান, আমরা আনন্দ পাই না। গান্ধীজী যদি সত্যি সত্যিই ঐ কথা বলে থাকেন রোদের আলপনা দেখে, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ হলেও, শিল্প সম্বন্ধে নেহাৎই অজ্ঞ ছিলেন। আর, যদি নির্মলবাবুর হয় ঐ মন্তব্য, তা হলে বলবার কিছু নেই, কারণ তাঁর কাছ থেকে ওর বেশী আশা করি নে।

রোদের আলপনা দেখে গান্ধীজী ছাড়া আরও হাজার লক্ষ জন লোকমুগ্ধ হয়েছে, যাদের কোনো নন্দবাবু আজও সত্যি শিল্পী বলে বুঝতে পারেননি। তবে তাদের মধ্যে কেউ নন্দবাবুকে ওরকম হাস্যকর প্রশ্ন করবারও আবসর পায়নি। প্রকৃতির হাতে কত বিচিত্র ছবি ফুটে আছে হয়ত মরুভূমিতে, হয়ত পাহাড়ের শুষ্ক কঠিন নীরস বুকে—কিন্তু মানুষ যখন কোনারকে সেই শিল্পকার্যকে রূপ দিয়েছে তখনই আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকে শিল্পী বলে, স্রষ্টা বলে সম্মান দিয়েছি। দুরন্ত বর্ষার সঙ্গীতকে কবি যখন শুধু কথা দিয়ে ছন্দ দিয়ে ধরেছেন তাঁর রচনায় তখনই তাকে যাদুকর বলে মেনে নিয়েছি। মানুষের গলা দিয়ে যখন সুর বেরিয়েছে তখনই তাকে নমস্কার করেছে সর্বযুগের রসিক লোকেরা। এই প্রতিভাটা হয়ে ওঠা নয়। একে সৃষ্টি করতে হয়েছে, সেই কারণেই এর দাম। সূর্যের কিরণ পাতার ছাউনি ভেদ করে পড়লে আপনা থেকেই আলপনা হয়। কিন্তু তাকে ছবিতে ধরতে হলে যার প্রয়োজন তা হল প্রতিভা। এবং প্রতিভা আজো পর্যন্ত সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু। শিল্পপ্রতিভার অভাবেই গান্ধীজীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল কম। কাজেই মন্তব্য ছিল ঐরকম অরসিকজনোচিত।

[১ম বর্ষ, ১৩৫৪—৫৫-র বিভিন্ন সংখ্যা থেকে সংকলিত]

স. ম.ঃ--অচলপত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় আরেকটি ফিচার 'সাহিত্য দুঃসংবাদ।"

১৫ই আগস্টের সংকল্প

একবার মন্ত্রী করে দাও মা ; অন্ততঃ ছ'মাসের জন্যে! আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে আছে সকলের নামে ব্যবসা করি। আর, আর মা! একটু দয়া কর শুধু! বক্তৃতামঞ্চে মুখে বাণী জুগিও! রেডিও থেকেও অন্ততঃ ভালো কথা বলতে দিও! ব্যস! ছ'মাস মন্ত্রী করো মা, ছ'মাসের জন্যে মাত্র, একবার লুটোপুটে খাই মা, লুটেপুটে খাই!

স্বাধীনতাদিবসের বিশেষ সম্পাদকীয়

ফিল্‌ম্ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ফিল্‌ম্ ও প্যাটেল

যে সব জীবদের দু পায়ের মধ্যে ভগবান একটি করে টেল দিয়েছেন ফিল্‌ম্ ইণ্ডিয়ার বাবুরাও প্যাটেল তাদের অন্যতম, বাবু বাবুরাও প্যাটেল—প্যাটেল বলে কি না কে জানে, সর্দারি করাটাকে তাঁর জন্মগত অধিকার বলে ধরে নিয়েছেন ; রাজনৈতিক জগতের সর্দার প্যাটেলের মত, সিনেমার জগতের ইনিই একমাত্র নিধি, সর্দার নিধিরাম প্যাটেল। যে সব অন্যায়, অসত্য এবং মিথ্যাচার—যা যা ইনি নিজে করে থাকেন, সেগুলির বিরুদ্ধেই এঁর লড়াই। নিধিরাম সর্দারের মত ঢাল-তলোয়ারের ইনিও পরোয়া করেন না। উড়িয়াদের মত ইনিও পেছোতে পেছোতে হাঁক ছাড়েন। না, ভুল বললাম, ইনি হাঁক ছাড়তে ছাড়তে পেছোন। কিন্তু এ সব বর্ণনা অত্যন্ত স্থূল বর্ণনা প্যাটেলের। তাঁর চরিত্রের বৈচিত্র্য হল, প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই বাবুটির, সেই বারোয়ারী নারীদের মত,--বাবু বদলানোই যাদের ব্যবসা। পেশাদার গণিকারা যেমন বাবু বদলায়, আমাদের বাবু বাবুরাও প্যাটেল তেমনি তাঁর পিঠ চাপড়াবার লোক বদলান। আগে তাঁর কাছে প্রতিভা ছিল শান্তারাম ; এখন কিশোর সাহু।

সে যুগে 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' করেছিলেন দুঃশাসন কায়ায়। এ যুগে বাবু বাবুরাও প্যাটেল 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' করেছেন ছায়ায়। যতগুলি অভিযোগ আজ পর্যন্ত ভারতীয় ছায়াছবির বিরুদ্ধে প্যাটেল পেশ করেছেন, তিনি নিজে 'দ্রৌপদী' তুলে প্রমাণ করলেন, এর চেয়ে ঢের মারাত্মক ছবি তিনি নিজেই করতে পারেন। এই ভদ্রলোক আবার নিউ থিয়েটার্সের ছবির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতেন। নিউ থিয়েটার্স আজ পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ ছবি তুলেছেন "শোধ বোধ", তার দুহাজার মাইলের মধ্যে "দ্রৌপদী" পৌঁছতে পারেনি। Racy English লেখাই যে 'ছবি' তোলার একমাত্র 'গুণ' নয়, বাবু বাবুরাও প্যাটেল বোধ হয় এখনো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। না হলে তিনি এর পরে 'শুভলানি' তুলে সব গুবলে ফেলতেন না।

মাড়োয়ারীদের বিয়ে করতে বেরোনোর মত, বাবুরাওর কাগজ বেরোয় এখানে নীল, ওখানে লাল রঙের দাগা পেছনে নিয়ে ; ফিচারের ওপরে নিজের ছবি সমেতও কখনো কখনো যে না দেখা দেয়, তা নয়। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো কাগজ কখনো দেখেছেন ফিচারের ওপরে গোল করে এডিটারের ছবি ল্যাপটানো? দেখেন নি। বাবুরাওর কাগজে দেখতে পাবেন। দেখে মনে হবে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কথা। "Don't be disappointed" ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে থাকলে মিলিয়ে নিতে পারেন। সেই যে একজন যৌবনের কামনায় তাড়িত হয়ে বিপথে গিয়েছিল তারপর সন্ন্যাসীর কৃপায় দৈব ওষুধের কল্যাণে মুক্তি পেল। তার ছবি দেওয়া আছে পাশে--টাইপরা যুবক!--আমাদের বাবুরাও সেইরকম ছবি প্রতিবার ছাপান নিজের কাগজে।

সমস্ত কাগজটি বেরোয় আমাদের একটিমাত্র দুর্বলতার ওপর নির্ভর করে। সে দুর্বলতা হল, গালাগাল দিলে আমরা ভয় পাই, 'ফিল্‌ম্‌ইণ্ডিয়া' ছবি খারাপ বলবে, অতএব বিজ্ঞাপন দাও। 'ফিল্‌ম্‌ইণ্ডিয়া'ও তা বোঝে, তাই বিজ্ঞাপন পেলে আরো গালাগাল দেয় এবং আরো বিজ্ঞাপন পায়। সবচেয়ে মজা, কলকাতার কোনো চিত্রঘরের মালিকরা এখানকার কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াটা অনর্থক, পকেটের অতিরিক্ত খরচা মনে করেন, কিন্তু বম্বেতে বিজ্ঞাপন পাঠান নির্লজ্জের মত! ছবির যারা মালিক তারা প্রায়ই গো-সদৃশ জীব, তাই। না হলে একখানা মাসিক পত্তর গালাগাল দিলে ছবির সেল কমে যাবে, এমন সিলি চিন্তা আর কার

মাথায় আসতে পারে? লোকে যদি ছ্যব নেয়, তো সমস্ত দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিকে মিলে তার কিছু করতে পারেনি, পারে না এবং পারবে না। শান্তারামের 'শকুন্তলা'কে বাবুরাও বলেছিলেন, ছবি হয়নি। না হোলো। ছবি না হয়ে যদি একশো সপ্তাহের ওপর 'শকুন্তলা' ছবিঘরে চলে থাকে তো তাতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয় যে, 'filmindia' পড়ে লোকে ছবি দেখতে আসা না আসা ঠিক করে না। তা যদি করত তাহলে তাঁর Twentieth Century-র best ছবি 'দ্রৌপদী'র এ হাল হত না। কলকাতা পর্যন্ত এসেছিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু বাঙালীরা বদলোক। 'দ্রৌপদী' তুলেছিলেন প্যাটেল ; বাঙালীরা বললে, 'দ্রৌপদী' নয়, যে এ মাল তুলেছে সে নিশ্চয়ই চারপদী। ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে চললেন প্যাটেল ; গিয়ে নতুন উদ্যমে বাঙালী-নিন্দে শুরু করলেন।

তবু মজা এই যে, বাঙালীরা এই কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, বাঙালীরা এই কাগজ কেনে, অনেকের মুখ দিয়ে লাল পড়ে filmindia বলতে।'

আমার ব্যক্তিগত মত হল, constructive criticism করতে যদি শক্তির দরকার হয় তাহলে destructive criticism করতে আরো বেশী ক্ষমতার দরকার। তারপর পক্ষপাতহীন কোনো সমালোচনা হয় না—এও আমি বিশ্বাস করি। ব্যক্তিগত কথাও যে এসে পড়বে, এ বিষয়েও ভুল নেই। কিন্তু কথা হল, সেই ব্যক্তিটি কেমন, যে এ কাজগুলি করবে। ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন ৺স্যার আশুতোষের সমালোচনা করেন, তখন নির্ভীকতার সঙ্গে লেখাটার জোর মিলে এক অদ্ভুত যাদু হয়। কিন্তু কারোর ঘরের কথা overhear করে art-paper-এ তা পরিবেশন করলে বড় জোর film টা-india হতে পারে, তার বেশী হয় না। গালাগাল দেওয়ায় যে ক্ষমতার দরকার হয় সে ক্ষমতা কাগজের ওপর আঁকা মুর্গীর ডিম পাড়ার মত সহজলভ্য নয়! তার জন্যে ভারী শক্ত সাধনা দরকার হয়, বড়ই মর্মান্তিক কষ্ট করতে হয়, প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে হয়। গলাগলি করার থেকে গালাগালি করায় পৌরুষের বেশী প্রয়োজন।

দী. কু. সা.

[২য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা : চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৫৬ থেকে সংকলিত]

যৌগিক ব্যায়াম

প্রত্যেকটি হিসাব তিনবার যোগ দিয়ে তবে আমার কাছে আনবে ;—নতুন সহকারী-এ্যাকাউন্টেন্টকে এ্যাকাউন্টেন্ট বলেন।

'আমি দশবার যোগ দিয়েছি—

'খুব ভালো! এরকম কাজই আমি পছন্দ করি—

'কিন্তু দশবারই দশ রকম আলাদা আলাদা যোগফল হয়েছে ; তার কি করি?

৩৭০·৪ মিটার

বেতারপঞ্চবিংশতি

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ছিল সে যুগের গল্প, বেতারপঞ্চবিংশতি হচ্ছে এ যুগের "গল্প নয়।" অবশ্য ভালো করে হিসেব করলে, কোনো অঙ্কের মাস্টারকে দিয়ে হিসেব করিয়ে নিলে, পঞ্চবিংশতি নয়, একনম্বর ডাস্টবিন প্লেসে যে কেলেঙ্কারী, আবেগজনিত যে হাস্যকর অবস্থা, বড়লোকের অকালপক্ক ছেলেমেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতায় গুণীদের যে হাল হয়, তাতে পঞ্চবিংশ নয়, ওকে পঞ্চবংশ বলাই সম্ভব ; চৌযট্টি কলার পেছনেই ওদের বংশ দেওয়া। সুরের যে একটা নিয়ম আছে, যখন তখন যে কোনো সুর যে শোনানো যায় না, সুর বাজাতে হলে কোন্ সুর আগে, কোন্ সুর পরে বাজাতে হয় তার যে একটা জ্ঞান থাকা দরকার, সুর-পরিক্রমা না জেনে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তা যে অসুরের পরাক্রমের মত উৎকট হয়ে দেখা দেয়, তা ঝোপ-কামিজ (Bush shirt) পরা ঝোপ-বুঝে-কোপ-মারা চাকরী-বজায়-রাখা বুড়ো-খোকাদের গজ-বুদ্ধিতে বোঝাই অজ-মস্তিষ্কে ˚ সুকুমার রায়ের ভাষায়, গজাল মেরেও ঢোকানো যাবে কি না সন্দেহ! আসলে কলকাতা-কেন্দ্রের বেতার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় গেটে ঢুকতেই। সেই যে যেখানে নেপালী দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গীন হাতে—সেই সঙ্গীনই হল বেতারের symbol! ভারী সঙ্গীন অবস্থা আমাদের কলকাতা বেতারের! বোতল-ব্যবস্থার পরে যে বেচাল-অবস্থা হয়, অনেকটা সেইরকম আর কি! সেইরকম ইয়ারকি হবে হয়ত!

বেতারের Gun-লেখক

গান লিখলেই যে আপনার গান রেডিওতে গাওয়া হবে এমন দুরাশা করবেন না! Gun লিখুন ; কলকাতা বেতারকেন্দ্রে এক list আছে গীতলেখকদের, তাহলেই তার মধ্যে আপনি পড়বেন। কখনো শুনেছেন মশাই যে, বার্থ রেজিস্ট্রেশন, ডেথ রেজিস্ট্রেশনের মত গীতিকার রেজিস্ট্রেশনও বাধ্যবাধক করা হতে পারে কোথাও। সে Gun-এ চাঁদ এবং হেনার সঙ্গে "ভুলিবে না" দিয়ে মিল দেওয়া চাই, তা না হলে আপনারটা শুধু সঙ্গীত হল ; কাব্যসঙ্গীত হল না! এবং কাব্যসঙ্গীত না হওয়া মানে বেতারে তা শোনানো অসম্ভব। গীতরচয়িতার list কি মশাই? চাকরীতে ইণ্টারভিউ যারা দিতে যায়, তাদের 'selected list' হতে পারে, নিমন্ত্রিতের list হয়, এমনকি যতরকম নির্বুদ্ধিতা, ক্লিক, ইয়ারকি, প্রতিভার অসম্মান, যা যা গুণপনা রেডিওর P.A.-দের মধ্যে পাওয়া যায় তারও একটা list করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু প্রতিভার আবার list কি? নতুন গীতলেখকরা জন্মাচ্ছে, নতুন গান নিয়ে তাদের নিত্যকালের পরীক্ষা, নতুন গীতলেখক এলেই পুরোনোরা বাতিল হয়ে যাচ্ছে ; সৃষ্টির সেই চির উর্বর ক্ষেত্রে যারা আসবে যাবে, তাদের আবার list কি? এ কি ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা যে টেক্সট বইএর list হবে? না কি যে সব লোকের অস্তিত্বই নেই পৃথিবীতে, কখনো ছিলও না, তাদের প্রক্সিতে Congress candidate-কে ইলেকশনে জেতাতে হবে বলে false list তৈরী করা? গাধার একটা list হতে পারে, (অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকেই তার একটা ভালো মত আঁচ পাওয়া সম্ভব) কিন্তু কোন্ কোন্ গাধার গান গাইতে দেওয়া হবে, তার আবার list কি?

আমাদের চোখের সামনে

দুটি জগৎ,—একটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক জগৎ, আরেকটি হল 'বেতার জগৎ।' বহুকাল আগে স্টেপলটন সাহেবের সময় যখন 'বেতার জগৎ' প্রকাশিত হয়, তখন তার বিক্রী ছিল সামান্য, পরিচয় ছিল মূল্যহীন। আজ 'বেতার জগৎ' বিক্রয়ে এবং বিজ্ঞাপনে অন্যান্য কাগজের ঈর্ষাস্থল ; অথচ দেখুন কি হাস্যকর এ কাগজের অবস্থা! 'আকাশবাণী' দিয়ে শুরু হয় বেতারজগৎ, সারা হয় Editor A.K. Senকে দিয়ে! মাঝখানে কিছু ব্লক ছাপা হয় যা 'দৈনিক বসুমতী'কেও লজ্জা দেয়। অথচ এ কাগজে কিনা পরিবেশন করা যেত ভালো ব্লক দিয়ে, বিজ্ঞাপনসম্মত lay out করে, বেডিও-সেটের দীর্ঘজীবন কেমন করে গড়তে হয়, তার সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা দিয়ে। রেডিওর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তার আলোচনা এবং রেডিওর limitation তার পক্ষে সব সময় সমগ্র শ্রোতার আনন্দবিধান কেন করা সম্ভব নয়, সে সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত মতামত দিয়ে বেতারজগতের ভোল ফিরিয়ে দেওয়া যেত না? অবশ্য এ সব কি অরণ্যে রোদন করছি? এ কাগজের Editor যে A.K.Sen! এ যেন "শ্রীমতী" নামক মহিলা পত্রিকার কর্তৃপক্ষদের বলতে যাওয়া যে Society Lady-দের বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে 'বিজ্ঞাপন' যোগাড় করা ছাড়া কাগজ বার করবার অন্য কয়েকটি দিক আছে, এমনকি সে কাগজ মেয়েদের জন্যে হলেও।

মাইকের অন্তরালে

কি হয় আপনি জানেন? জানলে অবাক হয়ে যেতেন! কোনো দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বসম্পন্ন পদে যাঁরা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁরা যে কতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন হতে পারেন একমাত্র কলকাতা কর্পোরেশনের কাণ্ডকারখানা বাদ দিলে তা ধারণা করা অসম্ভব। বেতার-কেন্দ্রে প্রোগ্রাম ব্যবস্থা করেন P.A-রা ; সেগুলি পাশ করে Programme Executive-রা। Programme Executive নিজেরা কোনো artistকে প্রোগ্রাম দিতে পারেন না। কিন্তু P A.-রা যদি কাউকে প্রোগ্রাম দেন, তা অনুমোদন বা বাতিল করার ক্ষমতা তাঁদের আছে। ফলে, Executive-রা যখন তাঁদের কোনো পেটোয়া লোকদের প্রোগ্রাম দিতে বলেন, P.A.-দের তখন তাকে প্রোগ্রাম দিতেই হয়। কেন? তাহলে শুনুন। ধরুন, কোনো P.A. তা করলেন না। তখন Programme Executive-এর কর্তব্য কি? না—সেই P.A.-র প্রোগ্রাম শিডিউল না করা ; বা, অনাবশ্যক দেরী করা। ফলে, শেষ মুহূর্তে প্রোগ্রাম যদি বা শিডিউল হল, তো Artist পাওয়া গেল না সেই প্রোগ্রামের। কারণ, প্রোগ্রাম শিডিউল না হওয়া পর্যন্ত artist contract সম্ভব হয় না। এবং শিডিউল দেরীতে হলে artist-কে সব সময় পাওয়া যায় না। অথচ এতে ক্ষতি হয় কার? Public-এর। যাদের পয়সায় রেডিও চলে।

তবুও Public কিছু বলে না কেন?

কারণ সেই অধিকার খাটানোর বোধ আজও দাসত্বমুক্ত জাতির জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। হলে এই নোংরামো দেশের এতগুলো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকত না। হলে মন্ত্রীসভা টিকত না, কর্পোরেশনের চেহারা বদলে যেত, রেডিও স্টেশনে একজনও থাকত না যারা আজ আছে, সিনেমার সামনে গুণ্ডারা টিকিট বিকোত না, কালা

কানুন বাতিল হত, ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে অন্য লোক আসত এবং সর্বোপরি জাতীয় সংবাদপত্র লালবাতি জ্বালত অনেক আগেই। সেই জাগরণ জনসাধারণের মধ্যে আসেনি বলেই রেডিওতে যোগ্য শিল্পীর জায়গায় অযোগ্য শিল্পী, যোগ্য অফিসারের জায়গায় অযোগ্য অফিসার, যোগ্য ব্যবস্থার পরির্তে শৃঙ্খলাহীন বানচাল অবস্থা ; রেডিও কর্তৃপক্ষ জানে, কাগজে গাল দেবে, লোকে হাসবে, কিন্তু তার বেশী কিছু করবে না। যদি তারা জানত যে, ভালো প্রোগ্রাম করলে Public যেমন ধন্যবাদ জানাবে, খারাপ প্রোগ্রাম করলে তেমনি হানা দেবে রেডিও অফিসে, Pass সঙ্গীন, আইন কিচ্ছু মানবে না, তাহলে দেখতেন চেহারা বদলে গেছে এক নম্বর ডাস্টবিন প্লেসের । তাহলে দেখতেন একটি ত্রুটিও সারাদিনে ঘটলে কত সাবধান থাকতেন এঁরা। সেই সচেতনতা ততদিন ফেরৎ আসবে না যতদিন না Public তার right সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। চল্লিশ হাজারী দৈনিকে প্রতি সপ্তাহে গালাগাল করেও নয় ; 'অচলপত্রে' ৩৭০.৪ মিটার দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালকে দিয়ে লিখিয়েও নয়।

দী. কু. সা.

[২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ থেকে সংকলিত]

স.ম:– '৩৭০.৪ মিটার' রেডিওর অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ফিচার। তখনকার বেতারের মিটার অনুযায়ী ফিচারের নাম।



--আমার একটা দশ নয়া পয়সা পড়ে গেছে...

তিনটে, ছটা, নটায়

[এবার ৩, ৬ ও ৯টায় কোনো ছবির আলোচনা না করে অন্য কাগজ ছবির আলোচনায় কতদূর দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে তারই কয়েকটি নমুনা ও সেই সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য]

কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কালোছায়া' প্রসঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল। আমরা বলছিলাম যে, আপনি ক্রাইম ছবিতে নবদ্বীপ এবং হুয়াকে ভাঁড়ামি কেন করালেন? বিশেষতঃ আসল ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ওদের দিয়ে Drag করানোটা ভারী খারাপ লাগে না? তাহলে আপনি ওরকম করলেন কেন? উত্তরে প্রেমেনবাবু যা বললেন তা মনে রাখার মত। তাঁর উত্তর হল ঃ "ওটা কেন রেখেছি? রেখেছি শুধু আমাদের দেশের চিত্রসমালোচকদের জন্য।" "কি রকম?" আমাদের ফের প্রশ্নাঘাত। "আমাদের ফিল্ম ক্রিটিকরা কি রকম জানো?" প্রেমেন্দ্রবাবু বলেন, "তাদের জন্যে যদি কোনো ত্রুটি না রেখে দাও, তো তারা সমস্ত ছবিটাকে নস্যাৎ করবে। কিন্তু ঐ যে একটু ভাঁড়ামো—ওইটা বাদ দিলে বইটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হত—এই কথাটুকু লিখে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার সুযোগ দিলে চিত্রসমালোচকদের, ভারী খুশী হয় তারা। তাই নবদ্বীপ আর হুয়ার শেষদিকের অভিনয় অংশটুকু অতিরিক্ত জেনেও রেখেছি, না হলে আবার..."।

কথাটা সত্যিই এ দেশে প্রণিধানযোগ্য। সমালোচনা জিনিসটা সাহিত্যের, কি চিত্রের, কি বাণীচিত্রের যারই হোক না কেন, তার একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব অযথা প্রশংসা অথবা অকারণ গালাগালিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। খোসামোদ করলে একটা তৃতীয় শ্রেণীর ছবির জন্যে যেমন যে কোনো ছায়াসমালোচকের সার্টিফিকেট পেতে দেরী হয় না, তেমনি যে কোনো ভিন্ন ধরনের ভালো প্রয়াসকে 'সিনেমা হয়নি' বলে উড়িয়ে দিতেও বাধা নেই একটুও। কিন্তু এই দায়িত্বের অবমাননা ফিল্ম-ক্রিটিক নয়, সাহিত্যিক যখন করেন, তখন লজ্জিত হতে হয় আমাদের। নমুনা ঃ

'প্রতিরোধ' ছবি সম্বন্ধে নারায়ণ গাঙ্গুলী

'আনন্দবাজার'-এ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'প্রতিরোধ' ছবি সম্বন্ধে লিখছেন ঃ "পরিচালক শ্রীখগেন রায় নির্দেশিত "প্রতিরোধ" ছবিখানি দেখবার সুযোগ পেলাম। কিছুদিন থেকে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও উন্নত আদর্শবাদ পরিবেশনের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে 'প্রতিরোধ' সেই লক্ষ্যের অভিমুখে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।...পরিচ্ছন্ন পরিচালনা, প্রাণোজ্জ্বল কাহিনী এবং সরল সংলাপ বইটিকে পরম উপভোগ্য করেছে।...পল্লীজীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে পরিচালক একটি সুন্দর সমগ্রতা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মার্জিত নির্মল রুচির এই পরিচ্ছন্ন বইখানি বাঙ্গালী দর্শককে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেবে বলেই আশা করি।"

বাঙ্গালী দর্শককে ১৫ই অগাস্ট আসা এবং মাস শেষ হতেই বিদায় নেওয়া এ বই কেমন আনন্দ দিয়েছে সে কথা থাক ; এবং পরিচালনা সম্বন্ধেও কোনো মন্তব্য করব না। তাছাড়া বাঙ্গালী প্রযোজকের নিবেদন এই ছবিটির বক্স অফিস ব্যর্থতায় আমরা সহানুভূতি প্রদর্শন করতেও পিছপাও নই। কিন্তু সেই অজুহাতে মাত্রাতিরিক্ত আবোল তাবোল বলতে হবে একটা অতি সাধারণ শ্রেণীর চিত্র সম্বন্ধে? তাও লেখার বাজারে কবে একটুখানি নাম (?) হয়েছিল, তার জোরে?—এ বরদাস্তের অযোগ্য। 'আনন্দবাজারের' সিনেমার পাতায় এই জিনিস প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক পত্রিকার কাজ হল, দেশের সাধারণ লোককে পথ বাতলে দেওয়া, সে রাজনীতি, অর্থনীতি, কি শিল্পনীতি--যে ব্যাপারেই হোক না কেন! আমাদের খবরের কাগজ সে দায়িত্ব কেমন ভাবে পালন করেন, তা আমরা এইরকম টুকরো ব্যাপার থেকে নয়, বড় বড় জাতীয় স্বার্থনির্ভরশীল ব্যাপারেও খবর পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে পাই। কিন্তু সাহিত্যেসেবী (?) একজন কোন্ ভ্রষ্টবুদ্ধির তাড়নায় এ জাতীয় সফররাজী করেন জানতে ইচ্ছে হয়। শিল্প সম্বন্ধে যে কোনো মতামত যে কেউ ব্যক্ত করতে পারে আইনের বাধা নেই বলেই। আইন যে দিন এই স্বেচ্ছাচারের পথ বন্ধ করে দেবে চাবুকের ভয় দেখিয়ে সেদিনই একমাত্র সমালোচনার নামে এই রসিকতা বন্ধ হতে পারে--তার আগে নয়। আমার দ্বিতীয় অভিযোগ সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যাধিনায়ক শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সার্টিফিকেট সম্বন্ধে। তাঁর বাংলাসাহিত্যে চিরস্মরণীয় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আপনারা সবাই জানেন, কিছুদিন হল, পর্দায় দেখানো হয়েছে। এ ছবি কেমন হয়েছে, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ছবিটির পর্দারূপ দেখে ঃ "আমার মনের কুসুমকে কেউ এভাবে ফোটাতে পারবে, এটা অন্ততঃ আমার কল্পনাতীত ছিল।" একটা ছবি তৈরী করতে অনেক টাকা লাগে। এমন কোনো কাহিনী নিয়ে সেই ছবি যখন তৈরী হয় যা জনসাধারণের কাছে সস্তা জিনিস দিয়ে জনপ্রিয় হতে চায় না, তখন সে চিত্র বক্স-অফিসের দিক থেকে এক্সপেরিমেণ্ট হয়ে দাঁড়ায়। এই এক্সপেরিমেণ্ট যাঁরা করেন পয়সা রোজগারের সহজ পথ ছেড়ে, তাঁরা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু শুধু এক্সপেরিমেণ্ট করলেই তো সব হল না। অর্থকরী না হোক, রসিক লোকের চিত্তহরণকারী কিছুটা তাকে হতে হবেই। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ছবির পর্দায় তা হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যে তা জানেন না, তা নয়। তবু সার্টিফিকেট যদি তিনি সাধারণভাবে দিতেন, তাহলে তা তাঁর উপযুক্ত হত, কারণ তাঁর মত কাহিনীকার ছবির প্রশংসা করে দু কথা বললে যদি ছবি দুদিন বেশী চলে ছবিঘরে, যদি দুটো লোক বেশী টানে তো এই ধরনের এক্সপেরিমেণ্টাল ছবির জন্যে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর মত দায়িত্বসম্পন্ন লেখকের হাত দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত কোনো কথা বেরোবে কেন? জীবনরহস্য উদঘাটনে প্রতি রচনার প্রতিটি লাইন যার কাছ থেকে ওজন-করা চাই আমরা, তিনি কেন একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সম্বন্ধে হঠাৎ উচ্ছ্বাসে কোনো কথা বলবেন? না কি, সত্যিই তাঁর বিশ্বাস যে, তাঁর মনের কুসুমকে কেউ এভাবে ফোটাতে পারবে, এ তিনি আশা করেননি। যদি সত্যিই নিজের জ্ঞানে এবং বিশ্বাসেই একথা বলে থাকেন, তাহলে বলব, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' তাঁর কনশাস সৃষ্টি নয় ; তিনি না জেনে লিখেছেন। তাহলে মানিকবাবু, আমার কাছ থেকে জেনে নিন, পর্দার কুসুম, আসল বইএর কুসুমের কিছুই হয়নি। কুসুম এমন একটি চরিত্র যা মহত্তম লেখকও একবারের বেশী দুবার সৃষ্টি করতে সময় নেয়, কিম্বা আর পারেই না।

স.মঃ—এটি সিনেমা সম্বন্ধে নিয়মিত ফিচার।

টিফিন কৌটা

(এক্সপেরিমেণ্টাল পোয়েট্রি)

[এই রবীন্দ্রোত্তর যুগে আপনি যাহা কিছু লিখুন না কেন কবিগুরুর সুর থাকিবেই। সুতরাং তাঁহার লেখা যে এ ধরনেরও হইতে পারিত, ইহা প্রমাণের প্রয়োজন দেখি না।]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো, টিফিনের কৌটা
        তোমার কাহিনী কত কব
তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি নিত্য
        নিত্য মোর লাগে অভিনব।
কভু লুচি, কভু রুটি, কভু বা পরোটা
তোমার উদর ভরি থাকে এটা ওটা
তোমা সাথে যদি মেলে
        জল এক লোটা
কোনো কিছুতেই আর হইব না চিন্তিত
আপন জঠর-অন্ন অপরে বিলায়ে
        ক্ষণতরে হও না কুণ্ঠিত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

("মেথর" কবিতাটি দ্রষ্টব্য)

কে বলে তোমারে বন্ধু মূল্য তব কম
জানি তুমি নহ শুধু এ্যালুমিনিয়ম্।
আপনি মুখের গ্রাস অকপট মনে
প্রতিদিন তুলি দাও পরিশ্রান্ত জনে।
ক্ষুধিতেরে অন্ন দিবে এই অভিলাষ,
ধন্য তব জীবনের পরম বিলাস।

বনফুল

(বনফুলের এ ধরনের কবিতা প্রচুর আছে)

গৃহিণীর অভিযোগ ছোট এ কৌটাটি
অল্পাহারে চেহারাটা করে দিল মাটি।
কর্তা কন, হত যদি বোতাম সিস্টেম
পাকস্থলীতে এটা পুরিয়া নিতেম।

নজরুল ইসলাম
('বিদ্রোহী'র অনুকরণে)

আমি টিফিন কৌটা সাত্ত্বিক বৈরাগী
আমি নিজ জঠরের অন্ন বিলাই
তোমার জঠর-জ্বালা নিবারণ লাগি।
আমি নিষ্কাম নির্লোভ,
আমি আপন বলিয়া রাখি না কিছুই
রাখিনাকো কোনো ক্ষোভ।
আমি খেলি খেয়ালের খেলা
মাটি থেকে মোর জন্ম বলেই
কোরো না কো অবহেলা।

সুকান্ত ভট্টাচার্য
("সিগারেট" দ্রষ্টব্য)

আমি টিফিন কৌটা--
কেন তোমরা অমন করে আমার জঠর থেকে
খাদ্য ছিনিয়ে খাও?
কঙ্কালসার লোভী তোমরা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে
চিরদিন বঞ্চিত করে চলেছ আমাদের।
নিষ্ঠুর লোভের বশে মানবতার
দোহাই মান না তোমরা।
ঘষে মেজে এই যে আমাদের
তনুশ্রী বাড়াতে চাও
সে শুধু তোমাদের রুচির তাগিদে।
কিন্তু একদিন বিদ্রোহ করব আমরাও।
তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে হিংস্র ঠোঁটের ফাঁকে
চেপে ধরব তোমাদের পরস্বাপহারী
আঙ্গুলগুলোকে।
কামড়ে ছিঁড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেব তোমাদের
দীর্ঘদিনের অন্যায় আর অত্যাচারের।

নিউ থিয়েটার্সের নিকৃষ্টতম নিবেদন "বিষ্ণুপ্রিয়া" ইতিহাস অবমাননার জন্যে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়া উচিত!

"বিষ্ণুপ্রিয়া" দেখতে দেখতে আমার যাঁর কথা প্রথম মনে এলো তিনি বিষ্ণু ঘোষ। আগে আগে ভাবতাম রেডিওতে তিনি যে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন, তা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এখন মনে হয় তা নয়। এমন একটি প্যাঁচ যদি শিখে রাখতাম তাঁর কাছ থেকে যাতে অনেকগুলিকে ঘায়েল করা যায় এক 'ঘা'-তে তাহলে নিউ থিয়েটার্সের "বিষ্ণুপ্রিয়া" ছবির চিত্রনাট্যকার, শিল্প-নির্দেশক, পরিচালক কাউকে যাতে এ জীবনের মত আর কোনো প্রিয়ার গায়ে হাত দিতে না হয়, তার ব্যবস্থা একবার দেখতাম। বাস্তবিক অল-ইণ্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা কর্পোরেশনের মত নিউ থিয়েটার্সকেও শুধু উপদেশে শোধরানো আর সম্ভব নয়। কিসে সম্ভব—তাই বলেই শুরু করলাম সমালোচনা।

এ ছবিতে প্রদীপ বটব্যালকে ন্যাড়া হতে হয়েছে গল্পের খাতিরেই। আমাদের খাতিরে হেমচন্দ্র চন্দ্রও যদি একসঙ্গে মাথা মুড়োতেন তাহলে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' দেখবার পর তাঁর অসংখ্য অনুরাগীদের পক্ষে তাঁর মাথায় ঘোল ঢেলে এ রাজ্য থেকে বিদায় করে দেওয়া সহজ হত। আজ দেশ এবং জাত নির্বীর্য হয়ে পড়েছে তাই, না হলে ঐতিহাসিক সত্যের যে বিকৃত এবং অযথাযথ রূপ এ ছবিতে দেখা গেছে তার জন্যে শুধু লাঞ্ছনা যথেষ্ট হত না, আইনের হাতে অভিযুক্ত হতেন যাঁরা এ ছবি তুলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই। বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং সত্যিকারের অহিংস তাই, না হলে বিষ্ণুপ্রিয়া-কাঞ্চনার বাক্যালাপ এবং অভিনয়, নিমাই-অন্তরঙ্গদের ব্যক্তিত্ব, জগাই-মাধাই উদ্ধারদৃশ্য এবং কাজীর সঙ্গে নিমাইএর মিলনদৃশ্য দেখার পর তাঁরা দেশের লোক এবং সরকারকে ধর্মের অবমাননায় উদাসীন দেখলে হয়ত বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধর্মযুদ্ধে একবার অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি হয়ত এই অনধিকারী snobদের কান ধরে বলতেন ঃ অর্ধচন্দ্র মানে যদি গলা ধাক্কা হয়, তবে ডবলচন্দ্র যা নাকি হেমবাবুর পেছনে উপাধি হয়ে রয়েছে তার মানে হচ্ছে ঃ শুধু গলায় হাত নয়, গলায় পা দিয়ে দরজা দেখিয়ে দেওয়া।

হেমচন্দ্র চন্দ্রকে আমি নীচে কয়েকটি প্রশ্ন করছি ঃ

(১) 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স কোথায়? (খড়ম-জোড়া--যেটা পড়ে রইল, চিত্রনাট্যকারের মাথায় সুপুরী রেখে তাই দিয়ে মারলে বোধ হয় একটা ক্লাইম্যাক্স হতে পারত ঃ তাই না?)

(২) জগাই-মাধাই উদ্ধার নিমাইএর একটা বিরাট ট্রায়াম্ফ। শুধু তাই নয়, 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালা দেখতে দেখতে আবালবৃদ্ধবনিতা যে চোখের জলে ভেসে যেতেন, তার কারণ নিমাইএর করুণা এবং বিপক্ষদের অত্যাচার এবং তার চরম পর্যায়ে জগাই-মাধাইকে উদ্ধারের মধ্যে দিয়ে নাটকীয় রসকে ঘনীভূত করে তোলবার যে টেকনিক, তারই সাফল্য। (অবশ্য 'বিষ্ণুপ্রিয়া' দেখবার পর মনে হল, জগাই-মাধাই আজও উদ্ধার হননি ; হেমচন্দ্র ও বিনয় চাটুজ্যে হয়ে তাঁরাই বেঁচে আছেন।')

(৩) মীরা মিশ্রকে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় কেন নামিয়েছেন, এ প্রশ্ন তাঁকে করা বৃথা। হয়ত এতে "Hitting him below the belt" হবে (আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে, হিট করলে below the belt করাটাকে অন্যায় মনে করিনে। কারণ, 'হিট' করার অর্থ

ভদ্রতা নয় ; আঘাত করা,

(৪) ছবির গোড়ায় পটভূমিকা দেখলুম অত্যাচারে জর্জরিত দেশে নিমাইএর আবির্ভাব প্রতিশ্রুতির। সারা ছবিতে অত্যাচারের দৃশ্য তো তেমন মর্মান্তিক কোথাও দেখা গেল না। কাজীর সঙ্গে দেখা না হতেই জড়িয়ে ধরা, জগাই মাধাইএর পতন হওয়ার আগেই উদ্ধার--এর সঙ্গে যে পটভূমিকায় চৈতন্যের আবির্ভাব তার সঙ্গতি কোথায়? (অত্যাচার অবশ্য আছে। সে হেমবাবুর এবং বিনয়বাবুর অত্যাচার দর্শকের শ্রবণ, চিন্তা, কল্পনা, শিল্পবোধ, ধ্যানধারণা, চিত্ররুচি, সাহিত্যশ্রদ্ধার প্রতি পাশবিক অত্যাচার!)

(৫) 'কাঞ্চনা' চরিত্রটি কি? যাত্রাদলের সুরে অনবরত তাকে দিয়ে "সখী" বলাবার মধ্যে কি humorous relief দিতে চেয়েছেন হেমবাবু? (না কি, মহাজন যে বলে গেছেন, "কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাজ্য"--'বিষ্ণুপ্রিয়া'র কাঞ্চন তারই জীবন্ত উদাহরণ?)

(৬) কাজীর সভাদৃশ্যের setটি কার পরিকল্পনা? প্রতিভার একমাত্র খনি সৌরেন সেন মহাশয়ের নিশ্চয়ই? যাঁরা নিউ থিয়েটার্সের টেকনিক বলতে অজ্ঞান, আমার এ প্রশ্নটি তাঁদের কাছে, যে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র set-ও কি সমালোচনার উর্ধ্বে?

(৭) রাইচাঁদ বড়াল মশাইএর music সম্বন্ধে হেমবাবু কি খুব আশা পোষণ করেন এখনো?--কিন্তু আমরা তো জানি তাঁর সুরের কাননে বহুকাল ফুল ফোটে না। তবুও কেন? নিউ থিয়েটার্সের বাইরে থেকে কোনো নতুন সঙ্গীতপরিচালক আনা যায় না?

এই প্রসঙ্গে আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। তা হল, নিউ থিয়েটার্সে অ্যাসিস্টেন্ট থেকে অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান থেকে ক্যামেরাম্যান হচ্ছে--অথচ সুর দেওয়ার ক্ষেত্রে রাই এবং পঙ্কজ মল্লিক ছাড়া কারোর নাম দেখা যায় না কেন? সুরকার বদলালে হয় না এবার? আর কেন?

আর প্রশ্ন নয়। জীবনে একবার জনপ্রিয় একটি চিত্র করতে পারলেই মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া ভারতীয় চিত্রপরিচালকদের দস্তুর। 'উদয়ের পথে' থেকে অধঃপাতের পথে তাদের অনায়াসযাত্রা। এই সব পরিচালকদের একটি ছবি যখন লেগে যায়, তখন তার পরের ছবিতে আরো ভাল করার দিকে মন না দিয়ে চার অক্ষরে ছবির নাম দিলে ছবি hit হবে না পাঁচ অক্ষরে দিলে লাগবে, তাই নিয়ে গবেষণার অন্ত থাকে না। প্রথম ছবির নামের আদ্যক্ষর যখন 'প্র' ছিল, তখন সব ছবির নামই 'প্র' দিয়ে শুরু কর--তাহলেই আর মার নেই। কিন্তু হায়! শেষে দেখা যায় 'প্রতিশ্রুতি'র 'প্র' পর্যন্ত নেই 'প্রতিবাদে।'

নিউ থিয়েটার্সে অনেক অপদার্থ আছে কিন্তু বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তারা কিছু নয়। 'বিনয়' নাম বটে, কিন্তু আসলে চিজটি যে কি নয়, তা ধরা শক্ত। কখনো ওরিজিন্যাল গল্প লেখেন, কখনো শুধু চিত্রনাট্য,--আমাদের এই 'কি নয়' চাটুজ্যেটি যে হাতিকে ক্রমশঃ চোরাবালিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বভ্রমণকারী কর্ণধারের কানে তা যে কবে পৌঁছবে! (পৌঁছবেই বা কেমন করে? 'কর্ণধার' কথাটার যে এদেশে মানে হচ্ছে, যে নিজের কর্ণ অপরকে ধার দিয়ে বসে আছে।'

'শোধবোধ' ছাড়া এত খারাপ ছবি এর আগে নিউ থিয়েটার্সও তুলতে পারেনি। নিউ থিয়েটার্সের পক্ষেও এর আগে এত নিকৃষ্ট কাজ দুঃসাধ্য বলেই ঠেকেছে। নিমাই-সন্ন্যাসের মত সাবজেক্ট যার নাকি বাঙালী দর্শকের কাছে মার নেই, তাও যে 'mishit' করা যায়, বিষ্ণুপ্রিয়া তারই সাক্ষ্য বহন করবে চিরকাল।

যদি শুধু 'যাত্রা'ও করতেন হেমবাবু 'বিষ্ণুপ্রিয়া'য় তাহলেও পয়সা ঘরে আসত আশার অতীত অঙ্কে। কিন্তু 'cinematic' হতে হবে যে--চিত্রসমালোচকরা যদি 'টেকনিক' বলতে অজ্ঞান না হল, তাহলে আর হেমচন্দ্র কেন? তাহলে তো যে কেউ করতে পারত! হ্যাঁ, হেমবাবু জেনে রাখুন, তিনি যা করেছেন তার চেয়ে ভালো যে কেউ করতে পারত! যে

কেউ এর চেয়ে বেশী পয়সা ফিরিয়ে দিত প্রযোজককে, যে কোনো স্টুডিওতে কাজ করে, যে কোনো আর্টিস্ট নিয়ে।

এর একাধিক গান লিখেছেন (কবি) বিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর একটি গানের প্রথম দুটি পদ হল ঃ

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!!"

তাঁর মত leftist কবি সিনেমার মত এত বড় ক্ষেত্র পেয়েও একটি "লাল" বন্দনা না লিখে ফ্যাসিস্ট কৃষ্ণের বন্দনা লিখতে কেন রাজী হলেন কে জানে?

'বিষ্ণুপ্রিয়া' করবার পর হেমচন্দ্র এবার বৈষ্ণব সাহিত্যটা একবার পড়ুন। চিত্রপরিচালক হলেও তিনি বাংলাটা বানান করেও অন্ততঃ পড়তে পারেন, এ ধারণা করে নেওয়া--আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। তারপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবনী নাট্যের কথা একবার ভাবুন। একটু আঁচ করতে পারবেন যে, জীবনীচিত্রের মধ্যে স্মরণীয় জীবনের নতুন imterpretation দিলেই তবে তা নাটক হয়! Shaw এর Saint Joan নাটকে আমরা তাঁর চিন্তার আভাস পাই। তিনি ঐ নাটকে বলেছেন যে, খ্রীস্টকে নিয়ে আমাদের এই যে হৈ হৈ, এ যে কতখানি কৃত্রিম, তা বোঝা যায় এখনি যদি খৃষ্ট আবার ফিরে আসেন। তখন আমরাই তাঁকে আবার ক্রুশবিদ্ধ করব। কারণ, খৃষ্ট যার প্রচারক সেই সত্যকে আমরা সবচেয়ে ভয় করি। এই চিন্তাদৃপ্ত নববাণীর জন্যে Saint Joan নাটক! হেমবাবুকে বলা মানে অবশ্য পাতা নষ্ট করা। না হলে তাঁকে বলতাম, পৃথিবীর সাহিত্যে দেখা গেছে, সবচেয়ে শক্ত হচ্ছে ধার্মিক বা ভালো মানুষের চরিত্র আঁকা। আঁকার দোষে প্রায়ই ভালো মানুষেরা প্রাণহীন হয়। Villain বা টাইপ-সৃষ্টি শক্ত, কিন্তু একটি মহান চরিত্র মহৎ করে আঁকতে যে অন্তর্দৃষ্টি এবং মানবতাবোধ থাকা দরকার তা সারাদিন নিছক নোংরামির মধ্যে কাটালে সম্ভব নয়। যে কারণে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ছবিতে নিমাইএর অন্তরঙ্গদের ছবি আঁকতে গিয়ে হেমবাবুর ধ্যানের মধ্যেই আসেনি যে, নিজেদের বিশেষ ক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন giant! (অবশ্য এমনও হতে পারে যে, হেমবাবু giant-killer বলে যে একটা কথা শুনে আসছেন তার মানে বোধ হয় এই মনে করেছেন যে, giant-killer হওয়া সব সময়ই বুঝি ভালো!)—এই সব চরিত্র চিত্রে ফোটানো বড় শক্ত কাজ। বড়ই কঠিন। তাঁর চিত্রনাট্যকারের ভুল ইংরাজীতে কথার তুবড়ী ফোটানোর চেয়ে অনেক শক্ত।

এ ছবিতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে মীরা মিশ্রের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' অনেককাল আগের রেডিওর ভূতপূর্ব দাদুমণি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অভিনীত কবি কালিদাসকেও হার মানিয়েছে। সবচেয়ে মজা যে, তাঁর কণ্ঠস্বর দর্শকের কান পর্যন্ত প্রায়ই এসে পৌঁছায়নি। কেঁদে, না কেঁদে, ফুলের মালা পরে, ছিঁড়ে, মাটিতে শুয়ে, খাটে শুয়ে তিনি যা করেছেন, তাতে প্রদীপ তো সাজা-বিষ্ণু, আসল বিষ্ণুই তাঁকে দেখে গৃহত্যাগী হতেন।

প্রদীপের অভিনয় দেখে আমি কিছুটা অবাক হয়েছি। ভেবেছিলাম, চেহারা ছাড়া আর কিছুই তাঁর দেখাবার নেই ; কিন্তু সত্যি বলতে কি, এ ছবিতে তিনি অভিনয়ও করেছেন। ভালো অভিনয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভূমিকাটি অত্যন্ত দুর্বলভাবে অঙ্কিত, তাই লোকে ভুল করেছে ; চিত্র্যনাট্যকারের যে ত্রুটি, সে ত্রুটির ভাগ তাঁকেও নিতে হচ্ছে। 'ভুলি নাই'-এর চেয়ে তাঁর অভিনয় অন্ততঃ দশগুণ ভালো হয়েছে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'য়। খ্যাতি যে অনেক সময় অত্যন্ত সাধারণ অভিনেতাকেও ভালো অভিনয় করবার দিকে সচেতন করায় এবং অনেক সময় সাফল্যও আনে প্রদীপ বটব্যাল তারই অন্যতম উদাহরণ। একটি দৃশ্যে তাঁর অভিনয় তো সত্যিই অপূর্ব এবং বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় বহন করে। সেটি হল, তাঁর খাওয়ার দৃশ্য। যেখানে মীরা মিশ্র কচুর ঘণ্ট না কি এনে দিচ্ছেন ও তিনি পরিতৃপ্তির সঙ্গে

আহার করছেন। যা খেয়ে তাঁকে ঐ মুখভঙ্গী করতে হচ্ছে, তা যে আসলে কি, তা তো আমরা জানিই। (তবুও রক্ষে যে সিনেমায় পুরো খাওয়াটা দেখানোর দরকার হয় না!) কিন্তু প্রদীপকুমার এখানে অভিনয়ে কোনো ত্রুটি করেননি। অভিনয় এতটা উতরেছে যে, আমি লিখতে লিখতেই অনুমান করতে পারি যে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া' দেখবার পর যাদের বাধ্য হয়ে হেমচন্দ্রকে প্রশংসা করতে হচ্ছে তাদের চেয়েও প্রদীপের এই দৃশ্যের অভিনয় নিখুঁত হয়েছে। অন্যান্য ছবিতে প্রদীপের সঙ্গে নবদ্বীপের অভিনয়ে আমি বিশেষ পার্থক্য বুঝতাম না। কিন্তু 'বিষ্ণুপ্রিয়া'য় তিনি অন্ততঃ ভবিষ্যতে সুঅভিনয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (বিষ্ণুপ্রিয়ায় অবশ্য নবদ্বীপের মত অভিনয় করাটা খারাপ হত না, কারণ, চৈতন্যের সঙ্গে নবদ্বীপ অবিচ্ছিন্ন)।

শচীমাতার চরিত্রে আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা চরিত্রাভিনেত্রী চন্দ্রাবতীকে অভিনয় করবার মত মালমসলা কিছুই দেওয়া হয় নি। তবুও 'চন্দ্রা' যা করেছেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর 'নিমাই' ডাকের প্রতিধ্বনি-দৃশ্যটি হল, এ রাজ্যের সেই মানেহীন কথা 'Technique'-এর চূড়ান্ত প্রমাণ। কিন্তু হেমচন্দ্রকে কে বলবে শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতায় যা ভালো লাগে সিনেমায় তাকেই শাস্তি মনে হয়। বারংবার 'নিমাই' কথাটার প্রতিধ্বনি শেষ পর্যন্ত হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ছাড়া আর সকলের পক্ষে বলছি।

পাহাড়ী সান্যালের চরিত্রটি অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্পূর্ণ। তাঁর অভিনয়ে একটা আশ্চর্য স্বাভাবিকতা যা বড়দিদি থেকে লক্ষ্য করা গেছে তা দ্রুত পরিণতির দিকে চলেছে। অভিনয় না করাটাই যে সত্যকার অভিনয়, এটা পাহাড়ী ক্রমশঃ প্রমাণ করেছেন বলে আমি বিস্মিত। তিনি এর ওপর আবার 'সান্যাল' বলে আমি গর্বিত। তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে বলে আমি শঙ্কিত। তিনি আমার পত্রিকার গ্রাহক বলে আমি যতটা খুশী, আমার কাগজের আজীবন গ্রাহক হতে চাইছেন না বলে আমি সেই পরিমাণ বিমর্ষ। তাঁকে একটি ব্যক্তিগত উপদেশ জানাচ্ছি। এ লাইনে জাল পাহাড়ীরা দেখা দিচ্ছেন। 'নকল হইতে সাবধান' গোছের একটা কিছু এখনি করা দরকার ('পদবী দেখিয়া লউন' বললে কেমন হয়?)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'বৃত্রসংহার'। আমাদের এই হেমচন্দ্রের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে 'বিত্তসংহার' হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র জন্যে হেমবাবুর মাইনে বাড়া উচিত। বিনয় চট্টোপাধ্যায় মশায়ের allowance বাড়া উচিত। মীরা মিশ্রকে permanent করা এবং রাইচাঁদ বড়ালকে music শুধু না দিয়ে একটা গোটা বইএর direction-এর ভার দেওয়া উচিত। এবং যদি সম্ভব হয়, হেমবাবু কি বিনয়বাবুকে দিয়ে (কি নয় বাবু?) music দিলে ছবিতে লোক হবে। বিনয়বাবুর পক্ষে Bernard Shaw-কে একবার এ বিষয়ে consult করে নিলে অসুবিধে হবে না তেমন। (পাঠক যাঁরা জানেন না, তাঁরা মনে রাখবেন, সাধারণ মানুষের যেমন 'হাইড্রোফোবিয়া' আমাদের বিনয়বাবুর তেমনি শফোবিয়া)। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' তোলবার পর যদি এঁদের পদোন্নতি (দু পা থেকে চার পা বলছি না, মাইনের কথা বলছি) না হয়, তাহলে বীরেন্দ্রনাথ সরকারোচিত হবে না তা।

সর্বশেষে একটা কথা। সাধারণ পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, আমি যে হেমবাবু এবং বিনয়বাবুকে এ লাইন থেকে বার করে দিতে বলেছি, তাহলে এ দুর্দিনের বাজারে তাঁরা খাবেন কি করে। সত্যিই নিউ থিয়েটার্সে যার অন্ন নেই, বাইরে তাদের কেউ নেবে না, তা ঠিক। আমি এদের ভাতে মারতে বলছি না। এ বিষয়ে আমার একটা প্রস্তাব আছে। চিড়িয়াখানায় যে সব প্রাগৈতিহাসিক জন্তু পাওয়া যায় না, যেমন ডাইনোসোরস ইত্যাদি, সেই সব শূন্য ঘরে এঁদের অনায়াসেই রাখা চলতে পারে এবং খাওয়ানোও। (অবশ্য তাতে একটা বিপদ আছে। 'প্রাগৈতিহাসিক' জন্তুদের শূন্যস্থান পূরণ করতে গিয়ে এঁরা যদি তাদের

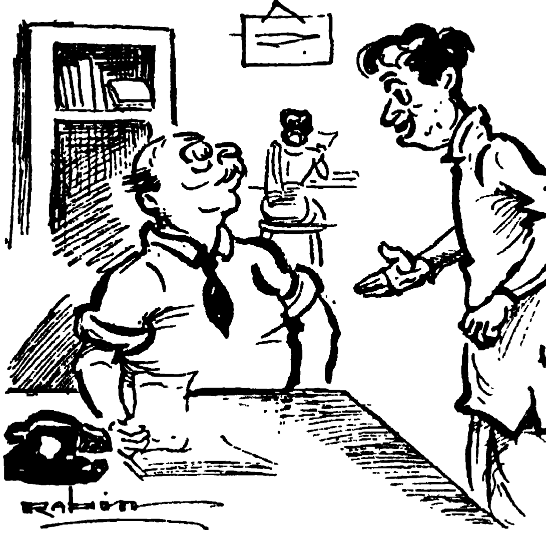
মত খেতে শুরু করেন, তাহ'লে অবশ্য ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে দাঁড়াবে। আর সেটা এমন কিছু অসম্ভবও নয়। কারণ, এত দিন এঁরা হাতির খোরাক পেয়ে এসেছেন।)

তবে প্রাগৈতিহাসিক জীবদের ঘরে রাখতে বলেছি এই কারণে যে, আগামী দিনে বাস্তবিকই এঁরা তাই বলেই গণ্য হবেন। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ভাববে,—এরা বাস্তবিকই ছবি তুলত একদিন? সিনারিও লিখত এমনি করে?

সতর্ক পাঠিকা লক্ষ্য করবেন, অসিতা বসুর অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলিনি। বলিনি তার কারণ, তিনি আমায় একদিন টেলিফোন করে অনুরোধ করেছেন, যেন খুব গালাগালি না করি। তিনি এ ছবিতে আছেন, শুধু এই জন্যে এ অনুরোধ করবার দরকার ছিল না। তাঁর অভিনয় আমার ভাল লেগেছে।

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

[২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৬ থেকে সংকলিত]



—চাক্‌রি? এত লোক অফিসে যে হিসেব রাখা যায় না.
—ওদের হিসাব রাখবার কাজটাই দিন না!

এ মাসের স্পেশাল

চারুবিশ্বাসকে বিশ্বাস নেই!!
সিণ্ডিকেটের কাছে একমাত্র নিবেদন ঃ "আমাদের
ডিগ্রী ফেরৎ নেওয়া হোক!!!
—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মহামান্য সদস্যগণ,

সবিনয়ে নিবেদেন,

প্রমথ ব্যানার্জীর জায়গায় এনেছেন চারু বিশ্বাসকে, বলিহারী বুদ্ধি আপনাদের। From frying pan to fire-এর এত বড় জ্বলন্ত নিদর্শন এর আগে আর দেখা যায় নি। ভদ্রলোক এসেই দোষ দিলেন কাকে?--না, কেরানীদের। যারা ভাইসচ্যান্সেলার তনয়ের নম্বর বাড়ালো তাদের জেল হল না, কিন্তু যারা খবর বার করে দিল, তারা হল disloyal। চমৎকার! অর্থাৎ বিষ্ (শ) বিদ্যালয়ের মধ্যে নোংরামী থাকে থাক, "তোমরা তাকে বাইরে টেনে আনবে কেন?" অবশ্য আমারো বোকামি। এসব কথা বলছি কাদের? আপনাদের ; সিণ্ডিকেটের মাননীয় সদস্যদের। যাদের প্রথম সরানো দরকার—যাদের না সরালে, যাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে না নিলে, পরিবর্তন কিছুই হবে না। প্রমথবাবুর জায়গায় শুধু আসবেন চারুবাবু। যা চলছিল অসতর্কভাবে, তাই চলবে সুচারু উপায়ে।

আমরা একবার ভেবেছিলাম ঃ দৈনিক পত্রের মত ব্লক ইত্যাকার ছেপে একটা হৈ হৈ বাধিয়ে দিই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার নিয়ে। তারপর ভাবি, কি হবে? কেন করব? এই কেলেঙ্কারী বেরিয়ে কি হবে? কেন করব? যদি এই কেলেঙ্কারী বেরিয়ে পড়ার পেছনে আদর্শগত কোনো বিরোধ থাকত, তাহলেও বুঝতাম। যদি জানতাম যে, দেশের যুবশক্তি জাগ্রত হয়েছে, তাদের চাপে মাথা নুইয়েছে এরা তবে আমরাও যোগ দিতাম এ যুদ্ধে। যতটুকু সাধ্য তাই নিয়েই এগিয়ে আসতাম আমরা। কিন্তু তা তো নয়। এ তো কোনো আদর্শগত লড়াই নয়। এ তো প্যাঁচের লড়াইমাত্র। প্রমথ ব্যানার্জিকে প্যাঁচে ফেলে বিপক্ষশক্তি সেই একই অন্যায় চালিয়ে যাবার জন্যে খবর বার করে দিয়েছে চোরাপথে। এবং 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।' তাই বলছিলুম, লাভ নেই কিছু বলে।

প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছেন তা নিন্দা করবার মত শব্দ পৃথিবীর ৩৬৫টির অধিক কোনো ভাষাতেই আছে বলে আমাদের বিশ্বাস নয়। এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব নেই, চারু বিশ্বাস আর যাকেই এ কথা বোঝাতে চান, আমাদের যেন না বোঝান। তিনি কিছু জানলেন না, শুনলেন না—হরি কর, শৈলেন মিত্তির তাঁর ছেলের জন্যে গদগদ হয়ে উঠল শুধু শুধুই। এ সব ছেঁদো কথার প্রয়োজন কিছু ছিল না। দরকার ছিল, যারা এই কাজ করেছে, তাদের খোলা রাস্তায় চাবকানো। তারপর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে চাবকানো। তারপর জেলে নিয়ে গিয়ে চাবকানো। তারপর জেল থেকে বার করে ফের চাবকানো।

আমি শুধু ভাবছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারদের এই চোরাপথে নিজের পুত্রপরিবারের জন্যে নম্বর সঞ্চয়ের ফলে, বঙ্গভারতীর কত যোগ্য সুসন্তান হয়ত হতাশায় পেছিয়ে গেল পরীক্ষায় সুফল হবে না সুনিশ্চিত জেনে। কত বিধবা তার শেষ কপর্দক ব্যয় করে মেধাবী পুত্রের শিক্ষাব্যয় বহন করলেন এই আশায় যে, প্রথম স্থান দখল করবে তাঁর পুত্র ; বুদ্ধির লড়াইতে নয়, মই দিয়ে তার ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছে এই জাতীয় কোনো তনয়কে, সোজা পথে যে পাশ করত কি না সন্দেহ।

আর ভাবছি, বিহারী রাজেন্দ্র প্রসাদ, মাদ্রাজী স্যার সি. ভি. রামন এরা ওঁৎ পেতে বসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কেলেঙ্কারী বেরিয়ে পড়ার জন্যে। ভারতবর্ষের কাছে বাঙালীকে এত ছোট যারা করে দিলে, জানি তাদের জন্যে আরো উন্নততর কোনো পদ অপেক্ষা করছে দিল্লীতে, সিমলায়, কি বিদেশে ; কারণ আজকের ভারতবর্ষের দস্তুরই এই। কিন্তু বঙ্গবিদ্বেষী ভারতীয় (অভি) নেতারা একে কিরকম কাজে লাগাবে, তাই শুধু ভাবছি : উঠতে বসতে শুনতে হবে—যেখানে শিক্ষার ব্যাপারেই এই সেখানে আর.....

আর মনে পড়ছে, পার্কে বক্তৃতা, খবরকাগজে বিবৃতি ঃ দেশের যুবশক্তি বিপথে গেল। আইন শৃঙ্খলা কিচ্ছু রাখলে না।—যারা আইনশৃঙ্খলা মানল, যারা সুপথে থাকল, যারা স্থবির এবং ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা কি করল, সে প্রশ্ন দুদিনে লোকে ভুলে যাবে। জনতার ভোলবার ক্ষমতা নাকি মেয়েদেরও হার মানায়। তাই ভুলে যাব, দেশের অগণিত জনগণকে যে দেশে পুলিসের গুলি খেতে হয় রাস্তায়, তাদেরই একজন এ্যামেরিকায় মহাত্মার অহিংসার বাণী ছড়াচ্ছে, যাদের হাতে শিক্ষার ভার, তাদেরই একজন নিজের ছেলের নম্বর বাড়ায় আরেকজনের সহায়তায়, ভুলে যাব যে, একজন স্বাধীনতার প্রথম সৈনিকদের বেঁধেছিল একসূত্রে 'আজাদ হিন্দ সরকারের' পতাকার তলে তাকে নিন্দা করল যারা তারাই আমাদের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আমাদের মাথার ওপর দণ্ড তুলে ধরেছে আজ।...

সব কিছু ভুলে যাবার আগে একটি নিবেদন জানাই আমাদের ডিগ্রী কেড়ে নিয়ে তোমরা আমাদের অব্যাহতি দাও। হে বিষ (শ) বিদ্যালয়ের মহামান্য কর্ণধার! আমরা বিপথগামী তরুণসমাজ, তোমাদের পঙ্কিল নোরামি মাখানো ডিগ্রী আমাদের দুর্বল স্কন্ধে চোরামি দুর্বহ সে ভার" মনে হচ্ছে। জেলে যেন সেই কত 'ডিগ্রী' শাস্তি হয় না?-- তোমাদের দেওয়া ডিগ্রী তার চেয়েও মারাত্মক। ফেরৎ নাও দয়া করে।

ইতি

দী, কু, সা.

[২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৬]

আন কমনসেন্স!

চার বছরের ছেলে টেলিফোন ধরে শুনলে একজন তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান। 'বাবা বাড়ী নেই'—এই কথা জানিয়ে সে মুরুব্বিয়ানা চালে বল্লে, তাঁর জন্যে আপনার কোন খবর রাখবার থাকলে আমায় বলতে পারেন—আমি লিখে রাখছি।'

আমার নামটা লিখে রেখে দাও, গিরিশচন্দ্র।

ছেলেটি একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলে, কিভাবে বানান করেন আপনি?

গ-এ ই, র-এ ঈ।...

একটু বাদে প্রায়-মিলিয়ে-আসা একটি গলা শুনতে পাওয়া গেল। ছেলেটি জিজ্ঞেস করেছে এবারে, আপনি 'গ' লেখেন কী করে?

কালাকে কালা বলিও না

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

বিদ্যাসাগরমশাই অন্ধকে অন্ধ বলতে মানা করেছেন ; খোঁড়াকে খোঁড়া ; কিন্তু বিদ্যাসাগর থেকে সুরসাগর—আজ পর্যন্ত কেউ এ কথাটা বলল না যে, "কালাকে কালা বলিও না।" মজা দেখুন, রাস্তায় অন্ধ হাঁকছে "অন্ধ নাচার বাবা' দুটো পয়সা দাও!" কিন্তু কেউ যদি এই কথা বলে আপনার দয়া আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে "কালার ওপর দয়া কর বাবা, একটা আধলা দাও", তাহলে দয়া তো আপনার হবেই না, বরং হেসে ফেলবেন সকলেই। আপনাদের মধ্যে কোনো কালাও যদি দৈবাৎ কথাটা কানে নেয় তো সেও একটা আধলা বার করবে না কিছুতেই। কিন্তু অন্ধ যদি নাচার হয় তো কালা অনাচার করল কিসে? চোখও ইন্দ্রিয় ; কানও তাই। চোখ গেলে যদি অসুবিধে হয়, কান গেলে সুবিধেটা কোথায়?

আসলে আমাদের সব ক্ষিদেই যেমন ক্ষিদে নয়, চোখের ক্ষিদে মাত্র, তেমনি আমাদের সব দয়াই প্রাণের দয়া নয়, চোখের সহানুভূতি শুধু। অন্ধ চোখে দেখতে পায় না, খোঁড়া হাঁটতে পারে না—এদের দুঃখ আমাদের চোখের ওপর জাজ্বল্যমান, তাই হৃদয় বিগলিত না হলেও চক্ষুলজ্জাতেও আমরা পয়সা দিই। কিন্তু কানে যে শুনতে পায় না, তারও যে কোনো অসুবিধে থাকতে পারে, এ যেন জেনেও, বুঝতে ইচ্ছে করে না, কারণ তা আমাদের চোখের অদৃশ্য।

অথচ একটু ভেবে দেখলেই আপনিও বুঝতে পারবেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালার অসুবিধে অন্ধের চেয়ে বেশী। উদাহরণ দিই। ট্রাম থেকে নামবার সময় অন্ধ একজন সাহায্যকারীকে নিয়ে নামছে, ট্রামশুদ্ধ লোক দেখবেন চেঁচাচ্ছে, "একদম থামিয়ে, একদম থামিয়ে।" খোঁড়া হলে তো কথাই নেই। অথচ অসহায় একজন যে কানে শুনতে পায় না, তার হয়ে বলবার কেউ নেই যে—"রোক্‌কে রোক্‌কে, একদম কালা হ্যায়!" বলবার তো নেই একজনও, বরং একথা বললে হাসবার আছে গাড়িশুদ্ধু লোক। কিন্তু রাস্তা পার হতে বিপদ অন্ধের নয়, এর সাহায্যকারী সঙ্গেই আছে ; বিপদ কালার। গাড়ির হর্ণ যখন সে শুনতে পায় তখন তার নিজের হর্ণ অর্থাৎ শিঙেও সে ফুঁকে বসে আছে।

কিন্তু দুঃখিত না হলেও আরেকজনের কানে শুনতে না পাওয়ায় হাসবার কি থাকতে পারে, এটা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না আমার। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক, যিনি বেশ ভাল ব্যবসা করেন, দেখেছি তিনি কোথাও এসে বসবার চেষ্টা করতেই, অন্যলোক বেশ চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করল—এইরে! শালা কালা এসেছে রে! চেঁচাতে চেঁচাতে এবার ফুসফুস ফেটে যাবে। অদ্ভুত মনোবৃত্তি কিন্তু! ফুটবল গ্রাউণ্ডে কতকগুলো ইউনিফর্ম-পরা ষাঁড়ের পেছনে চেঁচিয়ে গলা চিরতে আমাদের কষ্ট নেই, ঘুষ-খাওয়া কতকগুলো কাউন্সিলর আর এম. এল. এ.দের জন্যে "Vote for" চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করতে আমাদের লজ্জা কোথায়? যত কষ্ট আমাদের পাঁচ মিনিটের জন্যে বধিরদের সঙ্গে একটু চেঁচিয়ে আলাপ করতে। খবরের কাগজে কালার বিরুদ্ধে সাদাদের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন গান্ধী থেকে পল রবসন সবাই। কিন্তু নিজের দেশেই কালাকে উপহাস করবার এই মনোবৃত্তিকে যদি নিন্দে করতেন এঁরা তাহলেই সত্যিকারের বিশ্বপ্রেমিক বলতে পারতুম।

কারণ, এরকম উপহসিত কালা তো সাদাদের দেশেও কম নেই। কানা কেষ্ট গান গাইলে ব্র্যাকেটে লেখা হয় অন্ধ গায়ক ; কই বাণীকুমার রেডিওতে কিছু বললে তো বলা হয় না বধির বাণীকুমার কিম্বা অভিনেতা শরৎ চাটুয্যেকে রংমহলে বা স্টারে তো এভাবে উপস্থিত করা হয় না যে--'কালা অভিনেতা শরৎ চাটুয্যে'? করা হয় না, কারণ করলে লোকে হাসে।

২

কিন্তু কালারা কর্ণমানদের চেয়ে কত বড়--তার খোঁজ নিয়েছেন কখনো? কল্পকথা নয়, গল্পকথাও নয়, ঐ প্রতিদিনকার ইতিহাস থেকেই তার নজির মিলবে। মহাজন বলে গেছেন, কাকে কান নিয়েছে বললেই কাকের পেছনে ছুটো না। কিন্তু মহাজনরা বললে কি হবে, আমরা তাঁদের কটা কথাই বা শুনি। শুধু লোকের কথায় নেচে একমাত্র ছুটতে হয় না বদ্ধ কালাদের। লোকের কথা তাদের কানেই ঢোকে না যে। তারপর,--কালা না হলে আপনি দোকানদার, মজুতদার হতে পারবেন না, ব্ল্যাকমার্কেট কি কংগ্রেস রাজনীতি, কিছুই করতে পারবেন না। নেহরু সম্বন্ধে আজ দেশের লোক কি বলে, কালা না হলে তিনি শুনতে পেতেন। এমনকি, অনেক সময়ই আমার মনে হয়, কেষ্টকে যে কালা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, সে তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলে নয় ; আমার মনে হয়, কানে না-শুনতে পাওয়া কালা ছিলেন বলে। কারণ শুনুন। কালা না হলে কেউ রাধা এবং সেইসঙ্গে ষাটহাজার গোপিনীর সঙ্গে প্রেম করতে পারে? নিজের বোনকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলে যে দেশে কানাকানির শেষ থাকে না, সে দেশে ষাট হাজার গোপিনীর সঙ্গে প্রেম করতে হলে সমাজের কথা যার কান পর্যন্ত সেঁধোয় তার পক্ষে সম্ভব নয়। পিঠে কুলো-বাঁধা এবং কানে তুলো-গোঁজা সাধারণ লোকের পক্ষে সফল হতে হলে এই দুটো করা দরকার। কালাদের নয় ; ভগবান তাদের রাজনীতি করার জন্যে একটা দুরূহ গুরুভার জন্মের সময়েই করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ কানে প্রকৃতির তুলো গুঁজে তবে পাঠিয়েছেন। কাজের মধ্যে বাকী তাদের শুধু পিঠে কুলো বাঁধা।

৩

কান একটা কত বড় জিনিস, কখনো তা সম্পূর্ণ করে ভেবে দেখেছেন কি? এত বড় কুরুক্ষেত্রটা দুর্যোধন বাধাবার সাহস পেলেন কোথা থেকে? ভীষ্মের ভরসায়, দ্রোণের আশায়, দুঃশাসনের আস্ফালনে, শকুনির পরামর্শে? মাথা খারাপ! শুধু নিজের অহঙ্কারে আর কর্ণের জোরে। কর্ণবধের সঙ্গে সঙ্গেই তাই কুরুক্ষেত্র সত্যিকারের সমাপ্ত। কর্ণ বড় সব্বনেশে জিনিস মশাই। সব জড়পদার্থের মধ্যে দেওয়ালকে মানুষ ভয় করে কেন? না,--"দেওয়ালেরও কান আছে!" কোনো অন্যায়, কোনো লজ্জাকর কাজ প্রাণ থাকতে করা সম্ভব হয়তো, কান থাকতে নয়। এককান কাটলেও নয় ; দুকান কাটারাই একমাত্র সমস্ত অন্যায় কাজ করে, তারপরেও গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে সাহস করে--কিন্তু কান কেটে ফেলে দেওয়ার আগে নয়। তারপর দেখুন, শরীরের আর কোনো ইন্দ্রিয় খারাপ হলে, বাইরে থেকেই বোঝা যায়, শুধু কান খারাপ হলে নয়। চোখ, নাক, কি অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনোরকম হানিই লুকোনো অসম্ভব। শুধু কালাকেই বাইরে থেকে ধরা সম্ভব নয়।

অবশ্য কান না থাকার যে সবই অসুবিধে তা নয়, কিছু কিছু সুবিধেও আছে। ধরুন একেবারে বদ্ধ কালাকে রবিবার দিনের বেতারে পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত শিক্ষা বিরক্ত করে না। কালাদের আমি শুধু এই কারণেই ঈর্ষা করি। যেমন ঈর্ষা করি অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দেকে শুধু এই কারণে যে, ছায়াচিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁকে ভগবৎকৃপায় দেখতে হয় না ; হলে আমাদের অবস্থা তিনি অনুমান করতে পারতেন। কালা-প্রসঙ্গে এইখানে আরো একটা

ব্যাপার আলোচ্য। একটা চোখ খারাপ হলে কাঁচের চোখ করিয়ে নিতে অদ্ভুত লাগে না। চোখ এমনি খারাপ হলে চশমা পরতে লজ্জা তো হয়ই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত মেয়েরা ফ্যাসানের খাতিরেও আজকাল চশমা পরছেন। কিন্তু কানে কম শুনলে যন্তর কানে লাগিয়ে কথা শুনতে কালাদের ভারী আপত্তি। বোধ হয় উপহসিত হয়ে হয়ে এই কমপ্লেক্স জন্মেছে বধিরদের। তবে একটা কথা ; যন্তর লাগিয়ে কান ঠিক করা সব সময়েই সুফল দেয় না। সময়ে সময়ে tragic হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটা। যেমন হয়েছিল, কালা গুঞ্জরীলালের বেলায়। সেই গল্প বলেই এ রসনিবন্ধের খতম করি এখানে। কালা গুঞ্জরীলাল অবশেষে একদিন হ্যারিংটন স্ট্রিটের ইয়ার স্পেশালিস্টের কাছে গেলেন। বাষট্টি বছরের মধ্যে বাপের একমাত্র ছেলে গুঞ্জরীলাল কোটি কোটি টাকার গুণে বহু ইয়ারের মধ্যে কাটিয়েছেন, কিন্তু ইয়ার-স্পেশালিস্ট এই প্রথম। বুড়ো বয়সে যেমন অনেকের মনে নতুন করে রং লাগে, আমাদের বুড়ো গুঞ্জরীলালের তেমনি ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি নাগাদই কেমন যেন New ear করবার সখ গেল। ডাঃ গিবসন টাকা নিল প্রচুর ; কিন্তু ফিরিয়ে নিল গুঞ্জরীলালের কান। গুঞ্জরীলাল কান ফিরে পেল না, যেন প্রাণ ফিরে পেল। প্রচুর খুশী আর সকলের ফিসফিস পর্যন্ত শুনতে-পাওয়া কান নিয়ে গুঞ্জরীলাল ফিরে এলেন বটে তাঁর প্রাসাদে, কিন্তু খুশী অন্তর্হিত হল দুদিন না যেতেই। যারা জানত না যে, কালা গুঞ্জরীলাল কান সারিয়ে এসেছে, তারা ঠিক আগেকার মতই কালার সামনে উচ্চৈঃস্বরে আলাপ করতে লাগল কালার সম্বন্ধে। আলাপটা এতদিন বাদে নিজের কানে শুনতে পেয়ে গুঞ্জরীলালের কেমন যেন ভালো লাগল না। সকলেরই কথা প্রায় একধরনের। কালা বুড়ো কবে মরবে আর টাকাগুলো পাঁচভূতে খেতে পারবে। এই হল তাদের আলাপের একমাত্র বিষয়। শুনে গুঞ্জরীলাল থ। কাছে এলে, 'কি, কেমন আছ দাদু?'—কেউ 'জ্যাঠা', কেউ 'খুড়ো' বলে গুঞ্জরীলালকে কত আদর-আপ্যায়ন করে আর ব্যাটাদের মনে মনে এই! নিজের ছেলে পর্যন্ত শয়নে স্বপনে ঐ এককথা বলছে। কালা গুঞ্জরী বললে, "আর নয় ; ভালো ছিলাম কালা ছিলাম।" ফিরে চলল হ্যারিংটন স্ট্রিটে গিবসনের কাছে। বলে 'ফিরিয়ে নাও আমার কান। আবার কালা করে দাও আমাকে।'

ডাক্তার গিবসনের পঞ্চাশ বছর প্রাকটিসে তাঁর ডাক্তারী থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জানা গেছে, একটিমাত্র রুগী এ পর্যন্ত তিনি পেয়েছেন, যে কান সম্পূর্ণ সেরে যাবার পর কোন্ কারণে কে জানে আবাব 'কালা' করে দেবার জন্যে গিবসনের কাছে ফিরে এসেছিল। গিবসন তাঁর ডায়রীতে লিখছেন, 'লোকটির বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল'। কিন্তু আমরা জানি, সেই একটিমাত্র রুগী কে? আরো জানি, তার চেয়ে সুস্থ মাথার লোক সেই সময়ে আর একটিও ছিল না।—তাই নয় কি?

[২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৬]

ঠাকুর তোমায় কে চিনতো না চেনালে অচিন্ত্য?

তিনটে, দুটো, নটায়

মিনার-বিজলী-ছবিঘরে ঃ "বালিগঞ্জ বস্ত্রাগারলুণ্ঠন

* জাতীয় সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে *
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নামে হাস্যকর চিত্রনির্মাণ
সূর্য সেনের ভূমিকায় স্ত্রীলোক(!)

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' দেখে জিহ্বায় তিক্ততা নিয়ে ফিরে এসেছি। শুধু তিক্ততা নয়, আরেকটা যে জিনিষ মনকে নাড়া দিয়েছে, তা হল ঃ গল্পকার না হলে 'ছবি' হয় না। শুধুমাত্র একটা ভালো গল্পের অভাবে বিপুল-বিজ্ঞাপিত এই বইটি (ছবিটির প্রচারকার্য অত্যন্ত যোগ্য হস্তে হয়েছে) বিপুলতর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। একটি দৃশ্যে দেখা গেল, স্বামী দেশের কাজ নিয়ে উন্মত্ত হলে সূর্য সেনের অবহেলিত স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে প্রায়, এমন সময়, সূর্য সেনের দলেরই একজন এসে সূর্য সেনের স্ত্রীকে দড়ি থেকে নামাল। নামিয়েই এ রাজ্যে যাকে সংলাপ বলে, তাই দিলে একখানা ঃ

"চেয়ে দেখো সামনে এই পুষ্পিত জগৎ..." আচ্ছা বলুন তো মশাই, একজনকে সদ্য আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই ডায়ালগ দাগলে সে স্ত্রীলোক হলেও আবার ফাঁসির দড়িতে লটকে পড়বে না? সমস্ত ছবিটাকেই ফাঁসির দড়িতে লটকে দিয়েছেন চারুবিকাশ দত্ত।

আরেকজন চারুবিকাশকে সাহায্য করেছেন, তিনি সূর্য সেনের ভূমিকায় অবতীর্ণা 'স্ত্রী' অভিনেতা। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের" প্রযোজকরা ছায়াছবিতে পুরুষের ভূমিকা স্ত্রীলোক দিয়ে অভিনীত করিয়ে যে নূতনত্বের অবতারণা করলেন তার জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেব ভাবছি। নারাং-কে? নির্মল চৌধুরীকে? লোকনাথ বলকে? বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য অন্যদের চেয়ে একটু জৌলুসের সঙ্গেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সূর্য সেনের ভূমিকায় যিনি নেমেছেন তাঁর নাম ভবেন মজুমদার। সে যাই হোক—বাচনভঙ্গীতে, হাবভাবে যে কোনো স্ত্রীলোককে ইনি অনায়াসে হার মানিয়ে দিতে পারবেন। সূর্য সেন লোকটি বাইরে থেকে অত্যন্ত নিরীহ দেখতে হলেও তিনি ছিলেন অগ্নিগর্ভ ভিসুভিয়স। ভবেন মজুমদার, যিনি সূর্য সেনের ভূমিকায় নেমেছেন, তিনি বাইরে থেকে দেখতে পুরুষ হলেও আসলে মেয়েলিপনায় আশ্চর্য পটু।

চট্টগ্রাম-বিপ্লবের চিত্ররূপ দেওয়ার কথা ছিল, 'ভুলি নাই'—ব্যর্থ 'পরিবর্তন'—সার্থক ন্যাশনাল প্রোগ্রেসি পিকচার্সের। যে বই অবলম্বন করে সেই ছবিটি তোলবার কথা ছিলো সেটি মনোরঞ্জন ঘোষের 'চট্টগ্রাম বিপ্লব'। সরকারের খামখেয়ালীপনার জন্যে ভারতী-ভবন

প্রকাশিত এই বইটির ছাপার আকারে বেরোতেও অনেক দেরী হয়ে যায়। সেই বইএর শেষ পাতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি এখানে। কেন দিচ্ছি, তার কারণও পরে বিশদ করছি।

"মাস্টারদাকে যখন নিতে আসে, তখন তিনি বাধা দেওয়ার সঙ্কল্প করেন। আমরণ সংগ্রাম করবেন এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শত্রুর কাছে বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করা তাঁর অনুচিত। তাই মিলিটারীরা যেই সেলের দ্বার খোলে অমনি তিনি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথমেই সামনে যাকে পান তাকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেন।...মাস্টারের দাঁতগুলি তারা (মিলিটারিরা) ভেঙে দেয়। সূর্য সেনের সারা মুখ রক্তে লাল হয়ে ওঠে, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।

...দিশাহারা শাসকেরা সূর্য সেনের অচেতন দেহই ফাঁসিমঞ্চে টেনে তোলে...

...মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ জেলের মেথররা কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না।...

শুধু অন্ধকার রাত্রে বিন্দু বিন্দু রক্তের ধারা মাটিতে ঝরে পড়ে রক্তিম প্রভাতের সূচনা করে গেল...রক্তবীজ...বিপ্লব বিনাশহীন।"

এই শেষ ঘটনার ঐতিহাসিক তথ্য গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন, তদানীন্তন সরকারী ঘাতক শিবু বাগদীর কাছ থেকে সংগৃহীত। সূর্য সেনের এই অন্তিম বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে, লোকটা শুধু মাথা দিয়েই 'চট্টগ্রাম বিপ্লব'-এর সূচনা করেনি, নিজের রক্ত দিয়ে তার জন্য নবজন্মের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে তবে বিদায় নিয়েছে। ছায়াচিত্রে চারুবিকাশ দত্তের নায়ক সূর্য সেন শুধু বক্তৃতার বাণ্ডিল। কিন্তু ইতিহাসে মাথার সঙ্গে বুকের রক্ত দিয়ে বিনাশহীন বিপ্লবের যারা সূচনা করেছে সূর্য সেন সেই একক ব্যক্তিত্ব। সারা ভারতবর্ষে চট্টগ্রাম বলতে যেমন একটিমাত্র জায়গাকেই বোঝায় সূর্য সেন তেমনি একটিমাত্র মানুষ ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে যাঁর জুড়ি নেই।

এই শেষ সংগ্রাম না হলে সূর্য সেনের চরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ছায়াচিত্রে সূর্য সেনের চরিত্র পাঠাতে প্রধান অকৃতকার্যতা সম্ভব হয়েছে যে কারণে।

এ ছবি ডক্যুমেণ্টারী হয়েছে কি না জানি নে, কিন্তু ছবি হয়নি। ছায়াছবির বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তাকে গল্প হতেই হবে। কিছু একটা সে বলবেই ; কিন্তু বলবে প্রবন্ধের আকারে নয়, বক্তৃতার আকারে নয়. ছবির গল্পাকারে। এবং তার জন্য চাই একজন গল্পলেখক। যে কেউ গল্প লিখতে পারে না ; পারলে অনেক ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। গোমুখ্যুদের কাছে বর্ণর্ড শয়ের বক্তৃতা না বুঝে Quote করা, ছায়াচিত্রকে নতুন জিনিস দিচ্ছি বলার নামে ভাঁওতা দেওয়া—সবই সহজ, শুধু সহজ নয়, 'রামের সুমতি'র মত একটা গল্প লেখা। 'রামের সুমতি'র মত গল্প যিনি লিখতে পারেন তাঁর হাত দিয়েই জাতীয় সংগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনা সত্যকার কাহিনীর রূপ নিয়ে বেরোনো সম্ভব। অন্য কেউ লিখলে তা বক্তৃতায় পটু দন্তবিকাশ হয়; আর কিছুই হয় না, যেমন হয়নি চারুবিকাশের চট্টগ্রামকাহিনী ।

দীপ্তি রায়কে মিলিটারী পোশাক পরাতে গিয়ে সমস্ত দৃশ্যটির সিরিয়াসনেস যে নষ্ট হয়ে গেছে পরিচালক সেদিকে লক্ষ্য করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরেই একজন বিদ্রোহী নায়িকা কেন হঠাৎ আত্মহত্যা করল, তা বোঝা গেল না। ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দৃশটি মনে কোনোরকম রেখাপাত করে না, তার কারণ অত্যন্ত দ্রুততা, ... অভিনেতা-অভিনেত্রীর অপটুতা এবং সর্বোপরি পরিবেশ সৃষ্টিতে অক্ষমনীয় অক্ষমতা। 'স্বামীজী' ছবিতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যেমন একটির পর একটি দৃশ্য গাঁথতে গিয়ে গল্পকে বলি দিয়েছেন, শুধুমাত্র কয়েকটি খাপছাড়া ঘটনা বলবার মোহে

পড়ে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' অনুরূপ কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকটি গুলি ছোঁড়ার দৃশ্য পর পর দেখালে কি ছবির গল্প হয়?

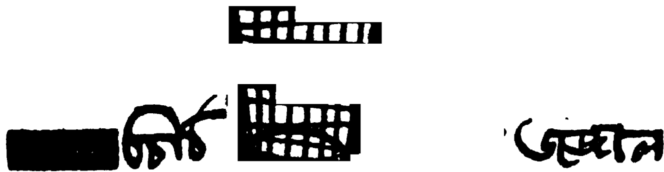
গোড়াতে Commentary দেওয়া হয়েছে, সেটাও কি একটু ভালো গলা দিয়ে বলানো যেত না?

চট্টগ্রাম বিপ্লবের মত একটা বিষয় নিয়ে এমন দুর্বল চিত্র আমাদের খামখেয়ালী 'ফিলম' লোকদের পক্ষেই করা সম্ভব। শুধুমাত্র তৈরী বাজার আছে, চট্টগ্রাম-বিপ্লব নাম শুনলেই বাঙালীমাত্রই একবার দেখবে, এই ব্যবসায়বুদ্ধি সম্বল করে আজও এ জাতীয় ছবি এ দেশেই তোলা সম্ভব। এ ছবি তোলা উচিত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের সেরা লোকদের সহযোগিতায়। কিন্তু সরকারকে বলে লাভ কি? '৪২' গেশে দেখালে সর্বনাশ হয়ে যায় তার কারণ তাতে পুলিষের নগ্নরূফরে আত্মপ্রকাশ যে পুলিসের ওপর সরকারের একমাত্র ভরসা। দেশের লোকও অস্থির। কারণ তার অদ্ভুত। তারা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দেখে এসে বলবে : 'বালিগঞ্জ বস্ত্রাগার লুণ্ঠন' দেখে এলুম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু করবে না। জাতীয়বাদী সম্পাদক এর নির্লজ্জ মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অন্য কাগজে প্রতিবাদ জানাবে, কিন্তু কিনবার বেলায়, ঠিক দাম দেবার বেলায়, পৃষ্ঠপোষকতা করবার বেলায় বেছে নেবে এই সব কাগজগুলোকেই। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বলবে সবাই, কিন্তু দেখুন সারা দুপুর, সন্ধ্যে, সকাল, রাত্তির বাজাতে কারুর বিরাম নেই রেডিও।

কতকগুলো নোংরা, পা-চাটা, সাহেবকে সেলাম-ভজানো চিত্রনাট্যকার, পরিচালক সুরকার দেশের এতবড় একটা ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে বাঙালীকে সরিয়ে দিলে। কোনো গুণী, কোনো একটু রুচিবোধসম্পন্ন লোকের পক্ষে এ লাইনে ঢোকবার পথ প্রশস্ত নয়। এ লাইনে গল্প একটা কোনোরকমে চুরি করে, ধার করে কয়েক সপ্তাহ দেখাতে পারলেই পর পর সেই লোকের গল্পই চলবে। এ লাইনে আপনার লেখা চিত্রনাট্য যত খারাপ হতে থাকবে, ছবির পর ছবিতে তত মাইনে বাড়বে আপনার, ততবড় সাহেব আপনার ওপর খুশী হবে। আপনার হিরোইনকে নিয়ে রাস্তায়-ঘাটে, পার্কে যেখানে খুশী নোংরামি করে বেড়ান, লোকে বলবে,—ও ফিল্ম লাইনের লোক, ওর সবই সম্ভব।' আপনি অবিমিশ্র যে কোনো একস্ট্রাঅর্ডিনারী নিউ ফাইণ্ড নিয়ে মাতামাতি করুন, বলবার কেউ নেই। শুধু ফিল্মে কেন? রেডিওতে বড় কাজ করেন আপনি। যে কোনো মেয়েকে রিহার্সালে ডাকুন ; তারপর সেই মেয়ের পাড়ার লোকেদের কাছে মার না খাওয়া পর্যন্ত আপনি নিরস্ত হবার পাত্র নন। মার খেয়ে লোককে বলুন, বাস থেকে পড়ে গেছ্লেন। কর্তাকে কষে তেল দিন। Peak-এ উঠতে আপনার বাধা কোথায়? রেডিও কেন? সিনেমার কাগজ করেছেন? যে কোনো তরুণীকে ডাকুন, স্টুডিও মালিকের সঙ্গে interview করিয়ে দেবেন। তার feature ক্যামেরা উপযোগী কি না, দেখবার জন্যে ডেকে ছবি তুলুন। যে রকম ভাবে ইচ্ছে, যেরকম pose-এ যতক্ষণ খুশী। ভাবছেন এগুলো বানানো? না, কলকাতায় হচ্ছে এ সব। কোনো কোনো মাসিক, সাপ্তাহিক এ সব আলোচনা সুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। আমাদের হাতেও যে কিছু কিছু প্রমাণ আসছে না, তা নয়। তবে যারা করছে এ সব কাজ তারা এতই নগণ্য, এতই নোংরা জগতের লোক যে, নাম দিতে বাধছে আমাদের। তাই এখানেই থামলাম। কিন্তু যে কথার সূত্র ধরে বলছিলাম, এই যেখানকার অবস্থা সেখানে ভালো জিনিস আশা করতে পারেন কি করে? কবে এইসব অপদার্থরা এ লাইন থেকে বিদায় নেবে? কবে ফিল্মব্যবসায়ীরা বুঝবে যে এ লাইন অন্য আর পাঁচটা লাইনের মতই একটা কর্মক্ষেত্র। কাজেই এখানকার একমাত্র মন্ত্র হওয়া উচিত কাজ।

দী. কু. সা.

[২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৬]



* মৃন্ময়ী চাকলাদার (ভবানীপুর)
'আবোল তাবোল' কার বলুন তো?
* সেকালে সুকুমার রায়ের লেখা ; একালে communist-দের বকা।
ননীগোপাল (বাদুড়বাগান)
'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' জিনিসটা কি?

* আমাদের দেশে ওর মানে হল, এমন একটি পরিকল্পনা করা, যাতে চার বচ্ছর নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়, তারপর পঞ্চম বর্ষে সময় পর্যাপ্ত নয় বলে আবার একটি করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে আবার চার বচ্ছর....

শ্রীকৃষ্ণসখা মিত্র (আশুতোষ মুখার্জি রোড)
আপনি লিখেছেন, "পঙ্কজ মল্লিক সবচেয়ে সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত গান" অথচ আপনি পঙ্কজ বানানটাও ঠিকমত লিখতে পারেননি। একাধিকবার লিখেছেন 'পঞ্চজ বাবু'।

* আমাদের একজন স্যাকরা ছিল। গয়না গড়াতে সে ওস্তাদ। লোকে বলত সে অলঙ্কারের রাজা। এখন একদিন সেই প্রায় অজ স্যাকরাটি তার ছেলের বই উল্টোতে উল্টোতে দেখল লেখা রয়েছে, "কবি জয়দেব ছিলেন অলঙ্কারের রাজা"....ইত্যাদি। ব্যস, আর যায় কোথা। সেদিন থেকে সে নাওয়া, খাওয়া, সুদ, গয়না, বন্ধকী সব ভুলে কাব্যচর্চায় মন দিলে। ফলে পাড়ার লোকেরা কিছুদিনের মধ্যেই একটি ভালো স্যাকরার দোকান হারালে। তাই বলছিলুম, আপনার যা কাজ তাই করুন। কি লাভ এসব সাহিত্যপ্রসঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করে?

অসীম মুখোপাধ্যায় (ঢাকুরিয়া)
ব্যর্থ প্রেমিকের স্থান কোথায়?
* ফিল্ম কোম্পানীতে।
সন্দীপকুমার চক্রবর্তী (রিচি রোড)

আপনার সম্পাদিত "অচলপত্র" পড়ে সুখী হলাম, কিন্তু একজায়গায় একটা কথা লেখবার আছে। আপনারা লেখেন যে, বড়দের পড়ার এবং ছেলেদের দুধ গরম করববার একমাত্র সাপ্তাহিক। ইহার সহিত 'এবং সম্পাদক দীপ্তেন্দ্র সান্যালের বাঁদরামি করিবার' কথাটি যোগ করিলে ভাল হয় না কি?

* 'বাঁদরামি' কথাটা আমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আপনি নিন্দে করতে গিয়ে না জেনে আমার প্রশংসাই করেছেন। সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। দেখুন, মানুষের মুখের অন্ন গুদোমে রেখে, কালোবাজারী পয়সায় বড়লোকি করার নাম যেখানে ব্যবসা, ছাত্রদের সব

কাজের নিন্দায় পরাঙ্মুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের পুত্রকে নম্বর বাড়িয়ে তারকা পাওয়ানোর নাম যেখানে শিক্ষা, দেশের অগণিত নরনারী যখন জেলে বন্দী এবং রাস্তায় পুলিশের গুলিতে রক্তাক্ত তখন দেশের বাইরে গিয়ে গান্ধীজীর অহিংসা সম্বন্ধে লম্বাচওড়া করবার নাম যেখানে রাজনীতি—সেখানে সমগ্র বাংলাদেশের পক্ষে একটি সামান্য কাগজের এই বিদ্রোহ সরকার এবং অবাঙ্গালীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে—তার সম্পাদককে আপনি যে 'বাঁদরামি' আখ্যা দেবেন—এ আর এমন নতুন কথা কি? সাম্প্রতিক মনুষ্যত্বের চেয়ে আপনার দেওয়া 'বাঁদরামি' আখ্যাকে নিজের জন্যে আমি অনেক গৌরবের মনে করি!

বীরেশ্বর সান্যাল (ডি. গুপ্ত লেন, কলিকাতা—২)

....এখন এই দুরূহ কর্মসম্পাদন করিবার দুর্নিবার দুরাকাঙক্ষা দমন করিয়া দয়া করিয়া ঘোড়ার ঘাস কাটিবার ব্যবস্থা করুন।....

* কেন? আপনার জন্যে ঘাস কাটবার কেউ নেই?

আতিয়ার রহমান (রমনা—ঢাকা)

পাঞ্চ, নিউ ইয়র্কের সঙ্গে নিজেদের তুলনা না করে লিলিপুটের সঙ্গে করলেই ভালো করতেন।

* আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, পাঞ্চ বা নিউ ইয়র্কের সঙ্গে 'অচলপত্র'কে কোথাও তুলনা করিনি। 'অচলপত্র' আমি আমার একার প্রচেষ্টায় যেখান থেকে যেখানে এনেছি, পাঞ্চ এং নিউ ইয়র্কের কর্তৃপক্ষ তা স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নে মরে, বেঁচে, হেজে, পচে, মাথা খুঁড়ে কোনোদিন করতে পারবে না। ওদের দেশের মেটিরিয়াল—ছাপা, টাকা এবং পাঠক নিয়ে ওরা যে সব কাগজ বার করে তাতে ওদেরকে আমার বুদ্ধু বলেই সন্দেহ হয়। মুশকিল কি জানেন, আমরা নিজেদের লোককে চিনতে দেরী করি। Nobel prize পাওয়ার পর তবে রবীন্দ্রনাথ কবি হন আমাদের কাছে। আমি দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল—আমার কাগজ কখনো বিলিতি বা অ্যামেরিকান কাগজের মত হতে পারে? হ্যাঁ, কোনো হ্যারল্ড নিকলসন যদি কাগজ বার করত এবং 'প্যাটার' কি ঐ জাতীয় কিছু নাম দিত, ব্যাস—রমনার মাঠে চার পা আকাশের দিকে তুলে রহমান না Coachman কি যেন আপনার নাম বলেছিলেন না—একেবারে স্বর্গ হাতে পেতেন। পাঞ্চের পেছনে আছে একটা রাজনৈতিক দল যারা অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ; পেছনে অর্থ আছে অপরিমিত ; কার্টুনিস্টের শেষ নেই সে দেশে। যে একটা 'কলাম' লেখে তাকে আর কিছু করতে হয় না। সর্বোপরি বিজ্ঞাপনের রেট শুনলে আমাদের ঘি-তেল-সাবানের বিজ্ঞাপনদাতারা ভিরমি খাবে। আর আমাকে একা এর চৌষট্টি পাতা ভরাতে হয়, বিজ্ঞাপন জোগাড় থেকে টাকা আদায় এবং দেশসুদ্ধ লোককে বোঝাতে হয় যে, আমার মত প্রতিভাবান লোক এ দেশে আসেনি। আর কাগজে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কিম্বা প্রিমিয়ার অ্যাটলিকে 'শালা' ছাপলেও ওদের আইনের অবমাননা হয় না। আমাদের তো রাজনীতি না করতেই জমার টাকা বাজেয়াপ্ত। এ সব অসুবিধের দোহাই দিচ্ছি না, এই নিয়েও আপনি শুনলে অবাক হবেন 'অচলপত্রের' বর্তমান সার্কুলেশানের চেয়ে বেশী কলকাতার দুটি তিনটি দৈনিক পত্র ছাড়া আর কোনো কাগজের নেই। অনিয়মিত প্রকাশ, ছাপার ভুলে কণ্টকিত, নিউজপ্রিণ্টে মুদ্রিত 'অচলপত্র' না পেলে টেলিগ্রাম আসে তবুও! কি আশ্চর্য! মাসের কাগজ পড়া হয়ে গেলে তার পরের মাসের কাগজের জন্যে আমার পাঠক অপেক্ষা করে ঠিক তেমনি রুদ্ধশ্বাস হৃদয়ে, চাঁদ ওঠবার অপেক্ষায়, উপবাসী রোজা ভাঙবার অপেক্ষায় অস্থির মুসলমান যেমন অপেক্ষা করে। আমি যে টাকা নিয়ে 'অচলপত্র' আরম্ভ করেছি, যে ব্যবস্থা সম্বল করে এবং প্রবাসী-ভারতবর্ষ-বসুমতী পড়া যে পাঠক নিয়ে কারবার আমার পাঞ্চ-নিউ ইয়র্কের তা করতে হলে তারা

কাগজ আর বার করত না। তবে হ্যাঁ, লিলিপুটের সঙ্গে যে তুলনা করছেন, আমি তার অযোগ্য, সত্যিই অযোগ্য। পাঞ্চ-এর যা উদ্দেশ্য ছিল, সাফল্য সে তুলনায় সামান্যই হয়েছে। লিলিপুট তার সার্থকতাকেও ছাড়িয়ে আজ বহুদূর অগ্রগামী। 'অচলপত্র' তারই সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত কিন্তু সার্থকতায় নগণ্য অংশমাত্র অতিক্রম করেছে।

বাণী রায় (বালিগঞ্জ)

বাংলা সাহিত্য কতটা 'গণসাহিত্য'...

* সাহিত্য মাত্রই গণসাহিত্য—না হলে তা সাহিত্যই নয়। লেখা এবং সাহিত্য এক জিনিস নয় ; লেখক এবং সাহিত্যিকে অনেক তফাৎ। গণসাহিত্য মানে বস্তীর সাহিত্য নয়। গণসাহিত্য হল মানুষের গল্প যে মানুষ শুধু রাজপ্রাসাদে বাস করে না—বস্তিতেও থাকে। গণসাহিত্য হল জীবনের সাহিত্য, যে জীবন শুধু সতীর ঠাকুরঘরে নয়, বেশ্যার সুলভ শয্যাতেও সমান প্রবহমান ; গণসাহিত্য হল সেই সাহিত্য যা শুধু পাপকে ঘৃণা করতে এং পাপীকে ভালবাসতে শেখায় না, পাপ এবং পাপী দুজনেরই পারিপার্শ্বিককে ঘৃণা করতে শেখায়। পরামর্শ দেয়, আবহাওয়া বদলাও, সমাজব্যবস্থা বদলাও ; অর্থনৈতিক সাম্য আনো —পাপ এবং পাপী, গুণ এং গুণীতে রূপান্তরিত হবে। যে গভীর জীবনদর্শন না থাকলে লেখক সাহিত্যিক হয় না; বর্তমান বাঙালী লেখকদের মধ্যে কারুরই তা নেই। এঁরা কেউই সাহিত্যিক নন। নিজের পাব্লিশারের দোকান, পরিচিত গল্পলেখক এবং স্তাবকদের ছোট আকাশ উত্তীর্ণ হয়ে এরা যদি পৃথিবী ঘুরতে বেরোয়—জীবন এবং মানুষকে ভালবাসতে শেখে, তবে এরা নয়, এদের পরবর্তী কেউ কেউ দেখা দেবে এই দেশে যে বলবে ঃ মানুষের জীবন হতাশার বাণী নয়, মানুষের জীবন যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধীর হিরোওয়ারশিপ নয়, মানুষের জীবন নেপোলিয়ান, হিটলার, নাথুরাম গডসের হত্যাব্যাপার বর্ণনা নয়, মানুষের জীবন এক অন্তহীন অগ্রগতি। জীবন বার্নার্ড শ'-র বক্তৃতা নয়. এমনকি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দর্শনও নয়, জীবন হল গোর্কির গল্প। বাংলাসাহিত্যে সেই গল্প যদি কোনোদিন লেখা হয় তো রচয়িতাকে চিনতে দেরী হবে না, সে আসবে পতাকা উঁচিয়েই— যেমন, খুব ছোট হলেও এমনি পতাকা উঁচিয়েই এসেছিলেন এই দেশে শরৎচন্দ্র।

কল্পনা দে (চেতলা)

'অচলপত্র' আর আগের মত নেই।

* হ্যাঁ, অনেক ভালো হয়েছে।

হারাধন দত্ত (পটুয়াখালি)

কোন্ একটি জিনিসের প্রতি এ পৃথিবীতে আপনার মোহ বেশী?

* আয়না! আয়নার সামনে আমি যখনই দাঁড়াই তখনি আমার দেশের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার সঙ্গে আমার মোকালাৎ হয়।

বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোলক দত্ত লেন)

"অচলপত্রের" চলন তো বাজারে খুবই, কাটতিও কম যায় না (অবশ্য) উইয়ের কাটা বিযোগ দিয়েই)। তবুও এমন একটা সচলপত্রকে "অচলপত্র" নামে বিভূষিত করে কি লাভ বলুন তো?

* আমি জীবনে যত কাজ আজ পর্যন্ত করবার চেষ্টা করেছি, তার সবই লোকসান হবে জেনে করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভ হয়েছে। বিশ্বাস করুন, এই কাগজ যখন বার করি, তখন দুদিনেই উঠে যাবে জেনে, কোনো দায় নেই, কোনো ভয়ও নেই ভেবে হাসতে হাসতে একা চৌষট্টি পাতা খেলা খেলা করে ভরিয়েছিলাম। কে জানত সারা দেশের মনে তা তুফান তুলবে? একজামিনেশান দিয়ে এসে মনে হয়েছে, ফেল করব ; তারপর রেজাল্ট বেরোলে দেখি একেবারে চূড়োর ধার ঘেঁষে গেছি ; কি করে যে হয় কে জানে?

বিশ্বাস করুন—আমার সবটুকুই কপাল ; Talent আমার মধ্যে নেই! প্রতিভা তো দূরের কথা! আমার কাগজে যাঁরা লেখেন তাঁরা প্রায় সকলেই আমার চেয়ে অন্ততঃ দুশোগুণ শক্তিশালী। কিন্তু মজা দেখুন, এ যাবৎ কাল 'অচলপত্রে' একটা রচনাই সত্যিকারের বেরিয়েছে, সেটা হল, 'পূজাসংখ্যা নয়' ৫৬-র একদম শেষ পাতায় প্রকাশিত 'ময়ূর' কবিতাটি। কপাল এমন যে, সেটি শেষ পর্যন্ত আমার কলম দিয়েই বেরোল। এবং আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, চব্বিশ বছর বয়সে আজকে আমাকে নিয়ে এই পাতলা হৈ-হৈ একটা প্রকাণ্ড গোলমালে দাঁড়াবে এবং তার গণ্ডী কত বড় হবে বলা শক্ত। তবে আপনি বিক্রীর কথা যা লিখেছেন সেটা কিছুই নয়। পাঁচশো-হাজার কপি ছাপা কাগজের দেশে অচলপত্রের বিক্রী বিস্ময়। কিন্তু পৃথিবীর বাজারে তা কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়। এবং 'প্রতিযোগিতা' কথাটার মানে বাঁকুড়া কি বাগবাজারের নয়, দাঁড়াতে হলে পৃথিবীর প্রতিযোগিতাতেই দাঁড়াতে হবে।

তড়িৎ রায় (বিডন স্ট্রিট)

আমাদের নেতাদের কোনো গুরুমশায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলে হয় না? তাঁরা তো শুনেছি অনেক গাধা পিটে মানুষ করেছেন।

* আমাদের নেতারা গাধাদের চেয়ে অনেক গর্দভ।

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর)

কাজেই ছোটলোকের মত যা খুশী তাই আর লিখবেন না।

* ছোটলোকের মত যা খুশী তাই তো 'অচলপত্রে' কখনো কেউ লেখেনি। আপনার কোনো লেখা কি 'অচলপত্রে' কখনো বেরিয়েছে? তাহলেও না হয় সন্দেহ করবার একটা কারণ ছিল।

অ. কু. রা. ও ক. কু. গা. (কলকাতা—২৯)

সজনীকান্ত তো দেখলুম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতিদের গালাগাল দিয়ে কিছুটা বদ 'নাম' কিনলেন। আপনিও কি গালাগালি দিয়ে সেইরকম 'নাম' কিনবার তালে আছেন না কি?

* ধরেছেন ঠিক ; তবে ঠিক একই তালে নেই। এমন একটা কিছু করে যেতে চাই যাতে পরে কেউ আমাকে গালাগালি দিয়ে বদ 'নাম' কিনতে পারে।

সুধীর দাস (ঢাকুরিয়া)

আপনার আত্মম্ভরিতাটুকু বড্ড বেশী। আশা করি, এ বিষয়ে আপনি আমার সাথে একমত হবেন যে, "অহঙ্কারই পতনের মূল।"

* "অহঙ্কারই পতনের মূল" এ কথাটা আপনিই প্রথম কিছু বললেন না যে, আপনার সঙ্গে একমত হতে হবে ; একমত হতে হলে পৃথিবীর প্রাজ্ঞজনদের সঙ্গেই হব যাঁরা একথা আগেই বলে গেছেন। তার চেয়েও বড় কথা হল : 'পতন' বলতে আপনি কি বোঝেন? নেহরুর প্রিমিয়ার হওয়াটা আপনার কাছে 'উন্নতি', আমার কাছে 'পতন'। আর 'অহঙ্কার' জিনিসটাই একমাত্র বড় হবার প্রেরণা জোগায়। আমি যে কাজে হাত দিয়েছি সে কাজে আমার চেয়ে যোগ্যতর লোক আর নেই একথা না ভাবতে পারলে কাজে পূর্ণ সাফল্য আসে না। আর, তা আমার পক্ষে এমন একটা কিছু বেশী ভাবাও নয়।

নিত্যানন্দ সোম (জলপাইগুড়ি)

'গাড়োল' কথাটার অর্থ কি?

* হিন্দী ছবির দর্শক।

বসুধারা বসু মল্লিক (কালী ব্যানার্জী লেন, হাওড়া)

"যার কিছু বিশ্বাসযোগ্য নয়"—এমন জিনিসকে ইংরেজীতে কি বলে?

"Government Report"!

বরুণ ঘোষ (সিকদারবাগান স্ট্রীট)

কিছুদিন আগে অ্যামেরিকার "Look Magazine-এর কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর ২০ জন ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরু স্থান পেয়েছেন, কিন্তু ভারতের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাম তাতে নাই কেন?

* রবীন্দ্রনাথ এঁদের চেয়ে অনেক বড় বলে। তিনি কোনো শ্রেণীর মধ্যে পড়েন না। আজকের পৃথিবীতে বিশজন প্রথম শ্রেণীর লোক নেই। অ্যামেরিকার Look Magazine এমন কে বট যে সে কাকে প্রথম শ্রেণীর লোক মনে করল তা নিয়ে আমার আপনার মাথা ঘামাতে হবে। Overlook করুন না।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পরও ভারতের মধ্যে এত লোক অসন্তোষ প্রকাশ করছেন কেন? প্রতি প্রদেশে প্রদেশে এত দাঙ্গাহাঙ্গামা কেন?

* অঙ্ক দুরকমভাবে মেলানো যায় জানেন কি? যে অঙ্ক সত্যিই কষতে চায় সে প্রতিটি step ঠিকভাবে কষে গিয়ে তারপর নির্ভুল মেলায় ; আর যে ফাঁকি দিতে চায়, সে মাঝের stepগুলি বাদ দিয়ে কারোর খাতা দেখে শেষ উত্তরটি মিলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করে। এই শেষের প্রচেষ্টাটি হল, মিল নয়, গোঁজামিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কোথাও একটা গোঁজামিল আছেই। ভারতের নেতারা বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা-অর্জনের যে গৌরব করেন, আসলে তা মস্ত অগৌরবের। বিনা রক্তপাতে পরাধীন জাত স্বাধীন হয় না। রক্ত ছাড়া জিন্দগী অসম্ভব। তাঁরা যে গোঁজামিল দিয়ে জট পাকিয়ে গেলেন তা ছাড়াতে হবে তাঁদের নয়, আমাদের। আমাদের আশ্রয় আর প্রাণ বলি দিয়ে তাদের গৌরবের (?) দুর্বহভার বহন করতে হবে কতকাল তা কে জানে?

নীলমাধব হালদার (বাঁশবেড়ে)

'অচলপত্র'র দেখাদেখি কতগুলো নতুন কাগজ বাজারে বেরিয়েছে দেখছেন? একেবারে হুবহু নকল। এমনকি অনেক পুরাতন কাগজও ভোল পাল্টে 'অচলপত্রের' অনুকরণে সজ্জিত হবার প্রচেষ্টা করছে লক্ষ্য করেছেন? আপনার অন্ন এবার সত্যিই গেল।

* বিদেশী সেন্টের শিশিতে দেশী মাল ভরলে তা কি Evening in Paris হয় সত্যিই? শুধু আমার কাগজ কেন—আর কদিন টিকে থাকুন—দেখবেন আমি যে ভাবে কথা বলি, যেভাবে চলি, যে কোম্পানীর কলম ব্যবহার করি—সব অনুকরণ হবে। শুধু আসল জিনিসটা ছাড়া—আমার 'ক্ষমতা'।

শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায় (লিলুয়া)

....মনে রাখবেন বাজে ভাষায় খানিকটা কাদা ছিটিকে দিতে সবাই পারে....

* আপনি মেয়ে বলেই বোধ হয় এত বোকার মত কথা বলতে পারলেন। চেষ্টা করে দেখলে দেখবেন—কাদা ছিটকানো ফুল ফোটানোর চেয়েও শক্ত। কাদা ঠিকমত ছিটকে দিতে না পারলে জিনিসটা আবার কেমনভাবে নিজের গায়েই এসে পড়ে! ঠিক তলোয়ারেরই মত—খেলতে না জানলে নিজেরই মাথা কাটা যায় কখন! আর বাজে ভাষায় সমালোচনা করলে এতগুলো লোক কি উতলা হত? আপনি চিঠি লিখতেন পয়সা খরচ করে? 'নিন্দে' করতে এবং সে 'নিন্দে' পড়বার জন্যে পঞ্চাশ হাজার লোককে ব্যস্ত করে রাখতে কি পরিমাণ কলমের জোর লাগে সে আপনি জানেন না শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিলুয়াটাই পৃথিবী নয়।

প্রণবেশ মজুমদার (গৌহাটি)

শীতকালে Falls-এর চেহারা দেখেছেন? বর্ষাকালের সেই গর্জন আর রূপ কিছুই থাকে না। একটু জোরে বৃষ্টি পড়লে যেমন হয় সেরকম জোরও থাকে না তার। সেই সময়ে

Falls-কে কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে?

* False!

চারুবিকাশ সাহা (চন্দননগর)

বাঙালীদের বর্তমানে কোন্ "Ism" follow করা উচিত?

* বাঙালীদের 'ism' বলে কিছু থাকবার কথা নয়, কারণ 'is' মানে বর্তমান—বাঙালীর বর্তমানে কোনো বর্তমান নেই—তাই বাঙালীর যদি কিছু follow করতে হয় তা হ'ল was-m অর্থাৎ অতীত।

মনু বন্দ্যোপাধ্যায় (ওল্ড জি.টি. রোড, উত্তরপাড়া)

মন্তর-পড়া বউয়ের যথার্থ উপমা কি বলতে পারেন?

* মন্তর-পড়া বউ হল ট্রাম কোম্পানীর মাস্থলি টিকিটের মত—not transferable।

বিমলেন্দু দত্ত (বরানগর)

যাহার দুই হাত সমানে চলে তাহাকে বলে সব্যসাচী। বলতে পারেন, যার দুই পা সমানে চলে তাকে কি বলে?

* ফুটবল প্লেয়ার!

আজকের পৃথিবীতে অনেস্ট লোক কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়?

* যায় ; পাগলা গারদে। তারা পাগলামিতে অন্ততঃ নির্ভেজাল। কিম্বা ঘুরিয়ে বলতে পারেন, আজকের পৃথিবীতে যারা honest তাদের স্থান সংসারে নেই, আছে শুধু পাগলাগারদেই।

শ্রীমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় (রহড়া)

নিউজিল্যাণ্ডের যে সব পুরুষদের শরীরে 'লোম" থাকে তাদের নাকি কোনো মেয়েই বিয়ে করতে চায় না। পৃথিবীর মধ্যে এই সব পুরুষরাই বোধ হয় সবচেয়ে হতভাগ্য—নয় কি?

* শুধু "লোম" থাকলে নিউজিল্যাণ্ড কেন, ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড কোথাওকার মেয়েই আপনাকে বিয়ে করবে না—কিন্তু "লোমের" সঙ্গে যদি যথেষ্ট টাকা থাকে—তখন? তখন সব মেয়েই আপনাকে কম্বল মনে করে গড়াগড়ি দেবে। কম্বলের লোম বাছবার চেষ্টা করবে—স্ত্রীলোক হলেও মেয়েরা এত বোকা নয়। আর "হতভাগ্য" বলছেন কেন? আমার তো ভগবানকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে : কুকুরকে যেমন লোম দিয়েছ বিশুদ্ধ-ঘি না খাবার জন্যে,—ঘোড়ার যেমন পা মোড়বার ক্ষমতা দাওনি, দাঁড়িয়ে ঘুমোবার জন্যে, ভাওয়ালের মেজকুমারকে যেমন বনে পাঠিয়েছিলে রামের মত রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্যে,—তেমনি আমাদের গা ভরে লোম দাও স্ত্রীলোকের হাত থেকে বাঁচবার একান্ত প্রয়োজনে।

সমরেশকুমার মাইতি (বলরাম বসু ঘাট রোড)

মেয়েরা রাস্তায় বেরোলেই ভ্যানিটি ব্যাগ লইবে (তার মধ্যে কিছু থাকুক বা নাই থাকুক)। আর, পুরুষরা রাস্তায় বেরোলে কি নিয়ে বেরোয় বলতে পারেন?

* মেয়েদের Vanity-র মূল্য Money-bag-এর মধ্যে নিয়ে!

অপরূপ দত্ত (ওয়েলিংটন)

ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা না উর্দু—কোনটার ওপর জোর দেব বলুন তো? আপনি জানেন, আশা করি, মহামান্য রাশিয়া "রেড চায় না" দখল করে এগিয়ে আসছে। এই নতুন ভাষাটি শেখা না শেখা নির্ভর করছে আপনার জবাবের ওপর।

* তার চেয়ে যে কোনো একটি জানোয়ারের ভাষা শিখে নিন। সমস্ত পৃথিবীর মানুষই জানোয়ার হয়ে যাচ্ছে। আপনি তাদের থেকেও এগিয়ে থাকতে পারবেন।

শৈব্যা চৌধুরী (রোল্যাণ্ড রোড)
আপনি প্রতিভাবান কিন্তু অসম্ভব দাম্ভিক ; সেই সঙ্গে পরছিদ্রান্বেষী এবং স্বার্থপর!—
* যথার্থ ! (প্রথম বিশেষণটি সম্বন্ধেই আমার এই উক্তি)
সুকুমার দাস (সিমলা স্ট্রীট)
দাড়িগত হিসেবে কে শ্রেষ্ঠ? (ক) কার্ল মার্ক্‌স্‌ (খ) রবিঠাকুর (গ) বার্নার্ড শ।
* ওঁদের মধ্যে কেউ নয়—সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন জিলেট ব্লেডের আবিষ্কর্তা মিঃ জিলেট।
কমলকুমার মুখোপাধ্যায় (ব্যারাকপুর)
যে পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ ছাড়া থাকিতে পারে না, তাহাকে বলা হয় স্ত্রৈণ। আচ্ছা বলবেন, যে স্ত্রীলোক স্বামীসঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে না—তাহাকে কি বলা হইবে?
* পরস্ত্রী!
শ্যামাপদ উকিল (রসা রোড)
আপনার লিখিত...
* উকিলের চিঠি আমরা accept করি না।
এ হালিম (ফজলুল হক হল, ঢাকা)
আচ্ছা "Society Girl" বলতে আপনি কি বোঝেন?
* "Society Girl" হল সেই সব মেয়েরা যারা Society-র সবটুকু সুবিধা আদার করে, কিন্তু Society-র সাধারণ আইন-কানুন মানতে গররাজি।
ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় (মানভূম)
যে সর্বস্ব হারিয়েছে সে তো হল সর্বহারা, কিন্তু যার কোনো কিছুই হারায় নি তাকে আপনি কি বলেন?
* রিফিউজি এবং রিহ্যাবিলিটেশান মিনিস্টার।
বারীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঁকুড়া)
বিবেকানন্দকে বলি স্বামীজী, গান্ধীজীকে বাপুজী, সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী , প্যাটেলকে সর্দারজী, নেহরুকে পণ্ডিতজী, রাজাগোপালাচারীকে রাজাজী, কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ? তিনি কি 'জি'?
* 'জি' কথাটার আগে 'পা' বসান, পেয়ে যাবেন।
সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত (আসাম) আপনি কখন রাগেন?
* যখন প্রতি সংখ্যায় "৫ টাকা পাঠালেই 'অচলপত্রের' গ্রাহক করে নেওয়া হয়" লেখা সত্ত্বেও চিঠি আসে,—'আপনার পত্রিকার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি—নিয়ম-কানুন দয়া করিয়া জানাইবেন।"—তখন রাগ হয়—ভীষণ রাগ হয় আমাব।
প্রদীপকুমার অধিকারী (বেলুড়)
শকুনি দেখেছেন কি?
* না, চাক্ষুষ দেখিনি। যদি সিনেমায় দেখেছি কি না প্রশ্ন করেন তো বলব, "হ্যাঁ, রাজাগোপালাচারীকে বার কয়েক সিনেমায় দেখেছি বই কি।
দিলীপকুমার মিত্র (গিরীশ ব্যানার্জী লেন)
আপনার 'অচলপত্রের' উদ্দেশ্য কি?
* নুনের ছিটে দেওয়া। যার সর্বাঙ্গে শুধু কাটা ঘা, সেই 'আধুনিক সমাজ'-ই একমাত্র 'অচলপত্রের' উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সম্পূর্ণভাবে।
মেঘলা ব্যানার্জী (হ্যারিসন রোড)
"আজীবন গ্রাহক হবার জন্যে আবেদন করুন"—এ সংখ্যার 'অচলপত্রের' শেষ পাতা। ভুলটা কম্পোজিটারের—না? (নিশ্চয়ই 'করছি' হবে, আবেদনটা সম্পাদকের কি না!)

* ধ্যাধ্‌ধেড়ে গোবিন্দপুর ক্লাবের সেক্রেটারী মেম্বার হবার জন্যে আবেদন করে। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাবের মেম্বার হতে হলে apply করতে হয়! পাত্রবিশেষে 'আবেদন' আলাদা হয় কি না!

অলোকমোহন রায় (ইডেন হিন্দু হোস্টেল)

'দৃষ্টিপাতে' যাযাবর লিখেছেন, প্রেমে পড়লে পুরুষদের বোকা বোকা দেখায়। আচ্ছা, প্রেমে পড়লে মেয়েদের অবস্থাও কি ঠিক এমনি হয়?

* আপনার প্রশ্নের উত্তর, আমার একটি ইংরিজি বই বেরোচ্ছ, তাতে পাবেন। বইটির নাম হল, "I don't answer silly questions."

বিমল দে (তিনসুকিয়া)

যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশে থাকে তাহাকে বলা হয় প্রোষিতভর্তৃকা। আচ্ছা বলতে পারেন, যে স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে, তাহাকে কি বলা হয়?

* ডেলি প্যাসেঞ্জার!

শঙ্কর রুদ্র (বিডন স্কোয়ার)

রাজনীতির স্রষ্টা কে?

* Arm-chair!

সুধীর চক্রবর্তী ভৌমিক (চিত্তরঞ্জন)

বলতে পারেন "যে জানতে চায়" তার একটি appropriate নাম?

* Income-tax inspector বোধ হয়।

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস (মেছুয়াবাজার স্ট্রিট)

যে প্রেমিকা উদাসীন তাকে কি বলে?

* গৃহিণী!

শ্রীমান দাশরথি (ডবলিউ. সি, ব্যানার্জী স্ট্রীট)

মানুষ বড় হয় কিসে—ধনে, মানে না ঐশ্বর্যে?

* লম্বায়!

অমূল্যভূষণ পাল

যে পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত তাহাকে স্ত্রৈণ বলে।

যে স্ত্রী পুরুষের বশবর্তিনী তাহাকে কি বলিবেন?

* ধোপানী ! পৃথিবীর সর্বত্র স্ত্রীই পুরুষকে চালায় ; একমাত্র ধোপারা ইচ্ছেমত তাদের 'ইস্তিরি'কে চালাতে জানে।

মোহিত ভট্টাচার্য (গার্ডেনরীচ)

"Two-faced Man" কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ কি?

* কেরানী। অফিসের বড়বাবুর সামনে এক face, বাড়িতে গৃহিণীর কাছে সম্পূর্ণ আরেক face!

প্রত্যুষ চৌধুরী (হাজরা রোড)

দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে যারা তাদের চেনেন?

* বাংলা সিনেমার ক্যামেরাম্যানদের কথা বলছেন?

বিমল রায় (এন. টি.)-এর চিত্রনাট্য ও উপদেশ

সত্ত্বেও ছবি ও বাণী লিমিটেডের
'তথাপি' অচল! কয়েক বছরের মধ্যে এত খারাপ চিত্রনাট্য
'বিষ্ণুপ্রিয়া' ছাড়া আর দেখা যায়নি।
বোবা নায়িকার ভূমিকা প্রণতি ঘোষের অতিসাধারণ
অভিব্যক্তিহীন অভিনয়।

'মল' কথাটি বাংলাভাষায় অতি জঘন্য একটি জিনিস বোঝায়, কিন্তু 'মল'-এর চেয়েও 'বিমল' যে কত জঘন্য হতে পারে—শুধু মাত্র 'রায়' এই উপাধি সংযুক্ত হয়ে এবং বিশেষ করে চিত্রনাট্যকার হিসেবে, ছবি ও বাণী লিমিটেডের প্রথম ছবি 'তথাপি' না দেখলে তা বোঝা অসম্ভব। এই ছবির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, মূক-বধির চরিত্র নিয়ে ভারতে 'তথাপি'ই নাকি প্রথম বাণীচিত্র। এই চিত্রের চিত্রনাট্যকার মূক কি না আমি জানি না, কিন্তু 'উদয়ের পথে'র পরিচালক যে সর্বপ্রকার সদুপদেশেই আশ্চর্যরকম বধির, 'অঞ্জনগড়', 'মন্ত্রমুগ্ধ' এবং 'তথাপি'র চিত্রনাট্যরচনা দেখলেই তা বোঝা যায়। নাট্যবোধে যে বঞ্চিত, শুধুমাত্র 'চিত্রবোধ' নিয়ে ছবির সিনারিও লিখতে যাওয়া তার বাতুলতামাত্র।

'তথাপি'-র কাহিনী

অতি সাধারণ কাহিনী, তার কারণ কাহিনীকার অত্যন্ত মিডিওকার মেরিটের। কোনো কোনো কাগজে লেখা হয়েছে, 'তথাপি' নাকি কিছুকাল আগে কলকাতায় প্রদর্শিত 'জনি বেলিণ্ডা' ছায়া চিত্র কাহিনীর অনুকরণে রচিত। কিন্তু 'তথাপি' এবং 'জনি বেলিণ্ডা'র মধ্যে একমাত্র দুইয়েরই নায়িকা বোবা এবং দুইয়েরই গল্প অত্যন্ত সাধারণ—এ ছাড়া আর কোনো মিল আমি খুঁজে পাইনি। 'জনি বেলিণ্ডা'র কাহিনীতে নাটকীয়তা ছিল বেশী, 'তথাপি'তে নাটক অনুপস্থিত—একমাত্র ছবির আরম্ভে ছাড়া—যেখানে সারপ্রাইজ রয়েছে যে, একটি মেয়েকে বিয়ে করবার পর নায়ক জানল যে, তার স্ত্রী বোবা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই—তারপর সারা ছবির কাহিনীতে আর কোথাও কোনো ঘটনা নেই। সকলে মিলে 'আহাহা' করলে বোবা স্ত্রীকে এবং কাহিনীর শেষেও কোনো ক্লাইম্যাক্স নেই। অন্যপক্ষে 'জনি বেলিণ্ডা'র কাহিনীতে নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে বোবা নায়িকাকে ধর্ষণ করিয়ে নির্দোষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে সেই নায়িকাকে জেরা করিয়ে রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। ফলে, কাহিনীর শেষ দৃশ্য পর্যন্ত সারপ্রাইজ একটা বজায় ছিল। এই সারপ্রাইজই ছবির কাহিনীর প্রাণ।

কাহিনীর নায়িকা বোবা হলে তা অভিনব হয় নিশ্চয়ই—কিন্তু সেই সঙ্গে কাহিনীকারও যদি বোবা হন, যদি কোনো বক্তব্য না থাকে তাঁর, তাহলে দর্শকের পক্ষে তা দর্শনীয় হয় কি?

চিত্রনাট্যের ত্রুটি

ছবির আরম্ভে কাহিনীর যে সারপ্রাইজ ছিল চিত্রনাট্যকার বিমল রায়ের উপদেশে তাও নির্মূলপ্রায়। নায়িকার আত্মীয়দের সাজেশানে দর্শকরা আরম্ভেই জানতে পারল যে, নায়ক যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার দৈহিক কোনো ত্রুটি আছে। এটার কি প্রয়োজন ছিল? কে বললে প্রয়োজন ছিল না? প্রয়োজন একটা ছিল বৈকি! ছবির কাহিনীকারকে মারার প্রয়োজন ছিল। যদি 'উদয়ের পথে'র মত লোকে বলে বসে যে যা কিছু প্রকৃত কৃতিত্ব তা কাহিনীকারেরই প্রাপ্য--তখন? তখন বিমল রায়ের বাহাদুরি কোথায় যাবে? কিন্তু বাহাদুরি বিমল রায়ের আছে--রায়বাহাদুরিও বলতে পারেন তাকে! বিয়ে হয়ে এসে বোবা নায়িকা সকলেরই সহানুভূতি পেল এক দর্শকের ছাড়া! নাটক কি করে জমাতে হয় 'মন্ত্রমুগ্ধ' পরিচালককে কে তা বোঝাবে?

নাটক হয় কনট্রাস্টে! একজন চেষ্টা করবে বোবাকে কথা বলাবার জন্যে--আর সবাই তাকে বাধা দেবে--উপহাস করবে--সেইখানেই জীবনেও সত্যিকারের নাটক--কাহিনীতেও তাই। দুঘণ্টা ধরে এঘর থেকে ওঘর, বাড়ির বাইরে, বাড়ির ভেতরে, গাড়িতে উঠতে গিয়ে, গাড়ি থেকে নেমে--কাহিনীর নায়ক এবং নায়িকার মধ্যে একজনের অনর্গল বকা আর আরেকজনের অকারণ বোকার মত চেয়ে থাকা--এর মধ্যে আর যাই থাক গল্প নেই। 'তথাপি'র কাহিনীকারের আরেকখানি বই আছে যার নাম 'অন্ত্যেষ্টি'। কিন্তু তার আসল 'অন্ত্যেষ্টি' সম্পন্ন করেছেন শ্রীযুক্ত বিমল রায়।

অভিনয়

সাধারণতঃ দেখা যায় কোনো দুরূহ ভূমিকা যখন কোনো নতুন অভিনেত্রীকে দিয়ে করানো হয় তখন তার মধ্যে অনন্যসাধারণ কোনো গুণ আবিষ্কার করেই তা করা হয়। এবং পরিচালকের শিক্ষায়, চরিত্রের অভিনবত্বে নবীনা অভিনেত্রী ভালোই করেন--অনেক সময় অসাধারণ কিছুই করেন। কিন্তু এ অসাধারণত্ব প্রণতি ঘোষের মধ্যে কোথায়? একমাত্র ভুল করে তিনি একবারো কথা বলে ফেলেননি--এই যা! (আপনারা ভাবছেন, সিনেমায় সে ভুল তো আর সম্ভব নয়, কারণ সংশোধনের পথ আছে দেখাবার আগে ; না, এমন পরিচালক-চিত্রনাট্যকারের অভাব নেই এ দেশে, যার মাথায় এটাও ঢোকে না, দেখিয়ে দেবার আগে)। বিজ্ঞাপনে যখন লেখা হয়েছে 'মূকবধির চিত্র' তখন আর ছবিতে তা দেখাবার দরকার কি-- এ ধারণাও থাকতে পারে এঁদের। না হলে ছবির আরম্ভে গাছ থেকে নায়িকার খিলখিল করে হেসে ওঠার কারণ কি? বোবারা ঐরকম করে হাসে না কি? ওরকম হাসি তো শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার পাবার পর বিমল রায়ও হাসতে পারবেন না! অন্যপক্ষে 'জনি বেলিণ্ডা'র ভূমিকাভিনেত্রী স্মরণযোগ্য অভিনয় করেছিলেন--তাঁর ঐ নামের ভূমিকায়। এ কথার আমার কাছে অন্ততঃ কোনো অর্থ নেই যে, ওদের দেশে যা সম্ভব, আমাদের দেশে তা অসম্ভব।

ছবির নায়ক যিনি, তাঁর সম্বন্ধে যে কোনো মন্তব্যই মানহানিকর হবে। মানহানিকর বলছি, অভিনেতার পক্ষে নয় ; যিনি করেন তাঁর পক্ষেই। কাজে কাজেই এ বিষয়ে নীরব রইলাম। সমস্ত ছবিতে নিপুণ অভিনয় করে গেছেন প্রথম দিকের সেই পাঁঠা আর ছবির চিত্রনাট্যকার। এ ছবির পাঁঠাটিকে আমি চিরকাল মনে রাখব।

পরিচালনার ত্রুটি

১০০০০০০০০০০০০০০ একটি ত্রুটিজড়িত 'তথাপি' কার উপদেশে তোলা, ছবির টাইটেলে তা সবিস্তারে বর্ণিত। এ একমাত্র তাঁর উপদেশেই সম্ভব। আমাদের ছবিতে সকাল-

সন্ধ্যে-রাত সব সময়েরই আলো একরকম। এ ছবির উপদেষ্টা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রকর হবেও বা। আগে উল্লিখিত বোবা মেয়েকে দিয়ে খিলখিল করে হাসানো কি কান্নার backgroundকে জীবন্ত করবার জন্যে? এই জ্ঞানটুকুও সম্বল না করে ভারতের সর্বপ্রথম মূক-বধির চিত্র তোলা আমাদের দেশেই সম্ভব বটে। গাঁয়ের মেয়ে কেমন হয়, শহরের মেয়ের সঙ্গে তার কোথায় তফাৎ, হাব-ভাব-ভঙ্গী, পোশাক-পরিচ্ছদ-চলা-হাঁটা—এগুলো যে তৈরী হয় বিশেষ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে—এটুকু জানতে পরিচালক এবং তাঁর উপদেষ্টার দোষ কি ছিল? পরিচালকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল সতর্ক নজর রাখা যাতে একটিও অপ্রয়োজনীয় শট না নেওয়া হয়, ছবির স্পিড যাতে ঝুলে না যায় এবং একটা ক্লাইম্যাক্সে ছবি যাতে পৌঁছয়। এই ত্রিবিধ কর্তব্যের কোন্‌টি তিনি পালন করেছেন এবং কোন্‌টি পালন করেননি তথাপি ছবি দেখলে তার রহস্য সহজেই উদঘাটিত হবে।

পরিশেষের নিবেদন

ছবির পরিচয়পত্রের সবশেষে আসে পরিচালকের নাম। কারণ, চিত্রকার্যে তাঁরই পরিচয় শেষ পর্যন্ত মনে রাখবার। 'তথাপি'র টাইটেলে শেষেরও পরে আছে। সে হল চিত্রনাট্যকার ও উপদেষ্টা বিমল রায়ের নাম। তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক; তাঁর নিজের সহকারীর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে এইটুকু কেড়ে নেবার লোভ তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না? আর, বিমল রায়ের পাশে ব্র্যাকেটে 'এন্. টি.' কেন—ওটা তো N. G. হবে—অর্থাৎ Not good।

দী. কু. সা.

[২য় বর্ষ, ১২শ ও ১৩শ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৫৬]



—এ্যাঁ! খালি অপমান করেছে! আমি কিন্তু মশাই এই বিশ বছর এ লাইনে আছি—গালাগালি দিয়ে, কান ধরে, গলাধাক্কা দিয়ে লাথি মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু ঐ 'অপমান'টা করতে পারেনি...

সুসমাচার

শ্রীমধুসূদন

বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে হাল্কা করে সবচেয়ে আগে বিস্মৃত হয়েছেন শ্রীমধুসূদন। আজকের দিনেও বঙ্কিম নাড়াচাড়া করে এমন লোক বিরল নয়। কিন্তু পাঠ্যকেতাবের বাইরে 'মেঘনাদবধ' রচয়িতার পদধ্বনি প্রায় অশ্রুত হয়ে এল। কিন্তু কেন? কারণ, মাইকেল তাঁর জীবনকে কাব্য করেছিলেন, কাব্যকে জীবন্ত করতে পারেননি। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে যে বাহুল্য দোষ, সংস্কৃত কাব্যে বর্ণনায় যে আতিশয্যদোষ ; মাইকেলের কাব্যে প্রেরণার মূলধন হল তাই। গভীরতত্ত্ববর্জিত কাব্য ধোপে টেঁকে না--মাইকেলও তাই টেঁকেন নি। অথচ তাঁর মধ্যে যথেষ্ট উন্মাদনার অভাব ছিল না। উন্মাদনাকে যিনি রসে পরিণত করতে পারেন, তিনিই কবি। সেই পরিণতিহীন হীন কবিত্বেই মাইকেলের শেষ।

কাব্য চিরযৌবনা নয়। সাহিত্যই তা নয়। গদ্য তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথই যখন আর কয়েক বছর বাদে সে রস পরিবেশনে অক্ষম হবেন, যে রসে আমরাও লালিতপালিত হয়েছি, তখন মাইকেল ধোপে না টিকলে দুঃখ করবার কিছুই নেই। কতকগুলো ইমোশনের মোহে পড়েই আমরা বলি যে, কাব্যের যৌবন উর্বশীর যৌবন। তা যদি সত্যিই হয়, তাহলে বলতে হবে, উর্বশীর যৌবন।--মিথ্যা অপবাদ। কোনো জিনিসই পৃথিবীতে চিরকাল টেকে না। কোনো বিশেষ কালের কোনো বিশেষ কবির কোনো বিশেষ কবিতাও নয়। লক্ষ্য করলে দেখবেন, Shakespeare বলতে যে দশজন রসিক মূর্ছা যায়, তার মধ্যে নজন কবির সেই চাষারও জানা লাইন কটি ঃ Tomorrow and tomorrow কিম্বা To be or not to be, that is the question- এর বাইরে লাইন মুখস্থ করে কিছুই বলতে পারবে না। তার কারণ, ক্ল্যাসিকাল লেখা পড়তে যে ভাল লাগে না, এ কথা আমরা স্বীকার করতে ভয় পাই। যে বৃত্তি রস উপভোগ করে, তার কাছে চিরকালের চিত্তহারী বলে কিছুই নেই। থাকলেও, রস পরিবেশনের ধারা যদি না বদলায় তাহলে তা গ্রহণ করতে অবশ্যই বাধা ঠেকে। "চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি"--কিম্বা "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" --এ কবিতাও চিরকালের কবিতা নয়।

আর তাছাড়াও, কাব্য কেন চিরযৌবনা হবে? যৌবন ক্ষণকালের বলেই তো তার এত দাম। যে চিরকাল এক বয়সে দাঁড়িয়ে থাকে, সে জিনিস আর যাই হোক 'যৌবন' নয় নিশ্চয়ই! চিরকালের কথাই ক্ষণকালের কাব্যে ধ্বনিত। ক্ষণকালের কবিই চিরকালের কথা বলেন।

'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'--এ কথা কি রবীন্দ্রনাথেরই প্রথম? না কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শেষ? এ কবিতা আমাদের যেমনভাবে কাঁদিয়েছে অনুরূপভাবেই তো চোদ্দোশো সালে আরেক কবি আমাদের উত্তরাধিকারীদের অন্য ভাষায় কাঁদাবে! কাব্য কি মহাকবি কালিদাসের, কি Shakespeare-এর কি রবীন্দ্রনাথের মৌরসী পাট্টা যে তাঁরা যে গান গেয়েছেন সে গানে ছাড়া প্রাণের কান্নাকে কেউ রূপ দিতে পারবে না!

'মৃত্যু' জিনিসটা খুব খারাপ, কিন্তু 'অমরত্বের' মত অত খারাপ নয়। অমরত্ব মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু মাত্র। 'মৃত্যুর' মধ্যে যে মহিমা দেখতে পায় না, সে হয় স্ত্রীলোক নয় শিশু! সে কবি নয়।

"ভাষাতেই ভাসিয়ে দিয়েছি"--এ কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই ভাষাই বদলায় যুগে যুগে,

কালে কালে। এক কবির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আরেক কবি গান গেয়ে ওঠেন আরেক কালে, আরেক ছন্দে, আরেক তালে। কোকিল এবং কোকিলের গেয়ে ওঠার মধ্যে তফাৎ নেই। তাই কবির প্রয়োজন হয় সেই সুরকেই ভাষার পোশাক পরিয়ে রসিকদের দরবারে হাজির করাবার জন্যেই। কোকিলের তানে মধুরতা আছে কিন্তু প্রথমবার শোনবার পর আর বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু সাহিত্যের কোকিল সেই চিরকালের কোকিল নয়। সে যা বলতে চায় তা হয়ত এক, কিন্তু যেভাবে বলতে চায়, পঞ্চাশ বছর আগে আর পঞ্চাশ বছর বাদে তা কখনোই এক নয়।

কাব্যের মৌল প্রশ্নের পটভূমিকায় মধুসূদনের কাব্যের ক্ষণস্থায়িত্বের কারণ আলোচনা করার সুবিধের জন্যেই ওপরের ভূমিকাকে বিস্তৃত করা গেল। মধুসূদনের কাব্য কিন্তু স্বল্পজীবীও নয়। কেন? হাউইও যেটুকু কাল আকাশে থাকে এতবড় বিদ্রোহী কবির কবিতা সেটুকুও রইল না। তার কারণ আর কিছুই নয় ; মধুসূদন যত বড় বিদ্রোহী ছিলেন, তত বড় কবি তিনি ছিলেন না। বিহারীলালের মত অতি সাধারণ কবিও কবিগুরুকে কিছুটা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন, কিন্তু 'মেঘনাদ বধ'-এর কবি হেমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। বাংলা সাহিত্যে যাঁরা স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে যাঁর পায়ের দাগ সবচেয়ে আগে নিশ্চিহ্ন হল, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কিন্তু আজো আমাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের ডিসিপ্লিন্‌ড্‌ ব্যক্তিগত জীবন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে কম, যা চোখে ধরে তা হচ্ছে মধুসূদন কি বায়রণ, কিম্বা কবি নজরুলের ব্যক্তিগত চমকপ্রদ কাহিনী।

সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নয়।' মাইকেলের প্রতিভা ধনী নয়, গৃহিণীও নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ লোকে যে কথা বলে যে, অনুকূল ধনী পরিবেশ পেয়ে তিনি অত বড় হয়েছেন, মাইকেলের বেলাতেও দেখা যায়, তাঁর পরিবেশ অন্ততঃ অর্থের দিক দিয়ে কিছু কম ছিল না। তবুও মাইকেল মহৎ কবি হতে পারলেন না, কারণ, সত্যিকারের প্রতিভা 'পরিবেশের' অপেক্ষা রাখে না। কাব্যে মিল ছিল না মাইকেলের, কিন্তু তাঁর জীবনের গরমিল নিয়ে হৈ-চৈ হল বেশী। কবিতায় অমিত্র নয় শুধু, জীবনেও তিনি প্রায় অমিত্র হয়ে উঠেছিলেন। একটার হৈ চৈ আরেকটার হৈ চৈ কে ডুবিয়ে দিলে।

যে ভাষার নৈপুণ্যে কবিরা কিছুকাল বাঁচে, মধুসূদনের ভাষায় সেই জোর ছিল, কিন্তু যাদু ছিল না। বড় বেশী আওয়াজ বড় বেশী আস্ফালন সারা 'মেঘনাদ বধ'কে শেষ পর্যন্ত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই হতে দেয়নি। মাইকেলের বাংলা অত্যন্ত কৃত্রিম বাংলা! যদিও আজ যে আমরা 'জুতাইল' বলতে পারছি, শব্দের পা থেকে সেই শৃঙ্খল মুক্তির কৃতিত্ব কিন্তু মাইকেলের। অবশ্য এর জন্যে 'টেবিলিল' ইত্যাদি ঠাট্টা সে যুগে তাঁকে করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! কবিরা যে একটি কথার পর আরেকটি কথা জোড়েন এমন কায়দায় যাতে একটিও বদলানো না যায়, একটিও তুলে না নেওযা যায়, মাইকেলের রচনায় তা কোথায়? আগাগোড়া অপ্রয়োজনীয় বিশেষণের বাহুল্যে ভারাক্রান্ত, অতি মন্থর গতি। শ্রীমধুসূদন বাংলাভাষাকে শেষ পর্যন্ত আয়ত্তই করতে পারেননি।

আরেকবার ফিরে যেতে হবে প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলুম যে বক্তব্য পেশ করে সেই বক্তব্যে। চিরকালের কাব্য বলে কিছু নেই ; রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সম্বন্ধে চিরকালত্বের দাবী আমাদের সবচেয়ে বেশী, তিনি নিজেই বলছেন, "সাহিত্য বড় ক্ষণস্থায়ী।...ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় গীতিকাব্যগুলি। কেননা, ওর ভিতরে সাবস্ট্যান্স নেই কিছু। সাহিত্য বেশীর ভাগ হচ্ছে unsubstantial, তাই ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রস মরে যায়।...তাই এক এক সময়ে ভাবি এত কেন লিখছি জীবনে। দু-চার কথা লিখে গেলেই তো হত।" আরও..."কিন্তু রসের সৃষ্টি যেখানে, তার স্থায়িত্ব এককালের। কবিতার বিশেষ রস ভাষার বিশেষত্বের ওপর নির্ভর করে। ভাষার ব্যঞ্জনায় তার রস। তাই তা ভাষাবদলের সঙ্গেই ম্লান

হয়ে যায়। এ কালের স্বাদ অন্যকালে অগ্রহণীয়।...কালের সঙ্গে ভাষা বদলাবে। ভাষার সঙ্গে রস পরিবর্তিত হবে। এ না মেনে উপায় নেই।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন ঃ "তবে সাহিত্যে একটা জিনিস স্থায়ী হতে পারে। সেটা হচ্ছে, যখন ভাষার ভেতর দিয়ে একটা চরিত্রকে ফোটানো যায়, ভাষা বদলালেও সেই চরিত্র বদলাবে না কোনোদিন।"

এই 'চরিত্র' মাইকেল সৃষ্টি করতে পারেননি বলেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' শেষ করবার পর মনে কিছু দাগ কাটে না। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণ অথবা মেঘনাদের মত দুর্বল চরিত্র আসল রামায়ণে একটিও নেই। চলতি মনের বিরুদ্ধে unconventional রচনা লিখতে গেলে মনের মধ্যে যে বিদ্রোহকে পরিষ্কার ভাবে আগে দেখে নিতে হয়, মাইকেল সেই clear vision কোথাও পাননি। তার কারণ, আগাগোড়া শুধু রামের বিরুদ্ধে চীৎকার ছাড়া আর কিছুই করেননি। অথচ রামচন্দ্র সমগ্র রামায়ণে 'রাবণ' নিয়ে হল্লা করেছেন কবার? এ যেন, আজকের স্ট্যালিনকে নিয়ে ট্রুম্যান, এ্যাটলি প্রভৃতিদের বিষোদ্গারের মত। 'নিয়তি'ই কি এই tragedy? মোটেই নয়। মাইকেল দেখাতে চেয়েছেন, রাবণের বা মেঘনাদের মত বীর শুধু নিয়তির নির্দেশেই যুদ্ধে হেরে গেলেন। তার মানে আদি কবির রামায়ণের যা আসল রস তা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

রাবণের tragedy সম্পূর্ণ আলাদা। রাবণকে যখন বলা হয়েছিল ঃ ইচ্ছে করলেই যখন আপনি পারেন তখন রামের মূর্তি ধরে সীতাকে ভোলালেন না কেন?—তার উত্তরে রাবণের সেই যে বাণী ঃ "রামের মূর্তি পরিগ্রহ করামাত্র আমি যে ভাবে সীতাকে চাই সে ভাব আর আমার মনে থাকত না?"—এই কটি কথার মধ্যেই রাবণের চরম tragedy উচ্চারিত। রাম এবং রাবণের একই লক্ষ্যের দিকে বিপরীত সাধনা। যাকে রাম চেয়েছেন নিজের চোখ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, রাবণ তাকেই চেয়েছেন আঘাতের মধ্যে দিয়ে। এর মধ্যে নিয়তি নেই।

"আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে"—এর মধ্যে আর যাই থাক বীরত্ব নেই। ভিখারী বলে রামকে সত্যি মনে করলে এ আস্ফালন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয়। এই একটি চরিত্রও যদি মাইকেল খাড়া করতে পারতেন তো তাঁর কাব্যপ্রাসাদ তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ত না। অনেক প্রতিশ্রুতি আর unconventional attitude নিয়েও মাইকেলের বিদ্রোহী চরিত্র 'চরিত্র' হয়নি। তিনি খানিকটা Vague emotion আর কিছুটা নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আঘাতের প্রতিক্রিয়া দিয়ে যাকে সৃষ্টি করেছেন তা 'অদ্ভুত' কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু 'মহৎ' চিত্র মোটেই হয়নি। মহত্তম কবির মধ্যে যে প্রচুর সৃষ্টির অঙ্কুর একদিন মাথা উঁচু করে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র স্রষ্টা সে সৃষ্টিক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে সঙ্গেই তা নিঃশেষ। 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' ও কয়েকটি farce তাঁর সম্বল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম tragic নাটকও অবশ্য তাঁর। এগুলোতে তিনি কিন্তু অপেক্ষাকৃত সার্থক। সমগ্র 'মেঘনাদবধ'-এর চেয়ে তিনি যে ঐ ছোট্ট কবিতাটি লিখেছেন ঃ

"রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
মধুহীন করো নাকো তব মন কোকনদে..."

আমার কাছে এর মূল্য অনেক বেশী। এর মধ্যে যে একটি করুণ ব্যঞ্জনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তারই দামে এর দাম। যা স্বাভাবিক নয়, তা কবিতাও নয়, সাহিত্যও নয়। কৃত্রিমতার জন্যই 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যে কোনো impression রেখে যেতে পারেনি।

[৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫৭]

দী. কৃ. সা.

অ্যালবাম

সোমেন্দ্রনাথ রায়

অতীতের ভগ্নাবশেষের থেকে বর্তমানের প্রত্যক্ষ বাস্তবে ইতিহাসের ধারা চালনা করে নিয়ে আসেন যে প্রত্নতাত্ত্বিকের দল, আর যাই হোক, তাঁদের কাজটা খুব সুগম নয়। অতিতুচ্ছ, অপরিচিত চিহ্নের গোপন ইশারায় কত সঙ্কেত লুপ্ত থেকে যায়, কাহিনীর কত অংশ হয়ে ওঠে দুরধিগম্য। কল্পনার নিপুণ তুলিকা চালনা করে কত অস্পষ্ট রেখাকে রূপায়িত করে, কত সামান্যকে অসামান্য করে তুলতে হয়। তারপর সেই জোড়াতালি দেওয়া নেগেটিভের ফলিত, মুদ্রিত প্রতিফলনে আমরা মুগ্ধ, চমৎকৃত হয়ে কারিগরির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই।

ফোটোগ্রাফের অ্যালবাম হাতে নিয়ে কাহিনী শুরু করার ভূমিকা হিসেবে উপরোক্ত মন্তব্য করলেন আমার সঙ্গী। সুদূর মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর-কাটনী ব্রাঞ্চ লাইনের একটি অখ্যাত স্টেশন উমেরিয়ার ওয়েটিং রুমের একান্তে বসে অনতিদূরে জঙ্গলাকীর্ণ বিন্ধ্য পর্বতের পটভূমিকায় নির্মেঘ আকাশে সূর্যাস্তের লীলাবৈচিত্র্য উপভোগ করছিলাম। হাভানার কুণ্ডলীকৃত নীলচে ধোঁয়ার আড়ালে সঙ্গীর অ্যালবামের উন্মুক্ত পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করল দুটি দূরমনস্ক, ভাবালু চোখ আর তারই পরিমণ্ডলে একটি দৃঢ়প্রত্যয়, সুগঠিত পুরুষের মুখ।

অখ্যাত জীবনের অবজ্ঞাত পরিবেশের যে কাহিনী আপনাকে শোনাতে বসেছি আজ,— বলে চললেন ভদ্রলোক—তার সার্থকতা খুঁজতে গেলে হয়ত ক্ষুণ্ন হবে আপনার কৌতূহল। তবু জোর করে বলতে পারি, আপনার অনুভূতিপ্রবণ মনে এর আবেদন নিষ্ফল হবে না, সমবেদনার বেদনামধুর রসে উচ্ছল হয়ে উঠবে আপনার সাহিত্যিক সত্তা।

ভদ্রলোকের বাচনভঙ্গী বড় সুন্দর। কাহিনীর আকর্ষণে না হলেও তাঁর বলার আশ্চর্য যাদুতে আকৃষ্ট না হয়ে উপায় ছিল না আমার। উনি যে সুদক্ষ গাল্পিক, তাতে আর সন্দেহ করার উপায় ছিল না। একই ট্রেনে আমরা ফিরে যাব বিলাসপুর, যার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে এই নির্জন স্টেশনে রাত্রের গভীরতম প্রহর পর্যন্ত। তাই সৌভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গ আর উপভোগ করছিলাম তাঁর গল্প হাভানার মিষ্টি আমেজের সঙ্গে রসিয়ে রসিয়ে।

ফটোগ্রাফের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বললেন ভদ্রলোক,—মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় আজ পর্যন্ত যত প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটেছে ইনি তাঁদের অন্যতম। কোনোমতে স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে শিল্পীমনের দুর্দমনীয় প্রেরণায় ইনি ভর্তি হয়েছিলেন আর্টস্কুলে। দুটি বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে উন্নতিও করেছিলেন আশাতীত। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। পরিণত অভিজ্ঞতায় যে প্রতিভা চিত্রকলায় অভাবনীয় উৎকর্ষ লাভ করতে পারত, সংসারের নিষ্ঠুর চক্রান্তে জীবনের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার আশাটুকু পর্যন্ত নির্মূল হয়ে গেল। আজ নীরদ মজুমদারের নাম অপ্রাসঙ্গিক কয়েকটি শব্দসমষ্টিমাত্র ; কিন্তু তার ছবির ফটোগ্রাফ আমার কাছে আছে, বর্ণসুষমাহীন শুধু সেই ফটোগ্রাফ দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন কি বিরাট খ্যাতির সম্ভাবনাই না লুকিয়েছিল তার ছবির অন্তরালে।

উল্টে গেলেন তিনি অ্যালবামের পাতা, ফুটে উঠল আমার দৃষ্টির সামনে। পাহাড়ী ঝর্ণার কূলে বিলীয়মান রুক্ষ প্রান্তরের শেষে পরিচিত বিন্ধ্য পর্বতের ধ্যানগম্ভীর রূপ। বিস্ময়ে দুলে উঠল আমার মন। অনড়, মূক প্রকৃতি যেন অন্তরের আকুলতা নিয়ে অপেক্ষা

করে আছে চিত্রের রেখায় রেখায়। শিল্পীর যাদুস্পর্শে ঘুমিয়ে পড়েছে অকথিত বাণী না বলে। এর আগে প্রকৃতির এমন প্রাণবন্ত ছবি আমি দেখিনি।

আমার বিস্ময় উপভোগ করলেন ভদ্রলোক। স্মিতমুখে বললেন,—নীরদের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর একটাও নয় এটা, তবু কম নাড়া দেয়নি আপনার মনে। এক এক সময় তাই মনে হয়, স্রষ্টার জীবনে বিফলতার মূল্য হয়ত আছে কিছুটা ; কিন্তু যে আঘাতে স্বাভাবিক পুষ্টির থেকে বিচ্যুত হয়ে ফোটার আগেই ঝরে যায় ফুল, সে নৃশংসতার বোধ করি তুলনা নেই।

আর্টস্কুলের সঙ্গে অকালে সম্বন্ধে ছিন্ন করে চলে আসতে হল নীরদকে ধানবাদে খনিজবিদ্যা শিক্ষার জন্য। ওর বাপ কাজ করতেন বিলিতি এক কোম্পানীর অফিসে, যাদের কয়েকটা কোলিয়ারী ছড়িয়ে আছে মধ্যপ্রদেশের এই অঞ্চলে। মাইনিং পাশ করতে পারলে সুপারিশের জোরে ছেলেকে মোটা মাইনের কোনো কোলিয়ারীতে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন. এ আশা তাঁর ছিল। তাই আর্টস্কুলে পড়তে যাওয়া অবিবেচক ছেলের প্রতি শুধু রূঢ় ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, জোর করে তাকে ধানবাদে পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। নীরদ অবশ্য নিরাশ করেনি তাঁকে, বাপের সুপারিশের জোরেই এখানে কোলিয়ারীতে ম্যানেজার হয়ে এসেছিল মোটা মাইনেয়।

বিখ্যাত শিল্পী হবার জন্যে জন্ম হয়েছিল যার তাকে হতে হল কয়লাখনির ম্যানেজার। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা এর চেয়ে প্রকট আর কবে হয়েছে। তবে যে নেশায় মানুষ বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে অন্ধের মত অনুসরণ করে হৃদয়ের আকুলতার পরম প্রকাশ, নীরদও সে আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি পায়নি। কয়লাখনির এতবড় দায়িত্ব হাতে নিয়েও সে অবসরকালে ছবি এঁকে যেত, শুধু আপন সৃষ্টির খেয়ালে। আজ তার সমস্ত সৃষ্টিই নষ্ট হয়ে গেছে অতর্কিত দৈবের নিষ্ঠুর চক্রান্তে, কেবল তার কয়েকটি ছবির ফোটোগ্রাফ আছে এই অ্যালবামে, যা এখনও সাক্ষ্য দেবে তার অসামান্য প্রতিভার।

—কোলিয়ারীতে আপনি যাননি বোধ হয়? অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। মাত্র কয়েকদিনের জন্য ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আমাকে উমেরিয়া যেতে হয়েছিল, সময় পাইনি সমস্ত কিছু ঘুরে দেখবার। মৃদু হেসে তাই ঘাড় নাড়লাম। তিনি ফিরে গেলেন তাঁর কাহিনীতে।

—এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে কোলিয়ারী, ওই পাহাড়টার কোলে। অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখিয়ে দিলেন তিনি।—অফিসার্স কোয়ার্টার্সগুলো এতোদূরে থেকে দেখা যায় না, সেগুলো সব খনির কাছেই। কিছুদিন কোয়ার্টার্সে থাকতে না থাকতেই হাঁপিয়ে উঠলো নীরদ। সারাদিন অন্ধকার খনির ভিতর ওঠা নামা করে লোহা লক্কড় আর ধুলো কয়লার মধ্যে কাজ করে অবকাশের সময়টুকুও সেই পরিবেশে কাটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল তার কাছে। কোলিয়ারীর মাইল দুই পশ্চিমে শাল মহুয়া পলাশ আর বেত-বাঁশের ঘন জঙ্গলের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় টিলার ওপর পুরোনো কালের একটা ছোট্ট কেল্লা দেখতে পেয়ে খুশী হয়ে উঠল সে। কর্তৃপক্ষের কাছে লিখে পাঠাল, অবসরটুকু সে নির্জনে কাটাতে চায়, তাই ওই পুরোনো কেল্লাটাকে সংস্কৃত করে বাসোপযোগী করে নিচ্ছে। কোম্পানীর বড় সাহেব সেই সময় খনির কাজ পরিদর্শনের জন্যে এসেছিলেন এখানে। ওর কথা শুনে আর জায়গা দেখে তাজ্জব বনে গেলেন তিনি। মানুষ একেবারে অপ্রকৃতিস্থ না হলে ওখানে বাস করার কথা কল্পনাই করতে পারে না। চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, বাইরে যাবার পথ মাত্র একটি, তাও আবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু ফালি মত পাহাড়ের কোলে কোলে চলে গেছে অন্ততঃ পঁচিশ গজ। জঙ্গল পরিষ্কার করে লোকালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হবে, তা চিন্তা করাও কোম্পানীর

পক্ষে পাগলামী। কিন্তু নীরদ দমল না। একক চেষ্টায় প্রভূত পরিশ্রমে মাস খানেকের মধ্যেই জায়গাটাকে সে বাসোপযোগী করে তুলল। এ দেশী লোকেদের ভূতের ভয়টা একটু বেশী। এত কালের পোড়ো জায়গা যে অপদেবতার প্রিয় আবাস স্থল, সে বিষয়ে এরা ছিল নিশ্চিত। অনেক লোভ দেখিয়ে দিনের আলোয় আলোয় কেল্লার ভাঙ্গা অংশ মেরামত করে আশপাশের আগাছা কেটে ফুলের গাছ লাগিয়ে দিল। বাসা বদলের সময় শেষ পর্যন্ত মন্দ দাঁড়াল না জায়গাটা।

মেলে ধরলেন তিনি অ্যালবামের পাতা। উদার আকাশের নীচে, উঁচু টিলার ওপর মাধবী কুঞ্জের আড়ালে একটি প্রাচীন কালের বাড়ি চারিদিকের দুর্ভেদ্য জঙ্গলকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে।—আগের সেই অসংস্কৃত কেল্লাটি আমি দেখিনি, ভদ্রলোক বলে চললেন,—তবে শুনেছি, যে কোন বিদেশীর কাছেও সে রুচি আর মনোবল ঈর্ষার বস্তু।

উমেরিয়া আসার বছর খানেক পরে নীরদের আলাপ হয় কোলিয়ারীর বাঙ্গালী ডাক্তার অমর সান্যালের সঙ্গে। স্বভাবতঃ মিতবাক বলে বিদেশেও তার অন্তরঙ্গ বলতে বিশেষ কেউ ছিল না। কোলিয়ারীর ভিতরে গ্যাস লাগা এক কুলিকে অপূর্ব অধ্যবসায়ে বাঁচিয়ে তুলেছিল অমর সান্যাল। সমস্ত ঘটনাটির নীরব দ্রষ্টা ছিল নীরদ। আগে থেকেই তার অদ্ভুত জীবনযাত্রা প্রণালী কৌতূহল উদ্রেক করেছিল ডাক্তারের, এই সুযোগে দুজনের আলাপ অন্তরঙ্গতার কোঠায় পৌঁছে গেল অতি শীঘ্রই। অমর সান্যালের মস্ত সখ ছিল ফোটো তোলার। এই যে অ্যালবাম দেখাচ্ছি আপনাকে, এ তারই, এই ছবিগুলি যে না তুললে এই কাহিনীর অনেক অংশই অনাবিষ্কৃত থেকে যেত।

এর পর নীরদের নিঃসঙ্গ জীবন অনেকখানি ভরে উঠল ডাক্তারের সাহচর্যে। ঘরের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছেঁড়া ছবির মেলা দেখে পীড়িত হয়ে উঠত অমরের মন। অনুযোগ করত প্রতিভার এমন অপচয়ের জন্য, বুঝতো না মুকুল ঝরিয়ে দিয়েই ফলবান হয়ে ওঠে গাছ। এই সময় মডেল নিয়ে ছবি আঁকার জন্য চেষ্টিত হয়েছিল নীরদ, কিন্তু দেশী লোকদের সংশয়াকুল মনে অপদেবতার ভয় ঘুচিয়ে কাকেও তার স্টুডিয়োর টুলে এনে বসাতে সক্ষম হয়নি সে। অমর সান্যাল তার অসুবিধে অনুভব করে নিজেই বন্ধুর মডেল হয়ে বসতে রাজি হয়। বহুদিনের বহু পরিশ্রমের পর শেষ হল ছবি ; ডাক্তারের ব্যক্তিত্ব, তার বন্ধুপ্রীতি, তার অন্তরের সত্যিকারের ঐশ্বর্য, নীরদের সেই ছবিতে যেমন ফুটে উঠল, এমনটি বোধকরি কারো ছবিতে কখনও হবে না।

সমস্তদিন কলিয়ারিতে পরিশ্রম করে নির্জন অবসরটুকু ছবি এঁকে আর দু'বন্ধুতে গল্প করে কাটতে লাগল দিনগুলো। শিশুকাল থেকে মেয়েদের প্রতি একটা বিরুদ্ধ ধারণা থাকায় তাদের সম্বন্ধে নীরদের আগ্রহ অথবা কৌতূহল কোনটাই বিশেষ ছিল না। সৌন্দর্য ও দেহসুষমার প্রতি তার স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের অন্তরঙ্গতাকে সে ভয় করত রীতিমত। অনেক সময় ডাক্তারকে সে বলত,—দেখ অমর, আমার মনে হয় মেয়েরা সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর জীব। ওদের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, ওদের সব কিছুই যেন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। একটা অদৃশ্য রহস্যের আবরণে যেন ওরা নিজেদের ঢেকে রাখে সব সময়। সেখান প্রবেশ করার সাধ্য আমাদের নেই। ডাক্তার হেসে উড়িয়ে দিত তার কথা। বলত,—এ তোমার এক ধরনের মানসিক বিকার। শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে তো আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর, তাই বাহ্যিক আচার ব্যবহারেও বহুসময় ওদের সঙ্গে আমাদের বহু তফাত লক্ষ্য করা যায়। তাই নিয়ে যদি তুমি সঙ্কোচ বোধ কর মনে মনে, সেটা আর কিছু নয়, মাত্র অভিজ্ঞতার সুযোগ পাওনি তাই।

নীরদের জীবনে সেই অভিজ্ঞতার সুযোগ যে অতি শীঘ্রই উপস্থিত হতে পারে, তা সে কল্পনাও করেনি। ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার মাস আষ্টেক পরে কলকাতা যেতে হল

অমরকে, স্ত্রীকে নিয়ে আসবার জন্যে। এখানে আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেনি স্ত্রীকে। অচেনা দেশ, সম্পূর্ণ জংলী জায়গা বালিগঞ্জের বিলাসবহুল পরিবেশে আজন্ম কাটান বিদুষী স্ত্রীকে অকস্মাৎ তার পরিচিত পৃথিবী থেকে ছিনিয়ে এই প্রায় অসভ্য দেশে নিয়ে আসা তার সাহসে কুলোয়নি। অমরের স্ত্রী সীতা ছিল কিন্তু অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মেয়ে। হেসে নেচে গান গেয়ে উচ্ছল হয়ে সমস্ত জীবনটা সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাঁচতে চাইত। বিয়ে করেছিল তারা পরস্পরকে ভালবেসে, স্বামীর সঙ্গে উমেরিয়া আসবার জন্যে, ঝুঁকেছিল মেয়েটা প্রচণ্ড রকম, এবং বিরুদ্ধ যুক্তির প্রাবল্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে রাজিও হয়েছিল সে প্রথমটা। এখানে এসে নানা রকম অসুবিধেয় পড়বে বলেই তার এত অনুনয়েও কোন কান দেয়নি অমর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হবার আশঙ্কাতেই রাজি হয়েছিল স্ত্রীকে নিয়ে আসতে।

সেদিনটার কথা ভুলতে পারেনি নীরদ কোনোকালে। বন্ধু চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে কোলিয়ারী থেকে ফিরে অভ্যাস মত মোটরবাইক নিয়ে চলে এসেছিল সে ঝরণাটায় স্নান করতে। বলিষ্ঠ বাহুর আঘাতে পাহাড়ি ঝরণায় স্রোত উৎক্ষিপ্ত করে কূলে ফিরে এসে দেখে সম্পূর্ণ অপরিচিতা একটি মেয়ে উৎসুক চোখে তার পানে চেয়ে আছে। বিপুল বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত সেদিকে সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ ; তারপর মেয়েটির হাসিভরা মুখের নমস্কারে প্রতিনমস্কার করতে গিয়ে নিজের সিক্ত বেশের স্বল্পতার কথা মনে পড়তেই পাগলের মত ছুটে নেমে এল জলে।

অকস্মাৎ তার এই পলায়নে বোকা হয়ে গেল মেয়েটি ; নিজের আচরণে কোথাও কোন অসঙ্গতি কল্পনা করে ধীরে ধীরে ফিরে গেল সে কোলিয়ারীর পথে। ঠিক তার পরমুহূর্তেই বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ল নীরদের, এ মেয়েটিকে সে যে বিলক্ষণ চেনে, এর কত ছবিই যে সে তার বন্ধুর অ্যালবামে দেখেছে। ও যে সীতা তাতে কোন ভুল নেই।

জল থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পোশাক পালটে মোটর বাইকে স্টার্ট দিল নীরদ। বেশীদূর যেতে পারেনি সীতা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলে ঘুরে গিয়ে সামনে বাইক দাঁড় করাল সে। এই পরিবেশে এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় যে বন্ধুপত্নীর দর্শন পাওয়া যেতে পারে সেকথা সে কোন ক্রমেই ভাবতে পারেনি ; সুতরাং তার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তাকে যেন ক্ষমা করা হয় এই কথাটা সে বার বার অপটু কণ্ঠে স্বীকার করেও যেন তৃপ্তি পেল না।

সেদিন সেই মনোরম সন্ধ্যাটি বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সাহচর্যে কাটিয়ে এসে অভ্যাস মত ছবি আঁকতে বসল নীরদ রাত্রিবেলা। অন্যমনে তুলি নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় চমকে উঠে দেখল ক্যানভাসের অজস্র হিজিবিজির মধ্যে সীতার হাসিমাখা মুখখানি কখন আপন স্বাতন্ত্র্যের স্পষ্টতায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। চিন্তাধারায় এই অবিশ্বাস্য পরিণতিতে লজ্জায় সঙ্কোচে ধিক্কার দিয়ে উঠল সে নিজেকে বার বার। কিন্তু তুলির একটি মোটা টানে সেই মনোবিকারের অঙ্কুরটি যে মুছে দেবে একেবারে, বহু চেষ্টা করেও তা সে পারল না কিছুতেই।

কিছুদিন পরে সীতার সন্ধানী চোখে তার সেই অসম্পূর্ণ ক্যানভাসটি আবিষ্কৃত হল পুরোনো কতকগুলি ছবির নীচে। নীরদকে সে ধরে বসল সম্পূর্ণ করতে হবে ছবিখানি। কিন্তু তা করতে গেলে দিনের পর দিন সীতাকে নীরদের স্টুডিওতে এসে সিটিং দিতে হয়, যেটা খুব সুবিবেচনার কাজ বলে মনে হল না নীরদের। কিন্তু খেয়ালী সীতার আগ্রহাতিশয্যে আর অমরের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজি হল সে ছবি আঁকতে। কিছুটা সঙ্কোচ এবং কিছুটা আশংকা নিয়ে কাজে হাত দিল বটে, তবে কয়েকদিন যেতে না যেতেই আপন সৃষ্টির তন্ময়তায় ডুবে গেল সে সম্পূর্ণভাবে। শিল্পীর কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠল নতুন

সীতা, মর্তলোকের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ধ্যানের রহস্যলোকে প্রাণ পেল তার আত্মার অবিনশ্বর রূপ।

অ্যালবামে খোলা পাতাটি মেলে ধরে চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক। বাইরে তখন গোধূলির আবছায়ায় দুরান্ত পাহাড়ের অস্পষ্ট ধূসরতায় অস্বচ্ছ আবরণ নেমে আসছে ধীরে ধীরে। সেই ম্লান আলোয় পরিস্ফুট হয়ে উঠল যৌবন চঞ্চল একটি মেয়ের হাস্যমুখর দুটি দীপ্ত চোখ। অনুরাগ-নমিত প্রতীক্ষায় ক্লান্ত সে দুটি চোখ যেন কত যুগ ধরে হৃদয় সর্বস্বকে অনুসন্ধান করে ফিরছে। চোখের কাছে টেনে এনে বহুক্ষণ দেখেও আশ মিটল না আমার।

গভীর নীরবতার নির্লিপ্তিতে ওয়েটিং রুমের অন্ধকারে আমাদের যেন আরো অন্তরঙ্গ করে তুলল। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ভদ্রলোক আবার বলতে শুরু করলেন,—এ ছবিটি আঁকতে নীরদের লেগেছিল প্রায় মাস দুই। তার মধ্যে এক মাসেরও বেশী সীতাকে সিটিং দিতে হয়েছিল নিয়মিত। সেই সময়টা কোলিয়ারীতে অসুখ বিসুখ বাড়ায় সব সময় স্ত্রীর সঙ্গে আসা ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে একাই আসত সীতা, ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক থেকে ফিরে যেত নীরদের মোটরবাইকের পিছনে চেপে। অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসেছিল দুজনকে। মাসখানেক পরে প্রাত্যহিক সিটিংয়ের প্রয়োজন যখন আর রইল না, তখন ক্ষুণ্ণ মনের অস্বস্তিতে ভরে উঠল সীতার অন্তর। দু-একদিন পরে পরে অমরের সঙ্গে স্টুডিওতে সে আসতো বটে ছবির উন্নতি লক্ষ্য করতে, কিন্তু মন ভরত না তাতে। কোন্ নিষ্ঠুর বিধাতা যেন তাদের এই গোপন খেলাটি শেষ করে দিল একেবারে।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল চারিদিক।। আমার সঙ্গী একবার উঠে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেলেন ওয়েটিং রুমে আলোর ব্যবস্থা করবার জন্যে। একা একা অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে থাকতে আমার মন কোন দূর জঙ্গলে ঘেরা পুরোনো কেল্লার ভিতরে ঘোরা ফেরা করতে লাগল। অস্বাভাবিক পরিবেশে একটি বিদুষী সুন্দরী মহিলা আর একজন অখ্যাত চিত্রকরের প্রণয়লীলার নির্বাক দর্শক বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে। এর পরিণতি কি এবং কোথায়, বহু চিন্তাতেও তার সামান্য মাত্র আভাস পেলাম না। মনে হল, আমার চারিদিকে ঘনায়মান অন্ধকারের মতই দুর্জ্ঞেয় তার রহস্য, সঙ্গী সেখানে আলোকপাত না করা পর্যন্ত কিছু বোঝবার সাধ্য নেই আমার।

খানিক পরেই ফিরে এলেন ভদ্রলোক, পিছনে তাঁর কেরোসিনের বাতি হাতে জমাদার। নিবন্ত চুরুটটা ধরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই বাধা দিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন,—একটু অপেক্ষা করুন, সামান্য চায়ের বন্দোবস্ত করতে পেরেছি। মনে মনে খুশী হয়েও স্বাভাবিক সৌজন্য বোধে বললাম,—সে কি, আবার এর জন্যে নিজেও কষ্ট পেলেন, ওঁদেরও হয়ত কষ্ট দিলেন। মৃদু হেসে উত্তর দিলেন তিনি,—এর চেয়ে অনেক সামান্য কারণেও মানুষ নিজেও কষ্ট পায়, পরকেও কষ্ট দেয়। অত কুণ্ঠিত হবার কি আছে এতে।

চায়ের বাটি সামনে রেখে গল্পের সূত্রে হাত দেওয়া গেল আবার। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে শুরু করলেন ভদ্রলোক,—নীরদের এই ছবিটি যেদিন সম্পূর্ণ হল, তার পরের দিন সকালেই কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পেল সীতা, মা তার আকস্মিক রোগে মরণাপন্ন। শঙ্কাকুল মনে সেইদিন প্রথম বুঝতে পারল সীতা, এতবড় দুঃসংবাদেও নীরদকে ছেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা প্রায় সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। মুখ ফুটে কারো কাছে না বললেও তার প্রতিমুহূর্তের ভাবভঙ্গীতে অজানা রইল না নীরদের যে, রুগ্না মায়ের চেয়েও বড় আকর্ষণ সে ফেলে যাচ্ছে এই বিজন বনের প্রান্তে। ট্রেনে দেখা করতে এল নীরদ ; ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে হৃদয়াবেগ সংযত করা অসম্ভব হয়ে পড়ল সীতার কাছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও উচ্ছ্বাস দমন করতে পারল না সে ; কামড়ে ধরল নীচের ঠোঁটখানা, আর অবরুদ্ধ অশ্রু নেমে এল গাল বেয়ে অশোভন অজস্রতায়।

এদের দুজনের নিভৃত আলাপচারীতে কোন অসঙ্গতি কল্পনাও করেনি ডাক্তার। মেয়েদের সম্পর্কে নীরদের যে ঔদাসীন্য ছিল, সীতার সংস্পর্শে এসে সান্নিধ্যের উত্তাপে তার কাঠিন্য হয়েছিল দূরগত। তাতে খুশীই হয়েছিল সে। স্ত্রীকে সে ভালবাসত ; বলতে গেলে আচ্ছন্ন ছিল তার মন স্ত্রীর প্রতি স্নেহে প্রেমে অন্তরঙ্গতায় ; এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন সময়ের জন্যেই অনুরাগহীনতার আশঙ্কা সে করেনি। তাই গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর অশ্রুসজল সীতার চোখ দুটির পানে চেয়ে অসীম মমতায় সে প্রশ্ন করল,—মার জন্যে মন কি খুব খারাপ হচ্ছে?

—মার জন্যে! কই না তো? অসতর্ক সীতার কণ্ঠ থেকে স্পষ্টোক্তি বেরিয়ে এল বিস্ময়ের রূপ ধরে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে,—মানে, মন খারাপ হয়নি, শুধু ভয় হচ্ছে, মাকে গিয়ে হয়ত দেখতে পাব না। সুদক্ষ অভিনেত্রীর সংযত হাসির করুণ ছলনায় গোপন করে নিল সে তার পাপ চিন্তার অন্যায় প্রকাশ।

সীতাকে কলকাতায় রেখে দিন কয়েক পরে ফিরে এল অমর এখানে। ইতিমধ্যে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তার শাশুড়ি। আসার সময় সীতা একবার বলল,—মা তো অনেকটা ভালো রয়েছেন, এখন আর আমি এখানে থেকে কি করব? বিস্মিত অমর উত্তর দিল,—সে কি, তাই কি হয়? এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, কি মনে করবেন বল দেখি উনি? লজ্জিত হাসি হেসে বলল সীতা,—সত্যি, খারাপ দেখায় সেটা। কিন্তু আমি ভাবছিলাম—তোমার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে, একা একা বিদেশে থাকা।—তার জন্য ব্যস্ত হবার কারণ নেই, অমর তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল,—এতদিন তো একাই কাটালাম। তাছাড়া নীরদ যে একা একা অমন সাংঘাতিক জায়গায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, কে তার জন্য চিন্তা করছে বল? নীরদের উল্লেখে রাঙ্গা হয়ে উঠলে সীতার সুগৌর মুখখানি, কাঁপা গলায় বলল, উনি যে কেন ওখানে থাকেন, আমার বড় ভয় করে বাপু। তুমি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওই অপয়া জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারনা ওঁকে?—সে আমি কেমন করে পারব, বিব্রত অমর জবাব দিল ;—আর তার তো কোনো কারণও দেখি না। চোর ডাকাতের ভয় ওখানে নেই, যে তো তুমি দেখেই এসেছ। দরওয়ান রয়েছে সঙ্গে, রিভলবার থাকে কাছে, ভয় তার কি?

উমেরিয়া ফিরে আসার দিন পাঁচেক পরে প্রথম আভাস পেল অমর, যে তার অলক্ষ্যে গোপন একটা লুকোচুরি চলেছে সীতার আর নীরদের মধ্যে। প্রতিদিনকার মত সন্ধ্যার সময় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখল, খোলা একখানা চিঠির সামনে তন্ময় হয়ে বসে আছে নীরদ, দৃষ্টি তার দূর জঙ্গলের পানে নিবদ্ধ, চুল উড়ছে হাওয়ায়।—ব্যাপার কি? প্রশ্ন করতেই চমকে উঠে চিঠিটা খামে বন্ধ করতে করতে উত্তর দিল নীরদ,—না কিছু নয়: তারপর সম্ভবতঃ বন্ধুর কাছে গোপন করার লজ্জায় হেসে বলল,—তোমার বউয়ের পাগলামীর কথা চিন্তা করছিলাম। একখানা চিঠি দিয়েছে সীতা।

যতখানি বিস্মিত হল অমর, ক্ষুব্ধ হল তার চেয়ে বেশী। সেইদিনই সীতার চিঠি পেয়েছে সে, নীরদকে যে একখানা চিঠি সে দিচ্ছে, তার সামান্য আভাস পর্যন্ত দেয়নি চিঠিতে। তবু হাসিমুখে জবাব দিল সে,—দিয়েছে নাকি? আমায় লিখেছিল বটে চিঠি দিচ্ছে তোমায়। কি লিখেছে তবু?

—বিশেষ কিছুই নয়, নিরাপদে চিঠিখানা পকেটে রেখে বলল নীরদ,—এমনি কেমন আছি এই সব আর কি। তার ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হল, বন্ধুর মিথ্যে ধরে ফেলতে একটুও দেরী হয়নি তার। অন্যদিন কথা বলা ফুরোতো না তাদের, কত সময় মধ্য রাত্রের কোলিয়ারীর ভোঁ শুনে সচেতন হয়ে আক্ষেপ করেছে সময়ের স্বল্পতার জন্য। টর্চ রিভলভার সঙ্গে নিয়ে অমরকে পৌঁছে দিতে গিয়ে বিজন বনপথ ছেড়ে ফাঁকা মাঠে কতদূর এসে তার পর ফিরে

গেছে নীরদ। সেদিন আর জমলো না কথা, শিল্প সাহিত্য অথবা সঙ্গীতের পুরোনো মুখরোচক আলোচনা বার বার খেই হারিয়ে থেমে যাচ্ছিল। খানিক পরে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই উঠে পড়ল অমর মিথ্যে শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে। বাধা দিল না নীরদ, দুজনের কাছেই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল সন্দেহের বিষবাষ্প।

পরের দিন অমর গিয়েছিল বিকেলের দিকে জরুরী একটা কেস দেখতে। পেনিসিলিনের অদ্ভুত ক্রিয়ায় বাঁচিয়ে তুলেছিল মৃত্যুমুখী রোগীকে। মনটা অত্যন্ত, প্রফুল্ল ছিল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, কোণের আরাম চেয়ারে গা ডুবিয়ে ইংরেজি একখানা সাময়িক পত্র পড়ছে নীরদ। পরম হৃদ্যতার সঙ্গে নীরদের পিঠ চাপড়ে কুশল প্রশ্ন করল সে। কথাবার্তা শুরু হল সদ্য বাঁচিয়ে তোলা রোগীকে নিয়ে, এবং কোন ফাঁকে যে মনোমালিন্য কেটে আবার সহজ হয়ে এসেছে তাদের পূর্ব অন্তরঙ্গতা বহুক্ষণ পরে সেটা আবিষ্কার করে মনে মনে হেসে নিল দুজনে।

মাস খানেকের মধ্যেই সীতা ফিরে এল উমেরিয়ায়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর অটুট সম্প্রীতির মাঝখানে যে একটা চিড় ধরে গেছে, তা তার অন্ধ দৃষ্টিতে প্রতীত হল না প্রথমটা। অমরের সন্দেহের আভাস পেয়েও সীতাকে সে বিষয়ে জানাতে নীরদ সম্ভবতঃ ইতস্তত করেছিল ; যার ফলে অসহিষ্ণু মেয়েটা দিনের পর দিন ক্রমশঃই স্থৈর্যের বাঁধ অতিক্রম করে যাচ্ছিল। অবহেলিত স্বামীত্বের অভিমান যে পুঞ্জীভূত ঘৃণায় রূপান্তরিত হতে পারে, তা তার নিঃসংশয় মনে এল না একবারও।

অমরের বাড়ি যাওয়া আসা কমিয়ে দিল নীরদ। উদ্বেগে আর আশংকায় অনিয়মিত হয়ে পড়ল তার কাজকর্ম। কোলিয়ারীতে কাজের ঝামেলায় মাথা ঠিক রাখা হল অসম্ভব, পরম সহিষ্ণু প্রকৃতি হয়ে উঠল রুক্ষ, কঠোর, রূঢ়ভাষী। কিন্তু বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করল সে চিত্রকলায়। রাতের নিস্তব্ধ প্রহরগুলোয় তুলির প্রত্যেকটি আঁচড় বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিতে লাগল তার মানসিক অস্থিরতার। এই সময় খান দুই ছবি সে এঁকেছিল পার্বত্য প্রকৃতির। একখানি তার নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নের প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণি ঝড়ের ছবি। সে ছবিখানি সম্বন্ধে এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তৃষ্ণাতপ্ত ধরণীর ভীষণ ভয়াল মূর্তি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার ছবিতে। অপরখানি বসন্তের পলাশ মঞ্জরিত বনভূমি। আগুন লাগা পাহাড়ী ফাগুনের মদির অস্থিরতা সঞ্চারিত হয়েছিল মোহময় তুলির প্রত্যেকটি টানে। অপূর্ব সেই দুটি ছবিই তাকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করত।

তার এই আত্মনিগ্রহ অমরের উদ্বেগাকুল অন্তরকে ফাঁকি দিতে পারল না। ভাগ্যের এই অস্বাভাবিক পরিণতি শুধু নির্বাক সহানুভূতিতে দেখা ছাড়া পথ ছিল না তার। যতখানি বিদ্বেষ তার পুঞ্জীভূত হয়েছিল স্ত্রীর বিরুদ্ধে সঙ্গোপন অন্তরের অন্তরালে তার অনেকখানি দ্রবীভূত হয়ে গেল বেদনার মধুর স্পর্শে। বুঝতে পারল সে, বন্ধুর নিঃসঙ্গ জীবনের মরুভূমিতে সরস আশ্বাস যদি এনে থাকে সীতা, তাকে অসম্মান করা উচিত নয় কখনো। তবু মন কি মানতে চায়? অন্যমনস্ক স্ত্রীর অমনোযোগিতায় কতবার যে মনের অশান্তি মনে চেপে প্রশান্তির অভিনয় করতে হল, তার হিসেব নেই। বিশেষ করে একদিন যখন সন্ধ্যের অনেক পরে বাড়ি এসে দেখল, বিশৃংখল গৃহকর্মের সামনে চুপ করে বসে আছে সীতা পরম নির্লিপ্তিত, আগুন হয়ে উঠল মেজাজ তার। দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করল,—তোমার ব্যাপারটা কি বলত? কোন কাজে মন নেই, দিনরাত এই রকম অসহ্য অবস্থা সহ্য করতে পারে কোনো মানুষ?

—কেন, কি হয়েছে? ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করল সীতা।

—কি হয়েছে! তুমি কি আমাকে পাগল করতে চাও? সমস্তদিন আমারই ঘরে বসে যদি তুমি নীরদের চিন্তা করতে থাক, সেটা সহ্য করা আমার পক্ষে কত কষ্টকর, তা কি বোঝ

না?

বিবর্ণ হয়ে গেল সীতার মুখ, আত্মসম্বরণ করতে পারল না সে। উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা প্রতিবাদ করতে গিয়ে টলে পড়ল সম্বিত হারিয়ে।

অন্তরের বিরক্তি চরমে পৌঁছে গিয়েছিল অমরের, তবু এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। মূর্ছিত সীতার চোখে মুখে জল দিতে দিতে অনুশোচনায় বিক্ষত হতে থাকল অপরাধীর মন। প্রেমের উত্তাল আবেগ যে ভেতরে ভেতরে মেয়েটাকে এত দুর্ব্বল করে ফেলেছে, তা সে বুঝতে পারেনি। স্ত্রীর প্রতি একটা অসহায় অনুকম্পায় অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল তার।

কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য করল সে সীতার ব্যবহারে। এর পর থেকে মেয়েটা বদলে গেল একেবারে। স্বামীর প্রয়োজন অপ্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রইল সজাগ, আচারে ব্যবহারে কোন সময়ও বোঝার উপায় রইল না যে স্বামী ছাড়া অন্য কেউ তার মনে স্থান পেয়েছিল। নীরদ যখনই আসত ওদের কাছে, সযত্নে সীতা সরিয়ে নিত নিজেকে তার সান্নিধ্য থেকে। প্রথমটা নীরদ বুঝতে পারেনি তার এই আকস্মিক বীতরাগের হেতু। তবে অনুমান করে নিতে দেরী হয়নি তার। এবং তাদের এই ছলনা অমরের অগোচরে নেই, আর তুচ্ছ খেলার দণ্ড যে অনেক দিতে হয়েছে সীতাকে, সেটা মনে করে বিষিয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ।

কোলিয়ারীর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ছিল একজন ইঙ্গ-ভারতীয়, নাম তার মিলার। অষ্ট-প্রহর লোকটা মদে ডুবে থাকত বলে বিশেষ বনিবনাও ছিল না তার নীরদের সঙ্গে। অমর লক্ষ্য করল, মিলারের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল নীরদকে। অবসরটুকু আগে সে ছবির পিছনেই কাটিয়ে দিত। আজকাল ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ায় সে কদাচিৎ। বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করার পর একদিন সন্ধ্যেবেলা দৃঢ় মনে নীরদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। প্রস্তুত ছিল না নীরদ, হাতের পান-পাত্রটা সরিয়ে অথবা লুকিয়ে রাখার আর উপায় নেই তখন। অনুযোগের চড়া সুরে প্রশ্ন করল অমর,—এ কি শুরু করেছ নীরদ, শেষ পর্যন্ত মদ খাওয়া ধরলে?

অপরাধীর অপ্রতিভ হাসি হেসে কোন রকমে উত্তর দিল নীরদ, কেন, অন্যায়টা হয়েছে কোথায়? সর্বদেশে সর্বকালে এ জিনিসটির প্রতি আর্টিস্টদের অনুরাগ একটু বেশী পরিমাণেই দেখা যায়। তা নিয়ে হৈ চৈ করা বুদ্ধিমান সাবধানী লোকেদের উচিত নয়।

—তা নয় জানি, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল অমর,—কিন্তু আগে তুমি খেতে না, এমনকি মদ খাওয়ার ওপর যথেষ্ট ঘৃণা লক্ষ্য করেছি তোমার। হঠাৎ তাই মদের প্রতি তোমার এমন পক্ষপাতিত্ব দেখে—

থামিয়ে দিল তাকে নীরদ,—মেয়েদের ওপরেও আমার যথেষ্ট বিরুদ্ধ ধারণা ছিল। তুমি কি বলতে চাও আমার সে ধারণা এখনও আছে?

ঘা খেয়ে চুপ করে গেল অমর। উঠে যেতে যেতে বললে,—তবে শুনে রাখ ভাই, কোন দিন কোন কারণের জন্য তোমাকে অশ্রদ্ধা করিনি, আজও তোমার প্রতি শ্রদ্ধা আমার অটুট আছে। এমন ভাবে তুমি যে নষ্ট করে ফেলবে তোমার জীবনটা, বিশেষ করে তোমার প্রতিভা—

—চুপ করো অমর, গর্জন করে উঠল শিল্পী,—কী জান তুমি প্রতিভার? কোনদিন তোমাকে তো সে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। জান, পনেরটা দিন আমি ঘুমোতে পারিনি, খেতে পারিনি, অন্তরের সমস্ত বেদনা রূপায়িত করে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি রং আর তুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ ফেটে আমার রক্ত বের হয়েছে, কিন্তু তুলির টানে কোন ছবির আভাসটুকু পর্যন্ত রেখায়িত হয়নি। কেন জান?

বিমূঢ় অমরের বিস্মিত দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে উত্তেজিত নীরদ বলে চলল,--কারণ, তুমি যাকে প্রতিভা বলছ, আমার সেই সৃষ্টির আকুলতাকে ছাপিয়ে একটা মস্ত ক্ষোভ বুকের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল,--কেন আমি আঁকব, কিসের সান্ত্বনায়। জীবনে তুমি চেয়েছ, তুমি পেয়েছও। তুমি বুঝবে না চাওয়া পাওয়ার গরমিলে অন্তরেব ক্ষতের গভীরতা কতখানি দাঁড়ায়।--কিন্তু যা চাওয়া যায় তাই যে পাওয়া যাবে, এ আশা করাটাই যে ভুল তোমার। অমরের সমবেদনায় এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না, তবু তার কথাতে জ্বলে উঠল নীরদ।--নিশ্চয়ই ভুল। কিন্তু অবুঝ মনটা তো তোমার ওই পরম ফিলসফি মেনে চাইতে জানে না, সেইখানেই যত গণ্ডগোল। যাক, তোমার এবং আমার কাছে এ জিনিসটা অত্যন্ত তিক্ত আকার নিয়েছে ; আমি আর কোন আলোচনা করতে চাইনে এ নিয়ে। একটু একলা থাকতে দাও আমায়।

আহত অমর পায়ে পায়ে চলে এল বাইরে, বাড়ি যাওয়ার সমস্ত পথটা আর মনটা বিনা অপরাধে চড় খাওয়া ছেলের মত উচ্ছ্বসিত হতে থাকল। নীরদ ভালবেসেছে পরস্ত্রীকে, দোষ নীরদের নয়, তার নিজের সীতা ভালবেসেছে নীরদকে এবং স্বামী হয়ে তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সে, সুতরাং দোষ তার। স্বাস্থ্যবান সচ্চরিত্র সুন্দর ছেলেটা বদ সঙ্গীর সঙ্গে মিশে নষ্ট করতে বসেছে তার প্রতিভা, সে বোঝাতে গিয়েছিল এমন করা উচিত নয়, তাই দোষটা তার। হা হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হল তার প্রথমটা, তারপর একটা বিরুদ্ধ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল তার অন্তর। দূর হোক, চুলোয় যাক সব প্রতিভার ন্যাকামী আর ভালবাসার ভড়ং।

বাড়ি পৌঁছোতেই চোখে পড়ল ছত্রিশগড়ি চাকর লোচন কোথায় চলেছে, আর সীতা দাঁড়িয়ে আছে দুয়ারে। শুকনো গলায় প্রশ্ন করল--কোথা যাচ্ছিস? ত্রস্ত হয়ে উঠল লোচনের ভীত চাহনি। বিব্রত সীতার পাংশু মুখের পানে তাকাল সে। ভ্রূকুঞ্চিত মুখে দুজনার পানে খানিক তাকিয়ে ধমকে উঠল অমর,--যাচ্ছিস কোথায় জানিস না? তবু চুপ করে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল লোচন অপরাধীর মত। মাথায় রক্ত চড়ে গেল অমরের ; লোচনের ঘাড়টা ধরে ক্ষিপ্তের মত ঝাঁকিয় দিতেই খসে পড়ে গেল তার স্খলিত হাতের থেকে একখানি চিঠি, আর অন্ধকারে অকস্মাৎ সাপ দেখার মত অমরের সর্বাঙ্গ দিয়ে এক মুহূর্তের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সে চিঠিটার দিকে, কুড়িয়ে নেবার ক্ষমতা রইল না। সম্বিত ফিরে পেল অচৈতন্য সীতার পড়ে যাওয়ার শব্দে।

সেইদিন সন্ধ্যায় বাগানে আরাম চেয়ারে বসেছিল অমর। মনটা ছিল বিক্ষিপ্ত, প্রবল অস্বস্তিতে বিকৃত হয়ে উঠেছিল তার চিন্তাধারা। ধীরে ধীরে সীতা এসে বসল সামনের চেয়ারে। পাতলা সাদা শাড়ির আবরণে দেহ মন প্রশান্ত করে তোলার সহজ চেষ্টায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল খানিকটা। কোন রকম ভণিতা না করেই শুরু করল সে,--আমাকে তোমার অনেক কিছু বলবার আছে, আমারও আছে কিছু বক্তব্য। দিনের পর দিন অমন টানা-পোড়েনের মধ্যে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, আজ তোমার যা বলবার আছে বলে নাও।

নিরুত্তর বসে রইল অমর অন্ধকারের পানে চেয়ে। ঘন কালো মেঘের মত দিগন্তজোড়া বিন্ধ্য পর্বত বিধাতার চিরন্তন প্রশ্নের মত উদ্ধত স্পর্ধায় মাথা তুলে আছে আকাশে। এখানে সেখানে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গের মত আগুনের আভায় পর্বতের গায়ে মানুষের অবস্থানের আভাস পাওয়া যায়। অপেক্ষমান রেলগাড়ির এঞ্জিনের একটানা স্টীম ছাড়ার শব্দ আর মাঝে মাঝে সানটিংয়ের দুদ্দাড় আওয়াজে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতায় যেন চিড় খেয়ে যাচ্ছিল। কোন প্রশ্নই মনে এল না অমরের, সব কিছুই নিতান্ত নিরর্থক বলে মনে হতে লাগল তার কাছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইল সে।

স্বামীর কাছে কোন সাড়া না পেয়ে অসহিষ্ণু সীতা বলে উঠল,--কিছুই--বলবে না?

বেশ আমার বক্তব্যই শুনিয়ে দিই তবে। মিথ্যে সন্দেহে অনেক কিছুই ভাবতে পার আমার সম্বন্ধে, যেটা আমার পক্ষে সত্যিই বেদনাদায়ক। তাই লজ্জার বালাই রেখে নিজের এতবড় ক্ষতি করতে মন সরল না। একমুহূর্তের জন্যও যদি আমাকে অকৃতজ্ঞ কিংবা অপরাধী মনে করে থাক, তবে বলব তোমার সে সন্দেহ মিথ্যে। নীরদকে আমি ভালবাসি, আমার কাছে একথা দিনের আলোর মত সত্যি। কিন্তু অপরাধী আমি নই। আমার যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা, যা কিছু উদ্বেগ আকুলতা সব তোমায় ঘিরে। তুমি ছাড়া আব কারও কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হবে আমায় দিয়ে তা আমি ভাবতেও পারিনে। যে নীরদ দেহ সর্বস্ব, স্থূল, রিপু বশবর্তী, তার প্রতি কোন আকর্ষণই নেই আমার। কিন্তু যে শিল্পীর রেখার রেখায় সুন্দরের অভিব্যক্তি রঙে রঙে জীবন্ত করে তোলে চোখের সামনে, তাকে মন থেকে সরাই এ ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যদি এর জন্যে আমায় শাস্তি দিতে চাও, কোন আপত্তি করব না আমি কারণ কোন মালিন্য স্পর্শ করবে না আমাকে। অন্যায় আমি করিনি এ বিশ্বাস অটুট থাকবে চিরকাল।

একটানা কথা বলে শ্রান্ত হয়ে চুপ করল সীতা। বিস্মিত অমরের মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগে সীতার সঙ্গে তার প্রথম আলাপের কথা, যখন এমনই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত মেয়েটা অকারণ আবেগে। তারার আলোয় সীতার অসুস্থ পাণ্ডুর মুখখানি বড় অসহায় ক্লান্ত বলে মনে হল তার কাছে। নিঃসঙ্গ জীবনতরী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে কোন অনিশ্চিতের পানে যে চলেছে, তার আশংকা যেন কালো চোখ দুটির গভীরতায় উজ্জ্বল স্বাক্ষরে ঘোষিত। অসীম মমতায় ভরে গেল অমরের মন, পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল নীরদের আঁকা সীতার ছবিখানির কথা। শিল্পীর অস্পষ্ট বক্তব্য আজ যেন প্রথম ভাস্বর হয়ে উঠল তার কাছে, সেই গভীর অনুভূতির অপূর্ব প্রকাশের কথা মনে পড়তেই শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে উঠল তার অন্তর।

তবু কাঁটার মত বুকের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল সীতার স্বীকারোক্তির প্রত্যেকটি কথা—নীরদকে সে ভালবাসে, তাকে মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার। চমৎকার প্রহেলিকা, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সামান্য সুযোগটুকুও শুধু তার কাছেই দুর্লভ। সীতা তাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল, আজ সে ভালবাসে নীরদকে। মনে পড়ে গেল নীরদের কথাগুলো, মেয়েদের সম্পর্কে তার বিরুদ্ধ ধারণা একদিন সে নিজেই খণ্ডন করেছিল ভালবাসা পাওয়ার যুক্তিতে। হায় সত্যদর্শী শিল্পী, তুমি জেনে শুনেও সেই ফাঁদে ধরা দিয়েছ নিজেকে।

দিন পনের আর দেখা হয়নি তার নীরদের সঙ্গে, এড়িয়ে চলত নীরদ তাকে। তবে শুনেছিল সে, ইদানিং তার কাজকর্ম আচার ব্যবহার বেশ খানিকটা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল সকলের মনে। আগে কারও কোন কথায় থাকত না সে, আজকাল নিজে যেমন ফাঁকি দিতে শুরু করেছিল, অন্যের সামান্য ত্রুটিতে তেমনি ক্ষেপে উঠছিল প্রচণ্ড রকমের। অধীনস্থ কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তার উল্টোপাল্টা আদেশের ঠেলায়। ছলে ছুতোয় অযথা পীড়ন বরদাস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। সীতা এবং নীরদকে নিয়ে কানাকানি আর গোপন রইল না, প্রকাশ্যেই যা তা বলতে শুরু করল সকলে। ফলে কানে যেতে দেরী হল না নীরদের এবং দুজন চাবুক খেয়ে বরখাস্ত হল।

অবশেষে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে বন্ধুর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শঙ্কান্বিত হয়ে পড়ল অমর। অনেকে প্রকাশ্যেই শাসাতে আরম্ভ করেছিল এবং একটা খুনোখুনি হওয়া এমন কিছু বিচিত্র বলে মনে হল না। অমর বুঝতে পারছিল কিছুই সে করতে পারবে না ; নির্বাক দর্শকের ভূমিকা ছাড়া করবার কিছুই নেই তার। কিন্তু সীতার উদ্বেগাকুল মুখের পানে চেয়ে চুপ করে বসে থাকা হয়ে উঠল না। রবিবারের দুপুরে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াতে হল

তাকে বন্ধুর দরজায়।

এইখানে সঙ্গী ভদ্রলোক থেমে তাকিয়ে রইলেন বাইরের অন্ধকারের পানে। আমার চোখের সামনে দৃশ্যগুলো যেন পরপর সাজিয়ে দিচ্ছিলেন এতক্ষণ, এইবার বিরতির ফাঁকে চুরুট ধরাবার সুযোগ পেয়ে আরাম বোধ করলাম। ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন,—পাহাড়ে আগুন লাগা দেখেননি বোধহয়? শুকনো ডালপালা আর পাতায় পাহাড়তলী শীতের শেষে এই সময়টা যেন বারুদের স্তূপ হয়ে থাকে। কোন পাথর গড়িয়ে পড়লে অথবা কাঠে কাঠে ঘসা লাগলে যেটুকু স্ফুলিঙ্গ হতে পারে, তাতেই বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়ে যায় এসব জায়গায়। গভর্নমেন্টের এবং স্টেটের এতে বেশ ক্ষতি হয় প্রত্যেক বছর, অনেক কাঁচা গাছ আর পশু নষ্ট হয় বলে ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকায় পর্যন্ত পৌঁছোয় সময় সময়। অথচ এর প্রতিকার হয়নি আজও। একবার আগুণ লাগলে আপনি না নেভা পর্যন্ত কারও ক্ষমতা নেই কিছু করে। কখনো কখনো তিন চার বর্গমাইল জুড়ে খাণ্ডবদাহন চলতে থাকে তিন চার দিন ধরে। আগুনের উত্তাপে আর ধোঁয়ায় লোকালয়ের গাছপালা মানুষ পশুও ঝলসে যেতে থাকে। কাঁচা গাছ পোড়ার ফট ফট আওয়াজে, আগুন আর বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে, বন্য পশু পাখীর চিৎকারে, ছাইয়ে আর ধোঁয়ায় সমস্ত প্রকৃতি যেন বীভৎস রূপ ধারণ করে। বাংলার নরম মাটিতে বাস করে তার সামান্যও কল্পনা করা অসম্ভব।

আবার খানিক চুপ করে রইলেন তিনি অন্যমনস্ক ভাবে জানলার পানে চেয়ে। কাহিনীর মাঝখানে অন্য প্রসঙ্গ এসে পড়ায় টেম্পো নষ্ট হয়ে যাওয়া ফিল্মের মত লাগছিল গল্পটা। সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্য বললাম,—রবিবার দুপুরে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার গিয়ে দাঁড়াল বন্ধুর দরজায়, তারপর?

ভদ্রলোক স্মিত হেসে বললেন,—অকস্মাৎ প্রসঙ্গ বদলালাম বলে মনে করবেন না আমি গল্পের গতি থেকে সরে গেছি. একটানা স্রোতের মধ্যে মাঝে মাঝে বাধা দিলে তবেই স্রোতের উদ্দামতা প্রত্যক্ষ করা যায়—নয়কি? আচ্ছা, ওসব কথা থাক। তারপর, স্টুডিয়োর ভেজান দরজা খুলে ঢুকতেই চোখে পড়ল তার, মদের গ্লাস হাতে নিয়ে তার ভিতরে রঙ্গের তুলি ডুবিয়ে আপন মনে হাসছে নীরদ। অবিন্যস্ত জামা কাপড়ে রাঙ্গা ছোপ, চোখ দুটোয় অস্বাভাবিক একটা ঔজ্জ্বল্য। অমরের দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ হয়ে নিল সে, তারপর রঙ্গ খোলা রঙ্গ গোলা মদের পাত্র ঠোঁটের কাছে এনে নাটকীয় সুরে বললে,—বন্ধু! মদ অনেকেই খায়,—কিন্তু এমন রাঙ্গান মদ কার ভাগ্যে জোটে বলতো? কথা শেষ করে পান করতে যাচ্ছিল নীরদ, ছুটে এসে বাধা দিল ডাক্তার। বিশেষ কষ্ট করতে হল না তাকে, নিজের থেকেই হাতের গ্লাস টেবিলে রেখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল নীরদ। ঘরের চারিদিকে তাকাতে পরিবেশের বিশৃংখলতায় দৃষ্টি আটকে গেল অমরের রুচি ও পরিচ্ছন্নতা নীরদের সহজ বৈশিষ্ট্য ছিল,—কিন্তু অগোছালো ঘরের উৎকট নোংরামি দেখে তা কল্পনা করাও শক্ত। উচ্ছিষ্ট, পানপাত্র, ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিটনো ক্যানভাস রং তুলি কাগজে, স্তূপাকার জামা কাপড়ের রাশিতে স্টুডিয়োর পরিবর্তে কোন নোংরা জায়গার কথাই মনে পড়ে যায়। মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসে কত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে দুজনের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতের অনুশীলনে। সৌন্দর্যের গভীর উপলব্ধি কত সময় অতীন্দ্রিয় লোকে পৌঁছে দিয়েছে তাদের রসপিপাসু আত্মাকে। আর তার মূলে সেই চিরন্তনী নারী।

ফিরে তাকাল নীরদ, অমরের মনে হল, মৃত্যুর আগে মানুষ বুঝি এমনই অসহায় অবহেলায় তাকায় জীবন্ত পৃথিবীর পানে। চোখে উজ্জ্বলতা নিবিড় প্রশান্তিতে গলে গিয়েছে, মুখের ভাবে এসেছে কোমলতা। বললে,—আমি আশা করেছিলাম কয়েকদিন ধরে, তুমি আসবে। আমার প্রতি ঘৃণা আসা স্বাভাবিক, তেমনই আমার আকর্ষণ মুক্ত হওয়াও সহজ নয় তোমার পক্ষে।

আহত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল অমর বন্ধুর এই স্পষ্টোক্তিতে নীরদ আবার বলতে শুরু করল,—দেখ অমর, যে মানুষ শুধু অতৃপ্তি নিয়ে মরে, তাদের প্রতি অনুকম্পায় সমস্ত পৃথিবী দুঃখের বিলাস করে থাকে। এক সময় তোমার সঙ্গে প্রাণের সংযোগ ছিল আমার। সেই খাতিরে তুমি অন্তত সস্তা ভাব বিলাসে মৃত্যুর পর আমার আত্মার অসম্মান করো না।

যথাসাধ্য সপ্রতিভ রসিকতায় জবাব দিল অমর,—অকস্মাৎ এমন মৃত্যুবিলাসী হয়ে উঠলে যে? আগে তুমি বলতে, যারা মৃত্যুর উপাসক তাদের জন্মগ্রহণ করা উচিত হয়নি। কারণ মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারলে তবেই বেঁচে থাকার পথ সুগম হয়। তুমি শিল্পী, তুমি স্রষ্টা, তুমি ভবিষ্যতের প্রতীক—

আঃ, থামো, থামো অমর, চিৎকার করে উঠল নীরদ,—আমার জীবনটাকে একটা প্রহসনে পরিণত করেছ তুমি, তার জন্যে কারও কাছে কোন অনুযোগ করতে যাইনি আমি। কিন্তু আমার সামনে বসে তুমি যদি ব্যঙ্গ করতে থাক আমায়, সেটা আমার ধৈর্যের ওপর একটু বেশী জুলুম হয়ে পড়বে।

আমি তোমায় ব্যঙ্গ করব, এ চিন্তা করতে পার? ধীর স্বরে বলে গেল অমর,—আমি জানি তোমাকে এই আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে কোন ক্ষতি স্বীকারই পর্যাপ্ত হবে না। কিন্তু তুমি বলে দাও তোমার জীবনটাকে আমি প্রহসনে পরিণত করলাম কেমন করে। সীতা আমার স্ত্রী, তাকে তুমি ভালবাস, এখন আমার কর্তব্যটা কি বলে দাও।

—কেন, নিবিড় ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল নীরদের মুখখানা,— যাও, চারিদিকে আমার নামে কুৎসা রটাও গে, আর ঘরে গিয়ে ঠেঙাও তোমার বৌকে যত পার। তুমি কি মনে কর আমি কোন খবর রাখি না, একবার নয় বহুবার মেয়েটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তোমার অত্যাচারে। পার তো অস্বীকার কর সেকথা। সীতা তোমার স্ত্রী, সুতরাং তার ওপর যা খুশি করার অধিকার আছে তোমার। আমি তাকে ভালবাসি, তাকে সামান্য চোখে দেখার অধিকারও আমার নেই বলতে চাও? যদি না থাকে, চাইনে তোমাদের কাছে ভিক্ষে, অস্বীকার করি সমাজ সংস্কার সব কিছু, আমাকে সহানুভূতি জানাতে এস না, দোহাই তোমাদের। প্রবল উত্তেজনায় পূর্ণ একটি বোতলের মুখ জানালায় ঠুকে ভেঙে ফেলে ঢকঢক করে ঢেলে দিল গলায়।

চুপ করে বসে রইল অমর যতক্ষণ না নীরদ একটু ঠাণ্ডা হল, তারপর হাসি মুখে বলল,—কে বলেছে তাকে চোখে দেখার অধিকার নেই তোমার? সীতা আমার স্ত্রী, সচরাচর স্ত্রীর চেয়ে বেশী কিছু দাবী নেই আমার তার ওপরে। কিন্তু আমি তো জানি, তোমার কাছে তার মূল্য অনেক বেশী। সে তোমার মহত্তর প্রেরণার উৎস, সৃষ্টির সহায়, প্রতিষ্ঠার উপায়। মিথ্যে আমার ওপর সন্দেহ করছ ভাই, কোন অত্যাচার তার ওপর কোনদিন করিনি, এবং চিন্তাও করিনি সে রকম কিছু। তোমরা পরস্পরকে ভালবেসেছ, এতে আমার ক্ষোভ নেই, শুধু এইটুকু তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে ওদের ভালবাসার কোন মূল্য দিতে আজ আর আমি রাজি নই। একদিন সে আমাকেও ভালবেসেছিল, আর আমিও তাকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিলাম। তুমি যদি চাও, আজই আমি এনে দিচ্ছি তাকে তোমার কাছে, এবং আমায় বিশ্বাস করো তোমরা যদি এতে সুখী হও, আমার অন্ততঃ এ সান্ত্বনাটুকু থাকবে, যে একজন শিল্পীকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করেছি।

ধীর পায়ে চলে গেল অমর ঘর ছেড়ে, আর স্থাণুর মত বসে রইল নীরদ তার গমন পথের দিকে চেয়ে। বাড়ি ছেড়ে পঞ্চাশ গজও যায়নি এমন সময় কানে এল নীরদের চিৎকার—যেও না, অমর ফিরে এস, ফিরে এস। কিন্তু অমরের বুকের মধ্যে তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে অকারণ অভিমান সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল সে স্থির সঙ্কল্প লক্ষ্য করে। একবার ভাবল না কি ছেলেমানুষিই না করতে যাচ্ছে ; আত্মহত্যার

নেশায় বুঁদ হয়ে ভুলে গেল, সীতারও কিছু আপত্তি থাকতে পারে এ ব্যাপারে ; স্ত্রী তার ক্রীত সম্পত্তি নয় যে যাকে ইচ্ছে দান করবে।

উত্তেজনার মুখে ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়েছিল, যতই বাড়ির কাছে আসতে লাগল ততই তার অসম্ভবনীয়তা প্রকট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। দুয়ারে পৌঁছে অপেক্ষমান সীতাকে দেখে আরও অসুবিধায় পড়ল সে। চোখ মুখের শ্রীহীন শুষ্কতায় উদ্বিগ্ন সীতা প্রশ্ন করল,—একি! কি হয়েছে তোমার, এমন চেহারা হল কেন?

—কিছু হয়নি, কোন রকমে উত্তর দিয়ে ঘরে ঢুকলো অমর। অন্তরের নিঃসম্বল রিক্ততা প্রকট হয়ে গ্রাস করে ফেলেছে তাকে, চিন্তা করবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। চেয়ারে বসে হাত দুটি প্রসারিত করে টেবিলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, কেউ না থাকে, ক্যামেরাটা তো আছে। বহুদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী, ফাঁকি দেবে না কোনদিন। পৃথিবীতে দুঃখের সঙ্গে সুখ, আঁধারের সঙ্গে আলো, কুশ্রীতার সঙ্গে সৌন্দর্যও আছে। অকরুণ জীবনযাত্রার ক্ষুদ্রতম ভালোলাগা মুহূর্তগুলি সে চয়ন করে রাখবে অবসর সময়ে। কোন চিন্তা নেই। চামড়ার খাপে বন্দী রোলিফ্লেকস্‌টি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে দৃঢ় পায়ে উঠে এল সে ; সীতার কাঁধে হাত রেখে বলল,—চল, একটু বেড়িয়ে আসি।—কি ব্যাপার বল তো তোমার, স্বামীর কাছে নিবিড় হয়ে এসে প্রশ্ন করল সীতা, একটা চক্রান্তের আভাস পাচ্ছিল যেন সে। —এই মাত্র এলে এমন মুখে চোখ শুকিয়ে, আবার ফিরে যেতে চাইছ, নীরদবাবুর হয়েছে কি?

—মরতে বসেছে সে, দাঁত চেপে রুদ্ধ গলায় বলল অমর,—আর দেরী কোরো না, সময় নেই বেশী।

বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেল সীতার মুখ, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থর থর করে, আর অনিশ্চিত আশঙ্কায় আকুল হয়ে স্বামীর হাতটা চেপে ধরলো সে। এমনই সময় মোটরবাইকের ফট্‌ফট আওয়াজে চমকে উঠল দুজনে নীরদ আসছে? বিস্মিত হল সীতা। নীরদ আসছে! শঙ্কিত হল অমর। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল তারা।

নীরদ নয়, আসছিল তার নেপালী দারওয়ান। বাইক দাঁড় করিয়ে এক দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে অমরের হাতে একখানা চিঠি দিল। নীরদ লিখেছে—বন্ধু, তোমার মহানুভবতার তুলনা হয় না, কিন্তু যে শিল্পীর জন্যে আত্মত্যাগ করতে চেয়েছিলে তুমি, অনেকদিন আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আজ আমার সময় নিকটতম, সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তোমার কাছে অপরাধই শুধু জমে রইল। মৃত্যুপথযাত্রীকে ক্ষমা কোরো।

এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে সীতার হাতে দিতে গিয়ে চোখে পড়ল নেপালীটার ব্যগ্র ব্যাকুল চাহনি।—চলিয়ে সাহেব ; অসহায় মিনতি প্রকাশ পেল তার নিষ্ঠুর মুখে,—ম্যানেজার সাহেব একদম পাগলা হো গিয়া, উ তো মালুম হোতা হ্যায় আগি লাগা দেগা সব ঘরমে। একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল সীতার কণ্ঠ থেকে,—আমিও যাব তোমার সঙ্গে, ছুটে ভেতরে গেল সে।

দূর থেকেই আভাস পাওয়া যাচ্ছিল দাবানলের। শুকনো পাতার ছাই আর কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উঠছে আকাশে, চিৎকার করতে করতে কয়েকটা বনমুরগী আর ময়ূর উড়ে পালাল। খবর পেয়ে কোলিয়াবীর সব কটা ফায়ার ব্রিগেড ইউনিট এসেছে, কিন্তু করবে কি, তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত দুটো শাল গাছ পড়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পায়ে চলার ছোট্ট পথটি গেছে বন্ধ হয়ে, এঞ্জিন ঢোকার উপায় নেই। উত্তেজনায় আশঙ্কায় গলায় উঠে এল অমরের হৃৎপিণ্ড। 'হতভাগা প্রভুভক্ত নেপালী, প্রভুর জীবনের চেয়ে তার আদেশটাই বড় হল জানোয়ারটার কাছে!"

নীরদের মাধবীকুঞ্জের দুশো গজের মধ্যে যাবার উপায় নেই। মাত্র কয়েক মুহূর্তে আগুন

যে কি বিপুল আকার ধারণ করেছিল ; চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। পথে আসতে আসতে নেপালীটার কাছ থেকে অমর জানতে পারল, সে চলে যাবার পর দরওয়ানকে ডেকে ওই চিঠিখানি লিখে দেয় নীরদ। তারপর স্তূপীকৃত ছবির রাশীতে সবকটি মদের বোতল নিঃশেষ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। দরওয়ান তাকে বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু ধমক দিয়ে উঠেছিল নীরদ। আগে তার কর্তব্য করুক। দোটানায় পড়ে আপন বুদ্ধি মত মোটরবাইক নিয়ে ফায়ার বিগ্রেডকে খবর দিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটে গিয়েছিল বেচারা। বেরুবার সময় লক্ষ্য করেছিল, জ্বলন্ত ছবিগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে ম্যানেজার সাহেব জঙ্গলের দিকে। কেল্লায় আগুন ধরান শক্ত জেনে চারিদিকে আগুনের বেড় দিয়ে নিয়েছে।

ক্ষিপ্তের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করছিল অমর, কোনপথে ভিতর যাওয়া যায় সেই চিন্তায়। রবিবারে হাটের লোক ভেঙে পড়েছিল চারিদিকে, ভয়ে কেউ পাহাড়ে উঠে গিয়ে দেখতে সাহস করছিল না, পাছে নামবার আগে বেড়া আগুনের মধ্যে পড়ে যেতে হয়। এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে একসময় অমরের খেয়াল হল সীতা কই? কোথায় গেল সে এর মাঝখানে? হঠাৎ তার নজরে পড়ল বিশ পঁচিশ গজ দূরে টিলার বাঁ দিকে ঘেঁষে একটা নেড়া পাহাড়ের গায়ে টিকটিকির মত বেয়ে উঠছে মেয়েটা। আতঙ্কে শিউরে উঠল অমর, সর্বনাশ, একটা নুড়ি খসলেই যে মৃত্যু অনিবার্য। চিৎকার করে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল, পাছে চমকে উঠে পিছলে যায়, তারপর ছুটলো সেদিকে উন্মত্তের মত।

কাছাকাছি পৌঁছতেই সীতার চিৎকারে চমকে উঠে পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল কোন রকমে। চেয়ে দেখে, ডান দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ফুল বাগানের মাঝখানে নীরদের মাধবীকুঞ্জ লকলকে আগুনের শিখায় জ্বলে যাচ্ছে দাউ দাউ করে। পেছনের গাছপালাগুলো বাতাসের আন্দোলনে যেন আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় কাঁপছে থর থর করে। আর বাঁ হাতে একটা পাথরের সুচোলো ভাগ ধরে উদার আকাশের পটভূমিকায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে সীতা। অকস্মাৎ কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় কাঁধের ক্যামেরা খুলে ফোকাস করে নিল অমর, আর সেই অপরূপ দৃশ্যটি বন্দী হয়ে গেল রোলিফ্লেকসের গর্ভে চিরদিনের মত।

অ্যালবামের পাতাখানি মেলে ধরে চুপ করে বসে রইলেন ভদ্রলোক কিছুক্ষণ, তারপর উঠে চলে গেলেন বাইরে অন্ধকার প্ল্যাটফর্মের মধ্যে। আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম কেরোসিনের আলোয় আধ প্রকাশিত ফোটোটির পাশে, জ্বলন্ত পরিবেশের মধ্যে নির্বাক বেদনায় স্তব্ধ সীতার মত।

কতক্ষণ পরে জানিনা, আমার চমক ভাঙলো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাস্টারের কণ্ঠস্বরে।

—আসুন, আপনার গাড়ি আসছে। ডাক্তার বাবু আপনাকে ডেকে পাঠালেন।

—ডাক্তারবাবু? প্রশ্নসূচক ভঙ্গীতে তাকালাম আমি।

—বাঃ হেসে ফেললেন ভদ্রলোক,—এতক্ষণ আপনারা গল্প করছিলেন।

—উনিও ডাক্তার নাকি?

—হ্যাঁ, এখানের কোলিয়ারীর ডাক্তার উনি। মস্ত দুর্ঘটনা একটা ঘটে গেল এখানে সেদিন। কোলিয়ারীর এক পাগলা ম্যানেজার পুড়ে মল আগুন লাগিয়ে। ওঁর স্ত্রীও দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে খুব অসুখে পড়েন ভদ্রমহিলা। তাঁকে কলকাতা পাঠিয়ে নিজেও যাচ্ছেন উনি সেখানে। যাক, আর দেরী করবেন না, আসুন।

বিমূঢ়ের মত উঠে পড়লাম, সিনেমার শেষে দর্শকের মত। অ্যালবামের খোলা পাতাটা আকর্ষণ করছিল অদ্ভুত ভাবে। বন্ধ করে হাতে তুলে নিলাম সেটা, মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে।

[৩য় বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৫৭ থেকে সংকলিত]

সাহিত্যদুঃসম্বাদ

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান উন্নতি আর উৎকর্ষতার জন্য হুগলী জেলার অবদান যে অবিস্মরণীয়, একথাটা বঙ্গশ্রীতে বারো পাতা ব্যাপী লিখে বোঝাতে চেয়েছেন জনৈক শ্রীহেমেন দাশগুপ্ত। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে,

...তাঁহার (হেমেন দাশগুপ্ত) অভিভাষণে তিনি বঙ্গ সাহিত্যে হুগলী জেলার অবদান বিষয়ে যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সকলেই স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন যে, সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।..."

AMEN! সেই চিরস্মরণীয় প্রবন্ধটির গোড়ার দিকটা সত্যিই পড়ার মত বটে,--

"...এখানকার শ্রীরামপুরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহের নিত্যসেবা হইত, রাজা হরিশচন্দ্রের দেবোত্তর সম্পত্তি শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের আয় হইতে, এখানে রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শুভাগমন হয়। দেবী হংসশ্বেরী এখানে বিরাজ করিতেছেন।...

...মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত এখানকার ভক্ত রঘুনাথ দাস পানিহাটী হইতে লোকজন পাঠাইয়া এই সপ্তগ্রাম হইতে ভক্ত মণ্ডলীর জন্য চিড়া মহোৎসব করেন...।"

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে 'চিড়া মহোৎসব।' বটে! মুন্সীজি বন মহোৎসব ত করেছেন, কিন্তু গাছ বড় হোয়ে বন হোলে সেই বনে চরে বেড়াবার মত কতগুলো জীবজন্তুরও দরকার। অন্ততঃ সেই হিসেবেও এই ধরনের প্রবন্ধ লেখককে ছেড়ে দেওয়া যায় না জঙ্গলে? যে দেশের নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি বলে কোনো জিনিস নেই, ছিল না সে দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র শুধু জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন বলেই যে হুগলী বাংলা সাহিত্যের তীর্থ হয়ে উঠবে এ ধরনের কথা ঐ এক হেমেন দাশগুপ্তের পক্ষেই বলা সম্ভব। যীশুখৃষ্ট আস্তাবলে জন্মেছেন বলেই খৃষ্টধর্মে আস্তাবলের অবদান নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়? প্রবন্ধে আরেক জায়গা আরো চমৎকার ;--

"...ইহাতে যে ভাষা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বোধগম্য না হইলেও নাটকীয় ভাব বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে--

কমঠ করটট, ফণিফণা ফলটট
দিগগজ উলটট ঝগটট ভ্যায়রে
বসুমতী কম্পত গিরিগন সম্রত
জলনিধি কম্পত বাৎময়রে।....."

পদের শেষে তারকাচিহ্ন দিয়ে ফুটনোটে আবার লেখা হয়েছে "লেখক আবৃত্তি করিবার সময় অভিনয় করিয়া দেখান।" ডারউইনবাদ প্রমাণ করতে কি একা কলকাতা বেতার কেন্দ্রের লোকেরাই যথেষ্ট নয় যে তার জন্যে হেমেন দাশগুপ্তেরও দরকার হোলো? ইচ্ছে হোলো আমিও একটা কবিতা লিখে পাঠাব বঙ্গছিরিতে--

"গাঁট্টা মারটট খড়ম পিটাওট
মাথা ফুলিয়ে আড়াই ইঞ্চি আলু করটট

নার্দমাত জল-পিলাও টটরে
হেমেন দাশগুপ্তেরে।"

শুধু এই নয় আরো আছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মত অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় কেউ নাকি কোরতে পারেনি (!!!) এই মহাতথ্যটি আবিষ্কার কোরে বসে আছেন হেমেনবাবু। উদাহরণ স্বরূপ ম্যাকবেথের গিরিশচন্দ্রীয় অনুবাদ উদ্ধৃত করা হয়েছে।'

...Upon the heath
There to meet Macbeth...

এর অপূর্ব অনুবাদ হোলো,

...ঢুষনো রাঁড়ীর মাঠে যাব
ম্যাকবেথেরে দেখাদিব ঘাপটী মেরে এক কোণে!.....

দিনের বেলা প্রকাশ্য দিবালোকে সভা সমিতি করার কি দরকার হেমেনবাবুর। দিনের বেলা তেঁতুল গাছে ঘাপটি মেরে এক কোণে থেকে রাতের অন্ধকারে বেরোলেই তো জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকত।

ডিস্‌পেপসিয়া না হলেও যে লোকে বাংলা কথা সাহিত্য নিয়ে লোম ওঠা কুকুরের মত এক বিতৃষ্ণাজনক প্রবন্ধ লেখে সে কথা ভাদ্রের পূর্বাশায় নারায়ণ চৌধুরীর "বাংলা কথাসাহিত্য" পড়ার আগে পর্যন্ত জানা ছিল না। আগে জানতাম নারায়ণ শিলার ওঠা বসা সমান, আজ আবিষ্কার করলাম প্রবন্ধ লেখাও। উদাহরণ দেখাতে গিয়ে নারায়ণ চৌধুরী প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্যেরও নাম করেছেন। পূর্বাশায় প্রবন্ধ ছাপাতে হলেই কি, একবার কোরে Homage দিতে হবে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে? "ভট্টাচার্যের দর্পণে" (এ ছাড়া পূর্বাশাকে আর কিছু মনে হয় না কারুরই!) প্রত্যেক মাসে আধদিস্তে কোরে অনাসৃষ্টি লেখা ছাপানো ছাড়া যাঁর অন্য গতি নেই তাঁর স্থান প্রেমেন মিত্রর পাশে বসে কি কোরে ভেবে পেলাম না কিছুতেই !

[৩য় বর্ষ, ৪—৫ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫৭ থেকে সংকলিত]

বঙ্গ সাহিত্যের
ইতিহাস

সুধীন্দ্রনাথ ডট · সজনীকান্ত ড্যাশ—
বনফুল স্টপ · তারাশঙ্কর ব্যাস!
রিল্‌কেতে দাঁড়ি। বুদ্ধদেব সেমি ;
বিষ্ণু দে শুধু কমা, উর্দ্ধকমা অমি'
পরশুরাম চন্দ্রবিন্দু ; প্রশ্নচিহ্ন খোদ—
দেবতাত্মা হিমালয়, সান্যাল প্রবোধ!
বিসর্গের শূন্য দ্বন্দ্ব মুখার্জি শৈলজানন্দ ঃ
কোলনের দুটি ফুটকি ঃ
মুজতবা আলির চুটকি।



নারায়ণ দাশশর্মা

পিঠ

বলতে পারেন কি এই শরীরটার সব অঙ্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে অনাদরে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে কে? একটু ভাবলেই সকলে একবাক্যে জবাব দেবেন "পিঠ"। আয়তনের দিক দিয়ে একক গরিষ্ঠতা যে-অংশটির, সেটিই সবচেয়ে অবহেলিত—এমনতর পরিহাস সাহারা মরুভূমি ছাড়া আর কারো ভাগ্যে দেখা যায়নি। পিঠ হ'ল শরীরের 'পশ্চাদপদ দেশের' অনুকল্প—তাই Back ward মানেই পশ্চাদ পদ।

সব দিক দিয়ে শোষিত এই পিঠের পক্ষ নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ দু'টো সহানুভূতির কথা বলল না। এমনকি দীপ্তেন সান্যাল পর্যন্ত না। গত কার্তিক সংখ্যায় দেখলাম কানে তুলো গোঁজা আর পিঠে কুলো বাঁধার উপরে দীপ্তেন মৌলিক গবেষণা শুরু করেছেন কিন্তু হায় কানের মহিমায় তিনি শেষ পর্যন্ত এত বধির হয়ে গেলেন যে, পিঠ-বেচারীর ক্ষীণ আর্তনাদ তাঁর কানে কোন অনুভূতিই আনতে পারল না। অগত্যা এই আনাড়ীকেই আজ কলম ধরতে হ'ল।

কত সাহিত্যে, কত কাব্যে রূপবর্ণনার কত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দেখলাম : 'মাথার চুল থেকে কপাল, ভ্রূ, চোখ, নাক, গাল, ঠোঁট, দাঁত. চিবুকের তো কথাই নেই—ও'রা হ'চ্ছে Priviledged section ; কিন্তু বর্ণনার বৈচিত্রে কমল—কর চম্পক অঙ্গুলি, মৃণাল—বাহু ; কপাটবক্ষও কম যায় না। কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি ; কবিদের কল্যাণে পা আর উরু পর্যন্ত উৎরে গেছে, অশ্লীলতার দোহাই দিয়ে কালিদাসকে ঠেকানো যায় নি শ্রোণী-শিলা বর্ণনায় ; কাঁধ আর তলপেট পর্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের দৌড় দেখেছি। কিন্তু এতবড় বিরাটত্বের মহিমায় মহীয়ান পিঠ আজো পর্যন্ত যে আঁধারে, সেই আঁধারে।'

অথচ কেন? কোনো আধুনিকার বুকের উপর যে-বেনীটি লুটিয়ে পড়েছে, তাকে নিয়ে এত মাতামাতি করতে পার আর পিঠের উপর লুটোলে তোমাদের কবিতার উচ্ছ্বাসে পিঠ বেচারীর নামোল্লেখ পর্বটা করতেই তোমাদের কলমের কালি আর মনের রং ফুরিয়ে যায়,—এ কেমন কথা? তোমার আগে-আগে চলা যে মেয়েটির পেছন দিক দেখতে দেখতে তুমি

মোটর চাপা পড়ার উদ্যোগ করছ, তার পায়ের নৃত্যভঙ্গী দেখবে, নিতম্বের পানে তাকাবে হ্যাংলার মত, মসৃণ গলার এতটুকু ফালির উপর সূক্ষ্মতম স্বর্ণরেখাটি তোমার চোখ এড়াবে না, অথচ মাঝখানে অতবড় পিঠখানা তুমি সত্যি লক্ষ্য করনি—এ কি তাজ্জব ব্যাপার নয়?

এই পর্যন্ত পড়ে যে রুচিবাগীশ বিকৃতমস্তিষ্কের দল লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন, তাঁদের কাছে দেহতত্ত্বের এই গূঢ় রহস্য বোঝানর চেষ্টা নিশ্চয় বৃথা। অতএব আমাকে পলায়ন করতে হবে—অর্থাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হ'বে। এই 'পৃষ্ঠপ্রদর্শন' শব্দটা থেকেই বুঝবেন, পিঠের মত বন্ধু আমাদের আর কেউ নেই। একদিন পিঠ ছিল সন্ধিকামনার দ্যোতক, ব্যক্তিগত শ্বেত-পতাকা ; যুদ্ধ করতে গিয়ে শেষে নিতান্ত বেকায়দায় পড়েছেন, কেবলমাত্র আপনার চির-উপেক্ষিত পিঠখানাকে ঘুরিয়ে শত্রুর সামনে ধরুন—ব্যাস্। আপনার গণ্ডার-চর্মের ঢাল যা করতে পারেনি, আপনার স্বচর্ম-রচিত পিঠ অনায়াসেই আপনাকে অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু মানুষই পিঠের এ মহিমা থাকতে দিল না ; বারংবার এপিঠ-ওপিঠ করতে গিয়ে শান্তির দূত পিঠকে করে ফেলল আক্রমণের মুখে একটা কামোফ্লেজ মাত্র। তখন থেকে শুধু পৃষ্ঠ প্রদর্শন নয়, সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন না করে আর বাঁচোয়া নেই। তবু পিঠ আজো যতটা আঘাত সহ্য করে মানুষকে পলায়নের সুযোগ দিচ্ছে, পূর্ব বঙ্গ পাকিস্তানভুক্ত হয়ে নেহরুকে ততটা সুযোগ দিতে পারেনি।

অথচ এই পিঠের নিকটতম প্রতিবেশী পেটের মত ও'র অতবড় শত্রু আর নেই। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—পেটে খেলে পিঠে সয়। এমন কথা কেউ বলে না যে পিঠ গদীয়ান থাকলে পেট উপোস সহ্য করবে ; যেন পিঠের একমাত্র কাজ হচ্ছে নিজে উত্তম মধ্যম হজম করে পেটকে উত্তম-মধ্যম হজম করার সুযোগ দেওয়া। সরকারী শ্রমসচিব যখন শ্রমিকদের কম মাইনে নিয়ে বেশী কাজ করতে বলেন, তখনো সেটা এতবড় পরিহাসের মতন শোনায় না।

আসলে পিঠ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পড়ে থাক ; আমাদের নিজেদের চক্ষু কোনদিন তার পরিচয় লাভ করতে পারে না। পিঠের এই হেনস্থার মূল হচ্ছে এই অন্তরালে বাস। যে রত্ন উজ্জ্বলতম জ্যোতি ছড়িয়ে চিরকাল পড়ে রইল সমুদ্রের অতলে, যে-ফুল নির্জন বনভূমিকে চকিত করেই শুধু গন্ধ বিলিয়ে গেল—তাদের সাথে তুলনা হয় এই অনাদৃত অঙ্গের। তাইত আজীবনের অনুচর এই পিঠের স্থান মেলে না কোথাও, যেমন মেলে না লোকচক্ষুর আড়ালে অনেক মিল্টন আর ক্রমওয়েলের।

ইংরেজী Patron শব্দটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে পৃষ্ঠপোষক। এমন সুন্দর অনুবাদ বড় দেখা যায় না। Patronদের সব কারবারই পেছনে, পিঠের দিক থেকে ; কক্ষনো কোন Patronকে কোন কাজের সামনে দেখা যায় না, তাঁদের যেটুকু পুষিয়ে নেওয়ার সেটুকু সবার পৃষ্ঠ থেকেই নিয়ে থাকেন। ওঁদের পেট-ron না "পিঠ-ron" বলাই বোধহয় উচিত হ'বে। অবশ্য নজর তাঁদের পেটের দিকেই ঃ নিজের পেট মেদবহুল করবার এবং আপনার পেট ফাঁসাবার।

যুগ যুগ ধরে এমনি অনাদৃত থাকার ফলে পিঠ আজ নিতান্ত স্পর্শকাতর হ'য়ে পড়েছে! একটু পিঠ চাপড়ে কত সহজেই তা'কে খুশী করা যায়, পিঠে খাইয়েও বোধহয় ততটা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু পিঠের অনাদরের দিন বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। অনেকেই আজ বুঝতে পারছে পেটে খেয়ে পিঠে সওয়া আর বেশীদিন নয়। তাই নেহরুকে দেখছি পিকিং সরকারকে তোয়াজ করতে উঠে পড়ে লাগতে, স্ট্যালিন সাহেবের মন রাখা কথা বলতে। কেন? না, পিঠ সামাল। এট্‌লি সাহেব হংকং আগলে চিন্তা করছেন—কোরিয়ায় সৈন্য পাঠাবেন কি না। অর্থাৎ পিঠ সামলাতে হ'লে কি করা কর্তব্য। স্বয়ং মালিক সাহেব উনোতে বসবার উদ্যোগ

করছেন ;—পিঠ সামলানো দরকার। ডাঙে আর রাজ্যেশ্বর রাও-এর দল তোবা করে বলছেন, "বোমা-পিস্তলের কারবার আর নয় ; *নিয়মতন্ত্রের পথেই* বিপ্লব আনবে।" অরুণা দিদি বিলাত থেকে বলছেন, "ছি ছি! গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আবার কি? "শ্যামাপ্রসাদ সময় বুঝে মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিলেন, হেমন্ত বোস—শ্রীকুমার জানা—দাশরথী তা হঠাৎ কংগ্রেসের দুর্নীতি আবিষ্কার করলেন এতদিন পরে, সর্দারজী ডালমিয়ার চাঁদা ফেরত দিতে চাইলেন, সব কিছুর পিছনে এক বীজমন্ত্র "ইলেকশন আসছে, পিঠ সামলে।"

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। অতএব আমাদেরও পিঠ সামলাতে হচ্ছে। পিঠে ছুরি না পড়ে, সেদিকের সাথে আরো লক্ষ্য রাখতে হ'বে পিঠ চাপড়ানোর ফলে সহজে না গলে যাই ; আমরা বাঙ্গালীরা পিঠে লাঠিঘুঁষি সইতেই এত অভ্যস্ত যে পিঠ চাপড়ানোতে বড় সহজেই বেড়ালের মত ঘর্-ঘর্ শব্দ করে চোখ বুজি ; মহা-আনন্দে গেয়ে উঠি—রঘুপতি রাঘব রাজারাম। কিন্তু এবারে, ইলেক্‌শান আসছে—*পিঠ* চাপড়ানোতে ভুললে অদূর ভবিষ্যতে পিঠে কুলো বেঁধেও কুলোবে না। শ্যাম-কুল দুই-ই যাবে।

[৩য় বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫৭ থেকে সংকলিত]



—ডাক্তারবাবু, অসুখের উপসর্গগুলো আবার ফিরে এসেছে...
—তা' হবে! আপনার দেওয়া চেকটাও ফিরে এসেছে...

হাত দেখানোর হাত থেকে

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

একমাত্র পুলিস ছাড়া আর প্রায় সবাই হাত দেখায় নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে। একমাত্র পুলিসেরই হাত দেখানোতে ব্যতিক্রম আছে। পুলিস হাত দেখায় যাতে গাড়ির তলায় আপনার ভবিষ্যৎ সংক্ষিপ্ত হয়ে না আসে হঠাৎ (কিম্বা এদেশে পুলিস হাত দেখায় অ্যাকসিডেন্ট বাধাবার জন্যেই)। আর? আর ব্যতিক্রম হলো যুদ্ধে কি বাজীতে, কি ঐ পুলিস ঠিক সময়ে হাত না দেখানোর ফলে (পাশেই কোথাও সুন্দরী পানউলী পান বেচতে থাকলে নাকি এরকম হয় শুনেছি)! যাদের অ্যাক্সিডেন্টে দুহাতই কাটা গেছে তারাও হাত দেখানোর হাত থেকে বঞ্চিত। আগে আমার সমবেদনা হত কাটা হাত লোক দেখলে। মনে হত একে তো আমাদের চার পা নয়, (সকলেরই নয় কি?) তারপর আবার যেসব হতভাগ্য দু'হাত থেকে বঞ্চিত তাদের কি দুঃখ! কিন্তু না, দুঃখ নয়, এখন আনন্দ হয় এই জেনে যে এরা পৃথিবীর সেই মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যতমশালীদের অন্যতম, যাদের কোনও ইহকাল পরকাল বলে দেওয়া জ্যোতিষীর কাছে হাত পাততে হয় না (ভাগ্যিস জানোয়ারদের হাত নেই, না-হলে তাদেরও জ্যোতিষী-গণনার হাত থেকে অব্যাহতি ছিল না!—মানুষ কি জানোয়ারের চেয়েও অধম?)

হাত দেখানোর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডী বাস্তবিকই আর নেই। এমন কি 'পেডিকিওর' করবার জন্যে পা দেখানোও তার চেয়ে কম দুঃসহ আর সবচেয়ে মজা হোল এই যে যারা দু'হাত নেড়ে আপনাকে বলবে "ওসব হাত দেখাটেখানোতেও আমি বিশ্বাস করিনে", সব চেয়ে আগে অ্যামেচার কি প্রফেসনাল কিম্বা রাস্তায় চক দিয়ে দাগ কেটে বসা দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন আধুনিক ভৃগুর কাছে হাত বাড়িয়ে বসে থাকে তারাই। যদি তখন চেপে ধরেন তাকে তো উত্তর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাবেন, "বিশ্বাস নেই, তবে বাজিয়ে দেখতে দোষ কি লোকটাকে?" বাজিয়ে দেখার আগে যে সে হাত দেখানোয় অবিশ্বাসীর বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে সেকথা তখন তাকে বলে কে? বললেই বা শোনে কে? শুনলেই বা কানে ঢোকে কার? কানে ঢুকলেই বা সেই মত কাজ করা সম্ভব হয় কি করে? কারণ উপদেশ মত কাজ করা সম্ভব হলে ত আরম্ভে অত আস্ফালন করে (পাকিস্তানের ব্যাপারে কংগ্রেসী আস্ফালনের মত) তারপর হাত বাড়ান ব্যাপারটা অসম্ভবই হয় ঠিকই। কিউরিওসিটি কথাটা কেন যে মেয়েদের চরিত্রেই একমাত্র প্রক্ষেপ করা হয় আমি ভেবে পাইনে। নিজের ভবিষ্যৎ জানার জন্যে বেটাছেলের অনুসন্ধিৎসা কি মেয়েদের 'কি দিয়ে আজ ভাত খেলিরে' জানার চেয়ে কম হাস্যকর? গ্রহচক্রে কোন গ্রহ সরে কোথায় আসছে, কার খারাপ দশা আর কে বক্রী শনির ঠেলায় গুঁতো খাচ্ছে, কার গুরুচণ্ডালী দোষ আছে জন্মপত্রে যার জন্যে লক্ষ লক্ষাধিক হওয়ার পরেই কারাবাস কার নিশ্চিত, হাতের তেলোতে পতাকা দেখা যাওয়া মাত্রই কারুর পৌষ মাস ; আবার কার হাতে সার্কল দেখা দেওয়া মাত্র সর্ব্বনাশ,—আমার আত্মীয় স্বজন এবং আপনাদেরও নিশ্চয়, অনেকেরই এই নিয়ে দিন কাটে, রাত বাড়ে। রেসের টিপ্‌স্ থেকে ফাটকার বাজার, রাজায় রাজায় যুদ্ধ যাতে উলুখড়ের প্রাণ যায় সবই কিন্তু নির্ভর করছে আপনার বক্রি শনি কি তুঙ্গী শনি তার ওপর। অবশ্য সান্ত্বনারও অভাব নেই। আপনার এখন মানসিক অশান্তি গেলেও আপনার স্ত্রী এখন

ভাল। রাশিগত বিচারে যদি আপনার এ-সপ্তাহে ব্যয় বেশি হয় তো লগ্ন বিচারে এ সপ্তাহ আপনার আয় প্রচুর। লোহার ব্যবসায়ে লোকসান হলেও ঘুঁটের ব্যবসাতে আপনার বাজী মেরে দেওয়ায় বাধা নেই। যদিও মৃত্যু নিশ্চিত আপনার শিয়রে, তবুও তা কাটাবার বন্দোবস্তও আছে। সবই নাকি কপালে হচ্ছে। নলিনী সরকার যে ফুটপাথ থেকে রঞ্জনীতে আর আপনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদ থেকে এখন জেলে তার কারণ আপনার কপালে গুরু চণ্ডালী দোষ। সরকারের কপালে একাদশে বৃহস্পতি। এমন কি আপনার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যদি প্রত্যেকটাই মিথ্যে হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনারই জন্মসময়ের ঠিক নেই (ভাগ্যিস জন্মের ঠিক নেই শুনতে হয় না!) অর্থাৎ সন্ধি মুহূর্তে জন্মাবার ফলে এক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে যাওয়ায় আপনার রাজা হওয়ার কথা কিন্তু আপনি বড় জোর হতে পারলেন 'রাজা' নামক বাসের কণ্ডাক্টর। জ্যোতিষীদেরও বিপর্যয় কম নয়। ব্যবসা যদি করতে হয় তাহলে তাদের লিখতে হবেই জাতক বুদ্ধিমান এবং প্রচুর সৌভাগ্যসম্পন্ন, তবে--' এই 'তবে'টুকু মুছতেই আপনার অর্ডিনারী খরচা সাড়ে বারো টাকা—স্পেশাল খরচা পঁচিশ টাকা। পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট আপনার কর্মফলের প্রতিক্রিয়া সমস্ত মুছে দিতে পারে একটি কবচ। আর এ সব না বলে যদি জ্যেতিষী আপনাকে বলে পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ লোকের মত আপনিও সাধারণ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন, চেষ্টা করেই আপনাকে বড় হতে হবে, যদি একান্তই বড় হওয়া আপনার বাসনা, তাহলে আপনি গুণ্ডা হলে তাকে মারবেন, শান্তপ্রকৃতির হলে বলবেন, 'লোকটা বাজে।' কিন্তু যে লোকটা বাজে বলল সত্যিই তার ওপর ভরসা করে বউএর গয়না বেচে আপনি আট নম্বর ঘোড়ার ওপর সব টাকা ধরে, পরের দিন পাঁচটা টাকার জন্যে সেই জ্যোতিষীর কাছেই হয়ত হাত পেতেছেন (এবারে আর রেসের টিপ্‌সের জন্য নয় অবশ্যই)। আপনি আমি, সে, সর্বনামের মধ্যম উত্তম অধম সমস্ত অধমর্ণ এবং উত্তমর্ণেরাই হাত দেখানোর ওপর তবুও বিশ্বাস রাখেন, কেউ বাইরে, কেউ ভেতরে। তবে একটা কথা ঠিকই। হাত দেখানোর মত হাতে হাতে আর কিছু ফলে বা বিফলে না। তবুও আশা যেমন কখনও ফুরোয়নি, তেমনি হাত দেখানোও হাতে হাতে ঘুরতে থাকে।

হাত দেখানো জানা থাকলে আপনার কিছু হাতাতেই বাধা নেই। পুরুষ মানুষের পকেট কি মেয়ে মানুষের মন (মেয়েদের মনও অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের পকেটেই থাকে)। আপনি ভাল লেখক কি উদ্ভট ছবি আঁকিয়ে কিম্বা বাচ্চা পঙ্কজ মল্লিক, আপনি যাই হোন না কেন, আপনি তরুণীচিত্তহারী তেমন নন, যেমন নাকি একজন অ্যামেচার জ্যোতিষ জমিদার (এই রকম টাইটেল জ্যোতিষীদের হয় কিনা!) আর তাছাড়া হাত দেখাবার নাম করে একটি সুন্দরী মেয়ের হাত যেই আপনার হাতে গ্রহণ করলেন পাণিগ্রহণ হয়ে গেল সেখানেই। মেয়েরা অবশ্য নিজেদের সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানতে চায় না—স্বামীভাগ্য কেমন দৃষ্ট হচ্ছে তাদের হাতে এইটেই একমাত্র জানবার। অবশ্য আমাদের দেশে এখনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা আলাদা কেরিয়ার করতে বেরোয় না। কাজেই মেয়ের মায়ের কাছে জ্যোতিষীদের শুধু এইটুকু বলতে হবে ঃ আই-সি-এস জামাই হবে আপনার। দশবছর আগেও আই-সি-এস জামাই বললে মেয়ের মা খুশী হতেন। যে জ্যোতিষী ভারতবর্ষে পলিটিক্যাল চেঞ্জের খবর না রেখে এখনও বলে আই-সি-এস জামায়ের কথা, সে ভেবে অবাক হয় মেয়ের মায়ের মুখ তাতে আরও শুকিয়ে গেল কেন। আই-সি-এসদের দিন চলে গেছে। লোকে যে তাদের দেখে বলে I see Ass—এ খবর গরীব ব্রাহ্মণ কোথা থেকে রাখবে? তবে জ্যোতিষের সব চেয়ে বড় টেস্ট মেয়েদের ক্ষেত্রেই ; অন্তত আমার কাছে তো তাইই। কোন জ্যোতিষী কোন মেয়ের আসল বয়স (যা ভগবানেও জানেন না) বলতে পারবে হাত দেখে, সেদিন বলব হ্যাঁ।—বিনয় সরকারের ভাষায় 'বাপকা বেটা।'

কিন্তু সত্যিই ভবিষ্যৎ জেনে কতটুকু লাভ? যদি হিন্দু শাস্ত্রমতে বিশ্বাসেই করতে হবে যে 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' তাহলে ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে এ আগ্রহ কেন? আর যা ঘটবার তা যখন ঘটবেই, যদি জ্যোতিষীদের মতে তা পালটাবার আর কোন চান্স নেই তখন এ হাহুতাশ কেন? এবং আমার নিজের অনেক সময়ই মনে হয় আমরা বেশির ভাগ লোকই অত্যন্ত দুর্বল মানসিক শক্তিতে। কেউ যদি ফশ করে খারাপ একটা কথা বলে দেয়, যদি বলে অমুক দিন আপনার পা খানায় পড়ে খোঁড়া হবে, তো মনে মনে আমরা খোঁড়া হয়ে রইলাম কিন্তু সাত দিন আগে থেকেই। আবার জ্যোতিষী যদি রসিকতা করে বলে একটা মাটির তলার কালো জিনিস নিয়ে যদি ব্যাবসা করেন তবে এ-সময়ে তুঙ্গীশনির কৃপায় আপনার লাভ মারে কে? আপনি গো-শাস্ত্র সম্বন্ধে ট্রেনিং প্রাপ্ত, আপনি ব্যবসা করতে গেলেন কয়লার এবং জলে দিলেন লাখ কয়েক টাকা—অবশ্য বাপের টাকা—এবং কয়লা সেই চাঁদের কলঙ্ক, যা কখনও ঘোচবার নয়। দেব ভাষায় যাকে বলে অঙ্গারং শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। শুধুমাত্র হাত দেখানোর ফলে কত লোকের যে নিজের মাথা ফেটেছে তার ইয়ত্তা নেই। মজা হচ্ছে হাত দেখানোয় ভবিষ্যৎবাণী না ফললেও বোঝাতে বিশেষ অসুবিধা হয়না জ্যেতিষীদের যে আমাদেরই দোষে ফলেনি, আমরাই ঠিক মত date দিতে পারিনি। আমি জানি আমার বন্ধু, যাকে জ্যোতিষী বললেঃ দ্বিতীয় প্রচেষ্টা তার অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করবে, আমার সেই বন্ধুটি পুস্তক প্রকাশক। তার প্রথম বইটি কোন জ্যোতিষ গণনা না করিয়েই ভীষণ বিক্রী হয়। এই দ্বিতীয় বইটি কিন্তু তেমন চলল না। জ্যোতিষী অবশ্য একদিন আমার সামনেই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে দ্বিতীয় বইটিও বাজারের তুলনায় বেশ চলছে। বুঝিয়ে প্রায় এনেছিল, কিন্তু তখনই কোন্ বইএর দোকান থেকে যেন চিঠি এলো যে তোমরা যে বই জমা দিয়ে গেছ তা একখানিও বিক্রী হয়নি, কাজেই ফেরত নেওয়ার বন্দোবস্ত করো। জায়গার বড় অভাব গুদামে, সেই জন্যই নাকি এই অনুরোধ না হলে...ইত্যাদি। যাক, আমি ভাবলাম এবারে প্রকাশক বন্ধুর জ্যোতিষ প্রেম বোধহয় কমল। কিন্তু না—কিছুদিন বাদে সেই বন্ধুটি আমাকে বললে ঃ জ্যেতিষী তো মিথ্যে বলেনি ভাই। আমরাই ভুল করেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "কি রকম? কেন?"—উত্তর এলো, "বুঝলে না?" বন্ধু সগর্বে বলেন, "আমরা যে বইটি আসলে দ্বিতীয় বই করে বাজারে ছাড়বো ঠিক করেছিলাম, সে বই তো দ্বিতীয় বই হয়ে বেরোয়নি, অন্য বই তার আগেই আমরা বাজারে ছেড়েছি। আগে ছাপা হয়ে গেছল বলে ; কাজেই তৃতীয় বই দ্বিতীয় প্রকাশ হওয়ায় বাজার পায়নি ভালো।" আশি বছরে কাদের যেন বুদ্ধি হয় প্রথম শুনেছিলাম আমার এই বন্ধুটির আশিতেও যদি সেই বুদ্ধি হয়তো বুঝবো ভগবানের আশীর্ব্বাদ আর জ্যোতিষীর মারের ফলেই তা হয়েছে। আরেকজন প্রায় প্রবীণ খ্যাতনামা একজনের কাছে শুনেছি, এক জ্যোতিষী তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। কিন্তু ভদ্রলোকের সন্দেহ হয় যে জ্যোতিষী আগে থেকেই তাঁর সম্বন্ধে খবর জানতো, অতএব তিনি তাঁর ভাগ্নীকে নিয়ে যান সঙ্গে এবং কোন পরিচয় দেন না তাঁর। এবারে জ্যোতিষ মহাপ্রভু ভাগ্নীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা ছাড়া বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না কারণ মুডের অভাব। আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এদেশে এক ডাক্তার ছাড়া আর প্রায় সবাই কিছু বলতে পারে।

কিন্তু তবুও জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যে নয়। প্রচুর ভেজাল মেশাবার পরেও কোনও কোনও লোকের ভৃগুর যা ভবিষ্যৎবাণী থাকে তা মেলে অসম্ভব ভাবে। এমন কি মুখ দেখে, হাত দেখেও অনেক সময় অনেক লোকই অনেকের সম্বন্ধে অনেক কিছুই না জেনে অনেক কিছু সত্যি বলে দেয়। তখন আপনার পিলে চমকায়, মুখ চোখ লাল হয়ে যায় (কেন বুঝতেই পারছেন) বুক ধড়ফড় করে, এবং প্রাণময় ছটফট করতে থাকে। কাজেই শাস্ত্র মিথ্যে নয়। যারা শাস্ত্র না দেখে ব্যবসা করে তারাই ধাপ্পা দেয় বেশির ভাগ সময়েই। কিন্তু জ্যোতিষ

শাস্ত্র ছেলের হাতের মোয়া নয়, জহরলালের ডিসকভারি অভ্ ইণ্ডিয়া নয়, ম্যাজিক নয় যে, প্রচুর ভুল করলেও তা শোধরানো সম্ভব। এতটুকু এদিক ওদিক হলে, ইনটার-প্রিটেশনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য 'দৃষ্টিপাত' আর 'শীতে উপেক্ষিতা'র ব্যবধান। জ্যোতিষ শাস্ত্রে সেই পারদর্শী হতে পারে যার ম্যাথামেটিক্যাল ব্রেন পরিষ্কার। অত্যন্ত লজিক্যাল এবং র‍্যাশন্যাল না হলে জ্যোতিষ বাণীর পাঠোদ্ধার করা শক্ত। শুভ সময় আবার নিজামের পক্ষে যা বোঝায় কয়লাঘাটা স্ট্রীটের কোন কেরাণীর ক্ষেত্রে নিশ্চয় তা বোঝায় না। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি বলতে আগা খাঁর ক্ষেত্রে যা বোঝাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকেল পিওনের বেলায় কিন্তু অর্থের পরিমাণ তা নয়। পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিগত অবস্থা না জানলে বা ভালো করে বিচার না করে বললে 'উল্টো বুঝলি রাম' হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রেই। অ্যাস্ট্রনমির ওপর দখল থাকা অ্যাস্ট্রলজি চর্চার পক্ষে অপরিহার্য বললেই চলে। অশিক্ষিত পটুত্ব বড় পরিবারের ছেলের ছবি আঁকার ব্যাপারের একমাত্র এক্সপ্লানেশন হলেও জ্যোতিষ চর্চার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতা এবং প্রচুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও জ্যোতিষ গণনা কেন ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণই হল সায়েন্টিফিক ট্রেনিংএর অভাব।

জ্যোতিষীদের আরেক শ্রেণী আছে যাদের কাছে পৃথিবীতে দাগ রেখে যাবার মত কোন ঘটনা ঘটে যাবার পরই শুনবেন ও ব্যাপার তাঁরা আগে থেকেই জানতেন। গান্ধী মারা যাবার খবর তাঁরা জানতেন, সুভাষ বোস পালানোর খবর। ১৫ই আগস্ট দাঙ্গা—সব। শুধু মুখে তাঁরা কাউকে বলেননি অশুভ খবর বলে। সুভাষ বোস কবে আসবেন সে সম্বন্ধে আমরা দুহাজারবার শুনেছি কিন্তু তাঁর যে একবার ঐরকম পলায়ন আছে এটা যদি ব্রিটিশরা আগে থেকে জানতেন। ভাগ্যিস কেউ সেটা বলেনি। অন্তত গান্ধীজির ক্ষেত্রে আগে থেকে জানলে এ-হত্যাকাণ্ড নিবারণ করা যেত না কি? আর আশ্চর্য, এতে বিশ্বাসও করে অনেক লোক। আরোও শুনবেন জ্যোতিষ সম্বন্ধে নানান গাল-গল্প। কিন্তু সত্যি বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি এরকম কটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন? আমি তো আজ পর্যন্ত একটাও নয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবেন কেউ না। কেউ তাদের বলেছেন যে একটা বিরাট যোগ আছে তাদের ভাগ্যে যার জন্যে অমুক সালে তার এত উন্নতি হবে যে স্বর্গেও রাস্তা হবে তাদের নামে। এবং তাদের হাতে একটা এমন চিহ্ন আছে যা নাকি সচরাচর দেখা যায় না। আরে মশাই সকলেরই হাতে যদি একটা করে অসাধারণ চিহ্ন থাকবে তো পৃথিবীতে সাধারণ লোক হয়ে জন্মাবে কারা?

কিন্তু ভবিতব্য জানবার মধ্যে কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আর কি কোন সত্যই লাভ আছে? যদি পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে থাকে আমাদের এবারের ভাগ্য তাহলে সেটা জেনে কি লাভ? যদি এড়ান সম্ভব হত তাহলেও না হয় জেনে সুবিধে ছিল কিছু। 'কর্মফলে' যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে একথা তো ঠিকই যে কপালে যা আছে তার হাত থেকে রাজা ফকির কারুরই নিস্তার নেই এবং যে কথা আগেই লিখেছি যে আমাদের মানসিক জোর এতখানি নেই যে কোনও লোক না জেনেও যদি আমাদের কাউকে খারাপ কিছু ঘটবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করে তো তাতে কর্ণপাত না করতে পারি আমরা। এমনকি এই খারাপ ভবিষ্যৎবাণী থেকে অনেকের জীবনে অকারণ বিপর্যয় ঘটান অসম্ভব নয় একেবারে। যেমন নাকি হাতুড়ে-ডাক্তারের আশ্বাসবাণী বা ভয় দেখানোতে এক সময়ে মারা পড়ার ইতিহাস বিরল নয়। যা হবার তা যখন হবেই তখন যা করবার তা করে যাওয়াই ভালো।

তবে ফুটপাথের পাশে যারা পাখী দেখিয়ে, ছক কেটে, কপালে তিলক কেটে লোক ঠকায় তাদের ওপর আমার বিরূপ ভাব নেই কিন্তু তারাই অসহ্য আমার কাছে যারা সব জেনে শুনেও এদের কাছে হাত পাতে। দুশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী, গুলবাজ, দাম্ভিক, বড়লোক সকলের প্রতিই আমার সহানুভূতি হয়, হয় না শুধু বোকাদের ওপর (আমি নিজেও তার

মধ্যে পড়ি বলে বোধহয়) আর শিক্ষিত বোকা পৃথিবীর কলঙ্ক, প্লাস্টিক এজে অচল। ভালো করে শিক্ষিত লোকেরা জানে যে ফুটপাথের তিলকধারীরা জ্যোতিষের কিছুই জানে না তবুও হাত পাতবার বেলায় অগ্রগণ্য হলেন এঁরা। তবু যে এদের ঠকিয়ে কিছু লোকের অন্ন জুটছে এর জন্যে এই বোকা সৃষ্টি করবার জন্যে বিধাতার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি ঢের বেশি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে এই তিলকধারীদের চেয়েও। আর বোকারা সবচেয়ে বেশি বড়লোকের ছেলেপিলেদের মধ্যেই। এটাও সৌভাগ্যের কথা।

'ভৃগু' শুনবেন কাশীতে প্রত্যেক জ্যোতিষীর কাছেই আছে এবং এও শুনবেন আপনি যাঁর কাছে গেছেন, একমাত্র তাঁর কাছেই আছে, বাকী সব প্রক্ষিপ্ত। নেপালেও শুনবেন পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনটা খাঁটি কোনটা ভেজাল তা ভগবানই জানেন, কিম্বা ভগবানও জানেন না। ভৃগু সমস্ত রকম প্ল্যানেটের যোগাযোগে যতরকম সম্ভব পারমুটেশন-কম্বিনেশন সব করে ভাগ্য গণনা করে গেছেন 'মন্দ' কাটাবার মন্ত্রও দিয়ে গেছেন এবং তাঁর সেই পারমুটেশান-কম্বিনেশানের মধ্যে আপনি আমি সে, তুমি, তোমরা তারা, আমরা সকলেই পড়ব (যদিও ভৃগু নাকি রাহু এবং কেতুর কম্বিনেশন করেননি) সেই গণনার পাতা আসতে যেতে নাকি খোয়া যায় এবং অনেকের মতেই শুধুমাত্র সূচীপত্রটুকু পাওয়া যায় সেই পাতাকটা থেকেই ভৃগু গণনা হয় আজকের দিনেও এবং পাতার বাইরে গুল।

অনেকে বিজ্ঞাপন দেখে প্রশ্ন করেন যে এত লোক—এবং গণ্যমান্য লোকেরা যে সার্টিফিকেট দেন অমুক জ্যোতিষীর অমুক গণনা অব্যর্থ হয়েছে তাও কি অবিশ্বাস্য? না, অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু লোক যত গণ্যমান্য হোকই না কেন, তার কোন্ বিষয়ে জ্যোতিষী মহাশয় গণনা করে বলেছেন এবং তাঁর কতটুকু ফলেছে এ-সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এবং জানতেও চাই না, শুনেই ছুটে যাই। আমার আপত্তি এইখানেই। নিজের বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস না রেখে শুধুমাত্র অপরের কথা শুনে দাঁড়কাকে নাক নিয়ে গেছে বলে দৌড়নর মধ্যে আর যাই থাক বাঙ্গালীবুদ্ধির পরিচয় নেই।

বড়লোক এবং যাদের হাতে প্রচুর সময় আছে তাদের একটা খেয়াল হিসেবে জ্যোতিষ আলোচনা বা জ্যোতিষ নিয়েও সময় কাটানো তেমন অনিরাপদ নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত লোক যখন জ্যোতিষ নিয়ে মাথাব্যথায় তখনই শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর। কারণ হবি হিসেবে 'জ্যোতিষ কতটা' মারাত্মক জানি নে তবে সারাদিনের, ধ্যানজ্ঞান যদি জ্যোতিষ হয় তো সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে তার মানসিক টিবি হয়েছে। মনের অপমৃত্যু না হলে কেউ কাজ না করে কপালের দোহাই দিয়ে বসে থাকে? অথচ মজা দেখবেন গরীবেরাই ঘোড়া রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। কারণ হল, সময় যখন সবদিক দিয়ে খারাপ পড়ে তখন লোকে এই স্তোকবাক্যেও ভোলে যে সময় ভালো আসছে। পঁচিশ বচ্ছর পর্যন্ত যার জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না হাতে একটা পতাকা দেখা দিলেই তার সব বদলে যাবে একথা কি বিশ্বাস্য? বরং যুদ্ধ বাধলে হঠাৎ, সাধারণ লোক হঠাৎ বড়লোক হয়ে যায় লাখ লাখ সেপটিপিন বেচেই—কিন্তু শুধুমাত্র হাতের পতাকা দেখে চুপ করে বসে থাকলে হয় না। কিম্বা বড়লোকের হঠাৎ পতন হয় হাতে সার্কেল দেখা দিলে ততটা নয় যতটা তার নিজের ভুল দম্ভে, অকারণ লোভের তাড়-নায়।

আগুনে হাত দিলে হয়ত সত্যিই সব সময়ে হাত পোড়ে না কিন্তু হাতুড়ে জ্যোতিষীর পাল্লায় পড়লে কপাল সত্যিই ভাঙে। যদি কোনদিনই সত্যিই হাতের অসংখ্য রেখা পাঠকেও পড়তে পারে সে পড়বে হাতের তালুতে লেখা আছে ;—খবরদার হাত দেখিও না কারুর কাছে। এই যে রেখা দেখছ, এ হয়েছে ছোট বেলায় হাত মুঠো করতে এবং খুলতে খুলতে। আর হাত দেখার ব্যাপারে শেষ কথা হল সেই রাজা আর রাজজ্যোতিষীর গল্প। জ্যোতিষীকে ডেকে রাজা বললেন : আমার আয়ু কত? জ্যোতিষী বলে দিলেন : বেশি

নয়। রাজা ফের প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার আয়ু কত? জ্যোতিষী জবাব দিলেন আমার আয়ু আছে এখন বহু বর্ষ। রাজা বললেন তথাস্তু। তারপর কোটালকে ডেকে বললেন ঃ জ্যোতিষীর গর্দানটা নাও তো এখুনি। দেখি ওর আয়ু আমার চেয়ে বেশি কি কম?

জ্যোতিষীর গর্দান গেল কি থাকল এরপর জানি না কিন্তু আমার কাছে জ্যোতিষ শাস্ত্রের গর্দান এই গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই গেলো। এবং বোধ হয় আপনাদের কাছেও।

পুঃ এরপরেও যে সব অতি বুদ্ধিমান, অতি শিক্ষিতরা হাত দেখাবেই তারা যেন আমার কাছে আসে। আমার ফি যার কোন কথাই আমি মেলাতে পারব না তার কাছে ৩২ টাকা। যার এক আধটা কথা মিলে যাবে তার কাছে আট টাকা। সম্পূর্ণ নির্ভুল প্রমাণে আমি নিজেই পাঁচ হাজার টাকা দেব।

[৩য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৭ থেকে সংকলিত]



—বলত মানু, পৃথিবীটা কার Under-এ?..
—আজ্ঞে, আমার বাবার...
—সে কি করে?...
—আমার বাবা যে Pilot!...

গান

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

হরিশ মুখার্জি রোডের এ মেসটা মন্দ নয়। দুটো তিনটে স্নান ঘর আছে। সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হল তাই। স্নানের জলের খামতি নেই, অসুবিধে নেই দিনে দুবার স্নানের। মেস নয় ঠিক, আপিসের কয়েক বাবু মিলে করেছেন, একটা ফাঁকা সীটে তাঁরা বাইরে থেকে একজন নিতে খুব গরজ না দেখালেও আপত্তি করলেন না। প্রথমটা ঘাবড়ে ছিলেন আমি লিখি শুনে। তারপর খুব খুশী হলেন ডিটেকটিভ গল্প লিখি শুনে। বললেন, দেবেন তো স্যার একখানা বইতে নাম লিখে, উপহার দিয়েছেন যেন, দাম দেব আমি, তবে রণদা চক্রবর্তী তাঁর লেখা একখানা বই দিয়েছেন শুনলে বউএর কাছে প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে। আমি বললাম, দেব এক সর্তে, দাম না নিয়েই দেবো, তবে আমার একটা কথা রাখতে হবে আপনাকে ম্যানেজারবাবু।

বলুন, বলুন, ম্যানেজারের পক্ষে যতটা হাসি মুখে আনা সমীচীন, তার চেয়ে যেন একটু বেশি খরচ হয়ে গেছে বলে, যতটা হেসেছিলেন ঠিক ততটাই গম্ভীর হয়ে বললেন, পসিব্‌ল্ হলে নিশ্চয় কোরব—

ইম্পসিবিল্ কিছু করতে আমিই বা আপনাকে কেন বলব? শুধু কেউ যদি এসে জানতে চায় রণদা চক্রবর্তী এখানে থাকেন কিনা, বেশ কড়া ভাবেই 'না' বলে দরজা দেখিয়ে দেবেন।

'কেন বলুন তো'—সন্দেহকে যদি শানিত তলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা চলত তো বলতুম ম্যানেজারবাবু রীতিমত সন্দেহ করলেন আমাকে খুন করে এসেছি কিনা কাউকে এবং তলোয়ার উঁচিয়ে সন্দেহ নিরসনের জন্যে যেন এগিয়ে এলেন বলে মনে হোল।

"না না কোন মন্দ কাজ করে এসেছি বলে নয়, প্রকাশকদের জানা ঠিকানার বাড়িটা ছেড়ে উঠে এলাম তো শুধু বিশ্রামের জন্যেই। আঠারোখানা বইএর কন্ট্রাক্ট ছিল—এখন কিছুদিন আর লিখতে মন লাগছে না—তাই বলছিলাম—"

"বুঝেছি, বুঝেছি," ম্যানেজারবাবুর মুখ আবার গোল পাঁউরুটির মত মোলায়েম হয়ে এলো। এই দেখুন কত লোক একটা লেখা ছাপাবার জন্যে হা পিত্যেশ করে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায় আর আপনি টাকা পাবেন যে লেখার বিনিময়ে তাও লিখতে রাজী নন! ম্যানেজারবাবুর মুখে গাম্ভীর্যের গ্রহণ কেটে গিয়ে এবার পূর্ণিমা রাতের হাসি দেখা দিলো।—আঠারোখানা বই—কত টাকা পেলেন স্যার?

"টাকা—সে শুনে আর কাজ কি? বলবার মত নয়, মদ খাইনে, মেয়েমানুষের দোষ যাকে বলে তা নেই। স্ত্রীপুত্র পরিবার কেউ নেই, তাতেও পেট চালাবার জন্যে আঠারোখানা বই লিখতে হয়েছে আমাকে নিছক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে।"

"পোড়া দেশে তবু আর কিছু না করে যে শুধু লিখে চালিয়ে দিলেন এটাই কি কম কথা—রণদাবাবু? হ্যাঁ ভালো কথা। কথায় কথায় ভুলে যাবো—আপনার আগামটা।"

আগাম দিয়ে নিজের ঘরে এসে যখন তক্তপোষে লম্বা হলাম তখন দেওয়ালের ঐ টিকটিকিটা যে একটা ফড়িং ধরে খাচ্ছিল সে ছাড়া আর কেউ নেই। টিকটিকির ডিনারের সঙ্গে শুধু একটা টাইম পিসের টিকটিক ধ্বনি বোধ হয় মিউজিকের অতিরিক্ত আনন্দটুকু

জুগিয়ে চলেছিলো।

এসেছিলাম সত্যি করেই অজ্ঞাতবাসের জন্যে। উত্তরপাড়ার লোক আমি দক্ষিণপাড়ায় এসেছি একটুখানি মুক্তির জন্যে। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে। বহু লোকেই আমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করে আমি ছাড়া। আমার ওপর নির্ভর করে এমন কেউ নেই আমার। চল্লিশ টাকার কেরানী হয়েও আমার জীবন কেটে যেতে পারতো। কিন্তু খাল কেটে কুমীর আনলো আমার জীবনে পবনকুমার। পবনকুমার আমার গল্পের নায়ক, অজেয় অমর। তাকে প্রত্যেকবার মৃত্যুর গহুর থেকে বাঁচিয়ে এনে নবজীবন দান করেছে কে?—আমি। প্রত্যেকবার তার মুখ্যুমীর জন্যে শত্রুর জয় যখন অবশ্যম্ভাবী তখনও এক খোঁচায় জয়কে পরাজয়ের মোড় ঘুরিয়ে লক্ষপতির কন্যাকে পবনকুমারের হাতে তুলে দিয়েছে কে?—আমি। মাথায় হাতুড়ী মেরেও ভৈরব দুস্যু যে তার প্রাণ বার করতে পারেনি সে কার দয়ায়?—আমার। কে তাকে বাঁচাবার জন্যে ঠিক সময়ে তার সহকারীকে এনে হাজির করে দেয় প্রত্যেকবার—কে সে?—আমি। তবু পবনকুমার আমায় স্বস্তিতে থাকতে দেয় না এক মুহূর্ত। ঘুমিয়ে জেগে সেই এক মানসিক বিভীষিকা—পবনকুমারকে এবার কোথায় নিয়ে যাব—বাটাভিয়ায় না ব্লাডিভস্টকে। কোন সিচুয়েসানে তাকে ফেলে আবার বাঁচাব। কি করলে পাঠক আমার বাঁধা ফর্মূলা ধরতে পারবে না। পবনকুমার অকৃতজ্ঞ, সে তার স্রষ্টাকে বিপদে ফেলে আনন্দ পায়। পবনকুমার শুধু বুদ্ধিহীন নয় বিবেচনাহীন! বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়ায়—যেন ধরা পড়লে সব দায়িত্ব শুধু আমারই। গত ন'মাসে আঠারোখানা পবনকুমার লিখেছি আর নয়। আমাকে পাঁচ এডিশনের টাকা একসঙ্গে দিলেও নয়। পবনকুমার কে এখন আমি তা জানি না, জানতে চাই না। চিনি না চিনতে চাই না।

মেসের খাওয়াটা খুব খারাপ নয়। ঝোলের বাটিতে ডুবুরী নামালে মাছ হয়ত একটুকরো পাওয়া যায়। নুনের ঘাটতি, কিন্তু হলুদ পর্যাপ্ত পরিমাণে রান্নায় উপস্থিত। আর চালে কাঁকর থাকলেও চালের কোয়ালিটি যাতে অখাদ্যের চেয়ে ওপরে না যায় সেই ঐক্য সাবধানে বজায় রেখে চলেছেন ম্যানেজারবাবু। তাই চালের সঙ্গে কাঁকরও খাচ্ছি ভেবে দুঃখ পাওয়ার নেই কিছুই। পুরোটাই কাঁকর দেওয়ার বৈশিষ্ট্যে—ম্যানেজারবাবুর স্বাতন্ত্র্যও বজায় আছে। তবুও গায়ে মাখলাম না। আমার নায়ক যদি পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সামান্য কাঁকর হজম করতে পারব না আমি! পারব। পারলামও।

শুধু সহ্য করতে পারলাম না কালীবাবুকে। সন্ধ্যে বেলায় অফিস থেকে তিনি না ফেরা পর্যন্ত ধারণাই কোরতে পারিনি যে সব সুখ সত্যিই মানুষের কপালে নেই। তাঁর গলা দিয়ে যে কোনও দিন সুর বেরোবে না, আমার হাত দিয়ে পবনকুমারের মৃত্যু ঘটানো সম্ভব হলেও আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, সত্যিই প্রথম দিন তিনি যখন গলা দিয়ে আওয়াজ বার করলেন আমার ঠিক মনে হয়েছিলো বুঝি কাবুলীওয়ালা গান গাইছে। অমন বীভৎস অমানুষিক আর্তনাদ ক্লোরোফর্ম বেরুবার আগেও হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে কেউ শোনেনি। সারেগামা করছেন কালীবাবু। চোখ বুজে তানপুরো বাগিয়ে সুরের ঝর্ণাধারা ছোটাচ্ছেন তিনি। মানুষ জন্তু কীটপতঙ্গই যে শুধু বিস্মৃত রয়েছেন কালীবাবু তাই নয়। তাঁর চেতনা থেকে যেন পৃথিবীও বিলুপ্ত। সুরের সমাধি শুনেছি কিন্তু অসুরের যে সমাধি হয়, হতে পারে সেদিনই যেন প্রথম অনুভাবনায় এলো।

রাত্তির যত বাড়ে অসুরের সুরচর্চা তত সীমা ছাড়ায়। সারা বাড়িটায় কেউ কোথাও নেই। শুধু সেই উন্মত্ত স্বরতাণ্ডব চলছে আমার কানে একটানা। সুর নেই, তাল নেই, লয় নেই। গান শুনলেও যে খুন করবার ইচ্ছে জাগতে পারে এ-অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। কিন্তু সেই শেষ নয়। পরের দিন, তারপরের দিন, তারও পরের দিন এবং আবার তারও পরের দিন। সেই অশ্রান্ত গর্জন, সেই অবিশ্বাস্য বেসুরো গলায় সুরসাধনা। পাণ্ডবদের

অজ্ঞাতবাসের কষ্ট আমার কষ্টের কাছে কিছুই ছিলো না নিশ্চয়ই। চতুর্থ না পঞ্চম দিনে ম্যানেজারকে বললাম, কালীপদবাবুর কথা আমায় বলেননি কেন?

"কালীবাবুর কথা,—কেন তিনি আপনায় চিনতে পেরেছেন না কি? তা এক আধজন তো পারবেই—আপনি খ্যাত—"

মুখের কথা মুখেই রইল আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম! রাখুন মশাই চেনার কথা! অচেনাতেই কানে তালা লাগিয়ে দিলে, চেনা হলে তো প্রাণে ঘা দিত। না মশাই এর চেয়ে প্রকাশকের পাল্লায় ছিলাম ভালো। এ-জঞ্জাল বিদায় করুন, না হয় আমিই বিদায় হই।

ছি ছি কি বলছেন? ও-ভদ্রলোকের জীবনে আছে কি গান ছাড়া? মদ নেই, স্ত্রী নেই, অন্য মেয়েছেলে নেই, শুধু নির্দোষ একটু গান।

নির্দোষ কিন্তু দোষের কোন নেশা থাকলে হয়ত উনি একাই মরতেন। এ-নির্দোষ আনন্দ যে আমাদেরো সঙ্গে সঙ্গে মারবে।

কেন? ও-সময় তো সকলেই বাইরে থাকে—আপনিও না হয় ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসবেন?

বাড়ি থেকে পালাবার জন্যে যদি বেরুতে হয় তো বাড়ির বাইরে থাকাই ভাল, বাড়ি কেন তবে?—আর এসেছিই তো সারাদিনরাত ঘরে বসে অজ্ঞাতবাস করতে।

কিন্তু ওটুকু মাপ করতেই হবে।

মাপ করতাম যদি গলা দিয়ে এক আউন্স সুরও বেরুতো!

বলে রেগে বেরিয়ে এলাম, ঘর ছেড়ে। সন্ধ্যে বেলায় বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়েই মাথায় এলো পবনকুমার। কালীবাবুর গানের গুঁতোয় পবনকুমারকে ভুলে ছিলাম। এখন আবার আর এক যন্ত্রণা। ঘরে বাইরে দিনের পর দিন ব্যাডমিন্টন বলের মত দুই দুর্ভাবনার র‍্যাকেটে পিষে মরা ছাড়া উপায় দেখলাম না আর। তখন কালীবাবুকে একদিন সোজাসুজি বলব বলেই ঠিক করলাম। কিন্তু এখন ভাবি কেন বললাম। উধোম পাগল লোকটা। বলে সুরের তপস্যা করছি, দেবী প্রসন্ন হয়ে একদিন নাকি তাঁকে বর দেবেন। তারপর যখন জানালাম তাঁকে যে সঙ্গীত চর্চা তাঁর পক্ষে পণ্ডশ্রম হচ্ছে মাত্র, শুনে অত বয়সী লোক একটা, বলব কি, হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে। তাঁর মুখ থেকেই শুনলাম, সাত বচ্ছর ছঘণ্টা করে রেওয়াজ করেছেন কিন্তু তাঁর গান শুরু করা মাত্র লোক পালিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তেরোটা মেস তাঁকে শুধু গান গাইবার অপরাধে ছাড়তে হয়েছে। বুঝলাম সব এবং বললাম না আর কিছুই। কালীবাবু নিজের কানেই সব শুনতে পান এবং নিজের চোখেই দেখতে পান যা দেখবার। কিছুই তাঁর অজানা নেই যে তাঁর গান শুনলে লোকে পাগল হয়ে পালিয়ে যেতে চায়। যদিও যক্ষ্মারোগের মত সংক্রামক নয় কিন্তু মারাত্মক আরো বেশি। আধুনিক চিকিৎসায় যক্ষ্মা আর অনারোগ্য নয়, দুরারোগ্য মাত্র। কিন্তু এ-গানের পাগলামী কালীবাবুকে খেয়ে এমন জায়গায় তাঁকে এখন নিয়ে গেছে যা সমস্ত চিকিৎসার বাইরে। কোন চিকিৎসকের করবার এতটুকুও কিছু নেই।

মেস ছাড়লাম না কিন্তু পুরী পালিয়ে এলাম। না এসে উপায় ছিলো না। কয়েকদিন সন্ধ্যে বেলায় পর পর কালীবাবুর গোঙানী শুনবার পর তাঁর গানের ভূত আমাকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুললে। যখন তিনি সত্যি সত্যি গান গাইছেন না, তখনও মনে হচ্ছিল তিনি গান গাইছেন। সন্ধ্যে আসবার অনেক আগে থেকেই আমার সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে যেত। এই বুঝি গান শুরু হয়। পুরীতে এলে প্রথম সন্ধ্যেবেলায় ভারি একটা খুশী লাগল মনে। কালীবাবুর গান নেই। একটা বই নিয়ে বসলাম হোটেলের বারান্দায়। কিন্তু বেশিক্ষণ মন বসাতে পারলাম না বইতে। বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের দিকে। দীর্ঘকাল জ্বরের পর জ্বর ছেড়ে গেলে কিরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। যেন শরীর থেকে ভার কমে গিয়ে বড্ড

হালকা লাগে অথচ সে লঘুত্ব ভারি অস্বস্তিকর। যেন অন্ধ হঠাৎ আবার চোখ ফিরে পেয়েছে। যে আলো তার কাম্য ছিলো সেই আলোকেই সে যেন সহ্য করতে অক্ষম। না। অস্বস্তির ভাবটা ক্রমশ আমাকে পেয়ে বসল। কালীবাবুর প্রাণই যেন ভাল ছিল। কালীবাবু বিহীন হোটেল মনে হতে লাগল যেন বিপত্নীকের খাটের মত। স্ত্রী থাকতে যে জ্বলেছে অথচ স্ত্রী আজ নেই বলে একা শয্যায় শুয়ে থাকতে যার কেবলি মনে হচ্ছে আজ সে পাশে থাকলেই ভালো ছিল।

দুদিন কি তিনদিন। না, কালীবাবুর গান আমায় যেমন পাগল করেছিলো কালীবাবুর গান না গাওয়াও আমাকে পাগল করলে দেখছি। পুরী থেকে আবার ফিরে এলাম সেই মেসে। যখন মেসে পৌঁছলাম তখন সবাই কাজে চলে গেছে ম্যানেজার বাবুও নেই। ওপরে এসে কালীবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে নিজের ঘরে আসতে দেখি তাঁর ঘর চুনকাম করা হচ্ছে। একটু অবাক হলাম। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করলাম, কালীবাবুর ঘর চুনকাম হচ্ছে কেন রে?

চাকরটা বললে, কালীবাবু মারা গেছেন বাবু—তাই।

নিজের হৃৎপিণ্ডও বন্ধ হয়ে গেছে মনে হোল! মারা গেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যেদিন গেলেন সেইদিন রাত্তিরে শুলেন খেয়ে দেয়ে—সকালে আর উঠলেন না।

সন্ধ্যে বেলায় ম্যানেজারবাবু যখন এলেন, বললেন ঃ "যা চেয়েছিলেন তাই হোল। আর কালীবাবুর গান নেই—এবার আপনি নিশ্চিন্ত—" তখন ইচ্ছে হোল ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই তাঁর গালে। কিন্তু কেন যে এমন ইচ্ছে হোল কে জানে?

[৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৬]



—মেরামতের দাম!

—আরে পাবি বাবা পাবি। জুতোর আসল দামই দেওয়া হয়নি তো তোর মেরামতের দাম...!

সুরঞ্জনা

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সুরঞ্জনা না? হ্যাঁ, আর বলে দিতে হবে না, অবিকল সেই চেহারা। সেই কালো পুরু ঠোঁটের ওপর আরো কালো ছোট্ট তিল, কাটা জামার ফাঁক দিয়ে অন্ধকার রাতে দুটি দুরন্ত হেড লাইটের চক্ষু বিভ্রান্তকরা বারণ কি আমন্ত্রণ বোঝা যায় না, আর--

মণ্টি কার্লোয় ডিরেক্টর সুব্রত দাশগুপ্তকে ওরা ধরে বসেছিল তার নোতুন হিরোইন সুরঞ্জনাকে সে কি দেখে তার নোতুন এই বাইশ লাখী ছবি "ঘোমটার আড়ালে'র" প্রধান নায়িকা করলে। জিজ্ঞেস করবার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। সুব্রত দাশগুপ্ত যখনই যে-বই শুরু করেছে তখনই তার ছবির হিরোইন হয়েছে কোনও নতুন মুখ। আর সেই নতুন মুখ তার হাতে পড়ে প্রত্যেকবারই পুরনো মুখশ্রীদের ম্লান করে দিয়েছে। সুব্রত দাশগুপ্তর সব ছবিই কিছু রজত-জয়ন্তী সপ্তাহের সম্মান পায়নি, কিন্তু তার হাতের সব কটি হিরোইনই রাতারাতি স্টার হয়ে গেছে একের পর এক। সুব্রত দাশগুপ্তের তারারা সবাই ছিল মেঘের আড়ালে। মেঘ সরিয়ে সুব্রত তাদের মাটির মানুষের গোচরে এনেছে একদিন হঠাৎ আর তারা অবাক হয়ে গেছে, জল্পনা কল্পনা শুরু করে দিয়েছে নতুন তারা কোথায় ছিল। সুব্রত কিছু বলেনি। হেসেছে। মনে মনে শুধু নিশ্চিন্ত হয়েছে এবারেও ভুল হয়নি তার, এ-তারা তারাই। কিন্তু এবারে হেসে উড়িয়ে দিলে আর শুনছে না। ওরা আজকে জানবেই স্টার হওয়ার অভিধানে যে যে বিস্তৃত পরিচয় গুলো মেপে জুকে দেগে দেওয়া আছে তার কোনটির সঙ্গে সুরঞ্জনার মিল আছে! একটাও নয়। সুরঞ্জনার মুখ যাই হোক তাতে সস্তা কিম্বা বিদুষী কোনরই আদল পুরো নেই। সুরঞ্জনা ক্যামেরা ফেস থেকে অনেক দূরে। সুরঞ্জনা অত্যন্ত রোগা। মাত্র দুটি মেয়ের মধ্যে দেখলেও তাকে মনে রাখা শক্ত। গলার স্বরও সুব্রত স্বীকার করেছে নিতান্ত আটপৌরে। সে গলায় ঝর্ণা ধ্বনি দূরে থাক, কোরাস গানেও সুরঞ্জনার গলা সম্পূর্ণ অচল। তার শরীরে মার্জার গতি নেই, তার মুভমেন্ট স্লো-মোসান পিকচারের। শুধু বুকের কাছে এসে আপনার আমার তোমার সকলেরই চোখ থামবে একবার। অনেকখানি কাটা জামার ফাঁক থেকে অনেকখানিই দেখা যায় যার সঙ্গে এক তুলনা চলত যদি মোটর গাড়িতে হর্ণ থাকত একটা নয় দুটো। যে হর্ণ কখনও না বাজলেও ক্ষান্তি আনত না হাতে। অনবরত অসম্ভব চেষ্টায়! কিন্তু শুধু তার ওপর নির্ভর করে একজনকে বড়জোর দু'সীনে দেখবার আগেই ফেড আউট করা কোনও চরিত্রে পরিচালকের ব্যক্তিগত চরিত্রের দুর্বলতার মাশুল যোগানের জন্যেই নামান যেত মাত্র। কিন্তু নায়িকার পার্টে সুরঞ্জনা অকল্পনীয় এমন কি বাংলা ছবিতেও।

সেই সুরঞ্জনাকে সুব্রত সমস্ত শহরে, নর্থ কোরিয়ার প্রথম অগ্রগতির হট্টগোলকেও হারমানানো হৈ চৈ তার নতুন ছবি "ঘোমটার আড়ালে"-র নায়িকা নির্বাচন করলে আর বললে এ তার নতুন আবিষ্কার নয়, এ তার শেষ আবিষ্কার। তার হাতের বাকী সব কটি ছবিতেই সুরঞ্জনা নামবে একদিকে, নতুন নতুন চরিত্রে এক্সপেরিমেণ্ট করবে তাকে দিয়ে সুব্রত। তার প্রথম ছবির প্রথম চরিত্র যাকে সুরঞ্জনা জ্যান্ত করে তুলবে সে হোল একটি মায়ের ভূমিকা। চল্লিশের প্রায় প্রান্তে এসে যে মা তার ষোল বছরের মেয়ের গানের

মাস্টারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল একদিন। সমাজের নিষেধ বংশের মর্যাদা কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারল না। শুধু নিয়ে গেল চল্লিশ টাকার গানের মাস্টার পাখীকে যেমন করে নিয়ে যায় সাপ। এই দুরূহ আর অস্বাভাবিক চরিত্রকে যে-মেয়ে সুব্রতর মতে অত্যন্ত স্বাভাবিক করে তুলবে সে মেয়েকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পায়নি, তাকে আবিষ্কার করলে যে কেমন করে তারই কথা আজ মণ্টি কার্লোর বাইরে বৃষ্টির জলে আর ভেতরে রঙ্গীন সলিলে জমে উঠল ঘড়িতে যখন রাত আটটা আর রাস্তায় যখন জল জমেছে আধপুকুর আর রেস্তোরাঁর কামরায় যখন আমরা ছাড়া আর মাত্র একটি মোটা ফিরিঙ্গি মেয়ের সঙ্গে প্রেমগুঞ্জনে মত্ত দুটি বাঙালী ছোকরা—অবিবাহিত চাকরে কোন সওদাগর অফিসের।

আমরা যেদিনের কথা বলছি তার আগে হাওয়া অফিস খবর দিয়েছিলো অলইণ্ডিয়া রেডিওর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে আগামী কাল ঝড় উঠবে সন্ধ্যে সাতটার সময়। কিন্তু ঝড় উঠলো বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। দুপুরে যা ছিল ছুটকো মেঘ ড্যালহাউসী স্কোয়ারে কেরানীর পাল অফিসের দরজা থেকে যখন নিজের নিজের ছাতায় মাথা গলিয়ে নিষ্ক্রান্ত হল একে একে, তখন রাগে থম থম করছে সারা আকাশ। মেঘের পঙ্গপালে অন্ধকার হয়ে এলো জব চার্ণকের কলকাতা। ধুলো উড়লো গড়ের মাঠ থেকে ফুটপাথে। রাস্তায় হকার বেসামাল হাতে জিনিসপত্তর বাঁধতে আরম্ভ করলে ব্যর্থ ব্যবসার হতাশ ধিক্কারে, আর সকালে বাজার কি হবের বিপুল দুশ্চিন্তায়। আলগা-শিক ছাতা উল্টে পড়তে লাগল আর উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল মাথা গুঁজে দেওয়া মালিককে। ফিরিঙ্গি লেডি টাইপিস্টের দু হাতে চেপে ধরে থাকা স্কার্ট বাধা মানলে না। হাঁটুর ওপর থেকে উঠে গেল কোমরের ওপর। ট্রামে আর পথে ধুলোয় দু চোখ ভরে গেল ড্রাইভারের।

তারপরে নামলো-বৃষ্টি। গঙ্গার একটা ছোট অংশ উঠে এলো ঠনঠনে আর চীৎপুরে। আর নীচু দালান বাড়ির উঠোনে কাগজের নৌকো ভাসালে খেলতে-বেরুনো-বন্ধ দেশের ভবিষ্যতেরা, আটটা রাতের গরম খিচুড়ির জিভে জল আসা প্রত্যাশায়। বাড়ির চাল ফুটো হয়ে অঝোর কান্না নামল আকাশ থেকে মাটিতে। ট্রাম দাঁড়িয়ে রইল চলে যাওয়া বাসের দিকে করুণ চোখে চেয়ে। শুধু এখানে ওখানে সেখানে বকের মত দাঁড়িয়ে রইল ক্যালকাটা পুলিশ। হায় হায় করতে করতে ছাদে দৌড়ে এলো মাসিক বসুমতী পড়তে পড়তে বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়া গিন্নীর দল। রান্নার জন্যে গুল দেওয়া ছিল, তারা সারা ছাদ জুড়ে ছড়িয়ে আছে কাদা হয়ে। আর বিকেল বেলাতেই রাত হয়ে আসা বালিগঞ্জের বাতায়ন থেকে দেখে কে গাইলে : মন মোর মেঘের সঙ্গী...

মণ্টিকার্লোয় আমরা সেদিন বাইরে জলের সঙ্গে ছন্দ বজায় রাখবার জন্যেই ভেতরেও ভেসে পড়েছিলাম রঙ্গীন সমুদ্রে। এক ডিরেক্টর সুব্রত ছাড়া। সে ফিল্ম লাইনে ঢুকেও মদ খায় না—শরৎবাবুর বেশ্যারা যেমন কখনও স্বর্গীয় প্রেম ছাড়া আর কিছুর জন্যে উদ্বেল হয় না তেমন। সুব্রত বললে, "আজ তোমরা আমায় এত অবিশ্বাস আর ঠাট্টা করেছ যে এর পর যে পরিস্থিতিতে আমি সুরঞ্জনাকে নায়িকা করলাম তা সোজা কাঁচা ভাষায় বর্ণনা করে গেলে অর্থাৎ সর্বাধুনিক বাঙালী লেখকদের ভাষায় তোমরা তাকে বলবে গল্প, আমিও বলব গল্প এবং বলব গল্পের চেয়েও বেশি।

ওল্ড থিয়েটারকে তোমরা পুরনো কেল্লার সঙ্গে তুলনা করে থাক। আমিও ওকে পুরোনো কেল্লাই বলি, কারণ ওখানে প্রয়োজনের বাইরে একজন লোকেরও ঢোকা ফোর্টে ঢোকার মতই ঘাম বার করে দেওয়া ব্যাপার। আমার সঙ্গে দেখা করা বোধকরি বাকিংহ্যাম প্যালেসে রাজার সঙ্গে দেখা করার চেয়েও সে সময়ে শক্ত। আমি তখন আমার নোতুন বইএর হিরোইন খুঁজছি। শয়ের পর শ ছবি দেখে চলেছি। ইন্টারভিউ দিচ্ছি আর সবাইকেই বলছি পরে খবর দেব। আর চাকরীতে পরে খবর দেব বলার মানে তো তোমরা সবাই

জান। এই সময়ে আমার একদিন অফিস যেতে একটু দেরী হয়েছিল। গিয়ে তেতলায় আমার ঘরে দেখি একটি মেয়ে বসে আছে আগে থেকেই। অত্যন্ত বিরক্ত হলাম, আমার ঠোঁটকাটা বদনাম বন্ধুবান্ধবদের সীমানার বাইরে থেকে যে এসে বসেছিল সে মেয়ে হলেও ক্ষমার যোগ্য নয়। কড়াভাবেই জিজ্ঞেস করলাম ; আমাব সঙ্গে কি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টে ছিলো? মেয়েটি বললে, না, আপনার সঙ্গে যাদের অ্যাপয়ন্টমেন্ট হতে পারে আমি তার চেয়েও অনেক নীচের তলায় থাকি। যাদের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়ন্টমেন্টের বাইরে দেখা করতেও বাধে না, বুঝতেই পারছেন আমি তাদের দলেরও নই। অ্যাপয়ন্টমেন্টের অপেক্ষায় থাকলে যাদের সঙ্গে আপনার কখনোই দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই আমি তাদেরই স্বগোত্র। আমার নাম সুরঞ্জনা।

কড়া সুর গলায় বজায় রেখেই বলতে হোল, কিন্তু আমি,—আমি যে—

"ব্যস্ত, জানি।" মেয়েটি নিজেই জুড়ে দিল, "কিন্তু আপনার চেয়ে আমি অনেক ব্যস্ত। শুধু তাই নয় আপনি ব্যস্ত বলে আপনার সাক্ষাৎকারীদের ফিরিয়ে দেবার জন্যেও অন্তত একটি লোক গেটে আছে এবং আরেকটি আপনার দরজার গোড়ায় সব সময় আপনার চেয়েও ব্যস্ত হয়ে আছে। আমার মা আর ভাইয়ের ভাত জোগাবার জন্যে আমি এত ব্যস্ত যে আমার একদিন অসুখ করবারও সময় নেই।"

'প্রয়োজন?' পেয়ে বসবার আগে আমি আরোও কড়া হলুম।

'অনেক, তবে আপনার কাছে এসেছি সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজনে। ঘোমটার আড়ালে আপনি নায়িকার ভূমিকায় এখনো কাউকে দেননি...এখনও আপনি, হ্যাঁ মেয়ে খুঁজছেন।'

'আর খোঁজবার প্রয়োজন নেই। সে এসে গেছে।'

'কি রকম?' ব্যঙ্গ করবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারলাম না।

"ঠিক যেরকমটি আপনি খুঁজছিলেন।"—আশ্চর্য মেয়েটি এবারেও অপ্রতিভ হলো না একটুও বরং আমাকে একটু অপ্রতিভ করে দিলে। ব্যঙ্গ করলে সে সরলভাবে কথাটাকে নেওয়ার ভান করলে, তখন আমিও যে সরল ভাবেই কথাটা বলেছিলাম এ-ভান না করলে আর চলে না। তাই এবারে আমি সোজাসুজি বলে বসলাম, "আপনি পাগল নন তা আপনার সাজিয়ে কথা বলবার কায়দাতেই বোঝা গেছে। কিন্তু আপনার আশার বহরটা প্রায় পাগলামির সীমাতে গিয়ে পড়ছে না!'

'পড়ছে। তবে পাগলামি জিনিসটা এমনি পয়সাকড়ির ব্যাপারে বাঞ্ছনীয় নয় ; কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে যে যত পাগল সে ততই বাঞ্ছনীয়। অভিনয়-পাগল না হলে সত্যিকারের অভিনয় কাউকে দিয়ে হয় সুব্রতবাবু?'

'এ-মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। ঘণ্টা বাজিয়ে অ্যাসিসটেন্টকে ডাকলাম। "ঘোমটার আড়ালে" নামবার জন্যে যারা ছবি পাঠিয়েছে সেই ছবির ফাইলটা নিয়ে এসো একবার।'

'এ-তে মাত্র কয়েকটি ছবি আছে, ছবিগুলো আপনি একবার দেখুন এবং ওই মেয়েগুলির আগের আগের অভিনয়ের অভিজ্ঞতার সবিস্তার লিখিত বর্ণনাও আপনাকে দেখাব। তারপর—'

'তারপরও আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব। যদি চেহারার প্রশ্ন তোলেন তো বলব সিনেমার সুন্দরী মেয়ের চেয়ে টাইপ চেহারার দাম অনেক বেশি—যার ছাপ সহজে ভোলা শক্ত।'

'কোন্ চেহারা সিনেমায় চলবে এবং কার চেহারা অচল এ-সম্বন্ধেও কি আপনার কাছ থেকে আমার জানতে হবে?'

'জানেন আপনি অনেক কিছুই, কিন্তু জানতে আপনার হবে এখনও অনেক কিছু। জানবার কি শেষ আছে সত্যিই।'

বলব কি তোমাদের একটা আঠারো-উনিশ বছরের ড্যাকরা মেয়ে প্রায় ঘায়েল করে এনেছিল আমায়। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় বাঁচিয়ে দিলে টেলিফোনের ঘণ্টা। সেই একবার মনে আছে মনে মনে সত্যিই টেলিফোন যে আছড়ে ভেঙে ফেলবার যন্ত্র নয় তা সেই একবারই অনুভব করেছিলাম।

'হ্যালো—কে?'

'অনাদি? কি ব্যাপার?' আমার বন্ধু অনাদি ফোন করেছিলো সেই সময়ে নীচে থেকে। একটি মেয়ে আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে আমার ঘরে বসে থাকায় আমার মেজাজ কি হয়েছে বোধ হয় অ্যাসিসটেন্ট মারফৎ দরোয়ান অব্দি সে খবর পৌঁছে গেছে। নীচে থেকে টেলিফোনে আমাব সম্মতি না নিয়ে তারা আর কাউকে পাঠাতে রাজি নয় চাকরী খোয়া যাবার ভয়ে। না হলে অনাদিকে তারা জানে যে তাকে সোজাসুজি আমার ঘরে পাঠালে আমার দিক থেকে আপত্তি ওঠে না কোনদিন।

'ভাই—তোমায় বিরক্ত না করে পারলাম না। অনাদি বললে টেলিফোনে ঃ ছেলেটা তো গোল্লায় গেল।'

'সে তো অনেকদিনই গেছে—তার জন্যে আর নতুন করে ভাবা কেন? তোমার আমার ছেলে গোল্লায় যাবে না তো যাবে কাদের ছেলে?'

'না ভাই ঠাট্টা নয়। আমার একার ভাবনা হলে কিছুই ছিলো না। গৃহিণী তিষ্টোতে দিচ্ছে না একেবারে। ছেলের জন্যে মেয়ে দেখছে আর ছেলের কোন মেয়েটিকেই মনে ধরছে না। ডানাকাটা পরীও নয়। হাল-ফ্যাসানের এদেশ আর ওদেশের ককটেল করা সুন্দরীও নয়। তখন খোঁজ নিয়ে ব্যাপারটা জানলুম। একটি মেয়ে আমার ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়ে নিয়েছে। তোমাকে বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—'

'বুঝেছি, বুঝেছি, ওপরে এস—পুরোটা শুনি—'

ওপরে অনাদিকে ডেকে আনবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। মেয়েটির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সময়ের ঢাল মাত্র, যেখানে তার কথার তীর অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে যাবে, তারপর আড়ালে বসে আমি আর অনাদি তার ছেলের বিগড়ে যাওয়ার ঘটনা শুনব আদিকাণ্ড থেকে শুরু করে বর্তমান কাণ্ড পর্যন্ত, যতক্ষণে বিরক্ত হয়ে চলে যাবে আর তারপর—

মেয়েটিকে বললুম ঃ 'আপনি একটু পার্টিশানের ওপারে গিয়ে বসুন। আমার বন্ধু আসছেন একজন, জরুরী কথা আছে। সুরঞ্জনা পাশের ঘরে চলে গেল নির্বিবাদে। গেল এমন ভাবে যে আমার সমস্ত উৎসাহ নিবে এলো মুহূর্তে, তার উত্তাপ গেলো ঠাণ্ডা হয়ে। দুদিন খেটেখুটে স্টুডিওর বাইরে একটা সেট তৈরী করেছি—হয়ত বাড়িতে আগুন লাগাবার দৃশ্য—বরুণদেব আমার পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি ঢাললেন তার মাথায়, বললেন, আর দরকার নেই তখন মনের অবস্থা যেমন হয়—ঠিক তেমনি খারাপ মেজাজে বসে বসে আমি অনাদির অপদার্থতার আর আমার অতিরিক্ত আশাপরায়ণতার জন্য নিজেরই চুল একটি দুটি করে ছিঁড়তে লাগলাম।

অনাদি যা বললে তা থেকে বোঝা গেল ঃ তার ছেলে একটু বেশিরকম বাড়াবাড়িই আরম্ভ করেছে। বাড়ী থেকে রোজ সকাল দশটা সাড়ে দশটায় বেরোয় অনাদির এক স্টিভেডর শ্যালক আছে তার ওখানে কাজ শিখতে যাচ্ছে এই অজুহাতে—আর ফেরে রাত এগারোটার ওদিকে। অনাদি এতক্ষণ কি কাজ হয় জানবার জন্যে খোঁজ নিয়ে শোনে মাসে তিনদিন ও ঘণ্টাখানেকের জন্যে শ্যালকের জাহাজে যায় কিনা সন্দেহ, বাকী কদিন কাটায় অন্য জায়গায়। সেই অন্য জায়গার সন্ধানও অনাদি নিয়েছে। পতিতা নয় কিন্তু তার চেয়েও নাকি অধঃপতিতা এক মেয়েই কি করে না জানি তার ছেলেকে তুক করে বসে আছে।

'জান সুব্রত' অনাদি না থেমেই বলে, 'দুএকবার ঐসব খারাপ পাড়ায় সকলে মিলে একটু ফুর্তি-টুর্তির জন্যে যাওয়া আসা এমন কিছু নয়। কিন্তু যার পেছনে ছেলে ঘুরছে আমার, সে আরও মারাত্মক। ছাপ মারা নয় বলেই ভয়ের বেশি। এখুনি কিছু করতে না পারলে আর কিছু কখনই করা যাবে না।'

'কিন্তু আমি—আমি কি কোন কাজে আসবো এ-ব্যাপারে?'

'কেন, আসবে নাই বা কেন?'

'কারণ, ভালো ভালো পরিবারের ছেলে আর মেয়েদের প্রথম ফিল্মে এনে তাদের খারাপ করার বদনামই আমার আছে, বিপথে যাওয়া ছেলে কি আমার কথায় রাশ টানবে?'

'সে দেখা যাবে ঠিক সময়ে' অনাদি আমার আপত্তি গায়ে মাখলে না, 'তোমার কাছে আমার গৌণ কারণ এটা, মুখ্য কারণ হোল মেয়েটি তোমারই জগতের—অর্থাৎ ফিল্মে নামা ভদ্রঘরের মেয়ে।' 'কি রকম' ঝিমিয়ে ছিলাম, উঠে বসলাম ঃ 'কে?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, ইনি কোন কাননবালা নন এখনও, ইনি সবেমাত্র ঢোকবার চেষ্টা করছেন, এখনও বোধহয় চৌকাঠ পেরোন নি। এর নাম, অনাদি নামটা যেন মনে মনে আউড়ে নিল, তারপর পরিষ্কার ঘেন্নার সঙ্গে বললে, 'অপ্সরীটির নাম সুরঞ্জনা—সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়।'

বসেছিলাম, দাঁড়িয়ে উঠলাম।

'কি হে দাঁড়িয়ে উঠলে যে, চেনা কেউ নাকি?'

'হ্যাঁ—না—ঠিকানাটা জানো?'

'জানি—৫নং—একটা রাস্তার নাম বললে অনাদি। 'সে ঠিকানাটা বললে তোমরা সবাই এখুনি সুরঞ্জনার ওখানে দৌড়বে বলে, সেটা এখানে উহ্য রাখলাম—' সুব্রত একটু অপ্রস্তুত করল তার শ্রোতাদের।

বাইরে বৃষ্টির উন্মত্ত প্রলাপ শান্ত হয়ে এসেছে প্রায়। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে নিয়ে তার এক রাতের প্রেমিকরা কখন উঠে গেছে আমরা খেয়াল করিনি। 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কোলকাতা নিস্তার দিয়েছে তার শ্রোতাদের ঘণ্টা দশেকের মত। বয়েরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হোটেলের মালিক এসে গেছে ক্যাশ মিলিয়ে নেবার জন্যে। টেবিলের ওপর মদের গেলাসের দাগ গোল হয়ে পড়েছিল যেখানে চার পাঁচটি, সেখানে এখন অসংখ্য চক্রাকার। একটি বেড়াল কাঁদছে হোটেলে ওঠবার একটুখানি রকে ল্যাজ গুটিয়ে বসে, অসময়ের ঠাণ্ডা অপ্রস্তুত আমাদের আদ্দির পাঞ্জাবীকে ঠাট্টা করে হাড়ে হাড়ে পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দ্যাখাচ্ছে, ওপারের ফুটপাথে নিওন সাইনটা তখনও একবার জ্বলছে আর আরেকবার নিবছে আর তারপর আবার জ্বলছে। 'দু'একটি গাড়ি জল ঠেলে চলবার চেষ্টায় নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে হোটেলের ভেতর পর্যন্ত। রিক্সার চালক আমাদের গল্পের পেছনে বাংলা সিনেমার ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিকের মত যখন তখন বেপরোয়া টুং টাং আওয়াজ করে বছরের অসময়ের ফল পাওয়ার মত বৃষ্টির রাতে চড়া দামের খদ্দেরকে জল ঠেলে পার করবার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত।

সুব্রত বললে ঃ অনাদি চলে গেল এবং মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। কথাগুলো শুধু শুনেছে নয় গিলেছে বলে মনে হোল। কিন্তু এতটুকু অপ্রস্তুতির বা ধরা পড়ে যাওয়ার ভাব নেই মুখের কোথাও। মনে হোল মেয়েটি অভিনয়ের সম্বন্ধে যত লম্বা চওড়া কথা এতক্ষণ শোনাচ্ছিল বোধ হয় তার সবটাই মিথ্যে নয়। সে সময় তাকে আমার একজন খেলোয়াড় অভিনেত্রী ছাড়া আর কিছু ভাবার কোনও কারণ ছিল না।

মেয়েটি আবার এসে আমার মুখোমুখি বসলে। কথা বলতে শুরু করা মাত্র লক্ষ্য কোরলাম এবারে গলার স্বর ভারি। চোখের পাতা চিকচিকিয়ে উঠছে। পাকা দাবা

খেলোয়াড় চালবার আগে যেমন শেষ বারের মত আরেকবার যাচিয়ে নেয় তেমনি আমার দিকে একবার চোখ দুটো বুলিয়ে নিয়ে সেই মেয়েটি বললে ঃ বিশ্বাস করুন যে কটি কথা ওই ভদ্রলোক বলে গেলেন তার একটিও সত্যি নয়।

'আপনার নাম আর ঠিকানাটা—সেটাও মিথ্যে বলেছেন—' একটা কাগজে সুরঞ্জনা তার নাম আর ঠিকানাটা লিখে টেবিলের ওপর রেখেছিলো। আমি না এলে আপিসে, আমার জন্যে রেখে যাবে বলে, সেটা হাতে তুলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'না, ও ছাড়া আরো একটি কথা উনি ঠিক বলেছেন, ওঁর ছেলের ব্যাপারটা বিশ্বাস করুন ওঁর ছেলের মাথা আমি বিগড়োইনি। ওঁর ছেলেই আমার মাথা প্রায় খারাপ করে দেবার উপক্রম করেছে।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করবার কারণটা কি?'

'কারণ আপনাকে ভরসা করে বলতে সাহসে কুলোচ্ছে না, তবুও বলব আপনি যদি আমার বাড়িতে একবার যান তো অন্তত এইটুকু আমি বোঝাতে পারব যে প্রেম করবার মত মানসিক অবস্থাও আমার নেই—'

'বলব কি তোমাদের ভাই' সুব্রত উঠে বসলে, মেয়েটি আমায় পাক্কা আধঘণ্টা একটি বক্তৃতা দিলে যার সারমর্ম শুনে আমার চোখ কপালে উঠে গেলো। সুরঞ্জনার পেছনে অনাদির ছেলে না কি আজ প্রায় আড়াই বছর ঘুরছে। প্রথম দেখা হয় একটি মহরতে তারপর থেকে গত কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি দিনও সে বাদ দেয়নি সুরঞ্জনার কাছে যেতে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, একটা সন্ধ্যে গেলে আর একটা সন্ধ্যেয়। একটি দুপুরের জন্যেও নিষ্কৃতি দেয়নি সুরঞ্জনাকে। একটি অপরাহ্নও সায়াহ্নে গড়িয়ে যেতে দেয়নি অনাদির ছেলে, যেদিন সে তার আর্জি থেকে রেহাই দিয়েছে সুরঞ্জনাকে, কোনদিন সুরঞ্জনার চোখকে সরিয়ে নিতে দেয়নি তার চোখ থেকে। একবারও মনে হয়নি তার যথেষ্ট করে বলা হয়েছে সেই একটিমাত্র বক্তব্য ঃ আমাকে তুমি বিয়ে করবে সুরঞ্জনা? প্রথম প্রথম তাকে বোঝাবার চেষ্টা যে করেনি তা নয়। সুরঞ্জনা বলেছে বিয়েতে মা-বাবার মত আছে কিনা আর সে যখন একমাত্র ছেলে অনাদির। সুরঞ্জনা তার নিজের যক্ষ্মারোগী ভাইয়ের কথা, বিধবা মায়ের কথা বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে বিয়ে করে সুখী হবার জন্যে সে জন্মায়নি। তবু, তবুও অনাদির ছেলে ঘুরেছে একটি হরিণীর পেছনে যেমন করে জয় করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ ধৈর্য্যের বাঁধ যার কখনো আলগা হয়নি সেই পুরুষ হরিণের মত, যাবার যারা তাদের যেতে দাও বলে হরিণীর জন্যে একা অপেক্ষা করে যে, যতদিন যতক্ষণ পর্যন্ত না হরিণী তার সম্মতি দেয়। সুরঞ্জনা অন্য মেয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে ছেলেটিকে। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত মেয়ে। সুরঞ্জনা যাদের পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয় যৌবনের জৌলুষে। ছেনালীর আর্টে। কিন্তু না। মাথা ঘোরেনি অনাদির ছেলের। মাথা বিকিয়ে দিয়েছে সুরঞ্জনার পায়ের কাছে। তারপর সুরঞ্জনা বুঝেছে এ-পাগলামী সারাবার নয়। সরাবারও নয়। অনাদির ছেলে জীবনের অন্যান্য অভিশাপের মত একটি অভিশাপ। অনাদির ছেলের হাত থেকে বাঁচলে সুরঞ্জনা ভাগ্যের আর সব পরিহাসকে সারাজীবন ধরে স্বীকার করতে রাজি। কিন্তু সুরঞ্জনা রাজি হলে কি হবে? তাকে ছাড়তে রাজি নয়। কি বলব? অনেকটা অনাদির ছেলের মত হিপনটাইস্‌ড্ হয়ে গিয়ে কথা দিলাম। 'অনাদি আর আমি কাল যাব তোমার ওখানে। যাহোক একটা হেস্ত-নেস্ত কিছু করব।'

এবং তার পরদিন গেলাম। যে-পল্লীতে আমার সেভ্রোলে গিয়ে ঢুকল সে পথে দিনের বেলায় কোনও ভদ্রলোক ঢুকবে না অনাদির ছেলেকে বাদ দিলে। সেখানে রাতের অভ্যাগতরা হয়ত আসে দিনের হতাশা ভুলতে। রাতের পরীরা চুনকাম করে দাঁড়ায় গলি

জানলায় সারি দিয়ে, হাসে, পান খায়। বিড়ি ফোঁকে। পানের দোকান থেকে গানের কলি উড়ে আসে, চটুল ছন্দের হাল্কা বিকৃত উচ্চারণের গান। আর হয়ত যুদ্ধ বাধলে আসে জীপ গাড়ি খাকি পোষাকে ক্ষুধিত জানোয়ারদের বয়ে নিয়ে। অনাদির সঙ্গে এখানে আসতে আমার মত নির্লজ্জ বেপরোয়া লোকেরও বাধ-বাধ ঠেকছিল। এ-কথা কবুল করতে লজ্জা পাচ্ছি না। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন দিনের আলো ম্লান হয়েও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। রাতের অন্ধকার গ্যাস-লাইটের তলায় এসে দাঁড়ায়নি। পল্লীমঙ্গল আসর সবে মাত্র শুরু হয়েছে। কুলপী বরফওয়ালা একটা হেঁকে যাচ্ছে যেমন হেঁকে যায় সে রোজ।

ঠিকানা মিলিয়ে দরজায় কড়া নাড়তে যে আমাকে অভ্যর্থনা করলে তাকে প্রথম দেখে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম। মেয়েমানুষের চেহারা এত বীভৎস হয় ফিল্মলাইনে থেকেও তা আমার কল্পনার অনেক বাইরে ছিলো। চোখ ঢুকে গেছে প্রকাণ্ড দুটো কুয়োর মত গর্তের মধ্যে। মুখের খানিকটা ধবল আর খানিকটা কালো মিলিয়ে জমকালো। নাকের পাশে আবের মত কালো আঁচিল একটা। হাতের চামড়া কুঁচকে কোথাও ধবলের জন্যে সাদা হয়ে কালো রংকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। তারই চাপে কি বয়সের ভারে মেয়েমানুষটি কুঁজো হয়ে গেছে অনেকটা। টকটকে লাল গামছা কি শাড়ি বোঝা যায় না। তার চেহারার চেয়ে বীভৎস যদি কিছু সম্ভব হয় তো সে তার গলা। অত্যধিক শরীর দেওয়া-নেওয়ায় শুনেছি মেয়েদের কণ্ঠস্বরে একটা পুরুষালি বিকৃতি আসে, অসম্ভব মোটা হয় তাদের গলার স্বর। আর মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। তখন বেরিয়ে পড়ে মেকি আওয়াজ। মনে হয় মেঝের ওপর দিয়ে কে ঘষড়ে নিয়ে যাচ্ছে ধারালো টিনের সিট। নার্ভে গিয়ে লাগে তার কাতরানি। খানিকক্ষণ শুনলে পাগল হয়ে যেতে বাধে না।

কাকে চাই?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ফিরে যাবো কিনা ভাবছিলাম। অনাদি ফস করে জিজ্ঞেস করলো ঃ সুরঞ্জনা বলে কেউ থাকে এখানে?

থাকে না আবার—খুব থাকে—জোর করে থাকে ; তিন মাসের ভাড়া না দিয়ে থাকে।

আছে সে?

না—সন্ধ্যাবেলায় তার মানুষ আসে যে--তার পেয়ারের রাজপুত্তুর গো—নষ্ট মাগী লুটছে তো সেই ভালো মানুষরা দু'হাতে ; আমার ভাড়াটাও যদি দিত—উল্টে আমাকেই হুমকী দেয় গো—বলে উঠে যাবে। তা উঠে যা না ছুঁড়ি—মুরোদ দেখি—তিন মাসের ভাড়া বাকী রাখলে কে না গলায় ধাক্কা দেয় দেখি।

অনাদি সুরঞ্জনার পেয়ারের রাজপুত্তুরের কথা শুনেই মুখ চোখ লাল করেছে। বুঝলাম রাজপুত্তুরটি কে? সে এবারে ফিরে দাঁড়ালো। আমি কিন্তু বললাম ঃ সে যে আসতে বলেছিলো আমাদের। ফিরবে কখন? তা ভগবান জানেন।

জেদ চেপে গিয়েছিল। আমার মর্যাদায় ভীষণ ঘা দিয়েছে সুরঞ্জনা। আমায় সে ভুগিয়েছে। হেস্তনেস্ত করে যেতেই হবে। ওপরে উঠলাম বাড়িওলীর সঙ্গে। ঘর খুলে দিয়ে সে আমাদের সাথেই ভেতরে এলো। আলো জ্বেলে দিলে কেরোসিনের ডিবেয়। সমস্ত ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। অসুস্থ রুগীর হতাশার মত ম্লান বিষণ্ণ ঘরের আবহাওয়া। অসঙ্গতি শুধু একটা হারমোনিয়াম। ময়লা জামা কাপড় দড়ির ওপর, একটা বেড়াল পেচ্ছাব করে গেছে—উৎকট গন্ধে নাকে রুমাল না দিয়ে বসা অসম্ভব। দই-মাখা চিঁড়ের একটা রেকাবীর ওপর মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে তখনও। ঘরের বাইরে অন্ধকার বারান্দা। খাটের ওপর ময়লা চাদর আরো ময়লা একটা তাকিয়া। গোটা দুই ওয়াড় খোলা বালিশ। একটা চ্যাপ্টা সস্তা কাঠের আলমারী—যার দরজাটা হাঁ করে আছে অসহায় দারিদ্র্যের মত।

মেঝের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া টিনের কাৎরানির মত মোটা থেকে হঠাৎ সরু

পর্দায় নেমে আসা বাড়ীউলির গলায় তখনও সুরঞ্জনার প্রতি ঝাঁঝ উড়ে যায়নি। বাড়ীউলী বললে :

'ঢের ঢের মেয়েমানুষ এলো আর গেলো, এমনটি আর দেখিনি। আবার বললে ভদ্দরনোকের মেয়ে। ভদ্দরনোকের মাথায় মারি ঝাড়ু! শরীর দিয়েছি আমরাও। বুড়ো মানুষকে মিছে কথা বললে ধম্মো অধম্ম নেই? মেয়েমানুষের শরীরে এত অধম্মো সইবে ভগবান। মুখে পোকা পড়বে বলে রাখলুম নইলে আমার নাম অন্নদা বাড়িউলী নয়।'

নীচে একটা আওয়াজ হতে অনাদি উঠে গেলো বারান্দায়। ফিরে এলো কিছু না বলে। বুঝেছিলাম প্রতি মুহূর্তে তার ভয় হচ্ছে এই বুঝি সুরঞ্জনাকে নিয়ে তার ছেলে ঘরে এসে ঢোকে।

বাড়িউলী আশ্বস্ত করলে তাকে না জেনে : রাত বারোটার আগে ছুঁড়ী ফিরবে? শরীরও দিয়েছে ছুঁড়ীকে ভগবান। রাতে ঘুমোয় না দিনেও টো টো করে কোথায় ঘুরে বেড়ায়। বিরিশ্রাম নেয় না এতটুকু। না জানি কি রাজকায্যি আছে মর্দমাগীর। বলি কোথায় ঘুরিস এতোবেলা অব্দি? জবাব দেয় না, হাসে। জবাব দেবার আছেই বা কি। ওর মনের মধ্যে সিঁধোবার কার সাধ্যি। পেটের কথা যে মুখ দিয়ে বার করে না সে আবার মেয়েমানুয।

রাত্তির নটায় পায়ের আওয়াজ পেলাম সিঁড়িতে। ঘরে ঢুকল যে, সে অনাদির ছেলে।

সুরঞ্জনা কোথায়—অনাদি বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল।

সুরঞ্জনা? অনাদির ছেলে অবাক হল। বাড়িউলী অনাদির ছেলেকে দেখেই লাফিয়ে উঠল। খাটের কোণায় মাথা লাগতেই পড়ে গেল মাটিতে আর মাথা থেকে যেটা খসে গেল সেটা পরচুলা। নাকের পাশ থেকে আঁচিলটা ছিটকে গেল।

আমার হৃৎপিণ্ড বোধকরি গলার কাছে এসে আটকে গেছে।

কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সুরঞ্জনা না?

হ্যাঁ, আর বলে দিতে হবে না—সেই চেহারা। সেই কালো পুরু ঠোঁটের ওপর আরো কালো ছোট্ট তিল। ছেঁড়া জামার দু'ফাঁক দিয়ে অন্ধকার রাতে দুটি দুরন্ত হেড লাইটের বারণ কি আমন্ত্রণ বোঝায় যায় না, আর—

[৩য় বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ,১৩৫৭]

দেবতার গ্রাস

জাহাজের রেলিং থেকে ঝোঁকার ফলে একজন তরুণী জলে পড়ে যায়। পরের মুহূর্তে তাকে বাঁচাবার জন্যে যে লাফিয়ে পড়ল জলে জাহাজের সব লোকের মধ্যে বয়সে সেই সব চেয়ে বড়। তার বীরত্বের জন্যে রাতে ডিনার দেওয়া হলো। ডিনারে বৃদ্ধকে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করা হলে বৃদ্ধ বললেন উঠে : আমার কিছু বলবার নেই ; শুধু জানবার আছে একটা কথা।

কি কথা, বলুন—সমস্বরে প্রশ্নের ঐকতান ওঠে ;

'কে আমাকে জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল?'

রুবি রায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

'এসো আলাপ করিয়ে দিই, ইনি শ্রীমতী রুবি রায়। আমাদের পাশের ঘরের প্রতিবেশিনী। বোম্বাইর মস্ত বড় একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মস্ত বড় এজেন্ট। তুমি যাকে যমের মত ভয় কর। নাও ভাই রুবি, নতুন একটি পার্টি তোমাকে জুটিয়ে দিলাম। এখন আমার কপাল আর তোমার হাত যশ।'

আড়চোখে স্বামীকে একবার দেখে নিয়ে উমা বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

রুবি নমস্কারের জন্য দু'খানা হাত জোড় করে লীলায়িত ভঙ্গীতে নিজের চিবুক পর্যন্ত তুলল তারপর মৃদু হেসে বলল, 'পরিচয়টা একতরফা হোল। কারণ স্বামীর নাম উমা মুখে আনে না, মনে মনে জপ করে। কিন্তু ও না বললেও আপনার নাম আমি শুনেছি বিভাসবাবু। আপনি তো এই ইণ্টালী অঞ্চলে রীতিমত একজন নামকরা লোক।'

বিভাস প্রতিনমস্কার করে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর বান্ধবীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল। নমস্কারের জন্য যে হাত দুখানা রুবি তুলেছে তার আঙ্গুলগুলিকে চাঁপার কলির সঙ্গেই হয়ত তুলনা করা যেত, কিন্তু প্রত্যেকটি নখের বিজাতীয় খয়েরী পালিশে বিভাসের চোখকে পীড়িত করল। সুন্দর পাতলা ঠোঁট দুটিতে যে হাসিটুকু এখনও লেগে রয়েছে তাও বিভাসের অপরূপ মনে হতে পারত, কিন্তু রুবির ঠোঁটে শুধু হাসিই নেই, সেই সঙ্গে চড়া রঙের লিপস্টিকও রয়েছে। ঈষৎ লম্বাটে ধরনের মুখের ডৌলটিরও স্বাভাবিক রঙ আর সৌন্দর্য পাউডারের অতি স্পষ্ট প্রলেপে ব্যাহত। আয়ত সুন্দর কালো চোখ দুটিতেও এই বেলা দশটার সময় সুর্মা টানবার কোন প্রয়োজন ছিল বলে বিভাসের মনে হোল না, বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটু কালো ফিতায় একটি ক্ষুদ্রাকার ঘড়ি ছাড়া আর কোন বন্ধন নেই, কিন্তু কানে আর গলায় আভরণ আছে, তার প্রগাঢ় রক্তচ্ছটা প্রবালের নয়, প্লাস্টিকের। পরনেও চড়া রঙের জর্জেট। কাঁচুলির অতিরিক্ত কারসাজি ছাড়া বাংলাদেশের চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়ের বক্ষচূড়ও উত্তুঙ্গ রাখা সম্ভব নয়।

বিভাস ভ্রূকুঞ্চিত করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রুবির কথার জবাবে গম্ভীর ভাবে বলল, 'এ পাড়ায় মাস ছয়েক আছি। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ আমার নাম ধাম জানবেন সেই তো স্বাভাবিক। তার জন্য নাম করা লোক হবার প্রয়োজন হয় না। নামকরা লোক আমি নইও।' বিভাসের ভ্রূভঙ্গি রুবির চোখ এড়ায়নি। প্রথম আলাপেই তার বিরূপ ভাবভঙ্গি রুবির মনকেও অসহিষ্ণু করে তুলেছে। কিন্তু মনের উত্তাপকে বাইরে প্রকাশ করতে না দিয়ে সে এবারও মৃদু হাসল। 'কেন যে এতদিন আপনি নাম করেননি তাই ভেবে অবাক হচ্ছি।'

বিভাস এবার বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন, অবাক হবার কি আছে?' রুবি বলল, 'কিছু আছে বইকি। নেতৃত্বের প্রত্যেকটি লক্ষণ আপনার চোখ মুখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।' রুবির ঠোঁটের চাপা হাসিতে শ্লেষ আর ব্যঙ্গ অপরিস্ফুট ছিল না।

কিন্তু বিভাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে শান্ত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সে লক্ষণগুলি কি?'

রুবি বলল, 'ওমা তাও জানেন না! কেন উমা কোনদিন বলেনি আপনাকে? না, আপনিই বলুন শুনি।'

'আপাততঃ অফিসের সময় বয়ে যাচ্ছে।' রুবি বলল, 'আচ্ছা পরে এসে শোনাব। উমা, আমি ভাই এবার বেরিয়ে পড়ি। এই ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টি আজ আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'

জানলা দিয়ে বাইরের বৃষ্টির দিকে একটু তাকিয়ে উমা চোখ ফিরিয়ে আনল, 'কিন্তু কি করে বেরুবে। এইনা বললে তোমার ছাতাটা ভাঙ্গা।'

রুবি বলল, 'তা হোক। যেটুকু আছে তাতেই বেশ কাজ চলে যাবে।'

রুবি বেরুবার উপক্রম করল।

উমা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি তো ভারি স্বার্থপর রুবি। তোমার তবু একটা ছাতা আছে। কিন্তু ওঁর যে তাও নেই। উনি কি করে বেরুবেন। এত করে বলি হয় একটা ছাতা, না হয় রেইন কোটটোট কিছু একটা কিনে নাও। ট্রাম লাইন থেকে এত দূরে যখন আসা। আর যত রাজ্যের বৃষ্টি সব যেন এবার কলকাতার শহর ছাড়া নামবার জায়গা পাচ্ছে না।'

রুবি হেসে বলল, 'তা তো ঠিকই। আষাঢ় মাসের বৃষ্টিরই যত দোষ। কিন্তু স্বার্থপর ছাড়া আমি কতখানি পরার্থপর হতে পারি বলতো। এক ভাঙ্গা ছাতার তলায় দুজনে না হয় ভিজতে ভিজতে যেতে পারতাম। কিন্তু ঝগড়া করতে করতে তো আর যেতে পারি না। তাতে দুজনেই লেট হব। তার চেয়ে বিভাসবাবুকে আজ ঘরেই আটকে রাখ, সেই ভালো।'

রুবি আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল। উমা জানলা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে বলল 'তার চেয়ে এক কাজ কর না। মোড় থেকে একটা রিক্সা ডেকে আন, দুজনেই একসঙ্গে যেতে পারবে।

রুবি যেতে যেতে বলল, 'আচ্ছা, রিক্সা যদি চোখে পড়ে পাঠিয়ে দেব।'

খানিক বাদে রুবি চোখের আড়ালে চলে গেলে উমা বলল, 'কেমন? কি রকম মেয়ে একখানা দেখলে তো? বোকা না হোক, তোমাকে একেবারে বোবা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটি কথাও বলতে পারলে না। তুমি পার কেবল আমার সঙ্গে।' বিভাস গম্ভীর ভাবে বলল, 'হুঁ।'

স্বামীর ওপর এবার একটু যেন মায়া হোল উমার, বলল, 'অবশ্য তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। তুমি কেন, কেউ পারে না ওর সঙ্গে। ওর কীর্তিকলাপ যদি শোন তুমি থ হয়ে যাবে। ও তো মেয়ে নয়, পুরুষের বাবা।'

বন্ধুগর্বে একটু দীপ্ত দেখাল উমাকে।

বিভাস স্ত্রীর দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'দেখ তোমাকে একটা কথা বলি। মেয়েদের সঙ্গে যত ইচ্ছে মেশো, পুরুষের সঙ্গেও যত খুশি মেশো, কিন্তু যে মেয়ে পুরুষের বাবা তার সঙ্গে মিশে মোটেই দরকার নেই। মেয়েটি আসলে ইঁচড়ে পাকা।'

উমা এবার প্রতিবাদ করে বলল, 'আ হাহা ওর মধ্যে ইঁচড় আবার কোথায়? এখনো বিয়ে করেনি বলে মুখের অমন কচি কচি ভাবটুকু আছে। কিন্তু তাহলে হবে কি বয়সে আমার চেয়ে ও দু'এক বছরের বড় ছাড়া ছোট হবে না। ইঁচড় নয়, একেবারে গোলগাল পাকা কাঁঠাল। তবে সারা গায়ে কাঁটা। আদর করে যে কেউ একটু গায়ে হাত বুলাবে তা জো নেই। যত মুস্কিল সেইখানে।'

বিভাস ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ থাম। সঙ্গের মাহাত্ম্য এরই মধ্যে ফলতে শুরু করল দেখছি। খবরদার কাঁঠালের আঠা যেন গায়ে আর না বেশি জড়ায়।'

উমা হেসে বলল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। আমার গায়ে আঠা জড়িয়ে আর কত ক্ষতি হবে। তেল সাবানে ঘষে ঘষে, আঠা তুলে ফেলবার লোক তো রয়েইছো, আমার আর ভয় কি?'

দোরের সামনে ঠুন ঠুন করে একটা রিক্সাওয়ালা এসে দাঁড়াল "বাবু"। উমা বলল, 'ওই

দেখ, তুমি তো রুবির কত নিন্দা করলে। আর ও তোমার জন্যে সত্যি সত্যিই একটা রিক্সা পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখ কিরকম ভদ্র।'

বিভাস ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'আবার মিছিমিছি একটা রিক্সা আনালে কেন বল তো, অনর্থক আনা চারেক পয়সা খরচ হবে। বৃষ্টি কমে এসেছিল, এইটুকু পথ তো হেঁটেই যাওয়া যেত।'

পাশের ঘরে বিভাসের দেড় বছরের ছেলে বাবলু কেঁদে উঠল। 'তোমার ছেলেকে এবার নাও উমা। কিছু খাওয়াও টাওয়াও এবার। পেটে কিছু না থাকলে কি আর চোখে ঘুম আসে।'

বলতে বলতে ছেলে কোলে নিয়ে উমার পিসি শাশুড়ী সুরবালা এসে ঘরে ঢুকলেন। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি তাঁর পরনে। বয়স পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে, পাক ধরেছে চুলে। আর সেই পাকা চুলের সিঁথির মধ্যে সিঁদুরের প্রশস্ত রেখা দেখা যাচ্ছে। হাতে শুধু দু'গাছি মোটা শাঁখা। আর কোথাও কোন আভরণ নেই। পানের রসে ঠোঁট দুটি লাল। ভারি সুন্দর মানিয়েছে। একটু আগে দেখা রুবির রক্তবর্ণ ঠোঁটের কথা মনে পড়ল বিভাসের। সে রঙের চেয়ে পিসীমার ঠোঁটের রঙ অনেক সুন্দর, অনেক স্বাভাবিক। আর যত বয়স বাড়ছে ততই যেন বেশি সুন্দরী, আর স্নেহশীলা হয়ে উঠছেন পিসীমা। দীর্ঘশ্বাস চেপে বিভাস গিয়ে রিক্সায় উঠল। উমা পিসীশাশুড়ীর কাছ থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে একটু আড়ালে চলে গেল।

সুরবালা দোরের পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'ও বিভু, সামনের ঢাকনিটা ফেলে নে না? জলের ছাট লাগে না গায়ে?' বিভাস মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, 'না পিসিমা মোটেই ছাট লাগে না। তুমি যাও ভিতরে।'

সুরবালা আবার বললেন, 'বাদল বৃষ্টির দিন। সকাল সকাল ফিরে এসো। কালকের মত রাত কোরো না বাপু।'

বিভাস স্মিত মুখে বলল, 'না পিসিমা রাত হবে না তাড়াতাড়ি ফিরব।'

গলি ছাড়িয়ে রিক্সা মিডল রোডে পড়ল। আর চিলড্রেনস্ পার্কের ঠিক কোণটায় এসে বিভাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রুবির। ছোট ভাঙা ছাতাটা কোন রকমে মেলে ধরে প্রায় ভিজতে ভিজতে রবি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটু ইতস্ততঃ করল বিভাস। তারপর রিক্সা-ওয়ালাকে একটু থামতে বলে রুবিকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভিজে লাভ কি? রিক্সায় আসুন।'

রুবি একবার যেন চমকে উঠল, তারপর বিভাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ধন্যবাদ।'

কিন্তু রিক্সায় উঠল না।

সার্কুলার রোডের মোড়ে রুবির চেয়ে দু'তিন-মিনিট আগেই অবশ্য এসে পৌঁছল বিভাস। কিন্তু অত্যন্ত ভিড় থাকায় প্রথম ট্রামটা ধরতে পারল না। পরের ট্রামে ভিড় একটু কম। উঠতে গিয়ে দেখে তার আগেই রুবি এসে হাতল ধরেছে।

বসবার জায়গা নেই। একটি লেডীজ সীট মার্কা বেঞ্চে দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। রুবিকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। রুবি জানলার দিকটায় বসে বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসুন।'

বিভাস মাথার ওপরকার রডটা হাত বাড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল, 'ধন্যবাদ।'

রুবি মুখ মুচকে একটু হাসল তারপর যে দুজন ভদ্রলোক আসনচ্যুত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী আরোহীটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে পরম সৌজন্যে বলল,

'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি। আপনি বসুন এসে।'

যুবকটি কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে রুবির পাশে গিয়ে বসল। তার সঙ্গী প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টিতে তার দিকে একটু তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। এমন কি মুহূর্তের জন্যে বিভাসের মুখও একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল।

শম্ভুবাবু লেনের যে পুরনো একতলা বাড়িটায় উমারা আজ মাস পাঁচ ছয় ধরে রয়েছে তার দক্ষিণ দিকের দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে মাত্র দিন চারেক হোল উঠে এসেছে, রুবিরা, ঠিক রুবিরা বলা যায় না শুধু রুবিই আছে। প্রথমে ওর সঙ্গে সাতাশ-আটাশ বছরের মোটাসোটা সাধারণ দর্শন আরও একটি যুবক এসেছিল, ওদের আলাপ-আলোচনা থেকে উমা টের পেয়েছিল ছেলেটি রুবির দাদা। কিন্তু ভাইবোনের মধ্যে যতখানি স্নেহ আর সৌহার্দ্র সাধারণতঃ থাকে এদের ভিতরে যে তা নেই তাও অনুমান করতে উমার দেরি হয়নি। সকাল থেকেই দুজনের মধ্যে কথায় কথায় খিটিমিটি শুরু হয়েছিল। সন্ধ্যার পর সেই খিটিমিটি দাঁড়াল ঝগড়ায় আর রাঁধতে রাঁধতে উমা নিজেদের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অবশ্য উৎকর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল না ওরা যত জোরে কথা বলছিল, পর্দা ফেলা জানলার কাছে এসে না দাঁড়ালেও তা উমার কানে যেত।

রুবির দাদার গলা শোনা গেল, 'তোর বৌদিকে নিয়ে এখানে আমি উঠতে রাজী আছি, কিন্তু আমার কথামত তোকে চলতে হবে। তুই যে যা খুশি তাই করে বেড়াবি--'

রুবি বাধা দিয়ে বলল, 'আমি তোমার আর বউদির খুশি অনুযায়ীই চলব, কিন্তু বাসা খরচ টুথার্ড তোমাকে দিতে হবে আর বাড়িতেও নিয়মিত টাকা পাঠাতে হবে, রাজী আছ?'

রুবির দাদা বলল, 'আর তোর টাকা বুঝি সিনেমা থিয়েটার দেখে ফুর্তি করে ওড়াবি?'

রুবি বলল, 'না সিনেমা থিয়েটারও যদি তোমরা দেখাও তা হলেই দেখব। তোমাদের অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে আমি আর পা বাড়াব না, চাকরিবাকরি সব ছেড়ে দেব। বউদির সঙ্গে সঙ্গে কেবল রাঁধব আর চুল বাঁধব।'

রুবির দাদা বলল, 'তা তুই মরে গেলেও পারবিনে, চাকরি ছাড়লেও স্বভাব ছাড়বি কি করে?'

রুবি বলল, 'তা ঠিক। স্বভাব যখন ছাড়তে পারব না তখন চাকরিটাও নাই ছাড়লাম। কিন্তু তাই বলে সেবারের মত সমস্ত খরচ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে তুমি যে হাত উঁচু করে বসে থাকবে তা হবে না। এ সম্বন্ধে গোড়া থেকেই একটা কথাবার্তা বলে নাও দাদা।'

রুবির দাদা উত্তেজিত ভাবে বলল, 'না কোন কথা নয়। তোর সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। কেবল টাকার খোঁটা, কেবল টাকার খোঁটা। না, তোর সঙ্গে এক বাসায় আমার থাকা হবে না। নিরঞ্জন রায় কারো কাছ থেকে অমন খোঁটা শুনবার লোক নয়। তার চেয়ে আমি যেভাবে আছি সেই ভালো। দূরে দূরে থাকাই উচিত। চোখের সামনে তুই যে যা খুশি করবি, বয়ে যাবি, তা আমি সইতে পারব না।'

রুবি বলল, 'সেই ভালো, তোমার স্বার্থপরতাও দিন রাত মুখ বুজে সয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

নিরঞ্জন এবার উঠে দাঁড়াল, 'স্বার্থপর? বেশ। সেই কথাই ঠিক। তোর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে, তোকে যা খুশি তাই করতে দিয়ে আমি অমন পরার্থপর হতে চাইনে। আমি চললুম।'

রুবি বলল, 'সেকি খেয়ে যাবে না? আমি তোমার চাল নিয়েছি যে।'

'তোর বন্ধুবান্ধবদের তো অভাব নেই। তাদের কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াস।'

বলে নিরঞ্জন দোর খুলে বেরিয়ে গেল।

পরদিন উমা গিয়ে রুবির সঙ্গে আলাপ করল, 'আপনার দাদা বউদির আসবার কথা

ছিল। ওঁরা এলেন না?'

রুবি বেরুবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, একটু হেসে বলল, 'না, তাঁরা আর আসবেন না এখানে।'

উমা বলল, 'সেকি, আপনি একাই থাকবেন নাকি?'

রুবি তেমনি হেসে বলল, 'একা আর কই? আপনারাই তো রয়েছেন।'

উমা বলল, 'তা তো আছিই, তবু ভয় করবে না আপনার?' রুবি বলল, 'না। আপনাদের ভয় না করলেই বাঁচি। মোটেই ঘাবড়াবেন না। যত একা ভেবেছেন আমাকে ততখানি একা আমি নই। দু'একদিন বাদেই দেখবেন আমার অগুনতি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব এসে নিত্য দুবেলা খোঁজখবর নিচ্ছে। একা থাকতে চাইলেই কি একা থাকা যায় নাকি একা থাকতে দেয় কেউ?'

উমা বলল, 'আপনি কি একা থাকতেই ভালোবাসেন না কি? তাহলে তো আমারও আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা চলে না। হয়ত এসে আপনাকে বিরক্তই করলাম।' চলে যেতে উদ্যত হোল উমা।

সঙ্গে সঙ্গে রুবি এসে তার হাত টেনে ধরল। 'তুমি তো আচ্ছা মেয়ে যা হোক। আত্মাভিমানে আমার চেয়েও এককাঠি বাড়া। বোসো বোসো।'

বলে জোর করে উমাকে রুবি নিজের তক্তপোষে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এত সহজে ছাড়ছি না। এই দেখ তুমি বলে ফেললাম। সমবয়সীদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের বেশী আপনি আপনি করা আমার ধাতে পোষায় না।'

উমা হেসে বলল, 'পোষাতে যে হবেই এমন তো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। তুমিই ভালো।'

রুবিও হাসল, 'আমি তো ভালোই। তুমিও ভালোই।'

উমা বলল, আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

রুবি হেসে মাথা নাড়ল, 'উহুঁ, জগৎটাকে যত সোজা মনে করছ তত নয় ভাই। কিন্তু তার জন্য আফসোসও আমার নেই। বরং সোজা হলেই দুঃখ হোত। সহজ কোন কিছু আমার পছন্দ হয় না, এই অষ্টাবক্র মুনিই বরং ভালো। এর বাঁকে বাঁকে রঙ বাঁকে বাঁকে রস।'

উমা মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রুবির দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই বিচিত্র রঙ আর রসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তারপর থেকে এই অসামান্যা মেয়েটির কথা উমা স্বামীকে অনেকবার বলেছে। আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছে বান্ধবীর সঙ্গে। কিন্তু বিভাসের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। উমার যত উৎসাহ উদ্দীপনাকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে বিভাস বলেছে, 'তোমার এই অসামান্যাদের সাক্ষাৎ আজকাল পথেঘাটে মেলে। উনি যে কোন্ কোন্ দিক থেকে অসামান্যা তা আমার বুঝাতে বাকি নেই। বাইরে যাদের অত চটক—'

উমা বাধা দিয়ে হেসে বলেছে, 'আচ্ছা তুমি কি! দুনিয়ায় সকলেই তোমার মত সাদাসিধে ভাবে থাকবে, সাজসজ্জা করবে না, পোশাক আসাক পরবে না, তাই কি তুমি চাও নাকি?' বিভাস জবাব দিয়েছিল, 'চাইলেই যে হয় না, তা জানি। কিন্তু আর কারো ওপর জোর না থাক তোমার ওপর তো আছে। সেই দাবীর জোরে তোমাকে আমি নিজের পছন্দ মত করে গড়ে তুলব।'

উমা বলেছিল, 'গড়ে তুলতে এখনও বাকি আছে নাকি?'

বিভাস বলেছিল, 'তা আছে বই কি। গড়ে তোলার কাজ তো একদিনের নয়, প্রতিদিনের।'

উমা আর কোন জবাব দেয়নি। কথাটা ঠিক। বিয়ের পর এই পাঁচ বছর ধরে বিভাস উমাকে সম্পূর্ণ নিজের পছন্দ মত করে গড়ে তোলবারই চেষ্টা করেছে। কোন না কোন বিষয়ে স্ত্রীকে উপদেশ নির্দেশ দেওয়া বিভাসের দৈনিক রুটিনের অঙ্গ। এই পাঁচ বছরের মধ্যে তার একটি দিনও ব্যতিক্রম হয়েছে বলে উমার মনে পড়ে না।

বিয়ের দিন কয়েক বাদে দূর সম্পর্কের এক ননদের রসিকতায় উমা বুঝি খুব জোরে হেসে উঠেছিল, খানিক বাদেই বিভাস তাকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, 'দেখ, অত জোরে জোরে হেস না, বেশি উচ্চ হাসি মেয়েদের পক্ষে শোভন নয়।'

উমা একটু কাল অপ্রতিভ হয়ে থেকে ফের হেসে ফেলেছিল, 'আচ্ছা তুমি কি থিয়েটারের মাস্টার, আর আমি অভিনেত্রী যে আমি কিভাবে হাসব কি ভাবে কাশব তোমার বলে দিতে হবে?'

কিন্তু উমার তারল্য বিভাসকে গলাতে পারেনি। সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, বলে দেওয়া দরকার। আমি কি পছন্দ করি না করি, কি ভালোবাসি না বাসি তা তোমার জেনে রাখা ভালো।'

এই পাঁচ বছরে বিভাসের রুচি অরুচি পছন্দ অপছন্দের কথা উমা ভালো ভাবেই জেনেছে। প্রথম দিন হেসেছিল, কিন্তু সবদিন হাসতে পারেনি। মান-অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটি অনেক হয়েছে তার পর। রাগ করে বাবা মার কাছে গিয়ে কয়েকবার নালিশ পর্যন্ত করেছে উমা। কিন্তু মা সহানুভূতি জানালেও উমার বাবা রাজমোহনবাবু মেয়েকে বার বার ধমকই দিয়েছেন, বলেছেন, 'আমি তো বিভাসের কোন অন্যায় দেখিনে। ও যা বলে ঠিকই বলে। অতিরিক্ত চাপল্য আর বিলাসিতা কি মেয়েদের ভালো? ছেলেদের পক্ষেও যে ভালো তা বলছিনে। ওসব দিকে ঝুঁকলে, বাইরের হৈ চৈ রংচঙের দিকে বেশি নজর দিলে জীবনের আসল জিনিসে ঘাটতি পড়বেই। বিভাসের মত এমন সৎ, আদর্শ চরিত্রের ছেলে একালে দুর্লভ।'

একালে দুর্লভ। উমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়। এমন কি এ কালের মানুষ বলেই যেন চেনা যায় না বিভাসকে। বাবার সঙ্গে তো তার মিল হবেই। কারণ বিভাসের বয়েসটাই শুধু তিরিশের এপারে কিন্তু চালচলন আদবকায়দা সব যেন ষাট বছরের বুড়ো মানুষের সঙ্গে বাঁধা। জীবন থেকে আড়ম্বর বাদ দাও অশন-বসনের জন্য অত আয়োজন কোরো না। বাইরের এসব স্থূল বস্তুকে বেশি মূল্য দিলে, জীবনে যা যথার্থ মূল্যবান, তাকে দেওয়ার মত কিছু থাকবে না। অভাব অভাব কোরো না অভাব যদি দূর করতে চাও অভাব বোধকে জয় কর। এই সব বড় বড় কথা বিভাসের মুখে। কেবল কথা বলেই যদি বিভাস ক্ষান্ত থাকত তাহলে উমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিভাস শুধু কথা বলেই নিবৃত্ত থাকে না, সংসারের খাওয়ায় পরায় সখ আহ্লাদে আমোদ প্রমোদে সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারেও তার সেই বড় বড় কথাগুলিকে খাটাতে চেষ্টা করে। সেখানেই হয় বিপদ, সেখানেই শুরু হয় মতবিরোধ আর মনোমালিন্য। সংসারের দৈনন্দিন হাটবাজারের ছোট ছোট থলিতে অমন বড় বড় ভাব আর আদর্শ ধরবে কেন? ধরেও না। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায়। রাগে দুঃখে ফেটে পড়ে উমা। 'যদি তোমার নিজের মতই সব সময় বহাল রাখতে চাও, তাহলে একা একাই সংসার কর। আমার আর থেকে কাজ কি?'

তবু না থাকলে চলে না। তবু যথারীতি সংসার চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় উমাকে। একটু একটু করে বিভাসের পছন্দ মতই নিজেকে আর সংসারকে গড়ে নিতে হয়।

কিন্তু বেশে বাসে আড়ম্বরহীনতার পক্ষপাতী হলেও বিভাস যে কৃপণ তা নয়। ওর অন্তঃকরণকে ক্ষুদ্র বলা চলে না, বরং অনেক আত্মীয় স্বজনের চেয়েই মহৎ এ কথা উমা

মনে মনে স্বীকার করে। ছোট বোন রমার বিয়েতে নিজের ইচ্ছেমত কান ঝুমকো উপহার দিতে না পেরে উমা যে দুঃখ আর লজ্জা পেয়েছিল তার তুলনা হয় না। কিন্তু সেই ভগ্নীপতি শীতাংশুই যখন এক মিথ্যা জটিল মামলায় পড়ল, জেল হয় এমন অবস্থা তখন ব্যারিস্টার যোগাড় করে টাকা ধারের ব্যবস্থা করে যে উপকার বিভাস শীতাংশুর করেছিল তাও তার নিজের কোন আত্মীয় স্বজন করতে পারেনি। শীতাংশু অনেকদিন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছে, বলেছে 'ভায়রার কাছ থেকে যা পেলাম তা আমার ভাইরাও করেনি।'

শুধু তাই না আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যে কেউ যখন এসে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে, বিভাসকে পারত পক্ষে না করতে দেখা যায়নি। কোন না কোন ভাবে প্রত্যেকেরই উপকার করেছে। দূর সম্পর্কের এক ভাইপো আর ভাগ্নীজামাই এমন মাস যায় না বিভাসকে বিরক্ত না করে। বিভাস উমার সামনে খুব রাগ করে আচ্ছা করে ধমকে দেয় তাদের। কিন্তু নিজেদের সংসার খরচের টাকা থেকে দশ পনের সাধ্য মত যে ধারও দেয় তা উমার টের পেতে বাকি থাকে না। ফলে মাসের শেষের দিকে টানাটানি পড়ে। উমার শাড়ি কি টুকিটাকি সখের জিনিস কেনা বন্ধ থাকে।.অবশ্য কেবল যে উমার শাড়িটা ঘাটতি পড়ে তা নয়, বিভাসকেও ছেঁড়া জুতো পায়ে চলতে দেখা যায়। কাঁধের কাছে ভিতরের গেঞ্জি বেরিয়ে পড়ে।

স্বামীর সম্বন্ধে তেমন আপত্তি কি অভিযোগের কারণ নেই উমার। মাসতুতো পিসতুতো বহু ভগ্নীপতির চেয়েই নিজের পতিভাগ্য উমার ভালো। একথা সেও স্বীকার করে। তবু মনের খুঁতখুঁতি যেন একেবারে মরতে চায় না। মনে হয় কি একটা বড় জিনিস থেকে বিভাস যেন তাকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

সে জিনিষ যে কি তা স্পষ্ট করে উমার চোখে পড়ল রুবিকে দেখে। উমার নতুন করে মনে পড়ল এ সংসারে সোহাগ আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে, ছেলেকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে উমা প্রায়ই যায় রুবির ঘরে। গিয়ে চেয়ে চেয়ে ওকে দেখে। ওর সাজসজ্জা, চালচলন যত অদ্ভুত লাগে, তত লোভনীয় আকর্ষণীয় মনে হয়। সকালে অনেক বেলায় প্রায় আটটার সময় ঘুম থেকে ওঠে রুবি। দ্রুত হাতে হাত মুখ ধুয়ে নেয়, স্টোভ ধরায় চা খায়। রান্না চাপায় কুকারে, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে যেমন তেমন করে খাওয়া শেষ করে। কিন্তু অশন দ্রুত শেষ হলেও বসন ভূষণ আর প্রসাধন যেন ওর শেষ হতে চায় না। উমা ঘড়ি ধরে দেখেছে পুরো দুটি ঘণ্টা ওর সাজসজ্জায় যায়!

উমা একদিন বলল 'এত সাজিস কার জন্যে বল তো।' সপ্তাহ যেতে না যেতেই তুমি থেকে তুইতে নেমেছে। ওর সম্বোধনের শেষ সিঁড়িতে রুবিই তাকে টেনে নামিয়েছে।

উমার কথার জবাবে আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখে পাউডারের পাফ বুলাতে বুলাতে রুবি একটু হাসল, 'কার জন্যে নয়, কাদের জন্য বল্। তোর এক, আমার অনেক। তুই একেশ্বরবাদী আমি ঘোরতর পৌত্তলিক, আমার তেত্রিশ কোটি দেবতা, পথে ঘাটে, বাসে ট্রামে আফিসে আদালতে কোথাও তাদের অভাব নেই। আর তাদের চোখগুলি যেন কুমোরের আঁকা। তাতে পলক নেই।'

উমা বলল, 'নিষ্পলক চোখগুলির আর দোষ কি তুই যদি এমন করে উর্বশী সেজে বেরোস--'

রুবি হাসল, 'মুনিগণ ধ্যান ভেঙে তপস্যার ফল পদে দেবেন না কেন? তবে একজন তপস্বীর কিন্তু আজও মন টলেনি। তিনি ভ্রূ কুঁচকেই রয়েছেন।'

উমা হেসে বলল 'সেই কুঁচকানো ভ্রূ যদি সোজা করতে পারিস তবেই বুঝব বাহাদুরী।'

রুবি বলল, 'দরকার নেই ভাই আর বাহাদুরী দেখিয়ে, শেষে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটবে।'

উমা বলল, 'না রে না। অত সহজে বিচ্ছেদ ঘটবার মত বন্ধুত্ব আমাদের নয়। তেমন ঠুনকো মন নয় আমার। আসল কথা স্বীকার করছিসনে কেন? তুই হেরে গেছিস ওর কাছে। ভালো কথা, সেই ইন্‌সিওরেন্সেরই বা কি হোল। এত লজ্জা, এক সংকোচ তোর যে একবার মুখ ফুটে ওকে বলতেও পারলিনে?'

রুবি বলল, 'বলব। সময় আসুক তখন ঠিক হাজার দশেক টাকার ইন্‌সিওরেন্স বিভাসবাবুকে দিয়ে করিয়ে নেব দেখবি। আগে থেকে অত অধীর হলে কি চলে। বড় মাছ গাঁথতে হলে তাকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তবে টেনে তুলতে হয়।'

উমা হেসে বলল, 'খুব বড় মাছ ঠাউরেছিস বুঝি? তবু ভালো।' জবাবে রুবিও একটু হাসল, কিন্তু আর কিছু বলল না।

সেদিন বেলা নটায় স্নান করতে যাওয়ার আগে দাড়ি কামাবার জন্য দেয়ালে টাঙানো বড় আয়নাখানা আনতে গিয়ে হঠাৎ বিভাসের চোখে পড়ল জায়গাটা খালি, আয়না নেই। বিভাস বিরক্ত হয়ে বলল, 'আয়নাটা আবার কি হোল?'

উমা রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'রুবি নিয়েছে। ওর বড় আয়নাটা পড়ে ভেঙে গিয়েছে কিনা।'

বিভাস বলল, 'তা তো গেছে। কিন্তু তোমারই বা আক্কেলখানা কি। আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে তা তো জানো। অথচ এই সময়েই কাজের জিনিসটা আর একজনকে দিয়ে রাখলে। ও আয়না আজ আর পেয়েছি।'

একটু বাদেই আয়নাখানা হাতে নিয়ে রুবি এসে উমার রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল, 'উমা, এই নাও তোমার আয়না।' উমা বলল, 'সে কি, এরই মধ্যে কাজ হয়ে গেল?' রুবি সংক্ষেপে বলল, 'হ্যাঁ', তারপর আর দাঁড়াল না।

বিভাস এবার একটু অপ্রস্তুত হোল। স্ত্রীকে ডেকে চুপিচুপি বলল, 'কি ব্যাপার, শুনতে পেয়েছে নাকি?' উমা গম্ভীর মুখে বলল 'পেয়েছে বই কি। পাশাপাশি ঘর। তুমি তো আর আস্তে কথা বলনি। ও কালা নয়।'

বিভাস বলল, 'হুঁ।'

তারপর আয়না সামনে রেখে গালে সাবান ঘষতে লাগল। দরকারের সময় হাতের কাছে আয়নাটা না পেয়ে বিভাসের মন বিরক্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সেই বিরক্তি প্রতিবেশনী জানতে পারুক এ তার ইচ্ছা ছিল না। শিষ্টাচারে ত্রুটি ঘটে গেল। অথচ সারল্য, অকাপট্য যদি আচারের আদর্শ হয়, বিভাস মনে মনে ভাবল, তাহলে তো সে অন্যায় করেনি। মনের বিদ্বেষকে ক্রোধকে সে যথাযথভাবেই প্রকাশ করেছে। আর রুবি যে তা জেনেছে, শুনতে পেয়েছে তাও সঙ্গতই হয়েছে। তা হলে সদাচারের সঙ্গে সুনীতির প্রভেদ অনেকখানি। সভ্যতা শিষ্টাচারের মুখোসমাত্র, যথার্থ শিষ্টতা নয়। বিভাস মাথা নাড়ল, উঁহু এও ঠিক হোল না। সভ্যতা আর সদাচার ভিন্নার্থবোধক হতে পারে না। তার আসল ত্রুটি ঘটেছে অসহিষ্ণুতায়, হাতের কাছে জিনিসটা না পেয়েই তার মন যে ধৈর্যহীন হয়ে উঠেছে, একবার বিচার করতে চায়নি বিবেচনা করে দেখতে চায়নি সে জিনিসে আর কারো প্রয়োজন হতে পারে কিনা, সেই প্রয়োজনের কাছে নিজের প্রয়োজনকে একটু স্থগিত রাখবার মত ত্যাগ স্বীকার করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে তার মন ভেবে দেখতে রাজি হয়নি। তাই তার অশোভন আচরণের মুখে রয়েছে অশোভন ভাব, অসহিষ্ণুতা, এবং কিছু পরিমাণে অনুদারতা। নীতির দিক থেকে সেখানেই তার ত্রুটি ঘটেছে। তবু এই নৈতিক বিচ্যুতিকে বাকসংযমের সাহায্যে যদি প্রচ্ছন্ন রাখত পারত বিভাস তাহলে কি তার শিষ্টাচার বজায় থাকত না? কিছু মনের মধ্যে থাকত কিন্তু কখনো না কখনো মনের সেই বিদ্বেষ প্রকাশ

পেতই। দোষটা জিভের নয়, দোষটা মনের, দোষটা মুখের।

শিশিতে তেল ভরবার জন্য ঘরে এসে উমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওকি কেটে ফেললে নাকি?'

বিভাস ফের অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'আঃ থাম। অত চেঁচাবার কিছু হয়নি। একটা ব্রণ ছিল, তাতে একটু লেগেছে। ফিটকিরির টুকরোটা দাও তো হাত বাড়িয়ে।'

শনিবার একটু সকাল সকালই ফিরে এল বিভাস। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পেল না। সদর দরজা জুড়ে জন তিনেক কুলি দাঁড়িয়ে। তাদের মাথায় নানা ধরনের ফার্নিচার। ড্রেসিং টেবিল, তিন-চারখানা চেয়ার, সোফা, খুলে রাখা খাটের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

কোন রকমে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে বিভাস ডাকল, 'পিসীমা পিসীমা।'

সুরবালা বাবলুকে কোলে নিয়ে পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। উমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'তাঁকে কেন ডাকছ। তিনি বাসায় নেই।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু সদর দরজায় এসব কি ব্যাপার?'

উমা মুচকি হেসে বলল, 'জিনিসগুলি রাখলাম।'

বিভাস বলল, 'তামাসা রাখ। ব্যাপারটা কি।'

উমা তেমনি হেসে বলল, 'তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। রুবি ওগুলি ওয়েলেসলী স্ট্রীট থেকে ভাড়া করে এনেছে, ঘর সাজাবে বলে।'

বিভাস গম্ভীরভাবে বলল, 'ও।'

তারপর নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'সবদিক থেকে একেবারে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আদব কায়দা। এসব জিনিস ভাড়া করে আনবার কি মানে হয়। তাতে কি খরচ কম পড়ে নাকি? সামর্থ্য থাকে একেবারে কিনে নেওয়া ভালো, আর তা যদি সাধ্যে না কুলোয় এসব জিনিস ব্যবহার না করলেই চলে।' উমা একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে এনে বলল, 'আঃ চুপ কর। রুবি সদরে তার জিনিসগুলি বুঝে নিতে এসেছে। সব কানে যাচ্ছে তার। আর তোমার কি মাথা খারাপ হোল? সবাই কি তোমার পছন্দ মত চলবে?'

বিভাস বলল, 'তা না চলতে পারে। কিন্তু অপছন্দ হলে আমার বলবারও অধিকার আছে।'

উমা বলল, 'না তা নেই। অন্ততঃ শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে তুমি পার না। সেটা অভদ্রতা। যার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকে তার চালচলনের খুঁটিনাটি নিয়ে সমালোচনা করা যায়। কিন্তু যার সঙ্গে তোমার বলতে গেলে আলাপ পরিচয়ই নেই—সে কি করল না করল--ছিঃ।'

বিভাস বলল, 'ছিঃ নয়। বিলাসিতা আড়ম্বরপ্রিয়তাকে আমি যদি খারাপ বলে মনে করি, আমাকে তা বলতেই হবে। আত্মীয়ই হোক অনাত্মীয় হোক বিরূপ সমালোচনা করতেই হবে আমাকে। এখানে মুখ বুজে থাকাটা নাগরিক সভ্যতা হতে পারে, কিন্তু নীতির দিক থেকে সেটা গর্হিত। তাছাড়া চুপ করে লাভ কি। সমালোচনায় কিছু ফল হলেও হতে পারে।'

কিন্তু রুবির বেলায় যে কোন ফল হবে তেমন লক্ষণ দেখা গেল না। সে কুলিদের সঙ্গে হেসে মিষ্টি কথা বলে তাদের আরো আধঘণ্টাখানেক বেশি খাটিয়ে সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে নিল। দোরে, জানলায় ঝুলিয়ে দিল রঙীন পর্দা। নিজেদের ঘরগুলির তুলনায় রুবির ঘর দুখানি স্বর্গ বলে মনে হোল উমার।

খানিক বাদে উমা স্বামীকে বলল, 'তুমি কি এমনি বাউণ্ডুলের মত সংসার চালাবে ঠিক করেছ নাকি? দেশ থেকেও জিনিসপত্রগুলি আনলে না, এখানেও যে প্রাণ ধরিয়ে একটা জিনিস কিনবে সেদিকে তোমার লক্ষ্য নেই। মেঝেয় শুয়ে শুয়ে গা ব্যথা হয়ে গেল। এর চেয়ে একেবারে গাছতলায় গিয়ে থাকলেই হয়। বিছানা বালিশের পর্যন্ত দরকার হয় না

তাহলে।'

বিভাস জমা খরচের খাতা থেকে চোখ তুলে মৃদু হেসে বলল, 'আমি ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলাম। কলিঙ্গ থেকে আমাদেরও খাট আলমারী ড্রেসিং টেবিল ভাড়া করে আনতে হবে, এইতো?'

উমা স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হবেই তো, সংসারে এসব জিনিসের কি দরকার হয় না বলতে চাও?'

বিভাস শান্তভাবে বলল, 'হবে না কেন, দরকার হয়। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে তো সব প্রয়োজন একসঙ্গে মেটানো যায় না। আয় বুঝে সব ব্যবস্থা করতে হয়। পার্ট টাইমঠাইম নিয়ে সব শুদ্ধ শ' আড়াই টাকা তো পাই। তাতে ওসব কি করে হবে বল তো?' উমা বলল, 'ইচ্ছে থাকলেই হয়। এত টাকা এত দিকে যায়—'বিভাস বলল, 'হ্যাঁ এই দিক নির্ণয়ই আসল কথা। খাট-পালঙ্কে শোয়ার চেয়ে বড় আয়নায় মুখ দেখার চেয়ে দুটি দুঃস্থ আত্মীয়ের ছেলের পড়ার খরচ যোগালে আমার কাছে বেশি দরকারী বলে মনে হয়, দু'বাক্স সাবান বেশি কেনার চেয়ে মাসে অন্তত একখানা ভালো বই কিনতে পারলে আমি বেশি আনন্দ পাই। আমি ভেবেছিলাম তুমিও তাই পাবে। তোমারও তাই পাওয়া উচিত।'

বিভাস স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল।

উমা কোন জবাব দিল না। কিন্তু মন ওর হঠাৎ বিদ্বেষে ভরে উঠল। কেবল উচিত আর উচিত। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেবল এই কোরো আর এই কোরো না, শুধু শাসন আর অনুশাসন। কী হয় এই শাসন না মানলে। রুবিও তো মানেনি, তাতে কি কিছু ক্ষতি হয়েছে ওর? বরং ও বেশ তো সুখেই আছে। আর সংসারে সুখে থাকতে পারাটাই সবচেয়ে বড় কথা। নিজের পছন্দ মত সাধ আহ্লাদ করা, চলা ফেরাতেই আনন্দ। স্বচ্ছন্দেই স্বাচ্ছন্দ্য। রুবির আর কিছু না থাক, জীবনে সেই স্বাচ্ছন্দ্য আছে। উমা মনে মনে ভাবল, আর তার এত থেকেও কিছু নেই।

রুবি কেবল ওর হাত ধরে না, হৃদয় মন ধরে যেন টান দিল। ও যা করে সব ভালো, ও যা ভাবে, ও যা বলে সব অভিনব। উমা যা হতে চেয়েছে অথচ হতে পারেনি, রুবি যেন তাই, ও উমার সেই দ্বিতীয় কল্পিত সত্তা, রুবি উমারই সেই পরম কাঙ্ক্ষিত রূপ। ওর সঙ্গে উমা অভিন্ন অভেদ।

রুবি ওকে বলেছে, 'কোন সংকোচ করিসনে ভাই। আমার ঘরের একটা চাবি তোর কাছে রইল। যখন দরকার হয় আসিস, যা যখন লাগে ব্যবহার করিস।'

বন্ধুর ঘর হলেও অতখানি অবাধ স্বাধীনতা নিতে উমার বাধ-বাধ ঠেকল। রুবি না থাকলে সে বড় একটা যায় না। তবে ও যখন ঘরে থাকে উমা সময় পেলেই ওর কাছে গিয়ে বসে, গল্পটল্প করে। কিন্তু দুচার দিন বাদে সেই গল্পেও বাধা ঘটল। রুবিকে আর একা পাওয়া যায় না। রোজ দু'চারজন করে আগন্তুক আসবেই। রুবি তাদের ওর বসবার ঘরে নিয়ে যায়, খুব অন্তরঙ্গ কেউ হলে তাকে ভিতরের ঘরেও আনে। তারা চা সিগারেট খায়, নানা বৈষয়িক কথাবার্তা বলে। কিছু কিছু অবৈষয়িক কথা ও আলাপের সংলাপে না থাকে তা নয়। বরং মনে হয় বিষয়ের চেয়ে বিষয়াতীতের দিকেই ঝোঁক ওদের বেশি। উমা ফাঁকে ফাঁকে আড়ালে এসে দাঁড়ায়, আর চেয়ে চেয়ে দেখে। নিত্যনতুন মানুষ, নিত্য নতুন মুখ, নিত্য নতুন রহস্য, আগন্তুকদের অধিকাংশই সুবেশ সুপুরুষ, সদালাপী, তরুণ যুবক। দুচারজন প্রৌঢ়ও যে না আসেন তা নয়। বেশে বাসে তাঁদের যেন আরো বেশি মনোযোগ দেখা যায়। রুবির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছা তাদের উদগ্রতর বলে মনে হয়। কিন্তু রুবি যে বেশির ভাগ শুধু রঙ্গই করে তা আগন্তুকেরা না বুঝলেও উমার বুঝতে বাকি থাকে না।

উমা একদিন বলল, 'আচ্ছা, রাজ্য ভরে লোকের সঙ্গে তোর এত আলাপ, এত খাতির

হোল কি করে?'

রুবি বলল, 'ব্যবসার খাতিরে খাতির রাখতে হয়। তাছাড়া খাতির রাখবার আর দরকার না থাকলেই যে ওদের দরকার ফুরোয় তা তো নয়। এ পর্যন্ত গোটা দশ বার অফিসে কাজ করেছি। সে সব কাজ ছেড়ে দিলেও পুরনো কর্মীরা ছাড়তে চায় কই?'

রুবির এই ভঙ্গি এই দেমাক উমার সব সময় সহ্য হয় না। যেন রুবির কাউকে দরকার নেই। কাউকেই ও চায় না শুধু পৃথিবীশুদ্ধ সমস্ত পুরুষ নিজেদের গরজেই ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকতে চায়। এমনি একটি অহঙ্কার রুবির মনে সব সময় আছে। ওর মনে কি আছে ওই জানে, কিন্তু মুখে ওর বড়াইএর অন্ত নেই, সমস্ত পুরুষ হ্যাংলা। তাদের লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, দূর দূর করলেও তারা রুবির পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করে। কিন্তু উমা লক্ষ্য করে দেখেছে এই নিরাসক্তিটা রুবির ভান। কেউ এলে ও যেমন খুশি হয় যে ভাবে উল্লসিত হয়ে ওঠে কোনদিন কেউ না এলে ও যেমন ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে, তাতেই বোঝা যায় পুরুষ মানুষ ছাড়া ওর এক মুহূর্ত চলে না। এসব ব্যাপারে রুবিকে বড় অহঙ্কারী মনে হয় উমার। না হয় ওর রূপ আছে, বি.এ, পাস করা বিদ্যা আছে, চোখে মুখে বুদ্ধির আর কথায় চাতুর্যের ছাপ আছে, তবু কথায় কথায় পুরুষের নিন্দা আর ওর আত্মস্তুতি ওর বড় খারাপ লাগে। আঘাত লাগে আত্মাভিমানে। রুবির মত অত রূপ তার না থাক, তাকে কুশ্রীও কেউ বলতে পারবে না, বি. এ. পাস না করলেও কলেজে বছর দুই অন্তত পড়েছে, পড়াশুনোর চর্চাটা স্বামীর জন্য এখনও কিছু কিছু রাখতেও হয়েছে। সুতরাং একেবারে নিরক্ষরা নির্বোধ সেও তো নয় যে রুবি তাকে যা বোঝাবে তাই বুঝবে। সে তো দেখেছে অন্তত একটি পুরুষ হ্যাংলা নয়, সে কারো পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়েনি, উমাকেই বরং তার পায়ের নিচে আসন নিতে হয়েছে। তাই রুবি যখন অমন মিথ্যা বড়াই করে উমা মাঝে মাঝে প্রতিবাদ না করে পারে না।

এ ধরনের আলোচনা উঠতে সেদিন উমা বলল, 'দেখ রুবি, তুই মুখে যাই বলিস, যত নিন্দাই পুরুষের করিস কিন্তু তুই আসতে দিস বলেই ওরা আসে। আসলে আসতে না দিয়ে তুই পারিস না।'

রুবি জবাব দিল, 'কথাটা ঠিকই ধরেছিস। প্রেমিক ছাড়া আমার চলে কিন্তু পুরুষ ছাড়া আমার চলে না। কি করে চলবে? এদেশে বেশির ভাগ কাজকর্ম চালাবার ভারই যে পুরুষের। রিক্সায় চড়ব গোঁফওয়ালা রিক্সাওয়ালা ছুটে আসবে, মোট আনার যে মুটে হতভাগাটারও পুরুষেরই চেহারা। এমন মুচি, মুদ্দফরাস থেকে শুরু করে দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রীর গদি পর্যন্ত পুরুষে আটকে রেখেছে। ওদের বাদ দিলে কাজকর্ম সব বন্ধ করতে হয়। তাই কালো নয়ন আর হেরব না বলে মান করে বসে থাকতে পারিনে। ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই হয়। আর ওরা মনে করে সব দৃষ্টিই শুভদৃষ্টি।'

উমা একটু হাসল, 'পরে অবশ্য শনির দৃষ্টি বলে বুঝতে বাকি থাকে না।'

রুবি বলল, 'হ্যাঁ একরকম তাই। যে ব্যবহার আমি পুরুষদের কাছে পেয়েছি আর পাচ্ছি তাতে ওদের সঙ্গে একটি মাত্র সম্পর্কই আমার আছে, সে সম্পর্ক আর যাই হোক ভালবাসার নয়।' উমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, কি এমন খারাপ ব্যবহার তুই ওদের কাছ থেকে পেয়েছিস যে--'

রুবি জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'সে আর একদিন শুনিস।'

উমা বলল, 'আচ্ছা আর একদিনই বলিস না হয়। কিন্তু এ-বাড়িতে যে আর একজন মানুষ রয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে তোর মতামতটা আজই বলে ফেল।'

রুবি একটু হাসল, 'আমার মতামত শুনে তুই খুশি হবিনে।'

'তবু শুনি।'

রুবি তেমনি হেসে বলল, 'আমার কাছে যে সব তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষেরা আসে তাদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তোর পরম পুরুষটির কোন পার্থক্য নেই, আসলে সব সমান।'

স্বামীর সম্বন্ধে উমার অনেক রকম আপত্তি অভিযোগ আছে কিন্তু অপবাদ সে সহ্য করল না, তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, 'কিছুতেই না, আমি বাজি রাখতে পারি—'

রুবি বাধা দিয়ে বলল, 'খবরদার খবরদার। আমার মত জুয়াড়ীর সঙ্গে বাজি রাখতে আসিসনে। সর্ব্বস্ব নিয়ে টান পড়বে।'

রুবির ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে বাবলুকে কাজল পরাচ্ছিল উমা, কাজল লতাটা রেখে দিয়ে ছেলের মুখে চুমু খেতে খেতে বলল, 'অত সহজ নয় রুবি, অত সহজ নয়।' আর উমার সেই মাতৃস্নেহে, তার গভীর আত্মপ্রত্যয়ে রুবির বুকের ভিতরটায় হঠাৎ যেন বড় জ্বালা করে উঠল। মুখে হাসি লেগে থাকলেও সে জ্বালা চোখের ভিতর থেকে ফুটে বেরুল কিন্তু উমার তা চোখে পড়ল না, বাবলুর ছোট্ট থুতনিতে তখনও সে ঠোঁট লাগিয়ে রেখেছিল।

রবিবার সকালে সকালে বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছে বিভাস, দোরের কাছে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন, 'দেখুন, এইটাই তো সাতাত্তর নম্বর?' কাগজ থেকে মুখ তুলে বিভাস বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাকে চাই আপনার?' ভদ্রলোক বললেন', রেবা আছে? কোন ঘরে থাকে ও?' বিভাস বলল, 'রেবা বলে তো কেউ থাকেনা এখানে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'থাকে না? অথচ আমাকে তো সাতাত্তর নম্বর শম্ভুবাবু লেনের কথাই লিখেছিল। ফের কি কোন হস্টেল-টস্টেলে গিয়ে উঠল না কি? রেবা—রেবা রায় নেই এখানে? কবে উঠে গেল?'

বিভাস বলল, 'আপনি কি রুবি রায়ের কথা বলছেন? রুবি রায় বলে একজন মেয়ে অবশ্য আছেন এখানে।' ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রেবাই রুবি। আমার রাখা নাম মেয়ের পছন্দ হয়নি। খুশিমত বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিয়েছে।'

বিভাস মনে মনে ভাবল 'কেবল কি নামটাই বাঁকিয়েছে?' তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি ওঁর কিছু—' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আমি ওর বাবা। আমার নাম প্রিয়গোপাল রায়।'

বিভাস বলল, 'আসুন বসুন এসে এখানে। আমি দেখছি তিনি আছেন কি না।'

প্রিয়গোপাল এসে বিভাসের পাশে তক্তপোশে বসলেন। আধময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরা পঞ্চান্ন ছাপান্ন বছর বয়সের এক প্রৌঢ়। প্রিয়দর্শন না হলেও তাঁকে বিভাসের ভালই লাগল। হ্যাঁ ভদ্রলোককে রেবার বাবা বলেই মনে হয়, রুবি রায়ের বাবা বলে চেনা যায় না।

বিভাস সুরবালাকে ডেকে বলল, 'পিসীমা, শোন।'

সুরবালা ভিতর থেকে দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'ইনি রুবির বাবা। এঁকে তাঁর ঘরটা দেখিয়ে দাও।'

সুরবালা বললেন, 'ঘর দেখিয়ে দিয়ে হবে কি। সে তো এইমাত্র সেজেগুজে কোথায় বেরিয়ে গেল। উমার কাছে তো একটা চাবি রেখে যায়। দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে।'

খবর শুনে রান্না রেখে উমাও কৌতূহলী হয়ে চলে এল এ ঘরে। তারপর পরম পরিচিতের ভঙ্গিতে বলল, 'আসুন,' ঘর খুলে দিই। রুবি একটু বেরিয়েছে খানিক বাদেই ফিরবে।'

বিভাস বলল, 'বেশ তো তখনই উনি যাবেন। ওঁর একা একা ও ঘরে গিয়ে বসে থেকে তো লাভ নেই। তুমি বরং একটু চা-টা কর।'

উমা হেসে বলল, 'তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে? শুধু চা-টা নয়। রুবিকে আজ

খেতে বলেছি। মেসোমশাইয়েরও আজ আমাদের ঘরে নিমন্ত্রণ।'

প্রিয়গোপালবাবু অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বললেন, 'আবার ওসব ঝামেলা কেন।'

সুরবালা আর উমা ভিতরের দিকে চলে গেলে বিভাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই প্রিয়গোপালের সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করল। রুবির বাবা মা, ভাই বোন যে ভদ্রেশ্বরে থাকেন তা উমার কাছে বিভাস এর আগে শুনেছিল। এবার রুবির বাবার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে সে যেন অনেকখানি আশ্বস্ত হোল। এই মেয়েটির পারিবারিক পরিচয়, যোগ-সংযোগ তার যেন একান্তই দরকার হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু বিভাসের জানবার আগ্রহ যত বেশি, প্রিয়গোপালবাবুর বলবার উৎসাহ তেমন দেখা গেল না। মনে হোল তিনিও অনেক কথা চেপে যেতে চান।

বিভাস জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা এখানে সব, অন্তত কেউ কেউ চলে আসেন না কেন?'

প্রিয়গোপালবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'তাতে অসুবিধা আছে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু একটি মেয়ের পক্ষে একা একা এমনভাবে থাকায়ও তো অসুবিধা কম নেই।'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'কিন্তু ও 'এইটাই সুবিধার মনে করে।'

বিভাস বলল, 'ওঁর মনে করাটাই কি সব সময় ঠিক?'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'আমি তো তাই মনে করি। ওর বয়েস হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। নিজের সুবিধা অসুবিধা ওরই তো ভালো বুঝবার কথা। যাতে অসুবিধা হতে পারে ও তা করতে যাবে কেন।'

বিভাস চুপ করে রইল। বাইরের বেশেবাসে, চালচলনে যত বিভিন্নতাই থাকুক মতামতে পিতাপুত্রীর মধ্যে বিশেষ যে কোন পার্থক্য নেই তা বিভাসের বুঝতে বাকি রইল না। এরপর প্রিয়গোপালবাবু বিভাসের কাছ থেকে কাগজের একটা সীট চেয়ে নিলেন। বিভাস গোটা কাগজটাই ওঁর হাতে তুলে দিল।

প্রিয়গোপাল চায়ে চুমুক দিয়েছেন, রুবিকে দেখা গেল দরজায়, 'এই, তুমি কখন এলে?'

প্রিয়গোপালবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন, 'এই খানিকক্ষণ।' রুবি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ এসো, ঘরে এসো। প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'এতক্ষণ বসে বসে বিভাসবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। ওঁর সঙ্গে কি আলাপ নেই তোর?'

রুবি বলল, 'কী যে বল। আলাপ থাকবে না কেন। এখানে ওঁর অভিভাবকত্বেই তো রয়েছি।'

বিভাস ঘাড় ফিরিয়ে রুবির দিকে তাকাল। যে শ্লেষের শুরুটুকু কানে লেগেছিল, চোখে তার কিছুই ধরা পড়ল না। রুবির মুখ আজ অপ্রসাধিত। পাউডারের সূক্ষ্ম প্রলেপটুকুও তাতে নেই। স্নিগ্ধ স্বাভাবিক গৌরবর্ণই তাকে শ্রীমণ্ডিত করেছে, ফিকে নীল রঙের শাড়ি পরনে।

সেদিনের মত চুলের রাশ জালবদ্ধ নয়। এলো খোঁপায় বিনম্র ভঙ্গিতে ঘাড়ের কাছে নুয়ে রয়েছে। বিভাসের চোখ নিজের অনিচ্ছাতেও প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

বিভাসকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে রুবি ফের একটু হাসল, 'অবশ্য আমার মত ওয়ার্ড নিয়ে ওঁর ঝক্কিঝামেলার অন্ত নেই বাবা।'

প্রিয়গোপালবাবুও হাসলেন, 'তা কি আর আমার জানতে বাকি আছে? তোমার অভিভাবকগিরি করা কি সোজা? দুদিন যেতে না যেতে অভিভাবককেই তোর ওয়ার্ড হয়ে থাকতে না হয়। কই তোর ঘর কোন দিকে?'

মেয়ের পিছনে পিছনে প্রিয়গোপালবাবু বেরিয়ে গেলেন। বিভাস এবার যেন ব্যাপারটা

আন্দাজ করতে পারল। তা হলে প্রিয়গোপাল বাবুই প্রশ্রয় দিয়েছেন রুবিকে। মেয়ের এই ধরনের জীবনযাত্রায় তাঁর সমর্থন রয়েছে। কিন্তু বাবা কি কেবল স্নেহ দুর্বল হয়েই থাকবেন? তিনি সন্তানের যথার্থ শ্রেয়ের দিকে তাকাবেন না? সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত করে দিলেই কি তাঁর কর্তব্য শেষ হোল? অভিভাবকত্ব থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন? অন্তত বিভাস তা মনে করে না। সন্তানের যেমন বয়স বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, বাপও কি তেমনি আমৃত্যু বাড়তে থাকেন না? অন্ততঃ বাড়তে চেষ্টা করবেন না? তিনি কেবল বৃদ্ধই হবেন, তাঁর আর কিছু বৃদ্ধি পাবে না? সেই বর্ধিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সন্তানের সমৃদ্ধির কাজে তাঁকে আজীবন নিযুক্ত রাখতে হবে। অভিভাবকত্বের রূপ বদলাবে, ধমকের আর শাসনের দিন শেষ হবে, কিন্তু তাই বলে সন্তানের হাতে তিনি খেলার পুতুল বনে যাবেন না, প্রচুর বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়েই থাকবেন।

বিভাস বেরুতে যাচ্ছিল হঠাৎ রুবির চড়া উত্তেজিত গলা কানে গেল, 'তুমি কি ভাব বল তো? আমার ঘরে কি টাকার গাছ গজিয়েছে?' কিন্তু বিভাস তাতে কান পাতল না। গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। সুরবালাকে ডেকে বলে গেল, 'আমি একটু ঢাকুরিয়ায় চললুম। নির্মল নাকি ফের টাইফয়েডে পড়েছে। যাই, খোঁজ নিয়ে আসি। যদি ফিরতে একটু দেরি হয়, সবাই খেয়ে নিয়ো পিসীমা। আমার জন্য বসে থেক না।'

সুরবালা বললেন, 'এত বেলায় বেরুবি? বিকেলে গেলেই তো হোত। বেশি দেরি করিসনে যেন।'

ফিরতে ফিরতে বেলা একটা বেজে গেল। অসুস্থ বন্ধু কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তা ছাড়া ডাক্তার এসে কি বলেন তা জেনে আসার জন্য বিভাসের নিজেরও অপেক্ষা করবার দরকার ছিল।

'প্রিয়গোপালবাবু খেয়ে নিয়েছেন তো?'

তেল মাখতে মাখতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল বিভাস।

'হ্যাঁ, তিনি খেয়েদেয়ে চলেও গেছেন। তোমার তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এক ভদ্রলোককে খেতে বলে সেই যে বেরুলে--'

বিভাস একটু হেসে বলল, 'মেসোমশাইকে আদর আপ্যায়ন করার জন্য তাঁর শ্যালিকা কন্যাই তো উপস্থিত ছিলেন। আমার কি দরকার।'

উমা বলল, 'আহা।'

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ঘরে এসে উমা অবশ্য স্বামীকে আরো অনেক কথা বলল। রুবি আর তার বাবার কাহিনী। বিভাসের কাছে প্রিয়গোপালবাবু খুব গম্ভীর স্বল্পভাষী হয়ে থাকলে কি হবে, খেতে খেতে উমার কাছে তিনি নিজেদের অনেক গল্পই করেছেন।

ওঁদের আসল বাড়ি কুমিল্লায়। সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বছর দেড়েক হোল ভদ্রেশ্বরে বাসা বেঁধেছেন। সবাইকে নিয়ে এখনো শহরে এসে ওঠেননি। এখানে বহু খরচ। সেখানে বৃহৎ পরিবার। না, দাঙ্গায় তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে ব্যবসায়ে। বিশ বছর চাকরি করেছেন বিদেশী মার্চেন্ট অফিসে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে কয়েক হাজার টাকা জমেছিল। পূর্বতন সহকর্মী এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর সঙ্গে চালানী কারবারে নেমেছিলেন। বন্ধু তাঁকে পথে নামিয়েছেন সব বুঝেও প্রিয়গোপাল কিছুই করতে পারেননি। কারণ বন্ধুর ফাঁকির মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। বড়ছেলে বিয়ে করে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। তার ধারণা বাপের খামখেয়াল আর মূর্খতার জন্যই তারা নিঃস্ব হোল। পারতপক্ষে সে সংসারের তেমন একটা খোঁজখবর নেয় না। নেওয়ার সাধ্যও বিশেষ নেই। একমাত্র রুবিই এখন ভরসা। খরচপত্র ওই বেশির ভাগ দেয়। কিন্তু ওর ভাগ্য ও মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়গোপাল হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন।

রুবি তাঁকে প্রায় ধমক দিয়ে বলেছিল, 'ভাগ্য ভাগ্য কোরো না বাবা, ভাগ্য আমি মানিনে। ভাগ্যকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আমি আমার নিজের খুশি মত চলি।'

প্রিয়গোপালবাবু শান্তভাবে বলেছিলেন, 'তাইতো চলেছিস। আমি কি আজকাল আর কিছু বলি? তোর খুশিতেই খুশি থাকি।'

প্রিয়গোপালের নিরীহতার যথার্থরূপ এবার যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিভাসের চোখে। আজকাল আর মেয়েকে তিনি কিছু বলেন না, বরং নীরবে তার ইচ্ছামত চলতেই বলেন। তিনি যা পারেননি, রুবি যদি কোন রকমে তা পারে এই প্রতিকূল পৃথিবীর সমস্ত প্রতারণা আর প্রবঞ্চনার কিছুমাত্র প্রতিশোধ যদি নিতে পারে তাঁর মেয়ে, তিনি ভিতরে ভিতরে খুশিই হবেন। চরম এক হিংস্র জিঘাংসাকে নিরীহ নৈষ্কর্ম্যের আবরণে যেন ঢেকে রেখেছেন প্রিয়গোপাল। আর তাঁর সেই হননের তীব্র ইচ্ছা রুবির মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ হত্যা যে আত্মহত্যা। ভিতরে ভিতরে বড় বেদনা বোধ করল বিভাস। প্রতিশোধেই কি সংসারে সব শোধ হয়?

উমা বলল, 'ঘা খেয়ে খেয়ে ভদ্রলোক যেন খানিকটা সিনিক হয়ে গেছেন। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।'

প্রিয়গোপালের মুখখানা ফের চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেন আগুনে পোড়া চেহারা। দগ্ধ ভাগ্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

উমা বলল, 'বাপ আর মেয়ের মধ্যে সম্বন্ধও খুব ভাল বলে মনে হোল না।'

বিভাস গম্ভীরভাবে বলল, 'হওয়ার তো কথা নয়।'

উমা বলল, 'প্রিয়গোপালবাবু টাকার জন্য এসেছিলেন। বললেন বাড়িতে অসুখবিসুখ। রুবি বলল সুখ হোক আর অসুখই হোক মাসের শেষে টাকা আমি কোথায় পাব।'

প্রিয়গোপালবাবু বলেছিলেন, 'আচ্ছা, ব্যাঙ্কে তো তোর অ্যাকাউন্ট আছে। তার থেকে তুলেই দিস। আজ তো রবিবার। আমি বরং আজ এখানে থেকে কাল টাকা নিয়ে'—রুবি জবাব দিয়েছিল, 'তোলবার মত টাকা ব্যাঙ্কে নেই। তোমরা কি ভাবো আমাকে বলো তো? আমি যা দিতে পারি তা তো মাসের প্রথমেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আর আমার দেওয়ার সাধ্য নেই।'

'শখানেক টাকা, অন্তত গোটা পঞ্চাশ ষাটও দিতে পারবি না?'

রুবি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল, 'না। তোমরা যে কি ভাবো—' প্রিয়গোপালবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'তুইও যে কি ভাবিস তা আমি জানি। এরপর ফের যদি তোর কাছে আর হাত পাতি আমার নাম ফিরিয়ে নাম রাখিস। এ যাবৎ যা নিয়েছি তার পাই ফার্দিং পর্যন্ত হিসাব আছে, পৈতৃক ভিটা বিক্রি করেও যদি তোর সব শোধ দিতে হয়।'

রুবি বলল, 'তোমার পাকিস্তানের পৈতৃক ভিটা শিগগির বিক্রি হওয়ার আশা নেই বাবা। বিক্রি করে কাজও নেই। তুমি একটু বোসো। দেখি বাক্স দেরাজ হাতড়ে কিছু পাই নাকি।'

'তুই অমন করে মুখ ভেংচিয়ে ভিক্ষা দিবি আর আমি তাই নেব? আমাকে কি তুই এতই ছোট মনে করিস?'

'না, তা মোটেই করিনে। কিন্তু আমার ভাইবোনগুলি তো ছোটই, ওদের মনে করেই দিচ্ছি।'

প্রিয়গোপালবাবু কিছু নিয়ে তবে উঠলেন।

বিভাস এ কাহিনী শুনে চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

কিন্তু উমা যদি সবটুকু বলত, কিছু না কিছু মন্তব্য বিভাস না করে পারত না।

বাপকে ঘরে বসিয়ে রেখে রুবি উমার কাছে চলে এসেছিল, 'আমাদের কথাবার্তা তোর তো প্রায় সবই কানে গেছে, না উমা?'

'না ভাই, আমি নিজের মনে কাজ করছিলাম।'

রুবি বলল, 'আহা, শোনাও তো একটা কাজ। কিন্তু এতই যখন শুনলি আমার আরও একটা কথা তোকে শুনতে হবে উমা।'

'কি?'

'শ খানেক টাকা দেতো। কাল সন্ধ্যার সময় ফেরত পাবি।' উমা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'অবাক করলি যে, অত টাকা কোথায় পাব?' রুবি বলল, 'খুব পাবি। গয়না গড়াবি বলে টাকা বাক্সে তুলে রেখেছিস। তোর যেমন কান আছে, আমার তেমনি চোখ। ভালোয় ভালোয় যদি না দিস বাক্স ভাঙব, জানিস তো আমি সব পারি।'

উমা বাক্সের চাবি ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'ভাঙার দরকার কি? বাক্স খুলেই নে।'

রুবি এবার অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'না ভাই, তুই দে হাতে করে। তোর কোন ভয় নেই। কাল নিশ্চয়ই ফেরত পাবি।' এরপর উমা উঠে গিয়ে একশ টাকার নোটখানা বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিল, 'টাকাটা আমার বাবার।'

রুবি হেসে বলেছিল, 'টাকাটা আমার ও বাবার।'

পরদিন সন্ধ্যা উৎরে গেল। রুবির ঘরে ফেরার নাম নেই! উমা বারবার তাকাতে লাগল বাইরের দিকে। অবশ্য ঠিক সন্ধ্যার পরই রুবি কদাচিৎ ঘরে ফেরে। বেলা দশটায় বেরোয় আর ফেরেও সেই রাত নটা দশটায়। উমা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত রাত তুই বাইরে বাইরে কি করিস বল তো?'

রুবি জবাব দিয়েছিল, 'তুই ঘরে বসে যা করিস ঠিক তাই। গেরস্থালী।'

এর আগে রুবি তাকে বলেছে লাইফ ইনসিওরেন্সের কাজে বছর খানেক ধরে মোটেই তার সুবিধা হচ্ছে না। তা ছাড়া দোরে দোরে লোককে এমন তোষামোদ করে বেড়ান ধাতেও পোষাচ্ছে না তার। তাই রুবি ফের চাকরি নিয়েছে। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের এক প্লাস্টিক কোম্পানীর অফিসে চিঠিপত্র লেখার কাজ। কিন্তু এ কাজও খুব বেশিদিন রাখতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। উমা জিজ্ঞেস করেছিল 'কেন?'

রুবি হেসে বলেছিল, 'সেক্রেটারী বড় বেশি নোট পাঠাচ্ছেন। বড় বেশি ঘন ঘন ডাক পড়ছে তাঁর ঘরে। এরপর অফিসিয়াল পত্রালাপ শেষ করে তাঁর বিশেষ ধরনের চিঠির জবাব দেওয়ার কি আর সময় পাব? তাও যদি বা পাই এক অফিসে দুচার মাসের বেশি কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। বড় একঘেয়ে লাগে। তাই আগে থেকেই ব্যবস্থা রাখি। চাকরি করি একটা কিন্তু উমেদারী করি অনেকগুলির।'

হয়তো সেই উমেদারীর জন্যেই এত রাত হয় ফিরতে। উমাকে আরও উদ্বিগ্ন রেখে রুবি দশটা নাগাদ বাড়ি এল। ছেলেকে খাওয়ানো শেষ করে উমা রুবির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুবি তখন কাপড় ছাড়ছে। উমাকে দেখে বলল, 'এই যে আয়। শাড়ি বদলে আমিই যেতাম তোর ওখানে। টেবিলের ওপর রাখা শান্তিনিকেতনী ছোট ব্যাগটা খুলে একশ টাকার একখানা নোট উমার সামনে বাড়িয়ে ধরল রুবি। 'এই নে।' উমা ভদ্রতা করে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি কি ছিল।'

রুবি একটু হাসল 'ছিল না বুঝি? কিন্তু তাড়াতাড়ি না করলে রাত্রে কি ঘুমুতে পারতিস?'

উমা রাগ করে বলল, 'তুই তাই বুঝি ভেবেছিস?'

রুবি বলল, 'নারে না। আমি কিছু ভাবিনে। ভাবাটাবা আমার ধাতে নেই।'

উমা বলল, 'কিন্তু টাকাটা পেলি কোথায়? ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনলি তো?'

রুবি ততক্ষণে তার পুরনো আটপৌরে শাড়িটি পরে নিয়েছে। উমার কথার জবাবে বলল, 'ক্ষেপেছিস? তখনই তো বললাম ব্যাঙ্কে আমার কোন অ্যাকাউণ্ট নেই। তবে ব্যাঙ্কের

এ্যাকাউন্টেন্ট একজন আছে। আমার টাকা ব্যাঙ্কে থাকে না ব্যাঙ্ক কর্মচারীর পকেটে থাকে। সেই পকেট থেকেই তুলে আনলাম।'

উমা এবার চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, 'কার পকেট থেকে তুললি বল তো, সুধীর তালুকদার? সেই যে ছোকরা মত সুন্দরপানা ছেলেটি?'

রুবি ও পাশের চেয়ারটায় বসে হেসে বলল, 'হ্যাঁ সেই। ঠিক ধরেছিস। ওকে তোর মনে ধরেছে, না?'

উমা ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ কি যে বলিস। কিন্তু তুই না বলেছিলি সুধীরবাবুর বাসার অবস্থা ভালো নয়। একটা ছোট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিসে মাত্র শ দেড়েক টাকা মাইনে পান। বাড়িতে অনেক পোষ্য তিনি তোকে একশ টাকা দিতে পারলেন?'

রুবি বলল, 'দিতে কি আর পারলেন? আমাকে নিতে হোল। ক'দিন ধরে দেখছিলি তো? ভারি বিরক্ত করত। এলে আর নড়তে চাইত না। কেবল একথা সেকথা। অমুক সিনেমায় ভালো বই হচ্ছে চল দেখে আসি, আমার বন্ধু এক স্টুডিও খুলেছে চল তোমার একটা ফটো তুলবে। আজ অফিস থেকে ওকে ফোনে ডেকে বললুম আজ আমার হাতে সময় আছে সুধীর, যাবে নাকি কোন সিনেমা-টিনেমায়?' সুধীর একপায়ে খাড়া।

উমা রুদ্ধশ্বাসে সব শুনছিল, বলল, 'তারপর?'

রুবি উঠে গিয়ে তোয়ালে আর সাবান তুলে নিতে নিতে বলল, 'তারপর আর কি। ফোটো তুললাম রেস্টুরেন্টে খেলাম, সিনেমা দেখলাম, তারপর ওর কানে কানে প্রণয় গুঞ্জনে বললাম, সুধীর মাইনে নিশ্চয় পেয়েছ। মাসের শেষ তারিখেই তো তোমাদের মাইনে হয়। আমাকে একশটি টাকা দাও তো, ধার শোধ করতে হবে।'

উমা শিউরে উঠে বলল, 'ছি ছি ছি। তুই এমন করে একটি গরীবের ছেলের মাথায় বাড়ি দিলি?'

রুবি একটু হাসল, ছেলে গরীবের হলে হবে কি ধরেছে যে ঘোড়া রোগে তাই একটু চিকিৎসা করতে হোলো। কিন্তু মাথায় বাড়ি দেওয়ার মত হাত এখনো শক্ত হয়নি উমা। যারা বড় বেশি বিরক্ত করতে আসে এমনি করে তাদের গালে দু' একটা চড় চাপড় দিই। মাথায় বাড়ি একে বলে না, তোর ভয় নেই। সুধীরের টাকা আমি মারব না। তোর ধার যেমন করে শোধ দিলাম, ওর ধারও তেমনি করে শোধ দেব। কিন্তু এবার তুই ঘরে যা। বিভাসবাবুকে আর বিরহ অনলে দগ্ধ করিসনে।'

ফের একটু হেসে তোয়ালে সাবান হাতে নিয়ে রুবি বাথরুমে ঢুকল।

খেতে বসে একদিন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে যেন চমকে উঠল বিভাস, তারপর গম্ভীর ভাবে বলল, 'ওকি?'

হাতায় করে খানিকটা নিরামিষ তরকারি স্বামীর পাতে ঢেলে দিচ্ছিল উমা, বলল, 'কি আবার?'

বিভাস বলল, 'বাঁ হাতের ওই নখ দুটিতে কি হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করছি।' উমা লজ্জিত হয়ে আঁচলের তলায় হাতখানি লুকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'রুবি জোর করে একটু নেইলপলিশ লাগিয়ে দিয়েছে। আজকাল কিছুই তোমার চোখ এড়ায় না দেখছি।' বিভাস বলল, 'না তা এড়ায় না। বরং নখদর্পণে অনেক কিছুই আজ চোখে পড়ল। দেখ হাজার দিন বলেছি এসব আমি পছন্দ করিনে। তবু তুমি তাই করবে?'

উমা বলল, 'এতে পছন্দ অপছন্দের কি আছে। আমি তো আর নখে ঠোঁটে রং মেখে কোথাও বেড়াতে বেরুচ্ছি না। ঘরের মধ্যেই রয়েছি। তাতেও তোমার জাত গেল? এমন মানুষ আর দুনিয়ায় দুটি থাকে।'

'হুঁ।' বলে বিভাস গম্ভীর ভাবে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারতে লাগল। এসব তুচ্ছ বিষয়

লক্ষ্য না করলেও চলে। কিন্তু তুচ্ছ বলে এগুলিকে একেবারে উড়িয়ে দিতেই বা কি করে পারে বিভাস। তার সবরকম উপদেশ নির্দেশ উমা কান পেতে শোনে কিন্তু সে যখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় উমা গিয়ে যোগ দেয় রুবির সঙ্গে। তার সংস্পর্শ থেকে বিভাস কিছুতেই স্ত্রীকে ছাড়িয়ে আনতে পারছে না। রুবির চাল চলন আচার আচরণের প্রভাব পড়ছে উমার ওপর। ওদের সৌখ্য এমন ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে পৌঁছেছে যে মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে শাড়িগয়না পর্যন্ত বিনিময় হয়। এক দিন উমার শাড়ি আর অলঙ্কার পরে রুবি বাইরে বেরুচ্ছে। কিন্তু সেদিন ভারি অপ্রস্তুত হয়েছিল বিভাস। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তার ঘরের জানলার সিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রুবি। ঘরে আবছা অন্ধকার, আলো জালা হয়নি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিভাস বলেছিল, 'উমা গেল কোথায় আপনি কি ওর জন্য অপেক্ষা করছেন?'

জবাব এসেছিল, 'না। উমাকে আমার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি বিভাসবাবু।'

বলে মুখ ফিরিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল উমা। 'খুব নিরাশ হলে না?'

উমার পরনে রুবির সেই চড়া লাল রঙের শাড়ি সেই কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখবার ধরন, এমন কি তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত উমা নকল করেছে।

মুখ লাল করে বিভাস বলেছিল, 'দেখ, এধরনের বাজে ঠাট্টা ইয়ার্কি আমি মোটেই পছন্দ করিনে। ফের তুমি ওর শাড়ি আর ওর প্লাস্টিকের জিনিসগুলি পরে রয়েছো?'

উমা বলেছিল, 'এক্ষুণি ছেড়ে রাখছি। আর পরব না।'

কিন্তু প্রতিশ্রুতি উমা রাখতে পারেনি। আজ আবার নখে পালিশ লাগিয়ে এসেছে। বিভাস অপ্রসন্ন মুখে খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। উমাকে আর প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

স্বামীর নির্দেশে দিন কয়েক উমা একটু নিরস্ত রইল। কিন্তু কদিন বাদেই অফিস থেকে ফিরে এসে বিভাস দেখল, উমা বাড়িতে নেই। বাবলুর কান্না সুরবালা কিছুতেই থামাতে পারছেন না। বিভাস জিজ্ঞেস করল, 'উমা গেল কোথায় পিসীমা?' সুরবালা বিরস মুখে বললেন, 'কি জানি বাবা সেজেগুজে সেই ফক্কড় মেয়েটার সঙ্গে সেই যে দুপুরে বেরিয়েছে আর ফেরবার নাম নেই। এই ছেলে এখন রাখি কি করে?'

বিভাস মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, 'বেরুতে দিলে কেন তুমি? কেন নিষেধ করলে না?'

সুরবালা বললেন, 'আহাহা আমাকে একেবারে জুড়িয়ে দিলি তুই। তোর নিষেধই যেন কত শোনে, তারপর আমার নিষেধ মানবে। সেই রকম বউই তুমি বিয়ে করে এনেছ কিনা। সাথীটিও জুটেছে বেশ। একে মনসা, তাতে ধোঁয়ার গন্ধ।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে অফিসের জামাকাপড় ছাড়তে লাগল।

সন্ধ্যার পর রুবির সঙ্গে উমা ঘরে ফিরল। বেশে-বাসে প্রসাধনে উমার ওপর তার বন্ধুর প্রভাব সুস্পষ্ট। বিভাস কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

উমা বলল, 'সিনেমায়। রুবি কিছুতেই ছাড়ল না।'

বিভাস বলল, 'হুঁ। কি ছবি দেখে এলে?'

উমা তরল স্বরে বলল, 'রুবির ইচ্ছা ছিল ইংরেজী ছবি দেখার আমার ইচ্ছা বাংলা। মাঝামাঝি রফা হোল। নিউ সিনেমায় নওজোয়ানই দেখলাম শেষ পর্যন্ত। একেবারে বাজে। তবে যাই বলো গানগুলি কিন্তু বেশ।'

'নওজোয়ানে যে শ্লীলতার অভাব আছে সে খবরটা এর আগেই বিভাসের কানে

গিয়েছিল।'

একটু চুপ করে থেকে বিভাস বলল, 'ওর সঙ্গে যখন বেরিয়েছ তখনই বুঝেছি নওজোয়ান ছাড়া দেখবার মত ছবি খুঁজে পাবে না। কিন্তু উমা, তুমি কি ভেবেছ বল তো?'

বিভাসের গলার আওয়াজ চড়া।

উমা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি আবার ভাবব?'

বিভাস বলল, 'তুমি ভেবেছ ওকে যা মানায় তা তোমাকেও মানায়। তোমারও স্বামী নেই সন্তান নেই, সংসার নেই যা খুশি তাই করে বেড়ালেই হোল যেখানে খুশি গেলেই হোল, তাই না? কিন্তু তা চলবে না। আমি বলে দিচ্ছি মোটেই চলবে না তা। আমার এ সংসারে থাকতে হলে আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে। তা যদি না পোষায় দরজা খোলা আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পার।'

সুরবালা এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন, 'আঃ, তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি বিভু। অত চেঁচামেচি করছিস কেন? বেশ, তুই পছন্দ না করিস সে কথা বুঝিয়ে বলে দিলেই তো হয়। আর তোমাকেও বলি উমা, আর কিছু না হোক, ছেলেটির দিকে তো একটু তাকাতে হয়। সেই তোমরা বেরুবার পর থেকে ট্যাঁ ট্যাঁ শুরু করেছে সাধ্য কি থামাই? অসুখ-বিসুখের পরে কোলের ছেলে মার এমন ন্যাওটাই হয়। আগে তো দিন রাত আমার কাছে পড়ে থাকত। কিন্তু—'

'থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এবার দিন আমার কাছে।' বলে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ছেলেকে সুরবালার কোল থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে উমা বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে বিভাস ওর কাঁধ চেপে ধরল। 'মুঠি তো নয়, থাবা। আওয়াজ তো নয়, সিংহনাদ।'

'এই দাঁড়াও।'

উমা স্বামীর দিকে ফিরে তাকিয়ে মুহূর্তকাল নিশ্চল হয়ে রইল। বাবলু সভয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'বাবা মালে মা, বাবা মালে।'

সুরবালা তাড়াতাড়ি বাবলুকে ফের নিজের কোলে তুলে নিয়ে ভাইপোকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ছি ছি', কালে কালে তুই কি হলি বিভাস, 'ছিঃ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।'

বিভাস বলল, 'না, ছাড়ব না। ও আমাকে অপমান করে করুক কিন্তু তোমাকে অপমান করতে যায় কেন সাহসে?

সুরবালা বললেন, 'তোর সাহসই বা কম কিসে। আমার সামনেই—ছি ছি ছি। ছাড় শিগগির, ছাড়।'

অবশ্য পিসীমার বলবার আগেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে বিভাস সরে দাঁড়িয়েছিল।

'চুপ করে আছে কেন, জবাব দিক আমার কথার।'

বিভাস ফের গর্জে উঠল।

উমাও ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'কি জবাব চাও তুমি শুনি?'

'আঃ, আচ্ছা পাগলদের পাল্লায় পড়েছি। ওদিকে উনুন যে জ্বলে গেল। চল ওঘরে চল।'

বলতে বলতে উমাকে এক রকম জোর করেই বাইরে নিয়ে গেলেন সুরবালা, দাম্পত্য কলহটা আর বেশি দূর গড়াতে পারল না।

রাত এগারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত যথারীতি মানভঞ্জনের পালা চলল। তারপর স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল উমা, 'আমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি, তোমার মত লোক—'

সত্যি, তার মত লোকের এমন করা উচিত হয়নি একথা কেবল মুখে নয় মনে মনেও স্বীকার করল বিভাস। লজ্জিত হোল, অনুতপ্ত হোল। উমা ঘুমিয়ে পড়বার পরেও বিভাস

অনেকক্ষণ জেগে রইল বিছানায়। না, এ পথ নয়, এ পদ্ধতি নয়। উমার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের নতুন উপায় খুঁজতে হবে বিভাসকে। আশ্চর্য তার এতদিনের শিক্ষা, এতদিনের পরামর্শের কোন স্থায়ী প্রভাবই পড়ল না উমার ওপর। রুবির মত চটুল স্বভাবের বিসদৃশ রুচির অতি সাধারণ একটি মেয়ে দুদিনের আলাপে ওকে জয় করে নিল। মাধ্যাকর্ষণের মত, মানুষের মনেও কি স্বাভাবিক আকর্ষণ নীচতার কি হীনতার দিকে? সেই মারাত্মক টানকে কি কিছুতেই রোধ করা যায় না? কিন্তু বিভাস এত সহজে হার মানবে না ; এত অল্পে হাল ছাড়বে না। শুধু এই হাস্যকর শুচিবায়ুতার পথ তাকে ছাড়তে হবে।

উমার ওপর যদি রুবির প্রভাব পড়ে থাকে, তার নিজের প্রভাব ফেলতে হবে রুবির ওপর। ওকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, ওকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। উমার কাছে বার বার প্রমাণ করতে হবে রুবির পথটা আসল পথ নয়, মতটা মূলতঃ ভ্রান্ত। কোন সারবান বস্তু ওতে নেই কেবল কথার ফেনা ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

পরদিন বিভাস স্ত্রীকে বলল, 'তোমার বন্ধুকে আজ বিকেলে চা খেতে বল না। আমি সকাল সকালই ফিরব।'

উমা একটু হেসে বলল, 'কালকের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি। কিন্তু তার আর দরকার নেই। আমি ঠিক করেছি ওর সংস্পর্শে আর যাব না। তাছাড়া ওর নিজেরও তো একটা মান সম্মান বোধ আছে।'

বিভাস বলল, 'আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে যদি বলি তাহলে তো সেই বোধটা অটুট থাকবে।'

উমা বলল, 'তার কি দরকার। চা তো আমাদের ঘরে ও না খেয়েছে তা নয়, আজ এমন ঘটা করবার কি হোল।'

বিভাস বলল, 'ঘটার আবার কি আছে। এতদিন তুমি বলেছ, আজ আমি বললাম, এইটুকু শুধু ঘটনা।'

চায়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে রুবি একটু বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলল, 'ব্যাপার কি। আজ কি তোদের কারো জন্মদিন নাকি।'

উমা মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'তবে বুঝি বিবাহ বার্ষিকী? তাহলে বল একটা কিছু প্রেজেণ্ট ট্রেজেণ্ট নিয়ে আসি।'

উমা বলল, 'না, তাও নয়। অমনিই তোর প্রতিবেশী মশাইর সুন্দরী পড়শীর সঙ্গে চা খাবার হঠাৎ আজ সখ হয়েছে।'

রুবি একটু হাসল, 'ও সখ, কিন্তু সখি, তুই এ সখকে প্রশ্রয় দিস কোন সাহসে?'

উমা হেসে বলল, 'রঙ্গ রাখ। তুই সিনেমা থিয়েটারে গেলে নাম করতে পারতিস। সকাল সকাল ফিরিস কিন্তু। আজ আবার সেই রাত দুপুর করিসনে।'

'আচ্ছা দেখা যাক।'

রুবি কথা রাখল। ঠিক সন্ধ্যার একটু আগেই ফিরে এল ঘরে। অফিসের বেশ বাস বদলে, হাত মুখ ধুয়ে উমাদের দরজায় দাঁড়াল, 'আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তোমাদের হয়তো অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি উমা।'

বিভাস উঠে দাঁড়িয়ে শিষ্টাচারের ভঙ্গিতে বলল, 'না না না, আসুন।'

রুবি উমার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের যে বসিয়ে রাখিনি তা প্রমাণ করবার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে নাই বা থাকলেন।'

বিভাস লক্ষ্য করল রুবির কথার ভঙ্গিতে ঠিক আগের মত চপলতা থাকলেও পোশাকে সেই পারিপাট্য নেই। খয়েরী রঙের সাধারণ একখানা তাঁতের শাড়ি ওর পরনে। সেই প্লাস্টিকের গয়নাগুলিও খুলে রেখে এসেছে। হাতে শুধু সরু সরু দুগাছি চুড়ি। মেক-

আপহীন মুখ। উমার পাশে আজ চমৎকার মানিয়েছে।

বিভাস তার চেয়ারটা টেবিলের দিকে আর একটু টেনে আনতে আনতে হেসে বলল, 'দাঁড়িয়েছিলাম বলেই তো আপনি অমন ঘুরিয়ে কথা বলার সুযোগ পেলেন।'

রুবি বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। আপনি বসে থাকলেও আমার সুযোগের কোন অভাব হবে না। কিন্তু উমা তুমি যে আজ এত চুপচাপ রয়েছো। ও এইজন্যেই কোন কথা নেই। ঈস, বিপুল আয়োজন করে বসেছ।'

লুচির সঙ্গে ডিমের তৈরী হালুয়া প্লেটে করে রুবির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে উমা বলল, 'বিপুল আর কি', খেতে খেতে রুবি বলল, 'বাঃ বেশ হয়েছে তো।'

বিভাস বলল, 'ডিমের প্রিপ্যারেশন ওর হাতে ভালই হয়।'

রুবি হেসে বলল, 'ঈস্ স্ত্রীর প্রশংসায় অমনিই পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন দেখছি। উমার হাতে কিসের প্রিপ্যারেশনটা খারাপ হয় সাহস করে বলুন তো শুনি।'

বিভাস বলল, 'কেন, আমাকে কি খুব ভীরু বলে মনে হয় আপনার?'

'ভীরু বই কি। ধর্মভীরু।' রুবি মুখ টিপে একটু হাসল, 'কেমন ঠিক বলিনি?'

বিভাস বলল, 'না পুরোপুরি ঠিক বলেননি। এ ভীরুতা যে আসলে ভয় নয়, সাহস, একথা বললে ঠিক হোত।'

রুবি চায়ের কাপটা সামনে টেনে নিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'হোত না। ভীরুতা চিরদিনই ভীরুতা। তাকে কোনদিনই সাহস বলা যায় না। এমন কি ধর্মভয়কেও নয়। ধর্মভয়ের মধ্যে শুধু ভয়টুকুই আছে, ধর্ম নেই।'

বিভাস হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। বেশ একটু বিস্মিত আর গম্ভীর দেখাল তাকে। এতদিন এই মেয়েটির চটুল ভঙ্গিই শুধু সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু প্রয়োজন হলে ও যে দৃঢ় স্পষ্ট ভাষায় গভীর ভাবকেও প্রকাশ করতে পারে তার পরিচয় বিভাস যেন এই প্রথম পেল। আর পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল।

বিভাস বলল, 'কিন্তু আপনি যাকে ভয় বলছেন সে তো মানুষের নিজেরই সৃষ্টি—'

রুবি বলল, 'অনাসৃষ্টি বলুন। তাতে পুরুষেরা কাপুরুষ হয়েছে।'

উমা বলল, 'আর মেয়েরা?'

রুবি বলল, 'মনুষ্যত্ব বর্জিত মেয়েমানুষ। কিন্তু বিভাসবাবু, চায়ের কাপে আমরা মিছামিছি ঝড় তুলেছি কেন? দেখুন তো, এরই মধ্যে কেমন ঝোড়ো কাকের মত চেহারা হয়ে গেছে উমার। আরও খানিকটা খাবারটাবার দিয়ে ওঁর মুখটা বন্ধ করে দাও ভাই। না হলে আজ আর রক্ষা থাকবে না। বক্তৃতা বর্ষণে সব ভাসিয়ে দেবেন।'

পরের সপ্তাহে পাল্টা নিমন্ত্রণ করল রুবি। বিভাস বলল, 'এত তাড়াতাড়ি কেন।'

রুবি বলল, 'তাড়াতাড়ি আর কই। বরং বেশ দেরি হয়ে গেছে। অনেকদিন আগেই বলা উচিত ছিল। বলবও ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস পাইনি।'

'কেন। এত ভয় কিসের আপনার।'

রুবি বলল, 'ভয় ছিল পাছে আপনি না করে বসেন। বর্ণহিন্দুদের কাছে সব জাতই তো আর জল চল নয়।'

'আজ সে ভয় ভাঙল কিসে।'

রুবি বলল, 'উমার আশ্বাসে। তাছাড়া চায়ের গরম জলে তো কোন ভয় নেই। ওতে সব বীজাণুই মরে। একেবারে গঙ্গা জলের মত পবিত্র। কারো হাতেই ওর জাত যায় না।'

উমা বলল, 'নিমন্ত্রণ রাখতে রাজী আছি। কিন্তু একটা সর্ত, আজ আর তর্ক করতে পারবিনে।'

রুবি বলল, 'বাঃ যত দোষ পরের ঘাড়ে। তর্ক বুঝি সেদিন আমি তুলেছিলাম। আর

নিজের স্বামীটি একেবারে নিরপরাধ, না? বেশ তর্ক আমরা করব না কিন্তু সেও একটা সর্তে। তোকে গান শোনাতে হবে।'

উমা বলল, 'শোনাবার মত গান আমি জানি না। কি যে শোনাব। তার চেয়ে আমরা তোর সেতার শুনব সেই ভালো।' স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল উমা, 'জানো ও চমৎকার সেতার বাজায়।'

বিভাস বলল, 'না জানবার সুযোগ এতদিন হয়নি।'

রুবি একটু হাসল, 'যখন জানবেন তখন বুঝতে পারবেন সেটা সুযোগ নয়, দুর্যোগ। চলুন এবার।'

চেয়ার টেবিলে সুন্দর করে সাজানো ঘর। জানলায় দরজায় রঙীন পর্দা। এক পাশে বইয়ের র‍্যাকে কিছু বই, দেয়ালে টাঙানো সেতার।

চায়ের পর অনেক অনুরোধেও উমাকে গাওয়ানো গেল না। উমা বলল, 'না ভাই গলা কি রকম ভাঙ্গা দেখছিস নে। তার চেয়ে তুই বরং বাজা।'

রুবি বলল, 'গায়িকাদের এই এক সুবিধা। কথায় কথায় তারা গলার দোহাই দিতে পারে। তোর যদি গলা ভেঙে থাকে আমারও তাহলে আঙ্গুল মুচকে গেছে। বিভাসবাবু আপনি বক্তৃতা করুন, তাই ভালো।'

বিভাস বলল, 'উঁহু আজকে আর মুড নেই। আজ আপনার সেতারই হোক।'

রুবি বলল, 'কি করে হবে? বহুদিন অভ্যাস নেই। ওর ওপর কি রকম ধুলো জমেছে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন।'

'বেশ তো ধুলো ঝেড়ে নিন।'

'তা না হয় ঝাড়লুম। কিন্তু কেবল ধুলোই তো নয় 'জড়িয়ে' গেছে সরু মোটা দুটো তারে। তার কি হবে।'

বিভাস চোখ তুলে রুবির দিকে তাকাল, এ যেন আর কারো সুর, আর কারো মুখের কথা।

একটু চুপ করে থেকে বিভাস বলল, 'জড়িয়ে গেছে বলেই যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে ছাড়াতেও দেরি লাগবে না। রুবি অদ্ভুত একটু হাসল, 'কিন্তু ছাড়াতে গেলে ব্যথা লাগবে। আমি আপনাদের ওসব ব্যথা বেদনার মধ্যে নেই।'

বলে সেতারটা পেড়ে নিল রুবি।

বাজানো শুরু হতেই বিভাস বলল, 'সুরটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।' রুবি মুখ তুলল, 'তুমি যখন বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা। উমার বড় প্রিয় গান। ও তো গাইলো না। ওর হয়ে আমি বাজাচ্ছি। কিন্তু তাতে কি আপনার মন ভরবে!'

বাজনা শেষ হওয়ার পর সেতারটা ফের দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখল রুবি, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'কেমন লাগল।'

বিভাস আন্তরিক প্রশংসা জানিয়ে বলল, 'খুব ভালো। নিষ্ঠা থাকলে আপনি—'

রুবি হাসিমুখে বলল, 'নামকরা সেতারী হতে পারতাম। তাই না?' বিভাস বলল, 'ঠাট্টা নয়। আপনার মধ্যে যদি অভাব কিছুর থাকে সে এই নিষ্ঠার। অথচ জীবনে একনিষ্ঠ হতে না পারলে—' রুবি তেমনি স্মিত মুখে বলল, 'অনেক নিষ্ঠ হতে হয়। তাই বা মন্দ কি। জীবনে সেও তো এক রকমের হওয়া। দেখুন বিভাসবাবু নিষ্ঠা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা দ্বিতীয়ভাগের ওইসব শক্ত শক্ত কথাগুলি আমার মধ্যে পাবেন না, যে জীবনটা আমার ভাগে পড়েছে তাকে আমি সহজ সরল প্রথমভাগে ধরে রেখেছি। একেবারে কর খল, ইট ঈশ বড় জোর জল পড়ে পাতা নড়ে। তার বেশি নয়।'

বিভাস স্থিরদৃষ্টিতে মুহূর্তকাল রুবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তার বেশি নয়?

আপনি বললেই আমি বিশ্বাস করব? আকাশ ছেয়ে মেঘ জমে না। ঝড় ওঠে না? সে ঝড়ে একমাত্র সম্বল দ্বিতীয় ভাগ। না হলে প্রথম ভাগের একটি পাতাও আস্ত থাকবে না। ছিঁড়ে উড়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

উমা বিস্মিত হয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। বিভাসের এমন রূপকের ভাষা এর আগে সে শোনেনি। স্বামীর এমন দীপ্ত রূপ ও শিগগির দেখেছে বলে তার মনে পড়ল না।

রুবিও অপলকে বিভাসের দিকে একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল। তারপর মিলিয়ে যাওয়া হাসির দেখা মিলল ফের ওর ঠোঁটে।

ঠিক আগের মতই তরল কণ্ঠ শোনা গেল ওর, 'গেলই বা নিশ্চিহ্ন হয়ে। তাতে আপনার অত ভাবনা কিসের বিভাসবাবু। আপনার শুভঙ্করীখানা ঠিক থাকলেই তো হোল।'

আঙুল দিয়ে উমাকে দেখিয়ে দিল রুবি।

বিভাসের মুখ আরক্ত দেখাল, 'তাই বা ঠিক থাকতে আপনি দিচ্ছেন কোথায়। আপনার রকম সকম দেখে মনে হয়, আপনি ওকে বখাবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন।'

রুবি এবার কঠিন দৃষ্টিতে বিভাসের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'তাই নাকি? হবেও বা। আমার কি রকম একটা অভ্যাস হয়ে গেছে জানেন? কাউকে বখাতে না পারলে হাত নিসপিস করে। হাতের কাছে আছেন তো আপনারা দুজন। আপনি আর আপনার স্ত্রী। ভেবে দেখলাম আপনাকে বখানোর চেয়ে আপনার স্ত্রীকে বখানো অনেক নিরাপদ। বেশ উমার বেলায় যদি আপনার আপত্তি থাকে কাল থেকে পিসীমার দিকেই ঝুঁকব।'

বলে রুবি হেসে উঠল। উমাও না হেসে পারল না।

আর দুঃসহ নির্বাক ক্রোধে বিভাসের চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

একটু বাদে বিভাস কি বলতে যাচ্ছিল, বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। ভারি গলাও শোনা গেল, মিস রায় আছেন? পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে রুবি মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'এই যে মিঃ চ্যাটার্জী। আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি আজ এলেনই না। সেই চারটের পর থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আর এই আপনার সময় হোল। একটু দাঁড়ান আসছি।'

তারপর উমা আর বিভাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে রুবি বলল, 'Life insurance-এর party, সেদিন কিছুতেই রাজী হননি। আজ দেখি নিজেই ঠিকানা খুঁজে গরজ করে এসে পড়েছেন।'

বিভাস আর উমা দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

উমা বলল, 'শহর শুদ্ধ লোকের life insure করাচ্ছিস আর ওকে বুঝি তোর চোখে পড়ে না?'

রুবি হেসে বলল, 'আমার চেয়ে তোর গরজ দেখি বেশি। চোখে ঠিকই পড়েছেন। শুধু সবুরে মেওয়া ফলবে সেই আশায় আছি।'

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাইরের আগন্তুক ঘরে ঢুকলেন। বিভাসের কানে রুবির কলকণ্ঠ ভেসে এল, 'বাঃ সুটটি তো আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে মিঃ চ্যাটার্জী। Now you require only a rose and our company's contract form.'

ভারি গলা তরল হয়ে উছলে উঠল, 'yes a rose and its thorn. I think, I shall have them presently.'

বিভাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। একটু বাদে শোবার ঘর থেকে একখানা বই নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল বিভাস। দিনের আলো আর নেই। স্যুইচ টিপে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাল। কিন্তু বই খুলতে না খুলতেই জুতোর শব্দে চমকে উঠে বাইরের দিকে তাকাল। কালো স্যুট পরা ফর্সা চেহারার চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়সের একজন স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়ের পিছনে পিছনে রুবি বেরিয়ে যাচ্ছে। ওর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ পরনে গোলাপী রঙের সিল্ক।

যেতে যেতে একবার বিভাসের দিকে তাকাল রুবি তারপর হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ভিতরটায় হঠাৎ যেন জ্বালা করে উঠল বিভাসের। বইয়ে মন বসল না। একটু বাদে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। এই স্পর্ধা এই ঔদ্ধত্যকে কিছুতেই সে সহ্য করবে না। রুবিকে যদি এ বাড়িতে থাকতে হয়, তার চালচলন, আচার আচরণ বদলাতে হবে। শোধরাতে হবে ওকে। বিভাস ওকে শোধরাতে বাধ্য করবে। এ পর্যন্ত অনেককে শুধরেছে বিভাস। দু'জন পাঁড় মাতাল বন্ধুকে মদ ছাড়িয়ে বন্ধুপত্নীদের কৃতজ্ঞভাজন হয়েছে। দূর সম্পর্কের গৃহত্যাগিনী এক আত্মীয় কন্যাকে ফের গৃহস্থ করেছে। সেদিন তাদের ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল বিভাস। ভিন্ন জায়গায় বসিয়ে মল্লিকা নিজের হাতে ওকে পরিবেশন করেছিল। সেই কৃতজ্ঞ সানন্দ স্মিত মুখ বিভাসের আজও যেন চোখে লেগে রয়েছে।

রুবি অবশ্য অত সহজ নয়। কিন্তু দরকার হলে বিভাসও শক্ত হতে জানে। নাছোড়বান্দা সে-ই কি কম?

দিন কয়েক একটু যেন অন্যমনস্ক দেখাল বিভাসকে। সেই টি পার্টির পর রুবির সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু তার ধরণ ধারণ তেমনিই চলছে। তার ঘরে আগন্তুকদের যাতায়াতের বিরাম নেই। তার নিজের ঢুকবার বেরুবার সময়েরও স্থিরতা নেই কিছু। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে বিভাসকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছে।

উমা একদিন বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি এত গম্ভীর হয়ে গেছ যে।' বিভাস বলল, 'ভাবছি তোমার বন্ধুটিকে এখানে আর বেশি রাখা চলবে না। বাড়িওয়ালাকে বিষয়টা জানাতে হবে।' উমা বলল, 'ওরে বাবা। এতখানি রাগ কি ভালো?' বিভাস বলল, 'না, হাসির কথা নয়। সত্যি এবার একটা step নেওয়া দরকার। জানো ওর জন্যে পাড়ায় এ বাড়ির সুনাম নষ্ট হতে চলেছে।'

উমা বলল, 'কি যে বল। আসলে ওর দেখানোপণাটাই সব। বাড়াবাড়িকে ও বড় বেশি ভালোবাসে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু তারও তো একটা সীমা থাকা চাই।'

উমা বলল, 'বেশ তো। সাধ্য থাকে কথাটা ওকে বুঝিয়ে বল না। বললেও তো কয়েকদিন।'

বিভাস বলল, 'আর এক দিন ভাল করে বলা দরকার হয়ে পড়েছে।'

উমা হাসল, 'তা হলে বল কিন্তু একদিন বললেই কি দরকার মিটবে?

বিভাস একথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু ভ্রূ কুঁচকালো।

একদিন অফিসের প্রবীণ অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভুবনবাবু বললেন, 'বাড়িতে কি অসুখবিসুখ আছে নাকি বিভাসবাবু?'

বিভাস বিস্মিত হয়ে বলল, 'না। কেন বলুন তো।'

ভুবনবাবু বললেন, 'আপনাকে কিছুদিন যাবৎ যেন বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

বিভাস হাসল, 'তাহলে আমার মুখের আদলেরই দোষ। চিন্তা না করলেও তাতে চিন্তার ছাপ পড়ে।'

কিন্তু চিন্তা যে বিভাস একেবারে না করছিল, তা নয়। শুধু রুবির কেন, নিজের ধরন-ধারণও তাকে এতদিনে বিস্মিত করে তুলেছে। তার অফিস আছে, সংসার আছে। দু'একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড়। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যেও কেন যখন তখন তার মনে রুবির মুখের ছায়া পড়ে, এর কারণ? তাছাড়া রুবির সঙ্গে বিভাসের তো কোন মিল নেই। আদর্শে অমিল, রুচিতে অমিল জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন মিল নেই। কিন্তু অমিত্রতা বিভাসের অসহনীয়। সে দেখেছে কোন বন্ধুর সঙ্গে বেশি দিন

মনোমালিন্য পুষে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কথান্তর হয়, মতান্তর হয়, তারপর বিভাস নিজেই যায় মিটমাট করতে। অনেকের সঙ্গেই তার মেলে না। বোধ হয় সেই জন্যেই মিলের জন্য তার এত আগ্রহ। বাইরের আপাতদৃশ্য গদ্যময় কড়া পছন্দ-অপছন্দওয়ালা মানুষের মধ্যে এমন মিত্রাক্ষর ছন্দপ্রিয়তা কি করে থাকে বিভাস তা ভেবে পায় না। তার এই গোপন মনের খবর কেউ জানে না। উমাও নয়। জান্‌বার জন্য সেকি কোনদিন চেষ্টা করেছে? উমা কি কোনদিন ভেবে দেখেছে তার এই কঠিন-উপদেশ নির্দেশের অন্তরালে অন্তরের কোমলতা ফল্গুর মত লুকিয়ে থাকতে পারে? উমা কেবল তার বাইরের সাত্ত্বিকতা দেখেই সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে, সত্ত্বাকে অনুভব করবার চেষ্টা করেনি। আর রুবি? বিভাস বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল। ফের ও মেয়েটির প্রসঙ্গ কেন? রুবি কোনদিনই তাকে বুঝতে পারবে না। কিন্তু কেউ বুঝতে পারলে যেন ভালো হয়, বুঝতে চাইলে যেন ভালো লাগে।

বিভাস মনে মনে ঠিক করল এ মনোবৃত্তিকে কিছুতেই সে প্রশ্রয় দেবে না। কে জানে এ হয়তো প্রবৃত্তিরই ছদ্মরূপ। রুবিকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। ওর রুচি বুদ্ধি নিয়ে ও থাক। সংসারে বিভাসের আরো অনেক কাজ আছে, আছে আরো অনেক দায় দায়িত্ব।

পদ্মপুকুর পল্লী সমিতির সঙ্গে বিভাসের বহুদিনের যোগাযোগ। ওপাড়া ছেড়ে এলেও প্রাক্তন পড়শীদের বিভাস ছাড়তে পারেনি। এখনও সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাব আর কোষাগার রক্ষার ভার বিভাসের ওপর। পাকা হিসেবী বলে সভ্যেরা তাকে সমীহ করে। অফিসের পর আজ ইচ্ছা করেই সেখানে খোঁজ নিতে গেল বিভাস। সভাপতি কি সম্পাদকের দেখা মিলল না। কিন্তু সহকারী সম্পাদক ধরা পড়ে গেলেন। অনেক চাঁদা বাকি, বহু ডোনেশন আদায় করা হয়নি। এ নিয়ে সহকারীর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করল বিভাস, পরের সপ্তাহেই সদস্যদের একটি সাধারণ সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করল। কাজ সেরে উঠতে উঠতে সাড়ে নটা বাজল। বাস থেকে নিজেদের রাস্তার মোড়ে যখন নামল তখন দশটা পাঁচ আর ঠিক সেই সময় তার পাশ দিয়ে একটি মোটর বেরিয়ে গেল। গাড়িতে যিনি রথী, তিনিই সারথি। কালো মোটাসোটা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। বিভাসের চোখ এড়াল না সুভদ্রাবেশিনী যে মেয়েটি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে রয়েছে সে রুবি রায়।

একটু বাদেই আরোহিনীকে মিডল রোডের মাঝপথে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটি ফিরে চলল। কাঁচের উপর 'ডকটর' ছাপ মারা এ গাড়ি বিভাস এর আগেও কদিন তাদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

পার্কটা ছাড়াতেই চোখে পড়ল রুবি খুব আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে। বিভাস কোন কথা না বলে ওকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই রুবি হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনার যে এত রাত হোল ফিরতে।'

বিভাস বলল, 'কাজ ছিল।'

তারপর নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

পথ প্রায় নির্জন, দু একটা বিড়ির দোকান ছাড়া আর সব দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে।

তাকে গাড়িতে করে কে লিফট দিয়ে গেল বিভাস যে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করল না তাতে রুবি আশ্বস্ত হোল, কিন্তু তাই বলে বিভাস কোন কথাই বলবে না, রুবির মত মেয়ের পাশাপশি চলেও তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে, তা রুবি সহ্য করে কেমন করে? তাকে দেখে লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা যে কোন রকমের বিকারই পুরুষের আসুক না, সে তা বুঝতে পারে, তার সঙ্গে যুঝতে পারে—কিন্তু কারো নির্বিকার ঔদাসীন্য সে সইতে পারে না।

রুবি বলল, 'তাহলে অনেক রাত অবধি আপনারও মাঝে মাঝে কাজ থাকে? আমি তো ভেবেছিলাম উমার চিরন্তন সান্ধ্য আইন আপনার ওপর জারী করা আছে।'

বিভাস একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কাজকর্ম থাকলে আমার ফিরতে একেকদিন এমন রাত হয়। যে জন্য আজও কোন সান্ধ্য আইন জারী হয়নি। কিন্তু আপনার ওপর জারী হলে ভালো হোত।'

বিভাসের কথার ভঙ্গিতে রুবি একটু থমকে গেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'তাই নাকি? করে দেখুন না জারী।' বিভাস রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'জারী করবার দায়িত্ব আমার নয়। দায়িত্ব আপনার। আপনার চলা ফেরা নিয়ে পাড়ায় কথা উঠেছে। রাস্তায় বিড়িওয়ালারা পর্যন্ত আপনাকে দেখে হাসে, আড়ালে-আবডালে নানারকম কথা বলে।'

রুবি বলল, 'বললই বা। বিড়িওয়ালা হলেও ওরা তো দাড়িগোঁফওয়ালা পুরুষ। আমাকে দেখে কিছু না কিছু reaction ওদের হবেই, যেমন আপনার হচ্ছে।'

বিভাস বলল, 'ঠাট্টা নয়। এর পর থেকে আপনার সমঝে চলা দরকার।'

'সমঝে না চলার কি দেখলেন?'

'এত রাত্রে আপনার মত একজন অবিবাহিতা মেয়ের আর একটি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মোটরে করে বেড়ানোটা খুব রুচিসম্মত নয়। অন্তত আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পাড়ায় তা দৃষ্টিটুকুই লাগে।' ফের একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল রুবি। বিভাস যে তার মুখের ওপর এসব কথা এমন ভাবে বলতে পারবে—তা যেন সে আশা করেনি। একটু বাদে ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আপনার যত রাগ মোটর গাড়ি বলে। রিক্সা হলে বুঝি আর দুঃখ ছিল না? সুরেনবাবু আমাদেরই কোম্পানির ডাক্তার। রাত হয়েছে বলে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এতটা পথ কিছুতেই রিক্সা করে আসা যেত না, আপনি যাই বলতে চান না কেন।'

বিভাস বলল, 'আমি কিছুই বলতে চাইনে। কিন্তু এখানে নিজেকে সামলে না নিলে আপনি বড় মুশকিলে পড়বেন।'

সদরের কড়া নাড়তেই উমা এসে দোর খুলে দিল। দুজনকে একসঙ্গে দেখে সে যে একটু বিস্মিত হয়েছে—তা তার মুখের ভাবে গোপন রইল না।

রুবি বলল, 'কি চমকে গেলি নাকি? ভয় নেই দুজনে মিলে এতক্ষণ পার্কে বসে গল্প করিনি। রাস্তার মোড়ে দেখা। সেখান থেকে ঝগড়া করতে করতে ফিরছি।'

দিন দুয়েক বাদে বাড়িওলা শ্রীবিলাস দত্ত বিভাসের খোঁজ নিতে এলেন। কি খবর মুখুজ্যে মশাই। এক পাড়ায় থাকি অথচ দেখা সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে না। আর মশাই দিনের পর দিন যা হচ্ছে। তারপর সব ভাল তো?'

বিভাস বলল, 'এই চলছে এক রকম। বসুন শ্রীবিলাসবাবু।'

বাইরের ঘরের তক্তপোষে ভালো হয়ে বসে একথা ওকথার পর শ্রীবিলাসবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'ইয়ে আপনার সঙ্গে একটা কথার জন্য এসেছি। এই বাড়িতে দুখানা ঘর নিয়ে আর একটি মেয়ে যে থাকে তার চালচলন স্বভাব চরিত্র কিরকম মনে হয় আপনার?'

বিভাস একটুকাল আরক্ত হয়ে থেকে বলল, 'একটি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ের সম্বন্ধে এসব প্রশ্ন ওঠেই না।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে কিনা তাই। ঘর দুখানা ভাড়া নেওয়ার সময় উনি বললেন—ওঁর পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে থাকবেন, এখন দেখছি তাঁরা কেউ আসছেন না, অথচ নানারকম লোকজন বাড়িতে আসছে যাচ্ছে।'

বিভাস বলল, 'মিস রায় একটি Insurance কোম্পানীর এজেন্ট। সেই connection-এ কেউ কেউ আসেন। তা ছাড়া ওঁর আত্মীয়স্বজনও আছেন। শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'তা তো ঠিকই। তবে আমি ভাবছিলাম ওঁর তো দু'খানা ঘরের দরকার হয় না।

মিছিমিছি এত ভাড়াই বা উনি কেন টানেন। উনি তো স্বচ্ছন্দে মেয়েদের কোন হোস্টেলে টোস্টেলে গিয়ে থাকতে পারেন। এদিকে আমাকে আর এক ভদ্রলোক এসে ধরেছেন। স্ত্রী পুত্র নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন তিনি। তাঁর দুখানা ঘরের দরকার। তাই ভাবছিলাম আপনার পক্ষেও সুবিধে হোত। বেশ ভদ্রলোক প্রতিবেশী পেতেন। আপনাকে কোন রকম অসুবিধে ভোগ করতে হোত না। এ ধরনের tenant কি আর আমাদের মত গৃহস্থ বাড়িতে মানায় মশাই?'

একটু অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন শ্রীবিলাসবাবু।

বিভাস গম্ভীর ভাবে বলল, 'গৃহস্থ বাড়ির অনুপযোগী বেমানান কিছু মিস রায় করেননি। তিনি যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিতা, ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার তো মনে হয় তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে হলে শিষ্টাচার ও শোভনতা মেনেই করা উচিত।'

শ্রীবিলাসবাবু বিভাসের মুখের দিকে তাকালেন, 'অবশ্য আপনি যদি certify করেন তাহলে তো কোন কথাই থাকে না। আমি একটু অন্যরকম শুনেছিলাম কিনা। কিন্তু আপনি যখন বলছেন—আচ্ছা, ওঠা যাক আজকের মত।'

শ্রীবিলাসবাবু বেরিয়ে গেলেন। আর বিভাস অন্যমনস্কের মত সেখানেই বসে রইল।

উমার মেসিনে একটা ব্লাউজ সেলাই করে নেওয়ার জন্যে ওদের ঘরে ঢুকেছিল রুবি, উমা একটু আগে বাথরুম গেছে—তার ধারা স্নানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু মেসিনের কাছে বসবার আগেই বাইরের ঘর থেকে বিভাস আর শ্রীবিলাসবাবুর মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ তার কানে এল। নারীসুলভ কৌতূহলে আস্তে আস্তে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রুবি। সব শুনল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেল। ব্লাউজ সেলাইয়ে আর মন বসল না।

ঘরে গিয়ে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল রুবি। শ্রীবিলাস দত্ত যখন তার বিরুদ্ধে অশোভন ইঙ্গিত করছিল, তার সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক চাপড়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছা জাগছিল রুবির। কিন্তু যাওয়ার দরকার হোল না। বিনা চড় চাপড়েই বিভাস শ্রীবিলাস দত্তর মুখ বন্ধ করে দিল। শ্রীবিলাস যেন বিভাসকেই অপমান করেছে তার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছিল রুবির। এমন মুখের দেখা যেন অনেককাল বাদে মিলল, যেন এই প্রথম মিলল। নিজের ওপর অন্যায় অবিচারের প্রতিকার নিজে না করে যদি তার হাতে তুলে দেওয়া যায়, যদি আর কেউ স্বেচ্ছায় তুলে নেয় সে ভার—আশ্চর্য, আজও দেখতে ভালই লাগে, আজও ভাবতে ভালই লাগে।

কিন্তু সত্যিই এসব কি ভাবছে রুবি। বিভাস যা করেছে যে কোন সাধারণ ভদ্রলোকও তাই করত। এ তো নিতান্তই শিষ্টাচার আর সৌজন্য। তাতে এত তার ভাবালুতার কি আছে। রুবির জন্য সৌজন্য দেখাবার লোকের অভাব আছে নাকি? মনে হয় বিভাস যেন তবু আলাদা। সে সব লোকের চেয়ে বিভাস আলাদা স্বতন্ত্র। রুবি নিজের মনেই হাসল। কি স্বাতন্ত্র্য আছে ওর মধ্যে? কোন্ বৈশিষ্ট্য রুবি ওর মধ্যে আবিষ্কার করল? নিতান্তই সাধারণ কেরানী গৃহস্থ। হাতে নীতিধর্মের গতানুগতিক ধ্বজা। রুবি একটু যদি বাঁকা চোখে তাকায় ও ধ্বজা হেলে পড়বে, ঢলে পড়বে, রুবি অমন অনেক ধ্বজাধারীকে দেখেছে। সব পুরুষ সমান, সব পুরুষ সামান্য। আশ্চর্য একথা জেনেও রুবি ওদের বাদ দিয়ে চলতে পারে না, দুহাতে ওদের দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হাতে কলমে পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষের সামান্যতা প্রমাণের ভার কে যেন ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। সে দায় থেকে ওর রেহাই নেই। বড় একঘেয়ে দায়িত্ব। এতে আর যেন কোন বৈচিত্র্য নেই, কৌতুক নেই, রস নেই, রঙ নেই। বরং মাঝে মাঝে রঙের ছাপ পড়ে যখন একজনের অপমানে আর একজনের মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে, যখন একজনের জন্য আর একজনের মনে মমতার ছোঁয়া লাগে। মনে হয় সে ছোঁয়া যেন পুরুষের প্রথম ছোঁয়া, উষালগ্নে সোনার কাঠি দিয়ে সূর্য যেমন

করে পৃথিবীকে ছোঁয়।

কি একটা কবিতায় যেন পড়েছিল রুবি। তার ছন্দটুকু মনে নেই গন্ধটুকু আছে।

'কিন্তু আমি অসূর্যম্পশ্যা।'

রুবি নিজের মনে হেসে উঠল। গা ঝাড়া দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দিন কয়েক একটু যেন ভাবান্তর দেখা গেল রুবির। লোকজনের ভিড় ভেঙে দিয়ে ও যেন নিবিড়তা খুঁজছে। আজকাল ঠিক সন্ধ্যার পরেই ঘরে ফেরে। কোনদিন বইপত্র নাড়াচাড়া করে, কোনদিন সেতার নিয়ে বসে।

উমা একদিন স্বামীকে বলল, 'শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতলে বলে মনে হচ্ছে। দেখেছ কি রকম শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটি বনে গেছে রুবি। তোমার শাসনের ফল।' বলে উমা একটু হাসল।

বিভাস স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'শাসন নয়, স্নেহ। শাসনে কিছু হয় না, আমি এতদিন ভুল করেছি উমা।'

স্বামীর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে উমা হেসে বলল, 'সর্বনাশ। তুমি ওকেও এমন করে স্নেহ জানিয়ে আসনি তো?'

বিভাস বলল, 'ছি।'

সেদিন রুবির বিরুদ্ধে শ্রীবিলাস দত্তের অভিযোগের অমন তীব্র প্রতিবাদ করে বিভাস নিজেই বিস্মিত হয়েছিল। রুবির চালচলন একটু যে বিসদৃশ—তা তো অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু বাইরের কারো কাছে সে কথা স্বীকার করতে বিভাসের যেন আত্মমর্যাদায় বাধল। রুবির মর্যাদার সঙ্গে তার মর্যাদা সেই মুহূর্তে যেন অভিন্ন হয়ে গেল। এ ধরনের ঐক্যবোধ যেন অপ্রত্যাশিত, অননুভূত। তবু দু'একবার সংশয়ের খোঁচা লাগল বিভাসের মনে, এতে ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হোল না তো? কিন্তু রূপান্তর দেখে বিভাসের মন ফের উল্লসিত হয়ে উঠল। তার সেই মমত্ববোধের ফল যেন হাতে হাতে মিলেছে। আপাতদৃশ্য এত অনৈক্যের মধ্যেও সেই অন্তর্নিহিত ঐকতান মিলিয়ে যায়নি। সেতারের তারে তারে সুর ধ্বনিত হচ্ছে। তাৎক্ষণিক, তা ক্ষীণ, কিন্তু সংবেদনহীন নয়।

সপ্তাহ খানেক বাদে সেদিন উমা কিন্তু বড় অদ্ভুত খবর দিল। ছেলেকে দুধ বার্লি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে উমা বলল, 'আজ একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে বলতে পারি কিন্তু আমার গা ছুঁয়ে বল আর কাউকে বলবে না।'

বিভাস বলল, 'গা তো ছুঁয়েই আছি। নতুন করে ছুঁতে হবে নাকি।'

উমা বলল, 'কিন্তু কাউকে বলবে না, কথা দাও।'

বিভাস বলল, 'এ যে একেবারে আদালতের শপথ। বেশ বলব না কাউকে।'

উমা বলল, 'বিকেলে রুবির এক দেবর এসেছিল আজ।'

বিভাস হেসে বলল, আজ পর্যন্ত 'ওর বরই হোল না, তার আবার দেবর।'

উমা বলল, 'এতদিন তো আমরাও তাই জানতুম। কিন্তু আজ শুনলুম সবই হয়েছিল, শেষে ছাড়াছাড়ি হয়েছে।'

রুবি বিবাহিতা এ সংবাদে কেন যেন বিভাস ভারি অস্বস্তি বোধ করল। অকারণে একটা খোঁচা লাগল বুকের মধ্যে, একটু চুপ করে থেকে বিভাস বলল, 'কিন্তু তোমার কথা যে সত্য, সেই দেবর যে জাল দেবর নয়, তার প্রমাণ কি।'

উমা একটু হাসল, 'দেখ, জাল স্বামী সেজে কারো লাভ থাকতে পারে, কিন্তু জাল দেবর সেজে লাভ কি। ওর দেবর যে জাল নয়, সে কথা শেষ পর্যন্ত রুবি স্বীকার করেছে।'

বিভাস এরপর জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'ব্যাপারটা কি।'

ঘটনাটা উমা তখন আগাগোড়া খুলে বলল। বিকেলের কাজকর্ম সেরে উমা তখন সবে উনুনে আঁচ দিয়ে চায়ের জল বসিয়েছে, সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। কিন্তু উমার নড়তে ইচ্ছা করে না। ঠিকে ঝি কাদম্বিনী আজ কাজ কামাই করেছে। সেজন্য উমার মেজাজ খারাপ। বাবলুকে নিয়ে পিসীমা গেছেন পাশের বাড়ি। রুবি তখনো ফেরেনি। অগত্যা উমাকেই উঠে দাঁড়াতে হোল। দোর খুলতে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি সুবেশ সুদর্শন যুবক অপ্রতিভ হয়ে সরে দাঁড়াল।

উমাই প্রথমে কথা বলল, 'কাকে চান।'

'রেবা চন্দ আছেন?'

উমা বলল, 'রেবা চন্দ বলে কস্মিনকালেও কেউ এখানে থাকেন না। রুবি রায় বলে একটি মেয়ে আছেন।'

যুবকটি একটু হাসল, 'হ্যাঁ, ওই নামই আজকাল নাকি তিনি নিয়েছেন শুনেছি। আমাদের বংশের পদবীটা ছেঁটে ফেলেছেন।' উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনাদের বংশের পদবী মানে?' 'আমার বউদি। জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী।'

উমা বলল, 'কিন্তু রুবি তো কুমারীর বেশে থাকে। ওর তো বিয়ে হয়নি।'

যুবকটি একটু ইতস্তত করে বলল, 'বিয়ে ঠিকই হয়েছিল কিন্তু ডাইভোর্স হয়নি। হিন্দুমতে এখনো তো তার বিধান নেই। তবে উনি বোধ হয় নিজেই একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।'

একটু চুপ করে থেকে উমা বলল, 'রুবি এখন নেই। একটু বাদেই ফিরবে। আজকাল সকাল সকালই আসে। আমাদের বাইরের ঘর খুলে দিচ্ছি, আপনি সেখানে অপেক্ষা করতে পারেন।'

যুবকটি কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, 'তাহলে খুবই ভালো হয়। আমাকে আজ রাত্রেই দিল্লী রওনা হতে হবে। আমি সেখানেই সেক্রেটারিয়েটে কাজ করি। ভাবলাম ওঁর ঠিকানা যখন পেলাম, একবার দেখা করে যাই।'

উমা বলল, 'বেশ তো, ভালো কথা নাম কি আপনার।'

'সুবিনয় চন্দ।'

'আর আপনার দাদার নাম? রুবির স্বামীর?'

উমা কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না।

সুবিনয় সবিনয়ে বলল, 'মাফ করবেন!'

তারপর উমা অতিথিকে চা আর খাবার এনে দিল। বিভাসের জন্য যে খাবার তৈরী করে রেখেছিল তারই ভাগ দিল সুবিনয়কে। কিন্তু এত ঘুষ দিয়েও আর কোন তথ্য বের করতে পারল না। সুবিনয় ভারি সাবধান হয়ে গেছে।

খানিক বাদে রুবি ফিরল। আর সুবিনয়ের দিকে চোখ পড়তেই তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'ভিতরে এসো।'

আধঘণ্টাখানেক বাদে সুবিনয় বেরিয়ে চলে গেল। তার মুখ থম থম করছে।

উমা এক ফাঁকে রুবিকে গিয়ে ধরল, 'ভদ্রলোক বলছিলেন উনি নাকি তোর দেবর? সত্যি নাকি রে?'

রুবি গম্ভীর মুখে বলল, 'ভদ্রলোক কি কখনো মিথ্যা কথা বলে?'

উমা বলল, 'ধন্যি মেয়ে বাবা। তোর পেটে পেটে এত! দেবর তো বেরুলো। তার দাদাটি বেরুবে কবে। ব্যাপারটি কি রুবি।'

'তোর যা খুশি তাই আন্দাজ করে নে।'

বলে উমার মুখের ওপর রুবি সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল।

কাহিনী শেষে উমা স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ভিতরের ব্যাপারটা কি বলে তোমার মনে হয়?'

বিভাস বলল, 'কি করে বলব।'

উমা বলল, 'কিন্তু বিয়ে যে ওর হয়ে গেছে তা একেবারে নির্ঘাত সত্য। অনেকদিন আগে আমি ওর ট্রাঙ্কের মধ্যে ওড়নাসুদ্ধু একখানা বেনারসী শাড়ি দেখেছি, বিয়ের সময় ছাড়া অমন দামী শাড়ি মেয়েদের হয় না। এও তার একটা প্রমাণ।' বিভাস একটু চুপ করে থেকে বলল, 'প্রমাণ বইকি। বিয়ের পর মেয়েরা স্বামী ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু শাড়ি যদি দামী হয় তা প্রাণ গেলেও ত্যাগ করে না।'

উমা বলল, 'আহাহা সব মেয়েই সমান কিনা। ওর যে বিয়ে হয়েছে ভিতরের আরো অনেক লক্ষণ দেখেও তা বোঝা যায়। আমার তখনই একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি।' 'ওসব আলোচনা থাক উমা। বড় ঘুম পাচ্ছে।' বলে বিভাস পাশ ফিরল। কিন্তু স্বামী যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগেই রইল তা উমার বুঝতে বাকি রইল না।

পরদিন থেকে রুবির চালচলনে আবার ঠিক আগের ধরন ফিরে এল। সেই পক্ক বিম্বফল নিন্দিত অধর, ব্রেসিয়ারবন্দী উত্তুঙ্গ স্তনচূড়, আস্কন্ধলম্বিত অলকদাম, সুর্মারঞ্জিত চোখে বিদ্যুৎঝলক।

উমা বলল, 'কিরে আজকাল আবার এত রাত করছিস ফিরতে? রুবি জবাব দিল, 'কি করব বল আজকাল রাতেই তো স্যুটিং হচ্ছে।'

উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'স্যুটিং মানে! তুই শেষে সিনেমায় নামলি না কি?'

রুবি হেসে বলল, 'তুই যে আকাশ থেকে নামলি। একদিন যাবি আমার সঙ্গে স্টুডিওতে? দেখবি কাণ্ড কারখানা? যাস তো কাল চল।'

উমা বলল, 'না ভাই দরকার নেই। তোদের ছবি যখন রিলিজড হবে তখন দেখব, সেই ভালো।'

রুবি একটু হাসল, 'সব ছবিই কি আর রিলিজড হয়? আচ্ছা যদি হয় তো দেখিস।'

উমার মেজদা তপনের বিয়ে। সেই উপলক্ষে ওর বাবা রাজমোহনবাবু নিজেই নিতে এলেন দিন চারেক আগে। আনন্দের কথা। কিন্তু উমার যেন যেতে মন সরে না। এই অবুঝ মনকে তো কারো কাছে খুলে ধরা যায় না। তবু স্বামীর কাছে কি একেবারে না খুলে পারা যায়?

'তোমাকে ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।'

বাক্স গুছাতে গুছাতে উমা বলল।

বিভাস বলল, 'কিন্তু আমাকে নিয়েই বা কি করে যাবে। অফিসেরও যে আমাকে ছাড়তে ইচ্ছা নেই।'

'আহা কদিনের জন্য বুঝি ছুটি নিতে পার না?'

বিভাস বলল, 'কদিন তো ভালো, আমাদের অফিসে শালার বিয়েতে একদিনও ছুটি দেবার নিয়ম নেই।'

'তাহলে নিজের বিয়ে বলেই ছুটি নাও। দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাচ্ছ বলে দরখাস্ত কর।'

বিভাস বলল, 'তোমার পরামর্শটা ভেবে দেখব। ততদিন তুমি কোন চিন্তা ভাবনা কোরো না। এইতো এখান থেকে এখানে। কলকাতা থেকে উত্তরপাড়া। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হতে হবে এমন তো নয়।'

উমা বলল, 'তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমাকে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার করতে পারলেই তুমি বাঁচ।'

পাশের ঘর থেকে রাজমোহনবাবু তাড়া দিয়ে বললেন, 'ও বুড়ি, তোর হোল নাকি? গাড়ির সময় কিন্তু হয়ে গেছে।'

উমা বলল, 'যাই বাবা।'

রাজমোহনবাবু সুরবালাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এবার বুড়ি গিয়ে মাস খানেক আমাদের ওখানে থাকবে, বুঝলেন বেয়ান? কিন্তু আপত্তি করতে পারবেন না।'

সুরবালা হেসে বললেন, 'ঘর সংসার ফেলে যদি থাকতে পারে, এক মাস কেন, ছ মাস গিয়ে থাকুক না, আমার আপত্তি কিসের।'

রাজমোহনবাবু বললেন, 'বিভাস তো শুনেছি বিয়ের দিন ছাড়া যেতে পারবে না। আপনি কিন্তু ওর সঙ্গে অবশ্যই যাবেন।'

সুরবালা শুধু হাসলেন—কোন কথা বললেন না।

যাওয়ার আগে রুবির ঘরে গিয়ে ওর সঙ্গেও একবার দেখা করে এল উমা।

রুবি বলল, 'দাদার বিয়েতে যাচ্ছিস। খুব ফুর্তি, না?'

উমা বলল হেসে, 'স্বামী রত্নটিকে রেখে গেলাম।'

'আচ্ছা যা। অযত্ন হবে না।' রুবি একটু হাসল, 'তোর বরং ভয়, অতি যত্ন না হয়।'

উমা বলল, 'ঈশ, অত ভয় নিয়ে আমি বাস করিনে। কারো যত্ন করা তোর ধাতে নেই তা আমি জানি।'

রুবি গম্ভীর ভাবে বলল, 'তাহলে তো জানিসই।'

দিন দুই বাদে অফিস থেকে ফিরে এসে বিভাস দেখল একটা এনভেলপ তার ঘরের মেঝেয় পড়ে রয়েছে। তুলতেই চোখে পড়ল চিঠিটা তার নয়, রুবি রায়ের। ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটু ইতস্তত করল। তারপর নিজেই চিঠিটা হাতে নিয়ে রুবির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রুবির উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনার একটা চিঠি পিওন ভুল করে আমার ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে। নিয়ে যান।'

রুবি বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, বিভাসের গলা শুনে দোরের সামনে এসে দাঁড়ল, সাজসজ্জা এখনো শেষ হয়নি। বিভাসের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ভাগ্যে পিওনের ভুল হয়েছিল। না হলে আপনি তো ভুলেও এদিক মাড়াতেন না। ভিতরে আসুন।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু আপনি তো বাইরে যাচ্ছেন।'

রুবি একটু হাসল, 'বেশ তো আপনি বসে বসে আমার শূন্য ঘর পাহারা দেবেন। তাতে তো আপনার কোন অসুবিধে নেই। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। আসুন, আমার বাইরে যাওয়ার অনেক দেরী আছে।'

ইচ্ছা সত্ত্বেও আমন্ত্রণটা বিভাস উপেক্ষা করতে পারল না। মনে হোল—শিষ্টাচারের হানি হবে।

ঘরে ঢুকে ছোট সোফাটায় গিয়ে বসতে বসতে বিভাস বলল, 'কিন্তু আপনার মেক আপ তো এখনো শেষ হয়নি।'

একটু শ্লেষের সুর ফুটল গলায়।

রুবি তেমনি শ্লেষের ভঙ্গিতেই বলল, 'শুরুতে যেটুকু হয়েছে আজকের মত তাই যথেষ্ট।'

তারপর চিঠিটা খুলে দু'চার লাইন পড়েই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে রুবি সেগুলি গলিয়ে ফেলে দিল।

বিভাস বলল, 'ফেলে দিলেন যে।'

রুবি বলল, 'কি করব বলুন। এসব উড়ো চিঠি উড়িয়েই দিতে হয়, ঘরে জড়ো করে রাখা যায় না।'

বিভাস একটু ইতস্তত করে বলল, 'লোককে উড়ো চিঠি লেখবার সময় কেন দেন?'

রুবি কি বলতে যাচ্ছিল—সুরবালা এসে দোরের সামনে দাঁড়ালেন, 'তোর চা আর খাবার ওঘরে রেখে এসেছি। খাবি আয়।'

রুবি তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঁর চা আর খাবার আমি এঘরে নিয়ে আসছি, পিসীমা চলুন।'

বিভাস হঠাৎ কোন আপত্তি করতে পারল না।

সুরবালা গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বেশ।'

সুরবালার তৈরী চা আর প্লেটে করে দুখানা পরোটা তরকারি নিয়ে এসে রুবি বিভাসের সামনে রাখল, তারপর একটু হেসে বলল, 'পিসীমা জিজ্ঞেস করছিলেন আমি ঠোঁটে রং মাখি কেন?'

বিভাস বলল, 'আপনি কি জবাব দিলেন?'

রুবি বলল, 'জবাব না দিয়ে আমিও জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন সিঁথিতে রং মাখেন পিসীমা? ভালো দেখায় বলেই নয় কি? নইলে ওঁর পক্ষে এ সিঁদুরের আর তো কোন মানে নেই।'

বিভাস বলল, 'ওঁর কাহিনী তাহলে আপনি শুনেছেন?'

রুবি বলল 'হ্যাঁ। এতদিনে আমার কাহিনীও হয়তো ওঁর কানে গেছে তাই কেউ কাউকে দেখতে পারিনে।'

বিভাস বলল, 'ওঁর সঙ্গে আপনার কি মিল আছে আমার জানা নেই। ওঁর সন্তান হয়নি, এই অপরাধে পিসেমশাই দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন। তা সত্ত্বেও পিসীমা স্বামীর ঘর, সতীনের ঘর করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু ওঁরা রাজী হলেন না। ওঁর সতীন ভাবলেন উনি উপস্থিত থাকলে তাঁর ছেলেমেয়ে বাঁচবে না। পিসীমাকে বাধ্য হয়ে বাবার আশ্রয়ে আসতে হোল। তারপর থেকে আমাকে তিনি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। এবার পালা আমার ছেলের। আজকাল বাবলুই ওঁর সমস্ত শূন্যতা ভরে দিয়েছে। স্বামী ত্যাগ করলেও পিসীমা তাঁদের মঙ্গল কামনা ত্যাগ করেননি। তাই ওঁর পাকা চুলের ভিতর দিয়ে যে সিঁদুরের রেখা গেছে—তার রঙও পাকা।'

চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে বিভাস রুবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি বরং চা নিন এর থেকে। একটা কাপ আনুন। রুবি বলল যাক কারো অর্ধাংশভাগিনী হয়ে আর কাজ নেই। চা আমি একটু আগে খেয়ে নিয়েছি। আপনি বরং এই তোয়ালেটা নিন, হাত মুছুন।'

বলে আলনা থেকে একখানা সাদা টার্কিশ তোয়ালে পেড়ে আনল রুবি, 'আনকোরা নতুন না হলেও, সদ্য ধোপা বাড়ি ফেরৎ, কোন অসুবিধা হবে না আশা করি।'

একটু থেমে রুবি বলল, 'পিসিমার সিঁথির সিঁদুরের রঙ কতখানি পাকা জানিনে কিন্তু তার ভাইপোর কথাগুলি আমার কাছে বড়ই কাঁচা লাগল বিভাসবাবু। যত ফাঁপা আর ফাঁকা কথা। জীবনের শূন্যতা শুধু বড় বড় কথায় কোন দিনই ভরে না। পিসীমার মনে ভয় ছিল তাই আপনাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু আমার কোন ভয় নেই, তাই আপনাদের আশ্রয় দিচ্ছি।'

বিভাস উঠবার ভঙ্গি করে বলল, 'আপনার বাইরে যাওয়ার কথা ছিল—'

রুবি বলল, 'যাওয়ার সময় সরে গেছে। তাছাড়া বাহিরকে যখন ঘরে আনতে পেরেছি, আজ আর বাইরে যাওয়ার দরকার কি। আপনি সুস্থ হয়ে বসুন। আপনাকে আর একটা গল্প বলি। সে গল্প আপনি শুনেছেন, কিন্তু সবটুকু শোনেননি। এঘরের বালব্‌টা বড় বেশি জোরালো, অফ করে দিলে কি অসুবিধা হবে?'

বিভাস বলল, 'না। আপনার ইচ্ছা হয় দিন।'

রুবি বলল, 'ভয় নেই, একেবারে অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন না। জানলা দিয়েও বাইরে থেকে আলো আসবে।'

বলে হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ করে দিল রুবি। দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

বিভাস একটু নড়ে চড়ে বসে বলল, 'কি বলবেন বলছিলেন।'

রুবি যেন চমকে উঠল, 'হ্যাঁ বলি। উমা সেদিন বলছিল আমাকে নাকি তার ডিটেকটিভ নায়িকা বলে মনে হয়। আমি জবাব দিলাম শুধু কি একটি কাহিনী? আমাকে নিয়ে অন্তত খান চারেক ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা চলে। আমি তো আর তোর মত গার্হস্থ্য উপন্যাসের নায়িকা নই, গোয়েন্দা কাহিনীর নারী বোম্বেটে। কত খুন জখম—'

বিভাস বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনিও তো গার্হস্থ্য উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ছেড়ে এলেন কেন?'

এমন সরাসরি প্রশ্নের জবাবে রুবি ফের একটুকাল নিরুত্তর হয়ে রইল, তারপর বলল, 'ধরুন, স্বামীর সঙ্গে আদবকায়দার রীতিতে রুচিতে বনিবনাও হোল না। রাতদিন ঝগড়া করার চেয়ে একেবারে চিরদিনের ছেদ টানলাম।'

'শুধু রুচির অমিল?'

রুবি বলল, 'কেন বিশ্বাস হচ্ছে না? সংসারে রুচির অমিল কি বড় অমিল নয়? আপনার সঙ্গে আমার যে অমিল সেও তো বেশির ভাগ রুচিরই।'

বিভাস একটু বিরক্ত ভাবে বলল, 'এসব কথা থাক। আপনাদের ছাড়াছাড়ি কেন হোল, যদি আপনার বলতে বাধা না থাকে বলুন। আর যদি সংকোচ বোধ করেন বলে কাজ নেই।'

আরও একটুকাল চুপ করে থাকবার পর রুবি বলল, 'না, সংকোচ কিসের। আপনি বরং শুনুন, সেই ভালো। বছর পাঁচেক আগে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরেই আমার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী বিদ্বান বুদ্ধিমান, রূপবান রুচিবান পুরুষ। নামকরা একটা গ্লাস ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার। দিনগুলি ভালই কাটছিল, কিন্তু একদিন রাত্রে এসে হঠাৎ তিনি বললেন—তোমরা ঘরে বসে শুধু বি. এ. পাসই করেছ কিন্তু না পারো একটা লাইন ইংরেজী লিখতে, না পারো একটা কথা শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে, কিন্তু আমাদের আইভি মাত্র ম্যাট্রিক পাস হলে কি হবে। চলনে বলনে তোমার মত অনেক গ্রাজুয়েটকে ও হার মানায়।' তুলনাটা কাঁটার মত বিঁধল। বললাম—'তোমার সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্টেনোগ্রাফারটিতো দেখলেই মনে হয় এক বিশেষ শ্রেণীর মেয়ে।'

বিভাস বলল, 'তারপর?'

স্বামী এই মন্তব্যে খুশী হলেন না, বরং চটে উঠলেন।

বললেন,—তুমি ওকে জানো না। অনেক স্টেনোগ্রাফার তো দেখেছি, কিন্তু এমনটি পাইনি। আমার বারো আনি কাজ ও করে দেয়। যে কোন assistant-এর চেয়ে বেশি সাহায্য পাই ওর কাছে। টাইপ রাইটারের ওপর যখন ওর আঙুলগুলো চলতে থাকে তখন একটা দেখবার মত জিনিস হয়। আমি বললাম 'আমাকে একটা টাইপরাইটার কিনে দাও, আমি ওর চেয়ে ভালো জিনিষ তোমাকে দেখাব। দিন কয়েক বাদে তিনি টাইপরাইটার কিনে আনলেন না, আনলেন নানারকম প্রসাধনের জিনিস, আইভি সিমন যে সব ব্যবহার করে। অফিসের পরে তাকে নিয়েই এগুলি ঘুরে ঘুরে কিনেছেন তা আমি দু একটা কথা জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারলাম। ভয়ানক রাগ হোল আমার। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জিনিসগুলি। কিন্তু রাত্রে শোয়ার আগে ফের সেগুলি কুড়িয়ে এনে আয়নার কাছে বসে অপটু হাতে একটু একটু টয়লেটের চেষ্টা করে বললাম, 'দেখতো কেমন হোল।'

স্বামী বললেন, 'কিছুই হয়নি। আমারই ভুল হয়েছিল ওসব তোমাকে মানায় না।'

আমি একবার ভাবলাম জিনিসগুলি ফের জানলা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু কি ভেবে বাক্সে তুলে রাখলাম। পরে সেগুলি কাজে লেগেছিল।

'আইভির' মত টয়লেট আমাকে মানাল না, কিন্তু স্বামীর পাশে তাকে বোধ হয় ভালোই মানাল। ওদের দুজনের নামে নানারকম কথা শোনা যেতে লাগল। অনেক রাত করে স্বামী বাড়ি ফিরতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন—অফিসের কাজ। রাত্রে একদিন তাঁর মুখে মদের গন্ধ পেলাম, ঠোঁটে দেখলাম লিপস্টিকের দাগ। স্বামী প্রথমে অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেন, না পেরে শেষে স্বীকার করে বললেন—এসব তো নিতান্তই বাইরের জিনিস। তুমি যদি ওদিকে না তাকাও ঘরের শান্তি, ঘরের পবিত্রতা তাতে নষ্ট হবে না।

কিন্তু আমি চোখ বুজে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম যতদূর চোখ যায় যাব। কিন্তু চোখ দুটো কলকাতা শহরের মধ্যেই আটকে রইল। উঠলাম এক বোর্ডিং-এ। নিলাম চাকরি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সবাই ধিক্কার দিল, নিজের হকের ধন কেন ছেড়ে এলি মুখপুড়ী। বললাম—অচল টাকায় থলি ভরে লাভ কি। পিসীমার মত এয়োতির চিহ্ন আমিও দু-একদিন রেখেছিলাম। কিন্তু দেখলাম তাতে অসুবিধা আছে। অনেক কৈফিয়তের পাল্লায় পড়তে হয়। তাই সুবিধা মত সাবান ঘষে সিঁদুরের দাগ একদিন তুলে ফেললাম।

বছর দেড়েক বাদে স্বামীর জীবন থেকে আইভি আর ম্যানেজারী দুটোই খসে পড়ল। তিনি আমার খোঁজ নিতে এসে দেখলেন, ততদিনে আরো একজন এসেছে।'

বিভাস আহত হয়ে বলল, 'আরো একজন? এত অভিজ্ঞতাতেও আপনার শিক্ষা হোল না?'

রুবি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, কই আর হোল। অভিজ্ঞতা অভ্যস্ততার জন্ম দেয়, আর কিছু দেয় না, দুজনই দুজনকে দেখে চমকে উঠলেন। কারণ একজনের অস্তিত্ব আর একজনের কাছে এতদিন গোপন ছিল। ফলে দুজনকেই হারালাম, হারালাম না বাঁচলাম। অভিভাবকদের উপদেশে স্বামী গিয়ে ফের বিয়ে করলেন।'

বিভাস বলল, 'বিয়ে করলেন?'

'হ্যাঁ, তাঁর আর কি করবার ছিল?'

বিভাস বলল, 'তারপর?'

তারপর শুনলুম আইভি মরে গেছে। কিন্তু মরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না। আমার মধ্যে ভূত হয়ে এসে ঢুকল। দেখলাম যেভাবে আমাকে চলতে হয়, নানারকম লোকজনের সঙ্গে যেভাবে মিশতে হয়, তাতে কূলবধূ সাজতে গেলে সময়ে কুলোয় না। তার চেয়ে আইভির বেশ অনেক ভালো। তাতে সাধারণ পুরুষের সমীহও মেলে, আর আপনার মত অসাধারণদের বিতৃষ্ণা। আজকাল এ দুই-ই আমার শাপে বর।

বিভাস একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা ওই ডাক্তার ভদ্রলোকটি কে?'

রুবি একটু হাসল, 'ওঁর সম্বন্ধে আপনার কৌতূহলের সীমা নেই দেখছি।'

'একবার এক শক্ত অসুখে ওঁর শরণ নিয়েছিলাম। রোগ গেল কিন্তু ডাক্তার গেলেন না। বললাম ডাক্তারবাবু আপনি রোগী হয়ে থাকতে চান থাকুন, কিন্তু আমি আর ফের রোগী হতে রাজী নই। তিনি আজও সেই সর্তেই আছেন।'

বিভাস বলল, 'শুধু সর্ত? আর কিছু নেই?'

'আর যেটুকু আছে, সেটুকু কৃতজ্ঞতা। রোগের প্রকোপ যখন মাঝে মাঝে বাড়ে তখন এক আধটু শুশ্রূষা করতে হয়।'

বিভাস বলল, 'আর সুবিনয় চন্দ বলে যিনি এসেছিলেন?'

রুবি বলল, 'তাঁর খবরও জানা চাই আপনার? সে আপনার মতই একজন সজ্জন। স্নেহাস্পদ। কিন্তু স্নেহের চেয়ে আরও কিছু বেশি পেতে চায়।'

'তাহলে দেন না কেন?'

'চাইলেই বুঝি দেওয়া যায়?'

সুরবালার গলা শোনা গেল, 'বিভু, সারারাত কি শুধু গল্পই করবি? ভাতটাত কিছু খেতে হবে না।'

এবার হাত বাড়িয়ে ঘরের আলো জ্বেলে দিল রুবি, বলল, 'এই দেখুন, আপনাকে অভুক্ত বসিয়ে রেখেছি, কিন্তু আপনাকে দেওয়ার মত কিছু নেই।'

বিভাস সোজাসুজি রুবির দিকে তাকাল, 'দেওয়ার মত সত্যিকারের ইচ্ছা থাকলেই দেওয়া যায়।'

রুবি বলল, 'বলেন কি। কেবল ইচ্ছে থাকলেই হয়? তার জন্য থাকবার দরকার হয় না?

বিভাস ফের রুবির দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখল, তারপর বলল, 'মানুষ তো আর যোগ্য হয়েই জন্মায় না, দিতে দিতে যোগ্য হয়, নিতে নিতে যোগ্য হয়।

শুনতে শুনতে রুবির যেন সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। আশ্চর্য, আজও শিহরণের শেষ হয়নি। শিহরণ সমস্ত অভিজ্ঞতা সমস্ত অভ্যস্ততা যেন বার বার হরণ করে নেয়। মনোহর রূপ নিয়ে যখন আর এক বসন্ত সামনে এসে দাঁড়ায়, আগের ব্যর্থ বসন্তকে আর মনে পড়ে না।

রুবি বলল, 'আপনাকে সব বললাম ভালই হলো।'

বিভাস বলল, 'কেন।'

রুবি বলল, 'আপনি আর এমুখো হবেন না, আপনি আর মুখ তুলে তাকাবেন না।' একটু যেন আশঙ্কার সুর ফুটে উঠল রুবির গলায়, 'তবু বললাম। কারণ মাঝে মাঝে না বলে থাকা যায় না, না বলে পারা যায় না।'

সুরবালা ফের ডাকলেন, 'বিভু।'

বিভাস সাড়া দিয়ে বলল, 'যাই পিসীমা।' তারপর রুবির দিকে ফিরে তাকিয়ে দৈববাণীর ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি শুধু না বলে পারবেন না তাই নয়, না বদলেও পারবেন না। জীবন অনেক সুন্দর অনেক মহৎ।'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ রুবির জীবন ইতিহাসের কথা চিন্তা করল বিভাস। ভাবতে ভাবতে ঘৃণা নয়, বিদ্বেষ নয় অদ্ভুত সহানুভূতিতে ওর মন ভরে উঠল। সব দোষ তো রুবির নয়, ভুল যদি হয়ে থাকে তার জন্য একা ওকেই দায়ী করা চলে না। এখনো দাঁড়াবার মত ওর মেরুদণ্ড আছে, চলবার মত শক্তি আছে। শুধু পথ বাছাই ঠিক হয়নি। সে কথা ওকে বুঝিয়ে বলতেই হবে। ওকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, বাদ দিলে চলবে না, সঙ্গে নিয়ে চলাটাই হবে সত্যিকারের কাজ।

উত্তরপাড়া শুভ রাত্রির নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে এলো বিভাস। আসবার সময় উমা এল সঙ্গে। ওর মা বললেন, 'কদিন পরেই না হয় যাস। এত তাড়া কিসের।' কিন্তু উমা আর থাকতে রাজী নয়। বলল, 'দিন কয়েক বাদে আবার আসব, আজ যাই।'

কিন্তু বাসায় এসে সুরবালার কাছে এক রাত্রির বিবরণ যা শুনল, তাতে ওর আর যাওয়ার উৎসাহ রইল না। রুবির ঘরের একটি অন্ধকার অশুভ রাত্রি ওর সমস্ত দিন রাত্রির ওপর যেন ছায়া ফেলে দিল।

বিভাস বলল, 'হোল কি তোমার।'

উমা বলল, 'কি আবার হবে। যদি কিছু হয়ে থাকে তোমারই হয়েছে।'

আর তারপর থেকে কারণে অকারণে রুবির সঙ্গে উমার কথান্তর হতে লাগল। কলের জল তোলা নিয়ে, বাথরুমের অংশ নিয়ে, কাপড় মেলা নিয়ে ছোটখাট কলহের আর বিরাম রইল না।

সেদিন বিকালে রুবির ঘরের দিকে যাচ্ছিল বিভাস, উমা পথ আটকে বলল, 'ওদিকে আবার কেন। কি দরকার ও ঘরে।'

বিভাস বলল, 'দরকার আবার কি। যাই একটু গল্পটল্প করে আসি।'

উমা বলল, 'থাক, ওখানে গিয়ে গল্প তোমার না করলেও চলবে। ছেলেটাকে একটু রাখ, তাতে বরং কাজ হবে সংসারের।' বিভাস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উমার দিকে তাকাল, 'তুমি কি ভেবেছ বল তো।'

উমা বলল, 'আমি যা ভেবেছি--ঠিকই ভেবেছি। তোমাদের কাউকেই বিশ্বাস নেই। আর ওসব মেয়ে সব করতে পারে।'

রুবি এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। উমার কথা কানে যেতেই সরে গেল। মনে মনে একটু হাসল রুবি। আইভি-রেবার কাহিনী আর একবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু এবার রেবার ভূমিকা আর তার নয়।

তবু রুবি উমার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে গেলে, উমা বলল, 'বোঝাবুঝির কিছু নেই, তোর মত মেয়েকে বিশ্বাস করাই আমার উচিত হয়নি। তোবা সাপের জাত।'

একবার ওর ভিতরকার সাপ সত্যি সত্যি ফণা তুলে উঠল, ফুঁসে উঠল, হাসির ভিতর দিয়ে এক ঝলক বিষ ঢেলে দিয়ে বলল, 'তাহলে কিন্তু সাবধান। ওঝা ডেকে এখন থেকেই ঝাড়ফুঁক শুরু কর, তাবিজ কবচ বাঁধ।'

উমা বলল, 'ওঝা ডাকবার জন্য আমার বেশি দূর যেতে হবে না। বাড়িওয়ালা আর পাহারাওয়ালাকে ডাকলেই তারা সাপের বিষ দাঁত ভেঙে দিয়ে যাবে।'

এ যে রীতিমত অপমান। রুবির দুই চোখ ঝলসে উঠল। কিন্তু ইচ্ছা করেই আর উমার দিকে তাকাল না। পাছে মনের অভিসন্ধি আগেই ওর চোখে ধরা পড়ে।

রুবি আজ সাজসজ্জায় উগ্রতার চেয়ে, তীব্রতার চেয়ে, মোলায়েম ভঙ্গি আনল বেশি। ধানী রঙের চোখ জুড়ানো শাড়ি পড়ল। ঘাড়ের নীচে এলো খোঁপাকে রাখল আনম্র করে। চোখে টানল কাজল্লের রেখা। তারপর আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল এত করেও আয়নায় যার ছায়া পড়ছে সে রুবিই। গত জন্মের রেবাও নয়, বিভাসের স্ত্রী উমারও অনুকরণ নয়। মনে মনে খুশি হোল রুবি। রুবিরই দরকার তার।

বিকেল বেলায় অফিস থেকে বিভাসকে ফোনে ডেকে বলল, 'আমি সেদিন অত কথা বললাম, আর আপনি কিছু বললেন না।'

বিভাস বলল, 'কথা আমারও কিছু জমেছে। এর মধ্যে একদিন বলবও ভেবেছিলাম। কিন্তু উমা বড় পাগলামি শুরু করল।'

রুবি বলল, 'ওর পাগলামির কি প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক।'

বিভাস বলল, 'তা তো নয়ই। কি করা যায় বলুন তো।'

রুবি বলল, 'সেই পরামর্শ করবার জন্যই তো আপনাকে ডাকছি, আসুন না।'

'কোথায়?'

'আউটরাম ঘাটে। অনেকদিন গঙ্গার ঘাটে যাই না। এই উপলক্ষে ঘুরে আসা হবে।'

বিভাস জবাব দিল, 'বেশ তো।'

পাঁচটার পর আউটরাম ঘাটের জেটির দোতলার দক্ষিণ প্রান্তে চায়ের কাপ নিয়ে দুজনে বসল মুখোমুখি। দুজনের মুখে সূর্যাস্তের রঙ লাগল।

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, ওর পাগলামির কি করা যায় বলুন তো।'

রুবি মুখ টিপে হাসল, 'ভালো মানুষকে জিজ্ঞেস করেছেন। কারো পাগলামির ওষুধ ভাবতে গেলে নিজেই আমি পাগল হয়ে যাই।'

কেবল কি রুবি একাই পাগল হয়? আর কাউকে পাগল করে তোলে না?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিভাস বলল, 'কিন্তু এভাবে আপনাকে আর চলতে দেওয়া ঠিক নয়। আপনার ভিতরে যে জিনিস আছে এতে তার শুধু অপচয় হবে।'

রুবি বলল, 'সে অপচয়ের নিবারণ কিসে হয় বলে আপনি মনে করেন?'

বিভাস বলল, 'ফের বিয়ে করুন। হিন্দু মতে অসুবিধা হয়, অন্য মতের সুবিধা নিন।'

রুবি একটু হাসল, 'মানে আপনার মতে যেন তেন প্রকারেণ বিয়ে করতেই হবে। কিন্তু একবার তো করে দেখলাম, সইল কই।'

বিভাস বলল, 'আরো একবার দেখুন। এতদিনে সহিষ্ণুতা নিশ্চয়ই বেড়েছে। বিয়ে করা ছাড়া আর কি গতি আছে আপনার? আর যাই হোক, আপনি সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে পারবেন না।'

রুবি একটু হাসল, 'আর আপনিই বুঝি খুব সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারবেন?'

বিভাস বলল, 'আমার কথা আলাদা। কিন্তু আপনি যদি একটা বাঁধাধরা রুটিনের ভিতরে না আসেন, আপনাকে সব ছাড়তে হবে। অনিয়মিত, অনিশ্চিত যৌন জীবনের সবচেয়ে বড় দোষ যে যৌন-জীবন ছাড়া আর কোন জীবন থাকে না। আর সমস্ত চিন্তা চেষ্টা গৌণ হয়ে যায়।'

রুবি বিভাসের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নীচু করে হাসল। মনে মনে ভাবল পাদ্রীরা যখন অবৈধভাবে প্রেমে পড়ে, তখনও একবার বিধিমত বাইবেল আওড়াতে ছাড়ে না। বিভাসকে যেন রুবির আর বুঝতে কিছু বাকি আছে। ওর যোগাসন যে নিঃশ্বাসে কাঁপছে তা কি রুবি টের পাচ্ছে না?

বিভাস হয়তো এ মুহূর্তে সে কথা স্বীকার করবে না। কিন্তু ওকে স্বীকার না করিয়ে রুবিরই বা নিষ্কৃতি কই।

নিষ্কৃতি সহজে মিলল না। বিভাস এক পা এগোয় তো দু'পা পিছোয়। একদিন কথা বলে তো, দুদিন কথা বন্ধ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করে। কাছে এসে যদি বসে, নীতি ধর্ম, শিল্প সাহিত্যের আলোচনা ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ তার কাছে পাড়া যায় না। ফলে রুবিকে ভোল বদলাতে হোল, বই পত্রে শুধু ঘর সাজানো নয়, পড়াশুনোর চর্চাও নতুন করে করা দরকার হয়ে পড়ল। এতদিনের বাঁধা গতে আর চলল না, সেতারের আরো কয়েকটি নতুন গৎ শিখতে হোল ওর জন্য। আরো মনে হোল রুবি যেন যথেষ্ট নয়, অন্ততঃ এই মুহূর্তে রুবি প্রায় অনাবশ্যক।

এতদিনের দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত নিরীহ বিভাস উর্বশীকে দেখে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু ভয়ে ছুটেও পালায়। ওর জন্য দরকার আর একটি গৃহলক্ষ্মীর। ভাষায় আভাসে, ভাবে ভঙ্গিতে, আচারে আচরণে বড় কঠিন। কিন্তু কাঠিন্য ছাড়া কৃচ্ছ্রতা ছাড়া শিকারে আনন্দ নেই। এতদিনে সত্যিই যেন একটি খেলার মত খেলা মিলেছে। কিন্তু সত্যিই কি খেলা? খেলতে খেলতে যেন তা মনে থাকে না।

একমাস কাটল, দু'মাস কাটল, চারমাস কাটল, তারপর এল পঞ্চম মাস। বিভাসের বুঝতে বাকি রইল না, সে ধরা পড়েছে। অনুকম্পা শুভেচ্ছা-সহানুভূতিতে ছদ্মবেশে দিনরাত তাকে যা সাড়া দিচ্ছে, নাড়া দিচ্ছে তার নাম উচ্চারণ করা যায় না। কিন্তু তাই বলে সে কি অনুচ্চারিত থাকবে। পাড়ায় এরই মধ্যে ফিসফিস আলোচনা শুরু হয়েছে। বন্ধুবান্ধব এর আগে আড়ালে হাসত, এখন সামনেই হাসে।

পিসীমা তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে প্রায়ই বকেন, 'ছিঃ তোর মত ছেলে এমন দুর্মতি হবে ভাবতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। হ্যাঁরে, তোর কিসের অভাব। তোর যে সব আছে। তুই কিসের লোভে সব হারাতে যাচ্ছিস।'

বিভাস আগের মতই প্রতিবাদ করে, 'তুমি এসব কি বলছ পিসীমা?'

কিন্তু গলায় যেন তেমন জোর পায় না, তেমন প্রাণ পায় না।

বিভাস নিজেও মাঝে মাঝে ভাবে, সত্যি কোন মোহ তাকে ওর দিকে এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? রুবি তাকে এমন কোন নতুন বস্তু দিতে পারবে যার স্বাদ সে আগে পায়নি। বিভাস নিজের মনেই জবাব পায়, বস্তু নতুন হয় না, কিন্তু ব্যক্তি চির নূতন। তার স্বাদ চির বিচিত্র। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য কি একের মধ্যে নেই? তাকে অনেকের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে হবে? এ কোন মূঢ়তা, দৃষ্টি শক্তির এ কোন দৈন্যে পেয়ে বসল তাকে? নিজেকে নিজে ধমক দেয় বিভাস। কিন্তু গলায় যেন তেমন জোর পায় না, প্রাণ পায় না।

উমা কখনো কখনো মৌনতার দেয়াল তুলে রাখে মাঝখানে। আবার কোন কোন দিন কথার আঘাতে আঘাতে সে দেয়াল টুকরো টুকরো করে ভাঙে। তার উচ্চকণ্ঠে মনে হয় বাড়িসুদ্ধ ভেঙে পড়বে।

বিভাস খানিকক্ষণ কান পেতে শোনে। তারপর যখন আর কান পাতা যায় না, তখন নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে। আশ্চর্য, বিভাসের একটুও মায়া হয় না, একটুও মমত্ব বোধ জাগে না। যেন তার পাঁচ বৎসরের সুখ দুঃখের ভাগিনী তার সন্তানেব জননী, তার পরমাত্মীয় স্ত্রী নয়, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক যেন অশ্রুতপূর্ব এক বিদেশী ভাষায় গলা ছেড়ে নিরর্থক চীৎকার করছে।

কিন্তু এ বাড়িতে যে দ্বিতীয়া মেয়েটি আছে তার যখন কথা শোনা যায়--বিভাস নিজের অজ্ঞাতে, এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। সূর্যের আলো যখন তার মুখের ওপর পড়ে, বিভাসের চোখে পলক পড়ে না, চাঁদের আলোয় সে মুখ আরো অপূর্ব দেখায়, তারা ভরা অন্ধকার রাতে সে মুখে আদিম যুগের রহস্য নামে। বিভাস জানে এসব তার নিজেরই সৃষ্টি। সে যা দেখছে রুবির মধ্যে, আর কেউ তা দেখবে না। কিন্তু বিভাস আর কারো মধ্যে এসব দেখতে পায় না কেন?

একদিন রাজমোহনবাবু বিভাসকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিলেন। এ কথা ও কথার ভূমিকা সেরে গম্ভীরভাবে আসল কথা পাড়লেন, 'এসব জিনিস তোমাকে কোনদিন বলতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে তোমাকে নিয়ে গর্ব করেছি। আমার সেই অহঙ্কার এমন করে চুরমার করে দিলে?'

বিভাস বলল, 'এমন কি হয়েছে যার জন্য আপনি--'

রাজমোহনবাবু বললেন, 'লুকোতে যেয়ো না বিভাস। লুকোতে তুমি পারবে না। উমার কাছে আমি সব শুনেছি। দুঃখে দুঃখে মেয়েটার কি চেহারা হয়েছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আমার কথা শোন। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। এ রকম ভুলপ্রমাদ মাঝে মাঝে ব্যাটা-ছেলেদের হয়। তাতে কিছু এসে যায় না। এখন দুটো কাজ তোমাকে করতে হবে। ওই মেয়েটাকে বাড়ি থেকে কালই তাড়াও। আর উমাকে নিয়ে তুমি একটু বাইরে কোথাও ঘুরে এস। খানিকটা চেঞ্জ দরকার। তাতে দেহ মন দুইই ভালো হবে। দেওঘরে আমার এক মক্কেলের বাড়ি আছে। তাকে আজই আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি ওদিককার সব ব্যবস্থা কর।'

তখনকার মত শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে বিভাস চলে এল। অফিসে দরখাস্ত করে ছুটিও নিল। কিন্তু যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন আরো এক ধাপ এগুতেই বিভাস ফের পিছিয়ে গেল। মনে হোল এ ভাবে যাওয়ার কোন মানেই হয় না, একজনকে ছেড়ে গেলে সব যেন শূন্য হয়ে যাবে।

বিভাস উমাকে ডেকে বলল, 'শোন, পিসীমাকে নিয়ে তুমি যাও, তোমার ছোট ভাইকেও বরং সঙ্গে নিতে পার। আমি কদিন পরে যাচ্ছি।'

উমা স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি কি এতই বোকা

যে তোমার মতলব বুঝতে পারি না। আমরা সব যাব, আর খালি বাড়িতে তোমরা দুজনে মিলে মজা লুটবে, না? আমি ফের বাবাকে খবর দিচ্ছি।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বিভাসও কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'বেশ, দাও তোমার বাবাকে খবর। শুধু তোমার বাবাকে কেন, আইন আদালত যা খুশি তোমার কর। আমি পথ বেছে নিয়েছি, তুমি তোমার পথ বেছে নাও।'

উমা বলল, 'এত সাহস তোমার? তুমি একথা বলতে পারলে আমাকে?'

বিভাস অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ পারলাম। এখন এ ছাড়া আর কোন গতি নেই উমা। কেবল আমাকেই নয়, তোমাকেও সাহসী হয়ে নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে।'

উমা বলল, 'নিজে জাহান্নামে যাচ্ছ, তবু উপদেশ দিতে ভুলছ না। যাও, তুমি চলে যাও, আমার সমুখ থেকে এখনই চলে যাও, আমি আর সইতে পারছিনে।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এল। গলির মুখে রুবির সঙ্গে দেখা। অফিস থেকে ফিরছে।

বিভাস তাকে ডেকে বলল, 'শোন কথা আছে।'

'কি কথা।'

বিভাস বলল, 'আজ সন্ধ্যা সাতটায় সেন্ট্রাল হোটেলের তের নম্বর রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আজ শেষ বোঝাপড়া হবে।'

রুবির বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ।'

ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে কি ভাবল রুবি। বিভাসের উত্তেজিত কণ্ঠ বারবার ভেসে আসতে লাগল--'শেষ বোঝাপড়া।' আর আটকে রাখা যাবে না। সব বাঁধ আজ ভেঙে পড়বে। বিভাসের চোখ দেখেই তা টের পেয়েছে রুবি। ভাঙুক। সব ভেসে যাক, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক। এই নিঃসঙ্গতার শুকনো চড়ায় পড়ে থাকার রুবিরও আর সাধ নেই, সাধ্য নেই।

রুবি সেই প্রথম দিনের মত গাঢ় রক্ত রঙের শাড়ি পরল। লিপস্টিকের ছোঁয়ায় বাসনার রঙ আরো গাঢ়তর হয়ে লেগে রইল ঠোঁটে। ব্রেসিয়ারবদ্ধ স্তনচূড় তীক্ষ্ণাগ্র হোল যাতে দৃষ্টি পড়ামাত্র বিদ্ধমূল অনড় হয়ে থাকবে। আজ আর বিভাসের চোখের বিতৃষ্ণাকে ভয় কি। তার দুর্নিবার তৃষ্ণার কাছে আজ অজেয় বলে কিছু নেই।

নিজের ঘর তালাবন্ধ করে বেরিয়ে এসে রুবি দেখল ভিতর থেকে উমার ঘরেরও দোর বন্ধ। এতক্ষণ সুরবালার শাপমুণ্যি আর ওর চড়া গলার গালাগালে বাড়িতে টিকবার জো ছিল না। এখন ফের শান্ত হয়েছে। প্যাসেজের সরু পথে আর একটু এগুতেই দেখা গেল উমার ঘরের জানলা খোলা। উমা হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছে। বাবলুর আজ কোন যত্ন হয়নি। সারা গায়ে ধুলো। মাথায় তেল পড়েনি। খানিকক্ষণ আগে হয়ত কাঁদছিল। চোখের কোণে এখনো জলের দাগ রয়েছে। একটু দূরে বসে বিভাসের একপাটি পুরনো জুতো নিয়ে তাতে বারবার জিভ লাগাচ্ছে আর হাসছে।

রুবি দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর আবার ফিরে গেল ঘরে। মিনিট পাঁচ সাত বাদে ফের বেরুল। ওর হাই হীলের শব্দ এবার অসঙ্কোচে সদর পেরিয়ে গেল। উমার জানলার ধারে আর থামল না।

চেয়ার টেবিল সোফা পালঙ্কে সজ্জিত হোটেলের তের নম্বর রুমে বিভাস অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। রুবি এসে ঢুকতেই বলল,'এই যে, এত দেরি করে এলে।'

রুবি বিভাসের পাশে প্রায় গা ঘেঁষে বসে বলল, 'হ্যাঁ, একটু দেরিই হয়ে গেল।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর রুবি ফের বলল, 'কি বোঝাপড়ার কথা বলছিলে।'

বিভাস বলল, 'বলছিলাম, ঠিক এভাবে আর চলা সম্ভব নয়।'

রুবি বলল, 'কিভাবে চলা সম্ভব বলে মনে হয় তোমার।'

বিভাস রুবির হাতখানা নিয়ে নিজের মুঠির মধ্যে সজোরে চেপে ধরল, 'আমি তোমাকে পেতে চাই, সম্পূর্ণ করে পেতে চাই এক ঘণ্টা নয়, এক রাত নয়, এক জীবনের জন্যে চাই তোমাকে আমার।'

রুবি রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'এক জীবন!'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ এক জীবন। আমি গৃহী। আমি জানি গার্হস্থ্য জীবন কি। সেই পারিবারিক জীবনে তোমাকে আমি ধরে রাখব। ফের তোমার সিঁথিতে সিঁদুর দেব, সমাজ সংসার সন্তানের ভিতর দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করে দেব, তোমাকে সম্পূর্ণ করে নেব। অংশে আমার আশা মিটবে না।'

মুহূর্তের জন্য বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল রুবির। বিভাসের হাতের মধ্যে কেঁপে উঠল ওর হাত। স্বামী, সন্তান, সংসার। ভাঙা জাহাজে আর এমন করে ভেসে ভেসে বেড়ানো নয়। পোতাশ্রয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ। একমাত্র স্বামী-সন্তানের বাহুবন্ধনের নিবিড় নীড় ছাড়া আর কোথাও এই ক্লান্তির অবসান হবে না, পরিপূর্ণ শান্তি আর তৃপ্তিতে ভরে উঠবে না বুক।

রুবির চোখের সামনে এক টুকরো ছবি ভেসে উঠল।

এই শহরেরই এক অখ্যাত অজানা গলিতে ছোট্ট একাখানা ঘর। ঘরের মেঝেয় দুরন্ত শিশু এতক্ষণ দাপাদাপি করছিল। এবার শান্ত হয়ে বসে তার বাবার এক পাটি জুতো নিয়ে নিজের মনে খেলছে। কিন্তু তার মা? তার মা? বুকের ভিতর আর একবার কেঁপে উঠল রুবির। হ্যাঁ, একপাশে খেলাঘরের কোণে তার মাকেও দেখা যাচ্ছে। তার মাথায় আঁচল নেই। পিঠ ভরে চুলের রাশ ছড়ানো। তাতে জট বেঁধেছে, তার মুখ হাঁটুর মধ্যে গোঁজা। সে মুখ দেখবার জো নেই, সে মুখ দেখাবার জো নেই। কিন্তু সে মুখ রুবির চেনা। সে মুখ শুধু উমার নয়, তার নিজেরও।

বিভাস বলল, 'চুপ করে থেক না রুবি, আমার কথার জবাব দাও। তোমার একটি কথায় আমার সমস্ত জীবনের আজ মোড় ফিরে যাবে।'

রুবি মুখ তুলে এবার বিভাসের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল, 'তাই নাকি বিভাসবাবু? এত বড় দাম আমার কথার? তাহলে দয়া করে ছোট্ট একটু কথা আমার রাখুন।' ব্লাউজের ভিতর থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করল রুবি, কলমটি খুলে নিয়ে বিভাসের হাতে দিল, 'নিন।'

বিভাস হতভম্ব হয়ে বলল, 'একি!'

রুবি বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। একখানা contract form উমার কাছ থেকে শুনে শুনে আমি একদিন সব ফিলআপ করে রেখেছিলাম। এবার সইটা করে দিন। বেশি নয়। মাত্র পাঁচ হাজারের। অমন করছেন কেন বিভাসবাবু? সমস্ত জীবনের কনট্রাক্ট করতে চেয়েছিলেন আর একখানা সামান্য বীমা ফর্মে সই করতে পারবেন না? খুব পারবেন। জানেনই তো দালালী করে খাই। কারো জীবনের ওপর আমাদের লোভ নেই, একখানা জীবন বীমার contract পেলে বর্তে যাই। নিন, কলমটা ধরুন ভাল করে।'

বলতে বলতে বিভাসের হাতের মধ্যে রুবি তার ছোট্ট পার্কার পেনটা গুঁজে দিল।

[৩য় বর্ষ, ফাল্গুন—চৈত্র, ১৩৫৭]

চিঠি পত্রের জঞ্জাল

নবজ্যোতি সরকার (হুজুরীমল লেন)

নেহেরু এখনও কমনওয়েলথের মায়া ত্যাগ করতে পাচ্ছেন না, কেন বলতে পারেন?

* কোন কোনও জীবকে একবার এঁটুলিতে ধরলে তার থেকে আর মুক্তি পায় না সে, জানেন তো? আমাদের প্রিমিয়ারকে ব্রিটেনের প্রিমিয়ার এটলি ঠিক অমনি ভাবেই ধরেছে।

শ্রীপূর্ণেন্দু সরকার (জলপাইগুড়ি)

যে-নারী কখনও সূর্য দেখে নাই তাকে বলে অসূর্যম্পশ্যা, আর যে পুরুষ কখনও সূর্য দেখে নি তাকে কি বলে?

* শ্রীঅরবিন্দ।

কালিদাস গুপ্ত (শম্ভূবাবু লেন)

গান্ধী মহাপুরুষ না আপনি?

* গান্ধী হলেন মহাত্মা, আমি--দুরাত্মা।

শ্রীসিতাংশু গঙ্গোপাধ্যায় (বাগবাজার)

ট্রামে বাসে 'ladies' মার্কা সীট্‌গুলো তো মেয়েদের জন্যে এবং বাকীগুলো সব পুরুষের। 'হিজড়েরা' তবে বসবে কোথায়--প্ল্যাটফর্মের ওপর?

* আপনি ট্রামে যেতে হলে কোথায় বসে যান?

শ্রীঅমিয়ভূষণ সান্যাল (যোগীপাড়া বাইলেন)

বর্তমানে বাস্তুহারাদের প্রতি সরকার যে রকম পন্থা অবলম্বন করেছেন এর কি কোন প্রতিকার নেই?

* না। "প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি আপনি কি সমর্থন করেন?

* করতাম, যদি লিয়াকত আমাদের প্রধানমন্ত্রী, এবং নেহেরু ওদের প্রধানমন্ত্রী হতেন।

শ্রীশুভ্রেন্দু মুখোপাধ্যায় (স্কট লেন)

লক্ষ্য করে দেখেছি, বহুলোক সিগারেট বা চুরুট ট্রামে বাসে উঠেই ধরায়। না ধরানোর অনুরোধ জেনে শুনেই উপেক্ষা করে। কেন বলুন তো?...এটা বন্ধ করতে আপনি কোন্ উপায় অবলম্বন করতে বলেন?

* যারা ধূমপায়ী তাদের জন্যে টিকিটের দাম এক পয়সা করে বেশি করলে--অনেকটা কমে যাবে!

'কম'-কামী (হাওড়া)

....আগেকার দু'পয়সার বাংলা এবং চার পয়সার ইংরেজি খবরের কাগজের কথা যেন স্বপ্ন ; কেউ ছ'পয়সার জায়গায় সুযোগ বুঝে দু'আনা করে যুগ বদলালে ; আপনার "অচলপত্র" ও আপনি ছ'আনার স্থলে আটআনা করলেন। এই সব "বাড়াবাড়ি"র কারণটা বলতে পারেন?

* কারণটা খুব সোজা! গরু যখন বাছুর থাকে তখন তা ৩০্ টাকায় পাওয়া যায় বলে বাছুর যখন গরু হয়ে ওঠে তখনও তার মার্কেট মূল্য কি এক?

শ্রীহরেন ঘোষ (দিলবাহার কর্টেজ, কার্শিয়াং)

বা. না. দা.-কে কোন্ ঠিকানায় চিঠি দেওয়া চলতে পারে?

* এখন দিলে ৫৫বি বালিগঞ্জ প্লেসে ; কয়েক বছর বাদে পাগলা গারদ কাঁকে।

সুচিরা রায় (আর-জি, কর রোড)

'happiness' কথাটার উল্টো কি হবে?

* Marriage!

অরুণ কুমার ঘোষ (বালিগঞ্জ পার্ক)

"নরদেহের অভ্যন্তর (?) দূষিত হলে যেমন খোস পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ বাহির হয়, রাষ্ট্রদেহের অভ্যন্তর (?) দূষিত হলে তেমনি কি বাহির হয়?"

* Deputy Minister, State Minister প্রভৃতি।

অশেষ গুপ্ত (মতি শীল স্ট্রীট)

কোন ভদ্রলোক যদি এক স্ত্রী বর্তমানে অপর আরেকজনকে বিবাহ করেন তাহলে দ্বিতীয়া স্ত্রী ঐ ভদ্রলোকের প্রথমা স্ত্রীর সপত্নী বা সতীন হইবেন। আচ্ছা, কোন ভদ্রমহিলা যদি এক স্বামী বর্তমানে অপর আরেকজনকে বিবাহ করেন তাহলে তাঁর দুই স্বামীর মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে?

* বাদী এবং প্রতিবাদীর সম্পর্ক!

শ্রীশ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় (বাটানগর)

গণিকার পুংলিঙ্গ কি?

* গণক নয় নিশ্চয়ই!

'স' (জলপাইগুড়ি)

...আসলে মেয়েরা এমন একটা জিনিস দিয়ে তৈরী যার প্রভাবে প্রত্যেক পুরুষই তার কাছে নতি স্বীকার করে! নয় কি?

* একটা নয়, এমন তিনটে জিনিস দিয়ে তৈরী! তবে সব মেয়েই নয়, কোন কোন মেয়ে বটে!

সলিল ব্যানার্জি (আসানসোল)

বলতে পারেন যে পাকিস্তানে এত অত্যাচার হইতেছে তাহার প্রতিকার না করার জন্যে দায়ী কে?

* ভোটাররা!

প্রশান্তকুমার বসু (টিপু সুলতান রোড)

বারীন দাশের ঠিকনা কি?

* প্রথম জীবনে, "অচলপত্র" অফিস ; শেষ জীবনে, 'শ্রীবারীন্দ্র আশ্রম' চন্দননগর।

শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায় (পি 34/109 হাজরা রোড, কলিকাতা ২৬)

সুন্দরবনের বাঘই বলুন আর বিছানার Bugই বলুন, মানুষের যারা রক্ত খায় তাদের সবার গায়েই বিশ্রী দুর্গন্ধ কিন্তু মাতাঠাকুরানী ইভের আমল থেকে অ্যাটম যুগের আধুনিক বিনোদিনীরা পুরুষের রক্ত খেয়েও বিশেষত স্ত্রীরা তাদের অবলা স্বামী রত্নটির (আপনিও এর ভেতরে) প্রত্যহ রক্ত চুষে ও শুষে খেলেও কি তাদের গা থেকে সুগন্ধ বার হয় বলতে পারেন?

* এ-রহস্য শুধু, 'Evening in Paris'-ই জানে!

বি, রায় (বালিগঞ্জ)

আচ্ছা বলুন তো বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া আর সম্পাদক্‌কা কি?

* বাপ্‌কা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া, সম্পাদক্‌কা ass (istant)

কুছ নেই ত' থোড়া থোড়া, সাবাস ! সাবাস!

শ্রীজ্যোতির্ময় (শিলং)

আপনার এক চিঠিতে দেখিলাম যে লেডী মিরাণ্ডা হস্টেল মোটেই বিক্রী হইতেছে না! কাজেই একখানা বই আমাকে দিবেন। পড়িয়া যদি ভাল লাগে তবে দাম পাঠাইব।

* অ্যাঁ?—কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যার কন্যার বিবাহ হচ্ছে না বলে আপনি জানেন, তাঁকেও কি আপনি অনুরোধ করেন নাকি?—যে আপনার কন্যাকে পাঠাইয়া দিন। ভাল লাগিলে বিবাহ করিব।"

শ্রীমণ্টু মজুমদার ("লেক ভিউ" আসানসোল)

কোন লেখকের ভাল বইকে আমরা সাধারণত, 'Master piece' বলে থাকি, লেখিকার বেলায় কি 'Mistress piece' বলব?

* কোন লেখিকার হাত দিয়ে কখনোও ভালো বই বেরোয় না!

শ্রীঅমল দত্ত (লোয়ার রডন ষ্ট্রীট)

কোন মেয়েকে বিয়ে করলে তার খাওয়া, থাকা, পরার সব খরচই দিতে হয়? প্রতিদানে কি পাওয়া যায় বলতে পারেন?

* মধ্যবিত্ত ঘরের হলে, ঝি—এবং ঠাকুরের কাজ এবং সভ্যতার আদিমতম কামনা মেটাবার যন্ত্র! এবং স্ত্রীরা প্রতিদানে কি পায় জানেন, শরীর ভেঙে পড়লেও প্রতিবছর একটি সন্তান, কখনো কখনো লজ্জাকর রোগ, আবার কখনও কখনও জোচ্চর বা খুনে স্বামীর স্ত্রী হওয়ার দুঃসহ সম্মান!

নবদ্বীপ চৌধুরী (এলগিন রোড, কলিকাতা)

চিত্র-তারকাদের প্রিয়ভাজন হতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কী?

—Luck?

* না বিজ্ঞাপনে বলছে Lux!!

বরুণদেব গুহ (ধুবড়ী)

অচলপত্র আর অচল টাকায় তফাৎ কী?

* প্রথমটা বাজে ; দ্বিতীয়টা বাজে না!

রবি মহাপাত্র (কটক)

আজকের কংগ্রেসী পেট্রিয়টদের সঙ্গে সেদিনকার বাঙালী বিপ্লবীদের কি পার্থক্য?

* বাঙালী বিপ্লবীরা জেল ভাঙত ; এঁরা 'জেল' ভাঙাচ্ছেন অর্থাৎ জেল ভাঙ্গিয়েই এঁদের অন্নবস্ত্র, মন্ত্রীত্ব!!

ব্রহ্মপদ বকসী (ফুলবাড়ী)

ভালবাসা কি?

* Rent control-এ গেলে যার ভাড়া অনেক কমে যায়!

ব্যর্থ প্রেমিক (সুইসাইড লেন)

মন দেওয়া নেওয়া জিনিসটা কি?

* ওটা ভারত পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি! ভারত ২ হাজার মণ কয়লার বদলে পাকিস্তানের কাছ থেকে হয়ত দেড়মণ পাট নিলো—এই আর কি!

২। নিজেকে পপুলার করবার সহজ উপায় কি বলতে পারেন?

* ডেল কার্নেগী না পড়া!

৩। রাশিয়ায় 'প্রেম' আছে?

* হ্যাঁ ; 'প্রেম'-কে ওরা Labour বলে!

৪। ভালবাসলেই কি ভালবাসা পাওয়া যায়?

* না ; ভালো সেলামী ছাড়া আর কিছুতেই ভালবাসা পাওয়া যায় না!

৫। বিবাহিতা আধুনিকারা কি মাথায় সিঁদুর দিতে অপমান বোধ করেন যে, যৎসামান্য না দিলে নয় তাই ব্যবহার করেন?

* তার জন্যে নয় আসলে অনেক ছেলেই যে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভারি ডরায়।!

নয়নহারা সিদ্ধান্ত (হরিসভা)

বাঙ্গলা ভাষায় আমার বড্ড ভুল হয়, মাপ করবেন অক্ষমতা।

* অক্ষমতা কি মশাই! এক্ষুনি আপনি সরকারের বিজ্ঞাপন সচিবের পদটির জন্য আবেদন করুন! ঐ একটি মাত্র অক্ষমতার জন্যেই পেয়ে যেতে পারেন!

কালিদাস গুপ্ত (শম্ভুবাবু লেন)

অচলপত্রের সহিত শনিবারের চিঠির পার্থক্য কি?

* চালের সঙ্গে চালকুমড়োর যা!!

শ্রীজনার্দন ভট্টাচার্য (উদয়ন সিনেমা হল, আগরতলা)

যে সব মেয়েরা হরিধ্বনি শুনলে আঁৎকে ওঠে তাদের জন্য কোন ধ্বনি ব্যবহার করা উচিত?

* উলু।

২। জুতো বড় ছোট একই দাম—কোনটা কিনব বলুন তো?

* মাঝারি!—দামেও এক নয় পায়েও এক হবে না!!

৩। একটা অ্যাটম-বম্ব পেলে কি করবেন?

* ব্ল্যাক-মার্কেটিং।

৪। মনে করুন পৃথিবী রসাতলে গেল। বাকী রইল শুধু অচলপত্রের কার্যালয় আর তার কর্মীবৃন্দ। আপনাদের ঘুম ভাঙার সাথে সাথে আপনারা প্রথম কোন কাজে ব্রতী হবেন?

* রসাতলে একজন এজেণ্টের খোঁজ করব!!

এ. রহমান (ঠিকানা নেই)

কমিউন্যাল ম্যারেজ অনুমোদন করেন? আমার বোনটি একটি হিন্দু যুবকের প্রেমে পড়েছে এবং তাকে ছাড়া বিবাহ করবে না। বাড়িতে সবাইর অমত। এখন Best উপায় কি বলুন তো?

* বোনকে হিন্দু ধর্মে ট্রান্সফার করে, হিন্দু যুবকটিকে মুসলমান হয়ে যেতে বলুন, তাহলেই কমুন্যাল ম্যারেজে আর বাধা থাকবে না!!

শ্রীমাণিকলাল দাস (হাজরা রোড, কলিকাতা)

স্বপ্ন কি?

* বাঙালীর বড় হওয়া!

সুবল ঘোষ (চক্রবেড়ে লেন)

বিয়ের সময় বরের হাতে জাঁতি দেয় কেন?

* বাকী-জীবন বউ-এর হাতে জাঁতিকলটি রাখবার জন্যে।

অ. কু. ব. (চাইবাসা)

'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' কথাটা প্রচলিত কিন্তু 'সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য' কথাটা প্রচলিত নয় কেন?

* কারণ, কলিকালে পুণ্য কিনবার জন্যে রোজগারের টাকা লাগে!

তৃপ্তি সেন (তেজপুর, আসাম)

১। শিশু প্রথমে তার নিজের দিদিকে ভালবাসে কিন্তু বড় হয়ে সে অন্যের দিদিকে ভালবাসতে আরম্ভ করে কেন?

* তখন যে সে আর শিশু থাকে না। "যাও, তুমি ভারি অসভ্য"—হয়ে ওঠে যে তখন!!

২। অন্ধ প্রেম না প্রেমিকা?

* কন্দর্প। তাই যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা প্রায়ই হয় না।

৩। আসলে মেয়েদের রূপ কখন ফুটে ওঠে?

* যখন পাউডার মাখা মুখে প্রথম ঘামের ফোঁটা দেখা দেয়!!!

চিত্তরঞ্জন দে (কামারপুকুর)

এবার 1st এপ্রিলে, এপ্রিল ফুল করলেন কাকে?

* গত ১৯৪৭ সালের পর থেকে তো আর 1st এপ্রিলে এপ্রিল ফুল করা হয় না; আমাদের ন্যাতারা ১লা এপ্রিলের বদলে ১৫ই আগস্ট সমস্ত দেশকে এপ্রিল ফুল করে ছেড়েছেন প্রথম ১৯৪৭ সালে এবং তারপর থেকে ঐ দিনটি প্রতি বছর সগৌরবে স্মরণ করতে বাধ্য করা হয় আমাদের!

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ গুহ (কলেজ রোড হাওড়া)

পরিষদ গৃহের স্পীকারের হাতুড়ি শুধু টেবিলেই পড়ে কেন?

* কারণ পরিষদ সভ্যের মাথা আরোও নীরেট, তাদের মাথায় পড়লে হাতুড়ীটাই শুধু ভাঙবে!

শ্রীবিশ্বনাথ বসু ('লালকুটির' ব্ল্যাকওয়ার স্কোয়ার, কলিকাতা)

মদ খেয়েও অনেকেই মাতলামী করে থাকে কিন্তু যারা না মদ খেয়েও মাতলামী করে তাদের কি বলব?

* M.L.A।

সত্যেন ঘোষ (কসবা)

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আবেদন জানিয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের পুলিসের প্রতি ভাই-ভায়ের মত ব্যবহার করতে...

* আমরা মন্ত্রী হলে আমরা তাইই করতাম। চোরে চোরে মাসতুত ভাই—এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে।

কোনও এক কারণবশতঃ আমার হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক (?) মহাশয় রাগ করিয়া আমাকে রসাতলে যাইতে বলিয়াছেন ; কিন্তু অদ্যাপি আমি রসাতলে যাইবার কোন রাস্তা পাইতেছি না। আপনার কোন প্রকার পথ জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

* হোস্টেলে আপনার তত্ত্বাবধায়কের যে ঘর আছে তার সঙ্গে আপনার ঘর বদল করুন!

স. না. দে (সেণ্ট ডেভিড হস্টেল, কলিকাতা)

১। সঙ্গীণ ও সঙ্গিণীর মধ্যে সাদৃশ্য কোনখানে?

* প্রথমটা খুঁচিয়ে ঘা করবার পক্ষে ভালো, দ্বিতীয়টাকে খোঁচাতে গেলেই ঘা। তবে সাদৃশ্য একটা আছে। দুই-এরই ব্যবহার জানা চাই।

২। বন্ধুর বোন ও বোনের বন্ধু—কোন সম্বন্ধটা বেশী মুখরোচক?

* প্রথম জনের বাড়ী যেতে হয়, দ্বিতীয় জন বাড়ীতে আসে—।

হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (দার্জিলিং)

নিজেই শপথ করে বলুন তো—প্রথম প্রথম অচলপত্র মারফৎ আমরা পাঠক শ্রেণী যে খোরাক পেতাম এখন তার ভগ্নাংশ কতটুকুতে দাঁড়িয়েছে!

* অচলপত্র যখন প্রথম বেরিয়েছিলো তখন শুনেছিলাম অচলপত্র অপাঠ্য। এখন

শুনলাম তখনই ভালো ছিলো। আরো পাঁচ বছর যাক, তখন শুনবো এখন যা বেরুচ্ছে সেগুলিই সত্যিকারের ভালো। আমার গল্প পড়ে লিখেছিলেন আমি কবিতা লিখতে সিদ্ধ হস্ত কিন্তু গল্প আমাকে দিয়ে হবে না। দাঁড়ান নাটকটা ছাপি আগে, তখন আপনিই লিখবেন। গল্প কবিতা লিখতে পারলেই কি আর নাটক লেখা যায়?—এ দেশে লেখার মত পাপ আর নেই। এই পাপের জানি এই নিয়ম। কিম্বা বলতে পারেন এই নিয়মের এইই পাপ!

নন্দদুলাল দত্ত (গোয়াবাগান)

'অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স'—কি জিনিস!—উদাহরণ দিন।

* বসন্ত সমাগমে—বাটার জুতো!!!

২। মেয়েদের বয়স ধরা বা বোঝা যায় কি উপায়ে?

* একটিমাত্র উপায় আছে। যার বয়স জানতে চান তার সঙ্গে একসঙ্গে স্কুলে-কলেজে পড়ত এরকম কোন মেয়ের বয়স তাকে বলুন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোঁস করে উঠেছেন, "ও তো আমার সঙ্গে পড়ত, আমার বয়স এখন--"দেখবেন আসল বয়সটা রাগের মাথায় তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কখন!

গোপাল ঘোষ (বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলিকাতা)

"Animals Without Backbone"--বইখানা পড়েছ?

* না। নাম দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী জাতের ওপর লেখা কোন বই, তাই না?

নলিনীরঞ্জন ঘোষাল (শিবপুর, হাওড়া)

হাঁস রাতে ডিম পাড়ে কেন?

* দিনে ডিম পাড়ে না বলে!

দে দোল দে (কলিকাতা)

অনেকগুলি ছেলেপিলে থাকা একটি বিড়ম্বনা—তাই নয় কি?

* মন্ত্রী হতে পারলে অনেকগুলি ছেলেপিলে থাকাই দরকার--তারাই তো অ্যামব্যাসাডার আমাদের!

অজিতকুমার মিশ্র (বাঁকুড়া)

১। জীবনে কোন সময়ে মানুষ ফুলের সৌন্দর্যের কোন মূল্য দিতে চায় না?

* Fool—এদের তা কে বোঝায় বলুন?

২। সাহিত্যিকতা এবং অনাহারের মধ্যে তফাৎটা কোথায় বলতে পারেন?

* অনাহারী খেতে পায় না কিন্তু লজ্জা পায়, সাহিত্যিকরা খেতেও পায়না, লজ্জাও পায় না।

৩। বলতে পারেন মানুষের জীবনকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলে কারা?

* কেষ্টনগরের কুমোরেরা!

শ্রীনগেন সান্যাল (লখনউ)

শুনেছি পাহাড়ী সান্যাল আর দীপ্তেন সান্যালে খুব দহরম মহরম ; পাহাড়ী সান্যালের ব্যক্তিগত পিকুইলারিটি কিছু লক্ষ্য করেছেন কি?

* পাহাড়ী সান্যালের একটি অভ্যেস হোল যাঁরা তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট তাদের সব সময় 'দাদা' বলে ডাকেন। আর যাঁরা তাঁর চেয়ে বয়সে এবং সম্পর্কে গুরুজন স্থানীয় তাঁদের তিনি কিছু বলতে হলেই বলেন, 'তোর তাতে কি রে বেটার ছেলে?' শোনা যায় তিনি একবার 'চিত্রা' সিনেমার দারোয়ানকে বলেন, 'দারোয়ান দা একবার গেট-দাকে খুলে দাও, আমার গাড়ী-দাকে ঢোকাব।' এবং আরেকবার আমাকে বলেন ; 'আমি অচলপত্রের লাইফ-মেম্বার হয়েছি দীপ্তেন সান্যাল বেটার ছেলের এত গায়ের জ্বালা কেন?'

শ্রীমতী মীরা বসু (পালপুকুর, হুগলী)

নেতাজী কি সত্যিই জীবিত আছেন?

* নেতাজী জীবিত আছেন কি তিনি মৃত এ–খবর তো নেতাজী ছাড়া আর সকলেই জানে! আপনি এখনো শোনেননি?

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কাঁকে)

যাহারা কানে কম শোনে তাদেরকে বলা হয় কালা আর যারা কানে বেশি শোনে তাদেরকে কি বলা হয় বলতে পারেন?

* ক্যারামের ঘুঁটি, যাদেরকে পকেটে যেতে বলল, আরও বেশি আজ্ঞাবহ হয়ে যাবার সময় স্ট্রাইকারকেও সঙ্গে নিয়ে, তবে যায়।

শ্রীপান্নালাল দাস (রামমোহন দত্ত রোড, কলিকাতা)

মানুষ মরে, বেঁচে থাকে কি?

* পাওনাদার!

শ্রীপ্রতুলকুমার হালদার (মলঙ্গা লেন, কলিকাতা)

বেলপাতায় শিব তুষ্ট হয় আর আপনি?

* মনসা পাতায়।

কপিলধ্বজ কপাটবক্ষ (শ্যামপুকুর স্ট্রীট)

ভণ্ড মানে যদি ভাঁড় হয়। গণ্ড মানে কি?

* কোন মানে হয় না। তবে 'অপো' কথাটা গণ্ডের আগে বসালে আপনার জন্মাবার একটা মানে পাওয়া যায়!

শ্রীমিন্টু ভট্টাচার্য (মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া)

মাটি খুঁড়ে যা বেরোয় তাকে বলে উদ্ভিদ্। কেঁচোও তো মাটি ফুঁড়ে বের হয়। কেঁচো উদ্ভিদ্ নয় কেন?

* কি হবে কেঁচো নিয়ে ঘাঁটা ঘাঁটি করে? কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোক শেষকালে!!

রবি মজুমদার (দার্জিলিং)

শো কেসে জিনিস দেখা আর রাস্তায় মেয়েদের দিকে তাকান কি ঠিক এক পর্যায়েই পড়ে (?) না?

* না। টাকা ফেললেই শোকেসের দেখা জিনিস সব সময় পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী সাবু (চাঁদপুর)

নারী জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি বলতে পারেন?

* না। এম. বি. সরকার মশাই পারতেন!

হস্টেল (রাঁচি)

Lip Lip -এ যা লেখা হয় তাই কি লিপিকা?

* বলতে পারেন এমন ধারণা হল, Kiss-এ?

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখার্জি (সিউড়ি, বীরভূম)

প্রেমের লক্ষণ কি?

* মেয়েদের হাতে 'দৃষ্টিপাত' এবং ছেলেদের হাতে 'প্রিয় বান্ধবী'। এবং বিচ্ছেদের সময় দুদলেরই হাতে 'শেষের কবিতা'।

মদন দত্ত

সিনেমায় যে সব গান প্লে-ব্যাক করেন তাঁদের নাম সিনেমা কর্তৃপক্ষ পর্দায় প্রকাশ করেন না কেন?

* আপনি যদি পরীক্ষার খাতায় আর কারুর উত্তর টুকে দেন, তবে আপনি কি আপনার

খাতায় যার দেখে টুকেছেন তার নাম প্রকাশ করেন?

কামাল উদ্দীন (ঝাউতলা)

যে গাঁজা খায় সে গাঁজাখোর, যে আফিম খায় সে আফিমখোর, যে তামাক বা বিড়ি খায় সে তামাকখোর বা বিড়িখোর কিন্তু যে চুমু খায়?

* শুধু চুমু খেলে সে Kiss উনয়! কিন্তু আরোও এগুলে তখন আর শুধু খোর নয়, খোরপোষ দিয়ে তবেই নিস্তার!!

শ্রীসনৎকুমার রায় (কলিকাতা)

আচ্ছা বলতে পারেন সুন্দরী তরুণীর মন রেখে চলার বাতিক যাদের তাদের প্রাপ্য কি?

* কিছুকাল চন্দ্র সেবনের পর সুন্দর ছেলে এসে পৌঁছন মাত্র অর্ধচন্দ্র খাওয়া!!

প্রণব মজুমদার (সেন্টার সিঁথি রোড, কলকাতা)

আমার মেয়েলি মন তাই...

* লে হালুয়া! শুধু মন?—তাহলে আর কি হবে?

পরিতোষ দত্ত (ইমাম বাজার লেন, হুগলী)

বলতে পারেন 'বে৩ার জগতের' অধিবাসী কারা?

* ধোবার ঘরে থাকলে যাঁদের কাপড় বইতে হোত ; রাঁচীতে থাকলে যাঁরা অনায়াসে সরকারের খরচায় থাকতে পারতেন। আলীপুরে থাকলে যাঁদের দেখবার জন্যে আমাদের এক আনা করে টিকিট কাটতে হোত।

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ গুহ (হাওড়া)

কালোবাজারের দৌলতে মাঝে মাঝে বস্ত্রাদি যে বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়—এ-বস্ত্রহরণের সঙ্গে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কিম্বা আমাদের কেষ্ট ঠাকুরের গোপিণীদের বস্ত্রহরণের কোনরূপ মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি?

* না। দুঃশাসন বা শ্রীকৃষ্ণ অন্তত pervert ছিলেন না বলেই পড়েছি। এরা তো বেটাছেলের গায়েও কিছু রাখতে দিতে নারাজ!

২। কালোবাজারের প্রবর্তন হয় কোথায়, কোন সালে আর কার দ্বারা? একজন বিখ্যাত কালোবাজারীর নাম করুন তো।

* লালবাজার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কালোবাজার ছিলো কিনা জানা যায় না। Unlimited কোম্পানী বলে টেলিফোন ডিরেক্টরীর মত একখানা অত বড় বই ছাড়া প্রবর্তকদের নাম ছাপা সম্ভব নয়। একজন বিখ্যাত কালোবাজারীর নাম জানি কিন্তু সম্প্রতি তাঁর পিতার মৃত্যুসম্বাদ পেয়েছি বলে দিতে পারলাম না!

শ্রীপান্নালাল দাস (রামমোহন দত্ত রোড)

সন্ন্যাসীরা বলেন যে বেশী কথা বললে আয়ু কমে যায়, আপনি কি বলেন?

* সন্ন্যাসীদের মধ্যে জহরলালের খ্যাতি কি এখনও অনুপস্থিত?

২। আচার্য কৃপালনী একদিন কলিকাতা কিশোর সভায় বলেছিলেন যে মহাত্মা গান্ধী বিড়ি খেতেন না বলে তিনি মহাত্মা হয়েছিলেন। যদি তাহা হয় তবে যারা বিড়ি খায় না তারা কি সব মহাত্মা?

* গণ্ডার বা কৃপালনী কেউই ঘাস খায় না তাই বলে যারাই ঘাস খায় না তারাই কি গণ্ডার বা কৃপালনী হতে পারে?

সুব্রত গুপ্ত (খড়্গপুর)

যে সাপ খেলিয়ে জীবিকা অর্জন করে তাকে বলি সাপুড়ে, কিন্তু যে লোক খেলিয়ে জীবিকা অর্জন করে তাকে কি বলবো?

* 'স্ত্রী'-লোক!

৩। একজন বৈষ্ণব আর একজন তান্ত্রিক, দুই-এর মাঝে কি?

* কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভক্ত!

এন রায় (ডিব্রুগড়)

শ্বশুর বাড়ি থাকে যদি তবে শাশুড়ী বাড়ি হবে না কেন।

* আপনি বলছেন, Prime Minister, Deputy Prime Minister-এর মত, দেশে যখন এত লুঠতরাজ হত্যা ধর্ষণ ডাকাতি হচ্ছে তখন Crime Minister, Deputy Crime Minister হবে না কেন? কিন্তু ক্রাইমের জন্যে আলাদা মিনিস্ট্রী হলে এখনকার মন্ত্রীরা কি করবেন?

শ্রীহরিপদ দাশগুপ্ত (ডবসন রোড)

পূজোর বাজারে নগদ দুইটি টাকা গঙ্গায় ফেলিয়া আপনাকে একটি প্রশ্ন করিতেছি, "অচল টাকা যদি বাজারে অচল। অচলপত্র নয় কেন?"

* গঙ্গা থেকে সেই দুটি টাকা তুলে নিয়ে জবাবে লিখছি যে, শ্রীহরির পদে আশ্রয় নিলে সব দুঃখ দূর হয় ; কিন্তু শ্রীহরিপদ দাশগুপ্তের শ্রীচরণে ধরলে শুধু নোংরা হয় কেন হাত বলতে পারেন?

দিলীপ সেন (হরিশ মুখোপাধ্যায় রোড)

বার্ণার্ড শর মত ক্রিটিকের মৃত্যুতে আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করছে আপনার মত ক্রিটিকের মনে সত্যিই আঘাত দিয়েছে কি...না?

* রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ায় দুঃখিত হওয়ার কারণ ছিলো, কারণ তাঁর পক্ষে আরোও দশদিন বাঁচার মানে ছিলো আরো দশটি রচনার জন্য ; শ'র বেঁচে থাকা মানে সাবান দিয়ে মুখ ধুলে কি হয় বড়জোর সেইটুকু জানা।

ভ্রমরকুমার ব্যানার্জি (ঘুঘুডাঙ্গা)

"আকাশেতে ধায় রথ, ভূতলে সারথী"—এমন রথখানা কি বলতে পারেন?

* ঘুড়ির এমন বর্ণনা কালিদাসেও পড়িনি।

রামধুন রায় (সরকার বাগান স্ট্রীট)

ছেলেদের বেলায় প্রাতঃস্মরণীয়, মেয়েদের বেলায়?

* রাতঃস্মরণীয়া!

শিশিরচন্দ্র মল্লিক (সাঁতরাগাছি, হাওড়া)

'পুরুষ মানুষের গলায় মেয়েলী স্বর'—এক কথায় বলুন।

* নরেশ মিত্তির।

মহেশ্বর চৌধুরী (রক্সৌল)

শুধু পাগল আর বদমাইস পাগলে তফাৎ কি?

* কাঁকের অধিবাসী এবং কংগ্রেসের সভ্যের মধ্যে যে—তফাৎ!

বারীন দাশের প্রথম প্রেম তো পশ্চিমা মেয়ে লছমী ; আপনার প্রথম প্রেম কে?

* অচলপত্র!

১। গুরুগজানন (কলিকাতা)

যিনি নিজের মনের কথা অপরের মুখ দিয়ে বলান তাঁকে এক কথায় কি বলে?

* সিনেমার ডিরেক্টর।

২। চিঠিতে কম টিকিট থাকলে প্রায় ডবল আদায় করে নেয়। কিন্তু বেশী থাকলে ফিরত দেয় না? বেশ মজা।

* আপনার তিন বছরের জায়গায় পাঁচবছর জেল হলে অ্যাপীল করেন। দশবছর জেল খাটাবার যার কথা, কোনও কারণে তার যদি পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ না হতেই মুক্তি হয়,

তাতে কি আর বাকী পাঁচ বছর জেল খাটবার জন্যে কর্তৃপক্ষকে সাধাসাধি করে?

শ্রীধর্মদাস ঠাকুর (কারগলী কোলিয়ারী)

আচ্ছা বলতে পারেন কোথাও যাবার প্রবল ইচ্ছা থাকলে যদি স্টেশনে এসে গাড়ি ফেল করে তবে তাহার অবস্থা কাহার সহিত তুলনা করা হয়?

* 'বরসাত' ছবিটি দেখতে দেরী করে এসে যদি শোনেন 'লাল দোপাট্টা মলমল' গানটি শেষ হয়ে গেছে তাহলে আপনার মনের অবস্থা যা হয় তার সঙ্গে।

সরিৎ তোপদার (রিপন হস্টেল, হ্যারিসন রোড)

১। Love and Cough Can not be hidden—কথাটার বাংলা কি হবে?

* 'বাংলা ছবির দৈর্ঘ্য বারো হাজার ফিটের কম হওয়া সম্ভব নয়'!

২। আমার রুমমেট অচলপত্রকে বলে বাচাল পত্র—আপনার মতামত কি?

* সজনীকান্ত দাস মহাশয় কি আজকাল রিপন হস্টেলে থাকেন?

মীরণ রায় (কলিকাতা)

প্রেমিক প্রেমিকাকে দেয় কি আর বিনিময়েই বা পায় কি?

* দেয় বাপ-মার অমতে পালিয়ে যাবার মন্ত্রণা আর পায় প্রেমিকার সঙ্গে অন্যলোকের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ লিপি!

সুরুচি পাত্র (অভয় ঘোষ লেন, কলিকাতা)

...আর যদি ঠিকানা নিয়ে আমার বাড়িতে আসেন, তবে বুলডগ আর পাড়ার ছেলেদের লেলিয়ে দেবো—বুঝেছেন।

* বুঝেছি। কিন্তু আপনি থাকতে আবার বুলডগকে বিরক্ত করা কেন?

রামলাল পাকড়াশী (হরিদ্বার)

ঘুণ জিনিষটা কি?

* একরকম পোকা যা কাঠে আর সরকারী মাথায় খুব সহজে ধরে।

স. না. ভৌ (গোলবাজার, খড়্গপুর)

লাক্স কি সত্যিই চিত্রতারকাদের প্রিয় সাবান?

* হ্যাঁ। জলযোগের পয়োধি ছিল যেমন রবিবাবুর প্রিয় পানীয়।

২। চুল কাটাইবার দরকার হইলে আমরা বলি চুল কাটব কেন?

* প্রত্যেক নরের মধ্যে নরসুন্দর হবার আদিম বাসনাই এর কারণ।

৩। জীবনের নানা ক্ষেত্রে মেয়েরা যে-সব সুবিধা পায় তার বিরুদ্ধে আন্দোলন কবে হবে?

* আপনি বলছেন স্বামী মারা গেলে মাসে একবার করে না খাওয়ার সুবিধা, সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকার সুবিধা, প্রতিবৎসর একটি করে রুগ্ন সন্তানের জন্ম দিয়ে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে পড়বার সুবিধে,—এর বিরুদ্ধে সত্যিই আন্দোলন হওয়া উচিত—তাই নয় কি?

৪। মেয়েরা ছেলেকে বিয়ে করে? না ছেলেরা মেয়েকে?

* আপনার জিজ্ঞাস্য ঃ সাপেরা মানুষকে খায় না মানুষেরা সাপের মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ে ;—কে জানে?

সত্যেন ঘোষ (কসবা)

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলিই কি প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চ?

* হ্যাঁ, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তফাৎ শুধু এই যে এখানে যারা দর্শক তারাও অভিনয় করে সর্বক্ষণ।

অসীমকুমার দাস (কলুটোলা, কলিকাতা)

১। বিজয়ার সময় মেয়েতে মেয়েতে কোলাকুলি করে না কেন?

* করলেই বা আপনার লাভ কি হোত?—তার চেয়ে বরং আপনার জিজ্ঞাস্য হোক! বিজয়ার সময় মেয়ে আর ছেলেতেও কেন কোলাকুলি হয় না?

২। বাংলা চলচ্চিত্রে নাট্য-সম্রাজ্ঞী কার উপাধি?

* কালিকা হলে রমা চৌধুরী ; রঙমহলে ঃ শান্তিগুপ্তা! শ্রীরঙ্গমে ঃ শিশিরকুমার ভাদুড়ী (ওঁর সামনে আর কারোর নাট্যসম্রাজ্ঞী হওয়াও আস্পর্ধা)—মিনার্ভাতে একজন নাট্য সম্রাজ্ঞী হচ্ছিলেন ঃ সীতা দেবী। আসলে ঐ উপাধি পাওয়া উচিত সরযূবালার!

শ্রীপ্রদীপ কুমার কাহালী (কর্ণেল বিশ্বাস রোড, কলিকাতা)

"খেলা"—definition কি?

* ফুটবল হলে যাতে রেফারী মার খায়, ক্রিকেট হলে যাতে ভালো খেলার অপরাধে মুস্তাক আলি বাদ যান, টেনিস হলে যাতে টিকিটের দাম পঞ্চাশ টাকা, বিলিয়াড হলে যাতে লজ্জিত না হয়ে মদ খাওয়া চলে সংগে সংগেই! এবং পঙ্কজ গুপ্ত যার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত নন, তা কোনো খেলাই নয়।

একজন পাঠিকা (রাঁচী)

যারা মদ খায় তারা মাতাল, কিন্তু যারা মদ খায় না তাদের কি বলা যেতে পারে?

* মদের দোকানের মালিক!

নরসুন্দর চোবে (কলুটোলা)

শ্বশুর মহাশয়রা জামাইদের বাবাজীবন বলেন কেন?

* 'ঠেলার নাম বাবাজীবন' জানেন না? পণের টাকার ঠেলায় বলেন!

কমলকুমার চক্রবর্তী (বালিগঞ্জ)

ইন্দ্রকে যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি হচ্ছেন ইন্দ্রজিৎ। আর নারীকে যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি হচ্ছেন কি?

* গয়নার ক্যাটালগ!

শ্রীঅমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বহুবাজার)

পুরুষেরা যদি পরীক্ষায় বারবার অকৃতকার্য হয় আর মেয়েরা যদি বারবার বরপক্ষ তরফ থেকে অপছন্দ হতে থাকে তখন উভয়ের যে মনের অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

* তখন পুরুষরা ভাবতে থাকে পরীক্ষায় পাশ না করেও রবীন্দ্রনাথ কত বড় কবি হয়েছেন। শ কত বড় নাট্যকার! আর মেয়েরা ভাবে কেন সব মেয়েই পুরুষের ক্রীতদাসী হবে? সব মেয়েই যে বিয়ের জন্যে পাগল নয় তার প্রমাণ হল তারাই! (এই কথা সগর্বে ঘোষণা করে আইবুড়ীরা)

সত্যেন ঘোষ (কসবা)

"নূতন প্রভাত" এর দিকে দৃষ্টিপাত দিয়েছেন কি?

আপনারই প্রশ্নের জবাবগুলো বেমালুম চালিয়ে দিচ্ছেন।

* 'নূতন প্রভাত' কি করছেন জানি না, তবে প্রভাত থেকে প্রদোষ সকলকেই দেখছি দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের ব্যর্থ অনুসরণ করবার উন্মত্ত প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হতে। অনুকরণ করতে গিয়ে ইদানীং এঁদের জ্ঞানে এসেছে যে আমার স্টাইলের ধারাটা অননুকরণীয়। তাই এখন বেমালুম নকল করবার চেষ্টাও চলছে। যারা আমার সাফল্যকে ঈর্ষা করে আমায় গালাগাল দেবার জন্যেই একখানা করে কাগজ বার করছে, মজা দেখছি তারাও বিজ্ঞাপন থেকে সমালোচনা সবই আমার দেওয়া ভাষার নকল করেই তবে পাতা ভরাতে পারছেন। তাঁরা বুঝছেন না imitation is the best complement paid to genius by

mediocrity ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার যাঁরা সমবয়স্ক তাঁরা এবং আমার সহপাঠীরা অনেকেই অচলপত্রের অভূতপূর্ব বিক্রী—বঙ্গদর্শন থেকে আজও পর্যন্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কোনও একখানিও ইংরেজী কি বাংলা পত্রিকার জীবনে যা সম্ভব হয়নি এবং সম্ভবত আর যার পুনরাবৃত্তিও হবে না, দেখে একটু চঞ্চল হয়ে ভাবছেন : এ সেই দীপ্তেন! যাঁরা আমায় কিছুকাল আগে boss করবার চেষ্টা করতেন তাঁরাও কিছুটা অবশ হয়ে এসেছেন এখন। আরো মুশকিল হচ্ছে আমাকে বাদ দিয়ে অচলপত্র ভাবাও অসম্ভব। আমিই এর সব। আর যারা আছে তারা fill up the gaps মাত্র। গল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমি এখনও হাত বাড়াইনি। তবে যেদিনই বাড়াব সেদিনই বাংলা সাহিত্যে এতকাল সব লেখকেরই যা নাগালের বাইরে ছিলো জানি তা আমার মুঠোয় আসবে। বাংলা সাহিত্যে একটিই নাম করবার মত লোক জন্মেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যে বদনাম করবার মত লোকও একটা জন্মেছে তার নাম দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল। রবীন্দ্রনাথ যদি সাহিত্যের রাম হন তো দীপ্তেন্দ্রকুমার বাংলা সাহিত্যের রাবণ। রাম-রাবণের যুদ্ধে কে কার অনুগমন করছে সেটা ধর্তব্য নয়। আমাকে অনুকরণ করে বা নকল করে যদি অন্ন জোটে কারও তাতে আর যেই রাগ করুক আমার অনুরাগে ভাঁটা পড়ে না তাঁদের ক্ষেত্রেও!

রবি রায় (জলপাইগুড়ি)

সেদিন আমার সামনে একখানা উলঙ্গ নারীর মডেল চিত্র দেখে এক ভদ্রলোক আমার রুচির নিন্দা ও যথেষ্ট তিরস্কার করলেন। আজ সকালে মন্দির শিল্পে (ভারতীয়) যৌন অভিব্যক্তি চিত্র পূর্ণ (?) একখানি অ্যালবাম আমার সামনে দেখে উক্ত ভদ্রলোক খুব অনুগ্রহের সাথে অ্যালবামের নগ্ন, অর্ধনগ্ন মিলিত ও মিলনেচ্ছু অজস্র নর-নারীর চিত্র দেখে আমার সাথে অতীত ভারতের শিল্পাচার্যগণের যশ গাথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

* জীবনের সব ক্ষেত্রেই দেখবেন অতীতকে সে যতটা মহৎ নয় ততটা মহৎ এবং বর্তমান যত খারাপ নয়, তাকে তত খারাপ করে দেখাবার একটা মর্মান্তিক চেষ্টা সব যুগেই সবাইকে পেয়ে বসেছে। এর কারণ যে, অতীত আমাদের জীবনকে কোনভাবেই affect করে না, 'বর্তমান' করে। অতীত ভারতকে আমার মডার্ন প্যারিস ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সেদিনকার মেয়েরা যেভাবে চুল বাঁধতো, কাপড় পরত, অঙ্গ রাগান্বিত করত, আজকের প্যারিসের মেয়েরাও অন্য কোনও উপাদানে প্রস্তুত একই স্টাইলের রকমফের করে নিন্দিত। সংস্কৃত কাব্যে যৌন বর্ণনার একশোর একের ভাগ আজকের সাহিত্যে থাকলে সরকার তা নিজেরা উপভোগ করবার জন্যে বাজেয়াপ্ত করতেন। পুরীর মন্দিরগাত্রের চিত্রগুলি সহনীয়, তার অনুকরণ কিন্তু অশ্লীল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের সমালোচকদের কাছে নিন্দিত, আজকে সেই একই কারণের জন্যে পূজা পান।

কুমারী রচনা রায়

আমরা নামের আগে কুমারী লিখি কেন?

* সেইটেই আমার প্রশ্ন!

"কচটতপ" (বেলেঘাটা)

Sex-appealটা কি মেয়েদের মনোপলি? পুরুষেরও তো Sex রয়েছে, appeal নেই কেন?

* টাইম-টেবিল জিনিসটা কি টেবিলের মধ্যে গণ্য হয়?

মানসী দে (কাটিহার)

মানুষ ছাড়া আর কারুর 'আত্মা' আছে?

* কেন? জুতোর সোল ; (বেশিই আছে জুতোর— $\frac{1}{2}$ সোলও!)

কল্যাণ দাশ (হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা)

১। ছেলেদের পক্ষে মেয়েদের কাছে attractive হবার উপায় কি?

* কোনও স্টুডিয়োর অভিনেত্রী রিক্রুটারের পদে আসীন হওয়া!

২। লম্বা হবার কোন ভাল exercise জানা আছে কি?

Height ৫ ফিট। এইজন্য কোন মেয়ে আমায় পছন্দ করে না।

* বাজে কথা। তাহলে লেডি মিরাণ্ডা হস্টেলের লেখকের জন্যে মেয়েরা এত পাগল হত না? বারীন দাশের হাইট তো ৪ ফিট ৭″।

৩। আচ্ছা, ছেলেরা কেন শীষ দেয় আর মেয়েরা কেন দেয় না, বলতে পারেন?

* শীষের সঙ্গে সিগারেটের একটা অঙ্গাঙ্গী অর্থাৎ তালা-চাবি বা রুটি-মাখন সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ ছেলেরা সিগারেট খায় এবং শিষ দেয়. মেয়েরা সিগারেট খায় না এবং শিষও দেয় না।। যে-সব মেয়েরা সিগারেট খায় দেখবেন তারা শিষ দেয়।

সুধীরকুমার ঘোষ (লিডু, আসাম)

দুশো টাকার থেকে দেড়শ সাড়ে উনপঞ্চাশ আট আনা বাদ দিলে কত অবশিষ্ট থাকে?

* আপনার Purse!

মানসকুমার (তিনসুকিয়া, আসাম)

তিনটে, ছটা, নটায় 'যুগদেবতার' সমালোচনায় একবার নয়, দু'দবার ভুল করে বসে আছেন। "যুগদেবতায়" রাণীর নাম নারায়ণী নয় তার নাম রাসমণি, একথা সর্বজনজ্ঞাত।

* ভুল নয়, বানানটা ভুল। রাণী রাসমণী নয় রাণী নারায়ণীই হবে। যুগদেবতা আপনি এখনো দেখেননি। দেখলে জানতে পারতেন যে ছায়াচিত্রে নামগুলো বদল করে রাখা হয়েছে। বিবেকানন্দের আসল নাম নরেন্দ্র না রেখে করা হয়েছে লোকেন। রাণী রাসমণি হয়েছেন রাণী নারায়ণী। মথুরবাবু হয়েছেন বৃন্দাবন। আপনি ট্যাড়শ তাই গালাগাল দেওয়া পণ্ডশ্রম মনে করলাম, শুধু ভুলটা শুধরে নেবেন।

শ্রীচাঁদু গাঙ্গুলী (কালীঘাট, কলিকাতা)

তরুণীর ঠোঁটের সাথে কিসের তুলনা করা যায়?

* পুডিংএর সঙ্গে যার taste lies in the eating.

শ্রীশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (গৌর দে লেন)

প্রতি দশ বৎসর অন্তর যে লোক গণনা করা হয়, তাহাতে কি ভিখিরীদেরও গণনা করা হয় না তাদের সংখ্যা বাদ দিয়ে লোক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

* গণনা করা হয়। বাঙালীদের তো কই গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয় বলে শুনিনি।

শ্রীদীপনারায়ণ দত্ত (ঢাকুরিয়া)

প্রায় সব ছবিতেই দেখি, নায়িকা হয়ত দোতলার ঘরে গান গাইছে, আর নায়ক তা শুনতে পেয়ে কাউকে কিছু না বলে হড়বড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো। ব্যস সঙ্গে সঙ্গেই গান, ইসারা, অভিমান, বিচ্ছেদ, মিলন।...এসব ব্যাপারে নায়িকাদের বাবারা কোনও আপত্তি করে না। ছায়াছবির সঙ্গে বাস্তবের মিল থাকা দরকার তো?...কিন্তু কৈ?

* নায়িকার ছবিতে দেখানো বাবারা আপত্তি না করবার জন্য প্রতিদিন কত টাকা পায় তা জানেন?

শ্রীসখেরা (পাটনা)

ফিল্ম স্টুডিওর মধ্যে বা তারকাজগতে কোনও প্রকার জাতি বিচার বা জাতি ভেদ প্রথা আছে কি?

* আছে : সেখানেও 'স্ত্রী'-জাতিরই সর্বপ্রকার সুবিধা।

শ্রীগোবিন্দলাল ঘোষাল (সাতগাছিয়া, বর্ধমান)

প্রত্যেক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্টেশনের নাম লেখা থাকে।...হাওড়া স্টেশনে কোথাও

নাম লেখা নেই। কারণটা কি দয়া করে জানাবেন?

* 'কেওড়াতলা বার্নিং ঘাট' লেখা না থাকলে কি ওখানে মৃতদেহ পোড়াতে কোন অসুবিধে হত?

পরিতোষ সাধুখাঁ (জগুবাবুর বাজার)

পটলের দাম কত হয়েছে জানেন?

* না ; তবে শুনেছি পটলের যা দাম তাতে পটল কেনার চেয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে পটল তোলাই এখন শ্রেয়!

নিদাঘ রায় (চুঁচড়া)

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আর উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য?

* গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া আর গঙ্গাযাত্রার মধ্যে যে পার্থক্য! ট্রামে করে নিমতলা গিয়ে ঘুরে আসা আর চারজনের কাঁধে চেপে নিমতলায় গিয়ে আর ফিরে না আসার মধ্যে যে পার্থক্য! গোগিয়া পাশার ম্যাজিক—টাকা আর গভরমেন্টের আসল টাকার মধ্যে যা তফাৎ!

ডি. কে. ঢাণ্ডানিয়া (১৬৮ বি, কটন স্ট্রীট)

The People of our nation is suffering particularly Bengal gone through the 1350. Starvation and in 1946 it has been butchered and there by Bengal has sacrificed and others are taking benefit.

* Dont আ Write আ Such আ English আ! এক বছরের অচলপত্র এমনি দেব যদি এরকম ইংরেজীতে চিঠি আর না দেন!

শ্যামলী (শিলং)

যে ভালবাসে সে প্রেমিক অথবা প্রেমিকা নামে অভিহিত হয় কিন্তু যাকে ভালবাসেনা, তাকে কি বলা হবে?

* নাবালক অথবা বৃদ্ধা!

জবারাণী দত্ত (আমহার্স্ট স্ট্রীট)

বাড়ির কেহ মরিলে আমাদের (বাঙালী হিন্দুদের) আনন্দ হওয়া উচিত না দুঃখ হওয়া উচিত? আমি বলছি এই জন্যে যে প্রায় সকল মৃত-বাহকদের কণ্ঠ নিঃসৃত "বল হরি হরিবোল" বুলিটি মনে সন্দেহ জাগায়!

* জানি না। তবে 'বল হরি বোল' শুনে যারা মরা বয়ে নিয়ে যায় ইচ্ছে করে তাদেরকেই আগে চিতেয় তুলে দিই—নাহলে মড়াও মরে শান্তি পাবে না!

কমলকুমার রায় (রামময় রোড)

পত্র যদি অচলই হয় তবে তাকে চালাবার এত চেষ্টা কেন?

* মেয়ে দেখতে খারাপ বলে তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কি অন্যায়?

বিশ্বনাথ বসু (প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা)

প্রথম বিয়ে কোরেছি, আলাপ করবো কেমন করে?

* প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট থেকেও শেষে এই প্রশ্ন!

জয়দেব বড়াল (শিবপুর, হাওড়া)

'বটতলা' একটা প্রেসের নাম না কি কোন প্রকাশকের নাম?

* ভাল লেখকদের খ্যাতির উচ্চতম শিখরে উঠে যা পয়সার তাগিদে লিখতে হয় তাকেই বলে 'বটতলার' নাটক গল্প উপন্যাস!

সুহাস চক্রবর্তী (লোকাল)

আচ্ছা বলুন তো "Achal Patras Edition is a noble animal" কথাটার

বাংলা মানে কী?

* অচলপত্রের সম্পাদক সুহাস চক্রবর্তী জাতীয় জীবের চেয়ে মহত্তর প্রাণী!

শ্রীমণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)

আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু বলেছেন, আপনার সম্পাদক না হয়ে নাকি উকীল হওয়া উচিত।...

*স্বভাবতই তিনি রসিকতা করতে গিয়ে না জেনে সত্যি কথা বলে ফেলেছেন একটা! উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার যে কাজেই আমি যেতাম তাতেই প্রথম হতাম। গান গাইলে কি ছবি আঁকলে ঠিক অচলপত্রের মত দেশ জোড়া হৈ হৈ আমি এখনও আবার আনতে পারি! প্রতিভা, যেখান থেকে ক্ষমতার জন্ম সেখানে এই মুহূর্তে আমার দেশে আমাকে অদ্বিতীয় বলেই জানবেন!

বুবলু রায় (হরধর স্ট্রীট, শ্রীরামপুর)

"A little learning is a dangerous thing"—বিশ্বাস করেন?

* না; বরং বিশ্বাস করি A little earning is a dangerous thing!

রামহরি, সত্যহরি দে (বকুলবাগান)

আপনি কি বলবেন যে ভগবানকে ডাকলে তিনি কথা শোনেন?

* শোনেন তবে অর্ধেক! ধরুন আপনি সদ্য বিবাহিত ; স্ত্রীর সঙ্গে একটু গাড়িতে ঘুরবেন, কিন্তু আপনার গাড়ি নেই। ভগবানের কাছে খুব কম করেই একখানা Baby Austin চাইলেন ; ভগবান আপনার প্রার্থনার অর্ধেক পূরণ করবার জন্য Baby Austin না দিয়ে আপনার স্ত্রীর কোলজোড়া একটি Baby দিলেন তখন? আরো খরচান্ত এবং আরো বড় গাড়ির প্রার্থনা না হ'লে তখন আর...!

ত্রিলোচন দে সরকার (নদীয়া)

Court Ship কথাটার মানে কি আমায় বলবেন?

* বিবাহ করতে প্রস্তুত দুটি নরনারীর বিবাহের পূর্বের প্রেম প্রেম খেলা ; যেমন মামলা করতে প্রস্তুত অ্যাটর্নী মক্কেলের মামলার পূর্বের প্রেম প্রেম খেলাকে বলা হয় High Court Ship!

রমেন মুকুল (ধল গোবিন্দপুর)

প্রোফেসর সোম, যিনি ম্যাজিক দেখান, তিনি কিসের প্রোফেসর এবং কোন্ কলেজের?

* ওই ম্যাজিকটির কথা তিনি কাউকে খুলে বলেন না।

শুদ্ধস্মৃতি শর্মা (কলিকাতা)

যারা পণ্ডিত হয়েও মূর্খ, তাদের বলি পণ্ডিত মূর্খ ; কিন্তু যারা শিক্ষিত হয়েও অন্ধ-তাদের কী বলবো?

* Proof-Reader!

শুভ্রা গাঙ্গুলী (বকুল বাগান রোড)

বাজী হেরে বাজীর টাকা না দেওয়া জিনিসটা কি?

* ডিগবাজী!

এস গুহ (লেক প্লেস, কলিকাতা)

দিবালোকে চুমু ও রাত্রি বেলার চুমুর পার্থক্য কি?

* ক্রশওয়ার্ড পাজল জেতা আর ডার্বি জেতার মধ্যে আনন্দের যেটুকু পার্থক্য!

শ্রীমৃণাল মজুমদার (ডিব্রুগড়)

'বন-মহোৎসব' পালনে আমাদের কি লাভ হোল আর কিই বা হবে?

* মস্ত লাভ হোল। পরের বোন নিয়েই মহোৎসবে আমরা এতকাল অভ্যস্ত ছিলাম ;

স্বাধীন সরকার বলছেন এখন নিজের বন নিয়ে...

শ্রীমাণিক (পাটনা)

প্রায় পত্রিকারই বিজ্ঞাপন দেখলাম বিভিন্ন কাগজে...যেমন : 'নিয়মিত দেশ পাঠ করুন' --আনন্দবাজার।...আপনার অচলপত্রের বিজ্ঞাপন দেখি না কেন?

* সূর্যের আর অচলপত্রের কোন বিজ্ঞাপন দরকার হয় না!

লাবণ্য মজুমদার (ডিব্রুগড়)

আপনি কি?

* ব্রহ্ম!

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ গুহ (হাওড়া)

ছেলেবয়সে পাকামি করলে বলা হয় 'অকালপক্কতা' আর বুড়ো বয়সে চ্যাংড়ামো করলে তাকে কি বলা যায়?

* "মাননীয় মন্ত্রীর বেতার-ভাষণ"।

বিয়ে বাড়ির অকারণ ব্যাস্তবাগিশতার সঙ্গে কিসের তুলনা করা যেতে পারে?

* কলকাতা পুলিসের রাস্তায় ভীড় সরাবার জন্যে 'আকুল উদ্বেগের' সঙ্গে!

শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া)

একদিকে নিরন্নের শোভাযাত্রা এবং অন্যদিকে খাদ্যের অপচয়,--এ কবে বন্ধ হবে বলতে পারেন?

* যতদিন আপনাদের তৈরী এই একচোখা সমাজ ভেঙে না পড়ে! যে একচোখা সমাজের একটি মাত্র চোখ আছে বড়োলোকদের স্বার্থরক্ষার দিকে। যে নুলো সমাজের একটি হাত আছে বড়লোকদের আশীর্বাদ বিতরণের জন্যে! আর যে খোঁড়া সমাজের একটি মাত্র পা আছে--গরীবদের পদাঘাত করবার জন্যে!

বিধানচন্দ্র সেন (লাউডন স্ট্রীট)

দেশের জন্যে যারা হেলায় প্রাণ দেয় তাদের চেয়ে বড় শহীদ আর কে আছে?

* কেন? ফুটবল রেফারী! শহীদরা তো মরে বেঁচে যায়--এরা বেঁচে থেকেই মারা পড়ে--প্রায় আধমরা হয়ে পুলিস পাহারায় ঘরে ফেরে--কাগজে পড়েন না?

পরিতোষ দত্ত (ইমাম বাজার লেন, হুগলী)

বলতে পারেন 'স্বরাজ' এবং 'রামরাজ্য'র প্রকৃত অর্থ কি হতে পারে?

* স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাগজের একজন লেখক। 'রামরাজ্য' একখানি হিন্দি-ছবির নাম।

সবিতা রায় (যাদবপুর)

কাগজে প্রায়ই দেখা যায় প্রতারণার বা ফুসলাইবার অভিযোগে এক ব্যক্তি দণ্ডিত ; মেয়েরা যদি ফুসলায় ছেলেদের তার দণ্ড কি হয় বলুন তো?

* কোন দণ্ড হয় না। সেই সব মেয়েরাই কালে শ্রেষ্ঠ চিত্র-তারকা হয়ে দেখা দেয়!

সুষ্ঠুভাষী (ভবানীপুর)

পত্রটির নাম "অচলপত্র" চমৎকার হইয়াছে। সম্পাদকের নাম কিন্তু 'দী' প্তেন্দ্র 'কু' মার 'সা' ন্যাল মানায় নাই মোটেই। নামটা হওয়া উচিত ছিলো ঃ 'দী' র্ঘকায় 'কু' ৎসিত 'সা'রমেয়।

* পৃথিবীতে দৈহিক-সুন্দর মানুষ মনে এত নোংরা যে আমাকে 'কুৎসিত' বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিই। মানুষ আজ এত বিশ্বাসঘাতক যে আমাকে 'বিশ্বাসী সারমেয়' বলার জন্যে আপনাকে নমস্কার জানাই।

শ্রী "অফুরন্ত" (মেদিনীপুর)

"জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" তাই যদি হয়, তাহলে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে এত লোক না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরল কিরূপে?

* ভগবান জীব দেন এবং আহারও দেন কিন্তু মনুষ্য-সমাজের এক অংশ যদি শুধু জিবে-গজা খেতে চায় তো আরেক অংশে জীবেরা না খেয়ে মরবেই।

শিবশঙ্কর নন্দী (বিবিগঞ্জ, মেদিনীপুর)

প্রবাদ আছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এ-সম্বন্ধে আপনার কি মত?

* আমার মতে পুত্রার্থে নয় আসলে "পণ্যার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"--পণের টাকার জন্যেই ত আসলে বিয়ে করা—নয় কি?

রমাপতি নাথ (বি. কে. পাল এভেন্যু, কলিকাতা)

মায়ের চেয়ে যে-বড় তাকে বলে ডাইনী। আপনার বাবার চেয়ে যে বড় তাকে কি বলবেন?

* জীবনবীমার দালাল।

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর, কলিকাতা)

দেবতায় যাদের বিশ্বাস নেই তাদের বলা হয় 'নাস্তিক' আর অপদবেতায় যাদের বিশ্বাস নেই তাদের কি বলা হয়?

* কম্যুনিস্ট।

সরোবরে সুশোভিতা নলিনী নস্কর (গার্ডেনার লেন, কলিকাতা)

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে 'সুনন্দা' হয় 'নন্দা' ; 'সুমিত্রা' হয় 'মিত্রা'। কিন্তু আমার নামের সংক্ষিপ্তরূপ সেই ব্যক্তির মুখে (ধরুন আপনিই সেই লোক) কি হয়ে উঠবে বলতে পারেন?

* ভীতা! (যদিও আসলে ভয় পাচ্ছি আমি!)

জনৈক পাঠিকা (রাসবিহারী এভিন্যু)

...সেইজন্যে আজকাল ক্রমশঃ মনে হচ্ছে আপনাদের রচনা যতটা চমক লাগায় ততটা মুগ্ধ করে না। কথাটা হচ্ছে যে আপনারা যদি এই উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য-আসরে নেমে থাকেন তো আমাদের বলবার কিছু নেই। হঠাৎ দেখা বিদ্যুতের মত ক্ষণেকের জন্য মানুষকে চমক লাগিয়ে সে অসীম শূন্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যে সময়টা দেখছি সেই সময়টুকু মাত্র আমাদের নয়ন মন ঝলসে দেবে, এইটুকু পর্যন্ত। তার বেশি নয়। আপনারা 'সাংবাদিক' হতে পারবেন কিন্তু 'সাহিত্যিক' নয়। মাঝে মাঝে আপনাদের অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য আপনাদের পত্রিকার প্রতি আমাদের মনকে শ্রদ্ধাহীন করে দেয়। প্রসঙ্গত যে নামের উল্লেখ করা এখানে অপরিহার্য সেই নাম উল্লেখ করতে আমার মন দ্বিধায় সঙ্কুচিত এবং কলম 'লজ্জায় কুণ্ঠিত' হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে কিছু বলব কারণ লজ্জা বা কুণ্ঠার চেয়ে দুঃখ এখানে অনেক বেশি। জনৈকা ভদ্রমহিলাকে আপনারা চিঠিপত্তরের জঞ্জালে লিখেছেন "আপনি দেখছি আধুনিক মার্কাদের সম্বন্ধে ঠাকুরের মন্তব্যকেও হার মানালেন।" আপনাদের বুদ্ধি আছে বেশী, কিন্তু তাই বলে হৃদয়ের অনুভূতিকে একেবারে ছেঁটে ফেলবেন না। তাহলে সেটা সাহিত্য না হয়ে ধাঁধা হয়ে যাবে না কি? এই ধরনের সমালোচনা চলতে পারে নীলিমা সান্যাল কিংবা বনফুল, বিমল রায় কিংবা রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্বন্ধে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমালোচনা করার উপায় এ নয়। আপনাদের বুদ্ধি শাণিত কিন্তু সেটাকে তলোয়ারের মত ভয়ঙ্কর করে বাঙালীর নিজ সংস্কৃতির ওপর ফেলবেন না, আপনারা অনন্যসাধারণ এবং অভূতপূর্ব নারীবিদ্বেষ ব্যক্ত করে দ্বিতীয় শোপেনহাওয়ার হতে চান কিনা জানি না কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধরনের মন্তব্য আপনাদের কাছে শোনা যায় সেগুলো মনে করিয়ে দেয় বাঙালীর কেরানী-সুলভ মনোবৃত্তি যে-কেরানীকে আপনারা নিজেরাই

বলেছেন two faced man.

* আপনার দীর্ঘপত্রের সামান্য অংশ মাত্র ছাপাতে পারলাম এজন্যে দুঃখিত। আপনার চিঠিতে পুরো ঠিকানা দেওয়া নেই, নাহলে যদিও আমি নিজের হাতে লিখে চিঠির জবাব প্রায়ই দিই না, তবুও আপনারটা দিতাম। আপনি মহিলা বলে নয়, ভদ্র বলে। 'সাহিত্যিক' হতে পারব না, 'সাংবাদিক' হতে পারি বড় জোর—আপনার এ মন্তব্যে খুশী হলাম।

'সাংবাদিক' যদি না হতে পারি অখুশী হবার নেই কিছুই।

পৃথিবী জুড়ে এতো লোক এতকাল ধরে এত কিছু হয়েছে যে আমরা নাহয় কিছুই না হলাম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কিছুই না, কেহই নাগো।' লেডি মিরাণ্ডা হস্টেলের ভূমিকায় বারীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন সেটা আমাদের সকলেরই কথা ঃ সৃষ্টি করবার ভার রইলো আগামী প্রজনীর উপর। আমরা শুধু চিত্রকর। ছবি আঁকাই আমাদের কাজ। ছবি বোঝান নয়।

সমাজ জীবনের এই ভাঙ্গনটুকু আমরা তুলে ধরছি আমাদের লেখায়, যাতে যা সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তার উপর যেন আপনাদের কোন মমতা না থাকে। সে জন্যেই আমাদের গল্প এত অশ্লীল, সে জন্যই প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমানদের প্রতি আমাদের আক্রমণ এতখানি শালীনতাবিহীন, সে জন্যেই আমাদের কার্টুন এত স্থূল, সমালোচনা এত নির্মম। ব্যঙ্গ এতখানি তীক্ষ্ণ। নতুন কিছু গড়তে হলে পুরোনোকে ভেঙে শেষ করে দিতে হয়। Reform আর creation-এ এজন্যেই কোনদিন কোন সম্প্রীতি থাকে না, শুধু এইটুকুই আমাদের দায়িত্ব আর এ-দায়িত্ব আমরা সার্থকভাবেই পালন করছি। তার প্রমাণ আপনার চিঠি। ইতিহাসে নাম রেখে যাবার জন্যে আমরা জন্মাইনি। সে সার্থকতা আমরা রাখি নে। কেউ আমাদের কোনদিন মনে রাখবে সে আশাও আমরা করিনে। হয়ত আপনি একাই শুধু মনে রাখবেন—আর সেইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

হাউই মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের বলে সে কি আকাশের তারকার চেয়ে কিছু কম! বরং সূর্য মানুষের আদিমকাল থেকে আজও পর্যন্ত রোজ এক সময়ে উঠে ও একই সময়ে ডুবে তার সমস্ত বিস্ময় নষ্ট করে ফেলেছে। হাউই আজও যেমন অবাক করে মুহূর্তের জন্যে আগামী দিনেও সে তাই করবে। জীবন এবং সাহিত্যকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করে তারাই যারা অত্যন্ত বোকা। যেমন গাম্ভীর্য জিনিসটা কথা ভালো করে বলতে না পারার মুখোস মাত্র। যে ভালো কথা বলতে পারে তার প্রতি গাম্ভীর্যের এত আক্রোশ বলেই কথা বলতে পারাটাকে সে ছ্যাবলামী বলে উড়িয়ে দেয়। অচলপত্র মারফৎ আমরা সমাজের সবদিক দিয়ে যে উলঙ্গ আলোচনা করেছি তা উলঙ্গ বলে বীভৎস কিন্তু তা সুন্দরের চেয়ে কিছুমাত্র কম সত্য নয়। ছায়াচিত্র সমালোচনা থেকে সাহিত্য সমালোচনা পর্যন্ত যাদেরকে প্রথম আক্রমণ আমরা করেছি তারা ওমরাহ-দলের। তারাশঙ্কর ও বনফুল আদৌ লেখক কিনা এ প্রশ্ন আজ দেখা যাচ্ছে যার পত্তন আমরা করেছি ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে। বাংলার ওপর আমাদের চেয়ে বিশ্বাস যদি আর কারো বেশি থেকে থাকে তো সে বিশ্বাস আজও রূপ পায়নি কাগজে কলমে। সত্যকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি মানুষ বা মহামানুষের চেয়ে, তাই রবীন্দ্রনাথ যখন ফতোয়া দেন অক্ষম লেখাকে সজোরে চলবার তখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য কাগজে কিংবা বক্তৃতায় করতে হয়ত রবীন্দ্রনাথের মর্য্যাদা রাখা সম্ভব হয়নি কিন্তু ইতিহাসের কষ্টিপাথরে তার দাম যাচাই হয়ে গেছে।

মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের বিদ্বেষ সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তার জন্যে গভীর দুঃখ এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মেয়ে-বিদ্বেষী হওয়া আমাদের মানায় না কারণ আমাদের জন্মদাত্রী বোধ হয় বিশ্বাস করবেন আপনাদের জাতই। মেয়েদের সম্বন্ধে যে কাগজ, "কোন মেয়েকে বিয়ে করলে তার খাওয়া, পরা থাকার সব খরচই দিতে হয় ; প্রতিদানে

কি পাওয়া যায় বলতে পারেন"—এই প্রশ্নের উত্তরে লিখতে পারে ঃ মধ্যবিত্ত ঘরের হলে ঝি ঠাকুরের কাজ এবং সভ্যতার আদিমতম কামনা মেটাবার যন্ত্র! এবং স্ত্রীরা প্রতিদানে কি পায় জানেন, শরীর ভেঙে পড়লেও প্রতি বছর একটি সন্তান কখনো কখনো লজ্জাকর রোগ আবার কখনো কখনো জোচ্চর বা খুনে স্বামীর স্ত্রী হওয়ার দুঃসহ সম্মান!"—(অচলপত্র বৈশাখ '৫৭'—পাতা নং ৯৩) তাকে কি আপনি নারী-বিদ্বেষী বলবেন? নারী-বিদ্বেষ নয়, সোসাইটির অনেকদিনের অনেক নোংরামো আজ মেয়েদের মধ্যেও বাসা নিয়েছে, আমাদের ব্যঙ্গ শুধু তাদেরকেই। আমাদের যাবার যা তা সবই গেছে কিন্তু ঘরের শ্রীটুকুও যদি থাকে সেই ভরসায় ব্যঙ্গ কখনও কখনও সীমা ছাড়িয়েছে 'কড়া অসুখের কড়া ওষুধ' এই বিশ্বাসেই। সর্বশেষে আপনি রবিঠাকুর সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য মিসকোট করেছেন, আধুনিক মার্কা লিখিনি আমরা। লিখেছিলাম আধুনিক লেখকদের রচনা সম্বন্ধে। আর রবিঠাকুর বানানটা 'রবী' করেছেন কেন? বোধ হয় এতটা রেগে গিয়েছিলেন যে খেয়াল রাখা সম্ভব হয়নি। নাহলে আপনার সমালোচনার যে রকম ধার, যুক্তি যে পরিমাণে সঙ্গত এবং গুছিয়ে লেখবার কায়দা যতটা আয়ত্ত তাতে ও বানান ভুল আপনার করা উচিত হয়নি। আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধেয় মন্তব্যের চেয়েও তাঁর নামের বানান ভুল লিখলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরাগ-ভাজন হতেন আপনিই বেশি। তাই নয় কি?

নটু মণ্ডল (ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)

যে-পুরুষ চিরদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকে তাকে বলা হয় 'ঘর-জামাই' কিন্তু যে-নারী চিরদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকে তাকে কি বলা হবে?

* সেকেলে বউ।

জগদীশ নাথ (শিলং)

আচ্ছা প্রেম জিনিসটা কি?

* "Loss of vital energy!"

পর্তুগিজ বনাম বেঙ্গলীজ!

ট্রেনের স্পিডের সেই পুরানো গুল্ চলছে ট্রেনে বসেই। তখনও পর্যন্ত পর্তুগিজ ফার্স্ট যাচ্ছে। তার গল্প হচ্ছে, সে বাড়ি থেকে দেরীতে বেরিয়ে স্টেশনে যখন পৌঁছেচে তখন ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। কুলিকে পিছিয়ে থাকতে দেখে চড় তুলেছে পর্তুগিজ। সেই চড় যখন গাল অব্দি নেমেছে, ততক্ষণে ট্রেন পরের স্টেশনে এবং পর্তুগিজের থাপ্পড় গিয়ে পড়েছে স্টেশন মাস্টারের গালে।

এরপর ক্ষীণস্বরে গল্প আরম্ভ করেছে বাঙালী। সে বললে, আমি বাঙালী লোকাল ট্রেন ছাড়া দেখিনি ; চাপিওনি। নটার সময় ট্রেনে একজন আসবে ; আনতে গেছি। বেলা এগারটায় দেখলাম ছায়ার মত কি চলে গেল ; অথচ সে ট্রেনের দেখা নেই।

স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, ট্রেন তো সাতটায় চলে গেছে। ট্রেনের টাইম বদলেছে, জানেন না? তাহলে ছায়াটা কার? বাঙ্গালী-প্রশ্নের উত্তরে স্টেশন মাস্টার বলে ঃ এত স্পীড ট্রেনটার যে ট্রেনটার ছায়া ট্রেনটাকে ধরতে পারে না ; চার ঘণ্টা পরে এখান দিয়ে পাস করে।

তিনটে, ছটা, নটায়

স্থূল, সাউণ্ড—অশ্রাব্য মেলোড্রামাটিক

সাড়ে ৩২-ভাজার অনুরূপ
ফিল্ম ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার
সাড়ে' ৪২ ভাজা।

মঞ্জু দের অভিনয়, জি কে মেটার ক্যামেরা প্রশংসাযোগ্য!

সাড়ে-৩২-ভাজা বলে বাংলায় একটা জিনিস আছে, যা খাবার সময় নাকি কেউই যাচাই করে নেয় না, যে সত্যিই সাড়ে ৩২ রকম ভাজা তাতে আছে কি নেই। আজ ৪২-এর মধ্যে ৪২ আছে কিনা যাচাই করবার প্রশ্নও ওঠেনি দর্শকদের মনে তারা একে স্বীকার করে নিয়েছে। '৪২' ছবির মধ্যে যেটুকু স্থূল দিক তাই নিয়েই এর পরিচালক ব্যতিব্যস্ত এবং দর্শকরা হুলুস্থূল করেছে কিন্তু সূক্ষ্ম দিকটা একেবারেই অগ্রাহ্য করে ৪২-কে সেণ্টিমেণ্টাল মেলোড্রামার ওপরে উঠতে দিয়েছে, না এর পরিচালক না এর কাহিনীকার। ছায়াচিত্রে একদল পরিচালক আছেন যাঁরা বাহ্যদৃষ্টিতে বিপুল সেট-ক্রাউড-হৈ-হৈ সমন্বিত একটা illusion create করতে সক্ষম হন--কিন্তু সাট্‌ল্‌ কোন কিছু করতে গেলেই দর্শক মন তুষ্টির কথা একদিকে ভেবে এবং আরেকদিকে সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের অভাবে এই দুয়ের মধ্যে শাট্‌ল্‌ ককের মত একবার এদিক একবার ওদিক, এবং অবশেষে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একটা যা হয়-না করে বসেন। হেমেনবাবুর crowd direction। সাবজেক্ট ম্যাটারের গুণে তাঁর ছবি উৎরোয়--যথা ঃ ভুলি নাই, ৪২। সাবজেক্ট ম্যাটাবের অভাবে তাঁর ছবি উৎরোয় না, যথা দ্বন্দ্ব, তকরায়। গ্রে ম্যাটারের জন্যে যেদিন তিনি উৎরোবেন সেদিন তিনি যথার্থ পরিচালকের পদে উন্নীত হবেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে শখানেক ছবি তুলে সাকসেসফুল হওয়ার মধ্যে বাহাদুরী কম। তাতে ভয়ও আছে, কারণ শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যা প্রকাশিত রচনার তুলনায় নেহাৎই কম। শরৎচন্দ্রের গল্পে শরৎচন্দ্রই বক্স অফিস, শরৎচন্দ্রই ডিরেক্টর শরৎচন্দ্রই সব। যদি তাঁর ওপর খোদার ওপর খোদকারী না করে হুবহু তুলে যাবার সুমতি কারুব হয় তবে সে বাজি মারছে। তবে, তার পরেই যে মনে করবে যে, শরৎচন্দ্র নয়, আমার পরিচালনাতেই ছবি উৎরেছে--সুমতি থেকে দুর্মতিগ্রস্ত হওয়ার মাশুল, আজ হোক কাল হোক ছায়াচিত্র জগৎ থেকে গণেশ উলটে মহাপ্রস্থান করে তাকে একদিন দিতেই হবে।

৪২ ছবির বিষয়বস্তুকে ছাড়িয়ে বন্দী ভারতের আত্মা যদি একবারও মুখোমুখি এনে দাঁড়

করাতে পারতেন হেমেনবাবু তাহলে ছবির আগে এবং ছবির পরে লম্বা বক্তব্য জুড়তে হত না তাঁকে। শুধু মেজরের অত্যাচার আর অজয়ের বক্তৃতা—এর তলা দিয়ে যদি বয়ে যেত ৪২-এর বক্তব্য অকথিত বেদনার অন্তরালে তাহলে যত কথা বলা প্রয়োজন হয়েছে এ-ছবিতে তার অর্ধেকও প্রয়োজন হত না।

৪২-এর সেই বক্তব্য হল ঃ জনতার স্বতস্ফূর্ত জাগরণ। হেমেনবাবু এইটেই ছবিতে উপস্থিত করতে পারেননি। উপস্থিত করতে যদি পারতেন তাহলে এ-ছবি ৪২-এর' আসল সংগ্রামের চেয়েও মহত্তরই বা হত কিছু।

'৪২ ছবি যাঁরা সেনসারে আটকে ছিলেন তাঁদের জন্যে আমার করুণা হয়। শুনেছিলাম নীলদর্পণের লেখককে নাকি এঁরা হাজির করতে বলেন ছবির স্ক্রিপ্ট প্রিসেনসারের সময়। শুনে বিশ্বাস করিনি। এখন মনে হচ্ছে, হতেও পারে, এঁদের দিয়ে সব সম্ভব। কংগ্রেসের মর্যাদারক্ষার শেষ চেষ্টা হয়েছে '৪২ ছবিতে। ডালে বসে ডাল কাটার কালিদাসী উপমাকেও সেনসারওয়ালারা হার মানালে। 'More sense, sir, More sense!

'৪২ ছবিতে Quit India মুভমেণ্ট সবচেয়ে সাকসেসফুল হয়েছে এর ডায়ালগে। Two have been already killed to death শুনে ইংরেজরা না হোক ইংরেজী ভাষা অন্তত যে Quit করেছে--এ বিষয়ে সন্দেহ কী। মনে আছে একবার একজনের প্রতিবাদ শোনবার সুবিধা দিয়ে সরকারী কর্মচারী জানান যে "তোমার বক্তব্য in camera শোনা হবে।" প্রতিবাদকারী ভয়ে গেলো না। In camera-- না না ও সব ফোটো-টোটোর ব্যাপারে আমি নেই। বেচারা! হেমেনবাবুর two killed to death অবশ্য এক হিসেবে সত্যি। একজন হোল হরিমোড়ল—ছবির শেষে সে কোথায় উধাও হোল তা ৪২-ই জানে। (বইতে অবশ্য তার মৃত্যু আছে মেসিনগানের গুলিতে) আরেকজন শ্রী V.A.P. AIYAR-- এই ছবির পরিবেশক--ছবি সময়ে মুক্তি না পাওয়ার জন্যে যিনি মোর ডেড দ্যান অ্যালাইভ হয়ে বেঁচে ছিলেন। এ ছবির Sound--ইংরেজি ফিল্ম পত্রিকা প্রায় sound এর মতই, যাতে আনন্দ-মঠের লেখক হিসেবে হেমেনবাবুর নাম ছাপা হয়। ফোটোগ্রাফী দেখবার মত। শম্ভু মিত্রের অভিনয়-কৃতিত্বের অর্ধেক হোল জি. কে. মেটার। মেজরের অজয়ের স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার দৃশ্যেও ক্লোজ আপের কৃতিত্ব মেটার। শম্ভু মিত্র যেখানে গাড়ির চাকার সঙ্গে বন্দী হয়ে যাবার আগে মেজরকে জবাব দিচ্ছে, সেখানে তার গলার শিরে আলো-ছায়ার আসা যাওয়া— মনে রাখার মত। হেমন্তবাবুর মিউজিক আবার প্রমাণ করল যে ভাল তাল থাকলে ভালো গান করা যায় কিন্তু ভালো সুর দিতে হলে সঙ্গীত সাধনার একটা মোটামুটি স্তরে উঠতে হয়। একটিমাত্র গানের প্রথম লাইন উচ্চারণে মেয়ের গলা এমন কেঁই কেঁই করে উঠেছে যে তাকে আর লাই না দেওয়াই ভালো।

অভিনয়ে মেজরের রোলে বিকাশ রায়কে ভারি মাইনর-মাইনর দেখিয়েছে। কথা বলা-- হাঁটা চলা মিলিটারী না হয়ে এ-আর-পির মত হয়ে গেছে। মহাভারত পড়েছ এবং 'আগুন লাগাও' দুটি জায়গা, বাচন ভঙ্গী এবং চোখের অভিনয়ে, বিকাশ রায়ের প্রতিভার উপযুক্ত। সাধারণের মন কাড়লেও বিকাশ রায়ের অভিনয় আমার কাছে সর্বোত্তম মনে হয়নি--তার এক নম্বর কারণ ছবিতে তাঁর রোল প্রায় One-man-show দ্বিতীয় একটু স্থূল, একটু বেশী বাড়াবাড়ি রকম ভাবে অতিরিক্ত। মঞ্জু দের রোল কিন্তু আসলে কিছুই ছিল না, সবটাই তিনি নিজের কৃতিত্বে ফুটিয়েছেন। পাগল হয়ে যেখানে পতাকাধারীদের গান শুনে একবার মাথা তুলে, তারপর আবার শুয়ে পড়লেন সেখানে সমস্ত ছবির মধ্যে মাত্র সেই একবার সাট্‌ল্ কিছু দেখলাম। ৪২-এর অভিনয় মঞ্জু দে-কে ভারতীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাবে। শম্ভু মিত্র Stage-এ অদ্বিতীয় অভিনেতা কিন্তু সিনেমায় নয়। কামারের রোলে তিনি স্যাঁকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা দিতে চেয়েছেন বিকাশ রায়কে। পারেননি। বড্ড যাত্রা যাত্রা মনে

হয়েছে। কালী সরকারের মণ্ডল কাকা হরিমোহন বসুর হরি মোড়ল এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টাইপ চরিত্রে অভিনয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রদীপ বটব্যাল আগের মত অসহনীয় অভিনয় করেননি। মেজরের অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁর মুখ তুলে তাকান দেখে আমার একটু বিস্ময়েই বোধ হয়েছে—মনে হয়েছে এ সেই পলাতকার প্রদীপ বটব্যাল তো? মাতঙ্গিনী হাজরাকে চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয়া সুরুচি সেনগুপ্তা। পরিচালনায় এক জায়গা প্রশংসাযোগ্য। ছবি কখন শেষ হয়, বাংলা ছবি দেখে আমি প্রায়ই তা বুঝতে অক্ষম হই। এতে যে ছবির শেষে বলা হয়েছে—দাঁড়ান, গল্প শেষ হয়েছে, তখন আমি খুশী হলাম ঃ "যাক গল্প শেষ হয়েছে তাহলে, দাঁড়ান যাক এবারে।"

তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাকী বক্তব্যটুকু শুনতে শুনতে আমি ভুলে গেলাম যে ছবি দেখছি। মনে হল বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছি যেন ইস্কুলে অঙ্কর মাস্টারের মুখে ইতিহাসের বক্তৃতা নির্গত হচ্ছে।

দী. কু. সা.



—খাবারে আলপিন, সেপ্টিপিন বুঝি ; কিন্তু গোটা আধুলী একটা!!

—তাহলে বাবু, কাটলেট আট আনা আর ক্যাশ আট আনা, আপনার বিল হ'ল গিয়ে এক টাকা...

এক ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দিলে কাগজে ঃ "আমি হিমালয় ভ্রমণে বাহির হইতেছি, আমার সহিত যাহারা পর্যটনেচ্ছু তাহারা অমুক ঠিকানায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" কয়েকদিন পর রাত তিনটেয় এক মাতাল এলো তাঁর বাড়িতে। দুরন্ত কড়া নাড়ানাড়ি শুনে ভদ্রলোক নীচে নেমে এলেন। "কী ব্যাপার?" "আজ্ঞে এই বিজ্ঞাপন আপনি দিয়েছেন?" "হ্যাঁ।" "আমি জানাতে এলাম যে আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।"

অম্লমধুর

মাননীয় পৌরপিতা,
৬৯-পল্লী,
কলিকাতা

২৭-সি চক্রবেড়ে রোড নর্থ
।। কলিকাতা ২০।।
৬/৭/১৯৬১

মাননীয়েষু,

আমার বাড়ির সামনে সারা পাড়ার ময়লা-কাদা সারাদিন গাদা করবার কারণে আমি অতিষ্ঠ। আপনাদের কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের গাড়ি পরের দিন তাকে পরিষ্কার করবার পর থেকেই তা আবার রক্তবীজের ঝাড়ের মতো মাটিতে পড়েই বাড়তে থাকে। অতএব হয় ময়লা, না হয় শতধৌতেন যার ময়লা ন মুঞ্চতে, সেই আমাকে অন্যত্র সরান।

আমার বর্তমান বাসাব ভাড়ার অনুরূপ [৭৪ টাকায় ৭ খানা ঘর] ভাড়ায় একখানা ভালো বাসা খুঁজে দিলে আমি উঠে যাই ; কারণ পৌরগাড়ি বেলা ১০ টার আগে ময়লা সরায় না। সরালেও পুরো সরায় না। পড়ে থাকা ময়লার দিকে সে গাড়ি চলে যাবার আগে কেবল বলে যায় ঃ ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে গাড়ি।

তাছাড়া, ময়লা সরাবার সময় প্রতিদিন গাড়িচালক এবং ময়লা বাহকদের মধ্যে যে ভাষায় আলাপ হয় সে ভাষায় সম্ভবত কংগ্রেসী এবং ইউ-ছি-ছি পৌরপিতারাও ঝগড়া করেন না এখনও!

শ্রীপার্বতী বসু
পৌরপিতা
৬৯, পল্লী, কলিকাতা

অতএব--
দুর্গন্ধমুক্তি-প্রত্যাশী
দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

---

* *

'বসুন্ধরা বীরভোগ্যা ছিল একদিন ;
এখন তদ্বিরভোগ্যা! বীরের তদ্বির নয় ;
কবিরের তদ্বির! হুমায়ুন কবিরের।'
--নীলকণ্ঠ।।

সাহিত্যদুঃসংবাদ

মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে সব চেয়ে সুবিধের কথা এই যে তার নাম করে অনেক আজে-বাজে কথা চালানো যায়। তিনি কখনো যা বলেননি, ঢোল পিটিয়ে, সে-কথা বললেও ধরা পড়বার ভয় নেই। সেজন্যেই কি কালিদাস রায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নির্ভয়ে যা-খুসি-তাই বলে যাচ্ছেন?

এক জায়গায় কালিদাস রায় লিখেছেন ঃ

মনে পড়ে একবার আমাকে নির্বিচারে পুস্তকাদি সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার জন্য (শরৎচন্দ্র) তিরস্কার করেছিলেন, "কালিদাস, এখন তুমি সাবালক হয়েছো, নাম-খ্যাতি হয়েছে একটা Position হয়েছে। এখন যে কেউ একখানা বই দিয়ে গেলে নির্বিচারে প্রশংসা ক'রো না। তোমার কথার কিছু মূল্য আছে, তুমি স্বীকার না ক'রলেও, আমরা করি। কবে দায়িত্বজ্ঞান হবে?"

কালিদাস রায় সাবালক, কালিদাস রায়ের Position আছে, কালিদাস রায়ের কথার কিছু মূল্য আছে,—এ সমস্ত কথা রঙমহল থিয়েটারের শরৎ চাটুয্যে বললেও বলতে পারেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নন নিশ্চয়ই। কালিদাস রায় সম্পর্কে এ-সমস্ত উক্তি যিনি করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্র নন, বড়ো জোর গোল আলু কিম্বা বইয়ের কারবারে ফেঁপে ওঠা একজন নির্বোধ হোঁৎকা গোলগাল হাঁদারাম ব্যক্তি। আমাদের ঘোরতর সন্দেহ, বুড়ো-বয়সের ভীমরতির ফলে কালিদাস রায় গজেন মিত্তিরের মুখে শোনা কথাগুলো শরৎচন্দ্রের উক্তি ব'লে চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করি, অবিলম্বে উনি ভ্রম সংশোধন করবেন।

পৌষের কথা সাহিত্যে নিজের কৈশোর-প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বালিকা (মানে ভাবী-পত্নী) সম্পর্কে ঃ

সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথায় আমি কয়েকটা চড় মেরেছিলাম। মুখ ভ্যাঙাতে পারিনি। ওটা বিধাতা আমার জন্যেই আমার হাত থেকে সেদিন বোধ হয় রক্ষা করেছিলেন। এমনি প্রহার আরও করেছি বিবাহের পূর্ব্বে ; সব মনে নেই।

ছি-ছি, এসব ঘরের কথা পরের পরের কানে ছিটিয়ে কি লাভ? তবু ভাগ্যিস্ সব মনে নেই। এসব মারামারির ব্যাপার বড়ো অশ্লীল। তারাশঙ্করের হয়তো ভাল লাগতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের কাছে এগুলো খুবই খারাপ লাগে। তারাশঙ্করের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন আছে ; এর পরে হয়তো উনি "আমার যৌবন" নামে নিজের যৌবন-কাহিনী লিখবেন। তখন যেন উনি দয়া ক'রে বিবাহের পরের মারামারির ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে লেখেন। ওগুলো পড়তে আমাদের ভারি লজ্জা করে।

একজন লেখক সম্পর্কে প্র, না, বি, লিখেছেন ঃ

আশা করি লেখকের বন্ধুবান্ধব এখনো ২।৪ জন আছেন,—তাঁহারা লেখককে লেখনী সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিবেন।

আশা কী রকম মিলে যায়, দ্যাখো। আমরাও যে আশা করি, এখনো প্র. না. বি.-র এ-রকম ২।৪ জন অন্ততঃ বন্ধুবান্ধব আছেন!!

পৌষের কথাসাহিত্যে হিন্দির খবর লিখতে ব'সে কে এক নরেশ পাল বাঙালী লেখকদের শ্রাদ্ধের জোগাড় ক'রেছেন ঃ

আমার ত মনে হয় হিন্দীওয়ালাদের দ্বারা আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতায় বাঙ্‌লা যোগ না দেওয়ার আসল কারণ অবজ্ঞা।...

কেন বাঙালী সাহিত্যিক গল্প প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন না? যদি হারিয়া যান, এই ভয়ে? কই অন্য প্রদেশ ত এই রকম ভয়ে পেছপা হন নাই। শ্রেষ্ঠ সম্মান ত পাইল মলয়ালম ও তামিল। তাহাতে কোন হিন্দীওয়ালা, কোন গুজরাতী লেখক, কোন উর্দু লেখক ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বলিয়া ত শুনি নাই।

হিন্দীওয়ালা, গুজরাতী কিংবা উর্দু লেখক ক্ষুব্ধ হননি, ভাল কথা। কিন্তু ক্ষুব্ধ হওয়া দূরের কথা, বাঙালী লেখক যে আসলে হিন্দীওয়ালাদের দ্বারা আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতাকে আমলের মধ্যেই আনে না। বাঙালী লেখকরা কিছুকে ভয় করে না, কাউকে অবজ্ঞা করে না। বাঙালী লেখকদের আত্মসম্মান বোধ আছে। তারা জানে, শুধু ভারতবর্ষ কেন এশিয়া মহাদেশের যে কোনো ভাষার চেয়ে বাঙলার সাহিত্যিক শক্তি নিঃসন্দেহে তুলনাহীন ভাবে শ্রেষ্ঠ। তবুও কেন বাঙালী লেখক এই গল্প-প্রতিযোগিতায় যোগ দিলো না? এর উত্তরে আমাদের প্রতিপ্রশ্ন ঃ সিংহ কি কখনো বীরত্বের প্রতিযোগিতায় ভেড়ার সঙ্গে পাল্লা দেয়

কিন্তু এ-প্রশ্ন কি এই নরেশ পাল না ভেড়ার পালের মাথায় ঢুকবে?

এক জায়গায় আছে ঃ

হিন্দী লেখকদের বড়ই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব।

তার একটু পরেই আছে কয়েকজন হিন্দী লেখকের নাম ঃ

রাধাকৃষ্ণন, জওহরলাল, কহোয়ালাল মুনশী, আম্বেদকর, রাজাগোপালাচারী, (এবং এখন গাডগিল) মন্ত্রিত্বের জোয়ালে কাঁধ দিবার পর হইতে আর লিখিবার ফুসরৎ পাইতেছেন না।

হিন্দী লেখকদের কাণ্ডজ্ঞান নেই, আর উপরোক্ত পাঁচজন হচ্ছেন হিন্দী লেখক। অতএব--??? বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এই কাণ্ডজ্ঞানহীনের দল আর লিখবার ফুসরৎ পাচ্ছেন না ভেবে দুঃখ করবার কী আছে? এঁরা কাজের কাজ করতে গেছেন, জোয়ালে কাঁধ দিয়েছেন। এতোদিন জানতাম যে বলদেই শুধু জোয়ালে কাঁধ দেয়, কিন্তু এখন নরেশচন্দ্র পালের কথায় দেখছি হিন্দীলেখকদের কাঁধও বলদের থেকে কম যায় না : তারাও রীতিমত জোয়াল কাঁধে দিতে পারে এবং দিচ্ছেও।

ন-রে-শ চ-ন্দো-র কী, জয়-য়'-য়'-য়'-য়'!!!

আরেকটু—উদ্ধৃতি ঃ

ভাল করিয়া হিন্দী শিখিয়া, এদেশে থাকিয়া, এদের সঙ্গে মিশিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যদি যথাপরিমাণে এখানকার আবহাওয়া বাঙালী লেখক আত্মসাৎ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার দান হিন্দী-ভারতীর ভাণ্ডারে অক্ষয় নিধির মত সঞ্চিত হইবে। তার আগে নহে।

যেন এর জন্যে বাঙালী লেখকদের রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না। বাঙালী লেখকের পরিশ্রম বঙ্গ-ভারতীকে আরো ঐশ্বর্যশালিনী করবার চেষ্টায়, ক্ষতি কোথায়? হিন্দী ভারতীর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করবার জন্য বাঙালী লেখক কেন বাঙলা ছেড়ে হিন্দীর পিছনে সাহিত্যের প্রয়োজনে পণ্ডশ্রম করবে? কেন, কেন?

কিন্তু এসব কথা কাকে বলি। মূর্খদের একথা বলা নিরর্থক, উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে কোন লাভ নেই। আমরা শুধু ভাবছি, যে ইডিয়ট কর্তৃপক্ষ একজন অজ্ঞাতকুলশীলের এ-হেন উজবুক আলোচনা একটা বাংলা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে বের করতে পারে, তাদের মাথায় ক'ডজন থেলো হুঁকো ভাঙা উচিত।

আরেকটি মোক্ষম আক্ষেপ আছে ঃ

বাংলাদেশে সাধারণের মধ্যে যে কম্যুনিজমের এক প্রসার, তাহার কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্র হইতে নিরপেক্ষ ভাবে প্রতি বস্তুর উভয় দিক দেখিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে।

নিরপেক্ষ ভাবে প্রতি বস্তুর উভয় দিক দেখবার শক্তি যে আমাদের লোপ পেয়েছে,— এটা অত্যন্ত সত্যি কথা। তা না হ'লে আমরা কিছুতেই এখনো গজেন মিত্তিরকে বাংলা দেশে রাখতাম না ; গত বছরেই আমেরিকার ছেলে-মেয়েদের উপহার হিসেবে আর দুটো বাচ্চা হাতির সঙ্গে ধাড়ি গজেন মিত্তিরকেও পাঠিয়ে দিতাম।

ঐ সংখ্যা কথা-সাহিত্যেই হীরালাল দাশগুপ্ত বাঘ-মারার কথা শুনিয়েছেন। ওসব বাঘ-টাঘের কথা আর ভালো লাগে না। শুনেছি হীরালালবাবু নিজেও একজন ভালো শিকারী ; ওঁর নাকি বন্দুক-টন্দুকও আছে।

তা উনি কি দয়া ক'রে অনতিবিলম্বেই বুঝে-শুনে তাক মতো কাছাকাছি একটা গোলমাল গজ-শিকার করতে পারেন না?

অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'পূর্ণিমায়' আছে সতী ঘোষের 'মোহ-মুক্তি' যার প্রথম লাইন ঃ

ডেকো না আমারে আর বাহুপাশে নাথ!

সত্যিই তো, একজন নাথের বাহুপাশেই একাধিকবার আবদ্ধ হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। সতী ঘোষের অনুরোধ অনুসারে, অনাথ হবার ভয় না করে, এই নাথ যদি আর একে না ডাকেন, তাহ'লেই তো ইনি দিব্যি আরেক ত্রিনাথের বাহুতে যেতে পারেন। খাসা পদ্য। সতী আর কাকে বলে!

ঐ সংখ্যারই শ্রীমতী মলিনা দেবী একজন প্রখ্যাতনামা বোম্বাই চিত্র-সাংবাদিক সম্পর্কে বলেছেন ঃ

ভদ্রলোক আমাকে 'বহিন' বলে সম্বোধন করলেও পাশে ব'সে যে ভাবে মদ্যপান করছিলেন তাতে আমার পক্ষে আহার্য গ্রহণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অসম্ভব। আজীবন বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে আমি—এ ধরনের সামাজিক সহবতে আমি আদৌ অভ্যস্ত নই।

এবং মলিনা দেবী একজন!!! উঁচুদরের অভিনেত্রী!

ইদানীং তাক লাগাচ্ছে রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা। চল্‌তি সংখ্যায় চিত্ত ঘোষের কবিতা "দেবযানী" থেকে ঃ

তোমার বাহুর উপাধানে শুয়ে
পেয়েছি পরম শান্তি।

এ—সমস্ত কথা চিত্রাভিনেত্রী দেবযানীকে লক্ষ্য ক'রে কি না জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, উপাধান নরম না হ'লে তাতে শুয়ে শান্তি পাওয়া যায় না এবং যে-কোনো মেয়ের বাহুতেই হাড়ের পরিমাণ যথেষ্ট। হাড়ের বালিশে শুয়ে যে শান্তি পায় তার মাথায় নিশ্চয়ই গবেট পাথরের গুদোম আছে।

কিন্তু উঁহু, চিও ঘোষের মাথা সে-রকম নয় ; যেহেতু ঐ কবিতার মধ্যেই আছে ঃ

ভ্রান্তি আমার ক্ষমা কর দেবযানী।

তার মানে বাহুর উপাধানের কথাটা একটা ভ্রান্তি। শক্ত বাহুর বদলে নরম কোন্‌ জায়গাটাকে উপাধান বানিয়ে শুয়ে উনি পরম শান্তি পেয়েছিলেন এই আসল কথাটা কিন্তু চিত্ত ঘোষ বেমালুম চেপে যাচ্ছেন। কিন্তু লজ্জা কি ব্রাদার? এসব কবিতার মূলে ওসব লচকালচকি (এটা কিন্তু বনফুলের কথা) একটু হয়েই থাকে।

একঘণ্টা বাসে চেপে ইলা সরকার যা কিছু দেখেছেন, এই সংখ্যায়ই তার একখানা ঢালাও ফিরিস্তি ঝেড়েছেন। এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

সামনের সীটে বসে কে দিব্যি দিল খুলে গাইতে' আরম্ভ করেছে "তু মেরা দিল্‌কে রোশনি, তু মেরা জান..." এই জানটি কে তা ঠিক ঠাহর ক'রে উঠতে পারলাম না।

এখন সবিনয়ে স্বীকার করছি, সেদিন সামনের সীটে বসে দিব্যি দিল খুলে ও-গান আমিই গেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখ এই যার জন্যে জান দিয়ে গাইলাম, সব জেনেও কিছু না বুঝবার ভান ক'রে ইলা সরকার এখন বলছেন যে তিনি ঠিক ঠাহর ক'রে উঠতে পারেন-নি। হায় রে, ইলা সরকার কি কংগ্রেস সরকারের চেয়েও নিষ্ঠুর?

মাঘ-সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে সজনী দাস বনফুলকে এক দাম্পত্য সংক্রান্ত উপদেশ দিয়েছেন ঃ

বাত সায়াটিকা শ্রীডায়াবেটিস
দাঁত কনকন হাত নিসপিস
আরো কত কি যে, যে দেবে হদিস
সে তব পাশেতে শুয়ে
ওই দেখো মরে "আহাউহু" করি
তবু পুরাতন' অভ্যাস ধরি
আরামেই থাকো করি জড়াজড়ি
চিরপুরাতন দুয়ে।।

কিন্তু এই বয়সে পুরোনো অভ্যাসমতো জড়াজড়ি ক'রে আরামে থাকতে গেলে যে সেটা ব্যারামে দাঁড়াবে। সজনী দাসের বয়স অনেক হ'লো কিন্তু বুদ্ধি-শুদ্ধি একটুও হলো না। আর লালবাজারের কর্তাদেরও বলিহারি। পত্র-পত্রিকায় অশ্লীলতা বন্ধ করবার জন্যে দেখি ওদের এতো হাঁকডাক ; আর এসব বুড়োবুড়ীর জড়াজড়ির ছাই-ভস্ম ব্যাপার কি ওঁদের চোখে পড়ে না?

এই সংখ্যায়ই একজন ভারতীয়ের কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে "ব্যাঘ্রাচার্য" লিখেছেন ঃ

বুদ্ধি-শুদ্ধি জন্মদোষে কখনো হবে না ;

সজনী দাস যে একজন ভারতীয় এবং তার যে কখনো বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে না এটা প্রথম থেকেই জানতাম, কিন্তু কেন যে হবে না সেটা এই প্রথম জানলাম।

মাতালের দুর্গা প্রণাম

মহাসপ্তমীর দিন মত্তাবস্থায় একজন দুর্গা প্রণাম করে বলতে শুরু করলে, 'জয় দুর্গা, জয় সরস্বতী, জয় লক্ষ্মী, জয় কার্তিক।' এখন এই পর্যন্ত বলে, তার মনে পড়ে গেল কার্তিক একটা মাসের নাম, সে ফের জুড়লে, 'নমঃ কার্তিক, নমঃ অগ্রহায়ণ, নমঃ পোষ, নমঃ মাঘ।' এবং মাঘ বলা মাত্রই আবার গুলিয়ে গেল সব, মোড় ফিরল তার প্রণাম ফের। শোনা গেল, সে বলছে, 'নমঃ মাগ, নমঃ ছেলে, নমঃ পিলে।' পিলে বলেই আবার মোড় ফিরল 'নমঃ পিলে, নমঃ যকৃৎ, নমঃ হাঁচি, নমঃ সর্দি, নমঃ কাশী।' কাশী বলা মাত্র তাকে আর পায় কে, সে বলে চলল, 'নমঃ কাশী, নমঃ বৃন্দাবন, পুরী।' পুরী বলতেই জিভে জল এল মাতালের...নমঃ পুরী, কচৌরী, সন্দেশ।' সন্দেশে এসে তার ছেলেবেলায় পড়া মাসিকের কথা মনে পড়ে গেল, 'নমঃ সন্দেশ, শিশুসাথী, মৌচাক, বসুমতী, ভারতবর্ষ।' ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে উড়ে গেল মন, 'নমঃ ভারতবর্ষ, জাপান, চায়না—ততক্ষণে দুর্গার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সে বলেই চলেছে,—'নমঃ চায়না, নাক্সভমিকা, পালসেটিলা...'

ল্যাম্প-পোস্ট

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

রাজপথের কাব্যে চিরকালের উপেক্ষিত হোল ল্যাম্প পোস্ট, রামায়ণে যেমন উর্মিলা। সারাদিন জেগে এবং সারারাত না ঘুমিয়ে আপনার বাড়ীর সাম্নে কি গলির মোড়ে, যে নাইট ডিউটি দেয় রোজ বিনে মাইনেয়, তার কথা আপনি কখনো ভেবেছেন? এইমাত্র আপনাকে আপনার জীবনের প্রথম প্রেম পত্র যে দিলে নীল কাগজে কালো কালিতে রঙ্গীন করে, আর বলে দিলে, বাড়ি গিয়ে তবে পড়তে, তার কথা কি আপনার রাখা সম্ভব সত্যিই? একটুখানি, কিন্তু যেন অনেকদূর, এসে আপনি দাঁড়িয়ে পড়বেন ল্যাম্পপোস্টের তলায়। চিঠিটা পড়া হয়ে যাওয়ার আগেই ভুলে গেলেন ল্যাম্পপোস্টকে। আপনি চলে গেলেন। আরেকজন ততক্ষণে ফিরে এসেছে সেই ল্যাম্পপোস্টের তলায়। একটু আগে সে এখান দিয়ে যাবার পরই পকেট হাতড়ে আবিষ্কার করেছে আটানিটা তার পকেট থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় উধাও। ল্যাম্পপোস্টের তলায় চিকচিক করছে যে গোল জিনিসটা, সেটা ফিরে পেয়ে সে স্মরণ করলে ভগবানকে, ধন্যবাদ দিলে কপালকে, কিন্তু ভুলে যাবার বেলায় সে প্রথম মনে করলো ল্যাম্পপোস্টকে।

একথা যে মিথ্যে তা আর আমার বলার অপেক্ষা রাখে না—অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের সেই মুখস্থ করা বাণীটি যে, সূর্য তার আলো বিতরণ করে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। মধ্যবিত্তের ঘরেও যে সে এসে পৌঁছয় না একটু, গলির ভেতর যেকোন বাড়িই হবে তার সাক্ষী। কিন্তু ল্যাম্পপোস্ট সকলের, যে চুরি করতে চায় তার এবং যে চুরিত হয় তার ; এমন কি অনেক রাতে যে মদ্যপান করে চুরচুরিত হয়ে ফেরে তারও আঁকড়ে ধরে দাঁড়াবার শেষ যষ্ঠী।

ল্যাম্পপোস্টের আলো যেমন অল্প তার নীচে অন্ধকার কিন্তু তেমনি অনেক। সেই অন্ধকার, সময় বুঝে আড়াল খুঁজে সবার আঁখি এড়ায় যারা তাদের বন্ধু। যেমন সাক্ষী সে বৃষ্টির রাতে মানুষ খুন করা ফেরারী আসামীর। আবার পাহারাদার পথের ধারে ফেলে রেখে যাওয়া অবাঞ্ছিত শিশুর। আর সেই ল্যাম্পপোস্টের একটুখানি আলোয় বসে বই পড়েছে যে বালক, আজকে তাকে সবাই জানে দুঃস্থ ঠাকুরদাসের জেদি ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর আগামী দিনের সমাজের বর্ণপরিচয় করানো বিদ্যাসাগর বলে।

আপনার সংসার খরচা যদি তিনশো টাকা হয় আপনি যদি একশো পঁচিশ টাকার কেরানী হন তাহলে আপনি দেখবেন আলোর নীচে যেমন অন্ধকার, আপনার বাড়ির সাম্নের ল্যাম্পপোস্টের তলায় তেমনি কাবলিওয়ালা। ল্যাম্পপোস্ট সবসময়েই কিছু শুধু post নয়, কখনও কখনও Post office--ও বটে। অনেক রাতে ল্যাম্পপোস্টের তলায় সত্যি সত্যি বে-আইনী আপিস বসে জুয়োর, কখনো-সখনো নিরুপদ্রব তাসখেলায়। দোলের সময় বসে হিন্দুস্থানী জলসার আসর। আমরা দরজা বন্ধ করে কান নয় প্রাণ বাঁচাই। গালাগালি, ঝগড়াও করি কিন্তু ল্যাম্পপোস্ট কিছুই বলে না। কারণ কাঁচের ঘরে তার অবস্থিতি আর সে জানে কাঁচের বাড়িতে বাস করে অন্য লোককে ঢিল ছোঁড়া যায় না।

পথের ধারের পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে কোন অপরাধের জন্যে কে জানে, ল্যাম্পপোস্ট চিরকাল ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। নির্মাতার কাছে কোন পাপের জন্যে কেউ জানে না তার জন্ম থেকেই একটি মাত্র পা। তবে কখনও

কখনও সেও এগোতে থাকে—দাঁড়িয়ে আর থাকে না। রাস্তায় মোটরগাড়ি যখন মেয়েরা চালায় তখন আর যে দাঁড়িয়ে নেই, এগিয়ে এসে একেবারে মোটর গাড়ির সাম্নে। কারণ মেয়েরা গাড়ি চালাতে না পারার জন্যে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা দিয়েছে একথা আর যেই বলুক, আমার ধড়ে রাবণের দশ মাথা থাকলেও আমি তা বলতে পারবো না, আমায় ছেলে-পুলের মাকে নিয়ে ঘর করতে হয়।

ল্যাম্পপোষ্টের সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। এমন একদিন ছিলো যখন নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস-টিকিটে ল্যাম্পপোস্টেও ইলেকসন জিততো। জিতেছিলোও। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বিধান রায়। আজ আবার নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ল্যাম্পপোস্টেও যদি দাঁড়ায় সেই জিতবে আগামী নির্বাচন। রাজনৈতিক দল এসেছে, গেছে, আসবে, যাবে, কিন্তু ল্যাম্পপোস্ট সেদিনও যেমন, আজও তেমনি আছে। এমন কি কালোবাজারীকে সব চেয়ে কাছের ল্যাম্পপোস্টে সরকার হাতে পেলে ঝুলিয়ে দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি নেহরু একদিন দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য লালবাজারের কৃপায় কালোবাজার আজও অব্যাহত, আজও সবচেয়ে কাছের ল্যাম্পপোস্ট নেহরুর কাছ থেকে সব চেয়ে দূরে।

নেহরুর মুখ রক্ষের জন্যেই কি না কে জানে কলকাতার ফুটপাথ থেকে গ্যাসের ল্যাম্পপোষ্ট তুলে দিয়ে বিজলী বাতির রাজকীয় প্রবেশের প্রস্তুতি চলছে। অর্থাৎ সহরের শেষ মেঠো চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে তাকে পুরোদস্তুর মেসিনে বেঁধে দেবার এই ষড়যন্ত্র এতদিনে সত্যি সত্যি মাথা তুললো। এখন থেকে আর সন্ধ্যেবেলায় ঘাড়ে মই নিয়ে সেই অজানা কিন্তু প্রত্যেকদিন দেখা মানুষটির পাত্তা মিলবে না। গাছে তুলে দিয়ে তার মই কেড়ে নেওয়ার পর্ব সমাপ্ত প্রায়। অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে, অন্ধকার পথের সমুদ্রে লাইট হাউসের রোমাঞ্চ আনবে না আর ল্যাম্পপোস্ট। কোন হাতের স্পর্শে নয়, নির্জীব সুইচের ওঠানামায় তার ঘুম আসবে এবং ভাঙবে।

একথা বুদ্ধি দিয়ে ঠিকই বুঝি যে গ্যাস ল্যাম্পপোস্টের জায়গায় ইলেকট্রিক আলো নগরবাসীর কাম্য এবং ধন্যবাদের পাত্র এবং হয়ত কেন, নিশ্চয়ই তাতে সুবিধে অনেক। পৃথিবীর বৃহত্তম সহরদের পর্যায়ে যেতে কলকাতা আর এক পা বাড়াবে এতে করে। কিন্তু অতিকায় প্রাণীদের যেমন যাদুঘর ছাড়া আর কোথাও প্রাণহীন স্থিতিও নেই, তেমনি পুরোনো কলকাতার ছবি কি এক অথর্ব সাংবাদিকের অপাঠ্য প্রবন্ধে ছাড়া আর কোথাও থাকবে না? পৃথিবী থেকে লুপ্তপ্রায় হিংস্র জন্তুদেরও না মারবার জন্যে সরকারী আদেশ আছে ; মারলে শাস্তির বন্দোবস্ত আছে। এমন কি reserved জঙ্গলে শিকার করে বেড়াবার অধিকারও দেওয়া হয় না। আর পুরনো কলকাতার শেষ চিহ্ন না অবলুপ্তির জন্যে একজন গেঁয়ো নগরবাসীর আবেদন কি একেবারেই অগ্রহণীয়?

সত্যিই গ্যাসের ল্যাম্পপোস্ট আর, থাকবে না, এ-চিন্তা আমাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। আমায় যৎসামান্য বিহ্বলও করেছে। আমার বাড়ির পাশেই পুলিশ ফাঁড়ীর গরুটা ল্যাম্পপোষ্টে বাঁধা থাকে। সেই দুধন্ত গরুটা আমার একটা নিজের কেনা এঁড়ে বাছুরের সামনে রোজ আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসে, সে আর সেখানে থাকতে পারবে না, এতটা ভাগ্যকৃপার জন্যেও আমি তেমন উল্লসিত বোধ করতে পারছি না। আমি ভাবছি আমার বাড়ীর সাম্নের অন্ধ ছেলেটার কথা। রোজ সন্ধ্যেয় মই কাঁধে নিয়ে যে গ্যাসপোস্টে আলো জ্বেলে দিয়ে যেত, সেই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। মই কাঁধে লোকটা এসে কেন জানিনে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করত : বল্‌তো বাদল আজ আলো জ্বেলেছি কি না? ছেলেটা বলত 'না। এইবার ত জ্বালবে।' তখন ল্যাম্পপোষ্টে আলো জ্বালার কাজ শেষ হয়ে গেছে, তবুও মইওয়ালা দুঃখ দিতে চাইত না সেই ছেলেটিকে, বলত, বাঃ কে বলেছে তুমি দেখতে পাও না,--তুমি ত সব দেখতে পাও। আমার মনে হত

গ্যাসল্যাম্পে নয় ছেলেটার চোখেই বুঝি বা অজান্তে রোজ আলো জ্বেলে দিয়ে যায় মইওয়ালা সেই লোকটা আর কমাস বাদেই লোকটা আর আসবে না। আর সেই অন্ধ ছেলেটা বোধ হয় নতুন করে তার চোখ হারাবে।

[৪র্থ বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৫৮]



--একি! চেক্-এ সই নেই কেন?
--আজ্ঞে, নামটা গোপন রাখতে চাই যে...!

পরম রুষই পরম পুরুষ ॥

এক

স্ট্যালিন একবার খানায় পড়ে যান খোঁড়া অবস্থায়। একজন রাশ্যান কৃষক তাঁকে বাঁচায়। খানা থেকে উঠে তিনি বলেন ; জানো আমি কে? 'না',--চাষা বলে। আমি স্ট্যালিন ; কি করতে পারি আমি তোমার জন্যে? পুরস্কার প্রত্যাশী চাষী বলে, আপনি যদি সত্যি স্ট্যালিন হন, তাহলে কাউকে বলবেন না যে আমিই আপনার প্রাণরক্ষার জন্যে দায়ী!

দুই

স্কুলে কেমন শিখছে ছেলেরা তাই পরীক্ষা করছেন স্ট্যালিন। একটি ছেলেকে তাঁর প্রশ্ন ঃ তোমার বাবা কে? 'পার্টি' অভ অল পার্টিস, কম্যুনিস্ট পার্টি আমার ফাদার,' জবাব দেয় ছেলেটি Good। তোমার মা কে?--আবার প্রশ্ন ; 'ল্যাণ্ড অভ্ অল ল্যাণ্ডস,--সোভিয়েৎ ল্যাণ্ড আমার মাদার।' ভেরি গুড! এবার বল বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও? গোঁফে তা দেন স্ট্যালিন আরও ভালো উত্তরের আশায়।

'ORPHAN'!--ছেলেটি খুব জোরের সঙ্গে জানায়!

অম্লমধুর

আর্ট-প্যালপিটিশন!
(হার্ট-প্যালপিটিশন নয়)

সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় দীপ্তেন,

কোন বৈপ্লবিক প্রেরণায় নয়, নিতান্ত সত্য, শিব ও সুন্দরের খাতিরে তোমায় এ পত্রাঘাত করছি। স্বয়ং তুমি অচলপত্রের কণ্টকমুকুট ধারণ করেছো, তার ওপর আমার এ পত্রাঘাতে আশা করি তুমি কিছু মনে করবে। কিন্তু তোমার চেয়েও বেশী মনে করবে অচলপত্রের জনসাধারণ। সে কথা থাক্।

জোর গুজব শোনা যাচ্ছে, অচলপত্র নাকি আগেকার জৌলুষ হারিয়েছে। কিন্তু পৌরুষ ছাড়িয়েছে এমন অপবাদ বোধ করি মেয়েছেলেরাও দেবে না। তবু একদল দিগগজ আছেন যাঁরা হোমিওপ্যাথিক ডোজে আমাদের সাহিত্যসাধনাকে বার্বারা ভালগেরিস নামে অভিহিত করেছেন। আবার তাঁদেরই মুখে অসর্তক মুহূর্তে শুনেছি, অচলপত্র আগে আরো ভালো ছিল। সত্যি কথা। আগে ছিল প্রতিটি লেখার লাইনে লাইনে রঙীন দুঃসাহসের ফেনিল উন্মত্ততা, ছিল আদিরসের সুড়সুড়ি দেওয়া গল্প। ইদানিং অচলপত্র নাকি স্কচ হুইস্কির পরিবর্তে ধেনো পরিবেশন করছে। বলা বাহুল্য যাঁরা বলছেন, তাঁরা স্কচ দূরে থাক, ধেনোর খদ্দেরও নয়। বড় জোর দুধকলা খেয়েই তাঁরা বেঁচে আছেন। কিন্তু ভাই দীপ্তেন, হাওয়া খেয়ে যারা বেঁচে আছে, আমরা তাদের জন্যই লড়ছি। আমরা তাদেরই কল্যাণের জন্যই বলিপ্রদত্ত।

দীপ্তেন ঃ আমাদের সামনে হাজার হাজার প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোকেই এইচ. জি. ওয়েলেস বলেছেন mosquitoes of modern world। নানা রকম প্রশ্নের দংশনে বাঙ্গালী জাতটা আজ ম্যালেরিয়া রুগীর মত হি হি করে কাঁপছে। তাদের সামনে জীবন সংগ্রামের প্রলয়চিহ্ন।

একদিন বাঙ্গালীর কাছে বাঁচাটা ছিল আর্ট, আজ বাঁচাটা শুধুই সায়েন্স। নয়া বাঙ্গালীর বেদান্ত কি বলে জানো? শুধু বেঁচে থাকতেই বলে না, বলে বাঁচতে শেখো। কিন্তু ভাই দীপ্তেন, কোন পেনিসিলিনের সাধ্য সেই যে বাঙ্গালীকে বাঁচিয়ে রাখে। বাঙ্গালীকে লাখ লাখ পেনিসিলিন ঠুকলেও কোনো বেকার বাঙ্গালীর চাকরী মিলবে না, নিরন্ন বাঙ্গালীর দু'মুঠো ভাত জুটবে না। তা'ছাড়া বাঙ্গালী আজ যে শুধু মাইনরিটি বা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সেই ভুগছে তা নয়, তার আজ আশু প্রয়োজন ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্সের।

দীপ্তেন আমাদের ফাউন্টেনপেনে আমরা সেই ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্সের বীর্য বহন করে আমরা প্রিয় কি অপ্রিয় জানিনে, কিন্তু ভাই, শপথ করে বলতে পারি, এই গিনিসোনার বাংলা, আমাদের দেশের খাঁটি মানুষ আজো আমাদের কাছে সমান প্রিয়। সমান প্রিয় আমাদের বাংলার কৃষ্টি লক্ষ্মী।

ভাই দীপ্তেন, আমরা বিশ্বাস করি, সাহিত্যের পথ স্বাধীনতার পথ কিন্তু স্বাধীনতার পথে

যেমনি, সাহিত্যের পথে দেখেছি তেমনি ভুখামিছিল। এদেশে চাকরীর দরখাস্ত দিস্তে দিস্তে লেখাই একমাত্র সাহিত্যসাধনা। এদেশের, না, সমগ্র দুনিয়ার একমাত্র সাহিত্যপত্রিকা—র‍্যাশনকার্ড!!

হ্যাঁ, ভাই দীপ্তেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের হাতে হাতে যে সাহিত্য পত্রিকা ঘুরতে দেখেছি তা ওই র‍্যাশনকার্ড। র‍্যাশনকার্ডই হলো আজকের যুগসাহিত্য। গান্ধীজী নাকি একবার কবিগুরুকে বলেছিলেন, ভারতের পাখীর একটিমাত্র গান আছে, 'রুটী চাই।' আমরা বলবো বাঙ্গালী পাখীর একটী মাত্র গান আছে, 'ভাত চাই'। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের পাকস্থলীও বাঙ্গালী। আমরা চাইনে, যবচূর্ণের দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের পাকস্থলীকেও "ছাতুর দ্বারা ন্যাশনালাইজ করা হোক্। কিন্তু বলতে বাধা নেই, তার আগেই বাঙ্গালীরা ক্ষুধার দৌরাত্ম্যে নিজেদের পাকস্থলী পর্যন্ত হজম করে বসে আছে।

ভাই দীপ্তেন, শুধু দিনমজুরের নয়, পাঠকপাঠিকার নয়, শিল্পী সাহিত্যিকের অবস্থাও ইদানীং নানা সমস্যাভারাবনত হয়ে উঠেছে। সারা দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছে Art-Palpitation ঃ শিল্পী সাহিত্যিকেরাও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন, Art এর সংগে Heart-এর যোগাযোগ যতটা-ততটা Stomach-এর সংগেও! ভাই দীপ্তেন, খালি পেটে কখনো ধর্ম হয়? খালি পেটে কখনো টিকে থাকতে পারে সাহিত্যের প্রতি পাঠক পাঠিকার অনুরাগ? যারা র‍্যাশন কার্ড হাতে নিয়ে চাল কিংবা কাপড়ের দোকানের সামনে কিউ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে, কিংবা হার্টফেল করছে, তাদের কথা আমরা কতটুকু ভাবছি কিছুই না ভেবে আমরা সহানুভূতির হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি মাত্র। ক্যাপিটালিস্টরা আমাদের শুকিয়ে মারছে শুঁটকো মাছের মত আর বাইবেলের বাণী বিতরণ করছে "Take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. ঈশ্বরের নামে দুষমনের এমন ভণ্ডামির শেষ কবে হবে জানো? যেদিন দেশের জনসাধারণ সত্যি সত্যি ভাবতে শিখবে, তাদের সামনে জীবনদর্শনের একমাত্র সাহিত্যপত্র র‍্যাশন কার্ড। হ্যাঁ, র‍্যাশন কার্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেদিন শিল্পীসাহিত্যিকের অবশ্যই ক্ষতি হবে। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক এইচ. ই. বেইটস্‌-এর মতো বলা চলবে না, "Art, it may be observed, dislike kissing. It requires some co-operation from both sides." "শেষের সে দিন. ভয়ংকর" হয়ে যেদিন দেখা দেবে। সেদিন চুমু খাওয়ার চেয়ে শুধুমাত্র চানাচুর খাওয়াটাই আরো বেশী সুখের মনে হবে। কিন্তু ভাই, শিল্পী শুধু রসনা নিয়ে বেঁচে থাকে না, রস বিতরণ করেই বেঁচে থাকে সাহিত্যের পথ যতই দুর্গম হোক তবুও আমাদের সেই পথ চলাতেই আনন্দ।

তা বলে চোখ বুজে পথ চলিনে। পথের এপাশে দেখেছি, ক্ষুধার তাড়নায় উলঙ্গ মনুষ্যত্বের ব্যভিচার পসরা। দেখছি দেশের মানুষের মৃতদেহের ওপর তৈরী গজদন্তমিনার চূড়ায় নলগড়গড়া-পলিটিক্সের কলধ্বনি। দেখছি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন চেহারার এক ভীষণতম ভবিষ্যৎ। না, ভাই দীপ্তেন, ভবিষ্যৎ আমরা একদম দেখতে পাচ্ছি না। তা অন্ধকার। আলকাৎরার মতই অন্ধকার!

সেই ভবিষ্যৎ, যা তুমি, আমি আরো পাঁচজনে ভাবছি, সেই ভবিষ্যৎ ভাবনায় একদিন এক চোখে আশা, আরেক চোখে কুয়াশা নিয়ে তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলো তো, ভবিষ্যৎটা কেমন? তুমি একটুও না ভেবে, একটুও না হেসে, অথচ চোখ দুটি অসম্ভব বড়ো করে বলেছিলে, ঠিক অতীতের মত! প্রায় হেসে ফেলেছিলুম সেদিন। অতীতের মত

কিনা জানিনে। কারণ, অতীত ঐতিহাসিকের, বর্তমান বৈজ্ঞানিকের, আর ভবিষ্যৎ শিল্পী সাহিত্যিকের আর সে ভবিষ্যৎ আলকাৎরার মতই অন্ধকার। কিন্তু ভাই দীপ্তেন, আমরা million-এর স্বপ্নবিলাসী লোভী বণিক নই, আমরা millenium-এর স্বপ্নদ্রষ্টা আর্টিস্ট। তাই আশা করবো, আলকাৎরা থেকে যেমন তৈরী হয় ন্যাপথালিন, বা সিঁরাপের রং তেমনি অন্ধকার ভবিষ্যতের বুক চিরে আমরা আবিষ্কার করবো ন্যাপথালিনের মতো নিষ্কলঙ্ক মানুষের দল, আবিষ্কার করবো সিরাপের রং-এর মতো নানা রং-এর সম্ভাবনা। আমাদের এক হাতে রং, আরেক হাতে মশাল। আমরা ঠিক তেমন ভবিষ্যৎকেই চাই। আর যা চাই, তা নির্ভুলভাবেই চাই, যা পাই চিরকালের জন্যেই পাই।

দীপ্তেন, আমরা জানি, রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বাহ্নে যে জিনিসটি একান্ত প্রয়োজন তা হলো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক লুটপাটের এক রীতিমত ব্যবস্থা। তারো আগে চাই, বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে কালচারাল রেভোলিউশন বা সাংস্কৃতিক সংহার। দেশের একটা নিদারুণ ঋতুপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে অচলপত্র ঋতু সংহারের ভার গ্রহণ করেছে। এই যবচূর্ণের দেশে এই এগ্রিকালচারের দেশে, তুমি এর চেয়ে বড় কালচারাল রেভোলিউশন আর কি আশা করতে পারো?

দীপ্তেন, আমাদের তরুণ ভিটামিনে সাহিত্যকে যে ভাবে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টা করছি, তার দ্বারা তো জনসাধারণকে জনসাধারণের কাছেই জনপ্রিয় করে তুলছি। জীবন সংগ্রামী মানুষের পেছনে আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, এগিয়ে এসেছি পাশে দাঁড়িয়েছি দেশবাসীর। আমাদের আদর্শ গোর্কীর আদর্শ। গোর্কীর আদর্শ ঃ Support a man when he is getting up. তাই সহজেই সবাই বিশ্বাস করতে পারে, আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের রকবাজ রকফেলো ছেলেরাই একদিন রকফেলার হবে, সেদিন বাংলাদেশ থেকে দুর্ভিক্ষের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলবে বাঙ্গালী জনসাধারণ।

কিন্তু দীপ্তেন, এ যুগটা এখনও র‍্যাশন কার্ডের। এখনো র‍্যাশন কার্ড আমাদের শুধু সাহিত্যেই নয়, জীবনে। সাহিত্য যা করতে পারেনি, এই র‍্যাশন কার্ড তা করেছে। সামান্য শিশুর পর্যন্ত, অক্ষর পরিচয় ঘটেছে। সামান্য শিশু পর্যন্ত এ ধনদৌলতী সমাজের বর্ণপরিচয় রপ্ত করেছে। সাধারণ মানুষ উদ্দীপ্ত হয়েছে, জেনেছে, শিখেছে। বিদ্যাসাগর মশাই মাইলস্টোন দেখে লেখাপড়া শিখেছিলেন, আগামী যুগের জনতা র‍্যাশন কার্ডের অক্ষর পরিচয় দিয়েই শুরু করবে তাদের স্বাধীনতার শত্রুর স্বরূপ উদঘাটনের। শত্রুশিবিরের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব সাহিত্যেরও।

হ্যাঁ ভাই দীপ্তেন, সাহিত্যের পথই স্বাধীনতার পথ। ভাই, রুশ কবি মায়াকভস্কীর মতো ডাক দেবার সময় এসেছে।

My last cry,–You at least
shriek through the ages
that I am ablaze.
মিছিমিছি চীৎকারে রক্ত জল করছি না ভাই!
আমাদের রক্ত পেট্রোল হয়ে আছে।

[৪র্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৫৮]

৩৭০·৪ মিটারে

শ্রুতিধর

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর বছরে পুনঃপ্রকাশ—অপেক্ষ অচলপত্রের জন্য বেতার-সমালোচনা লিখতে বসে ভাবতে চেষ্টা করি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব বা ঋষিসদৃশ চেহারাও যে কোন পশ্চিমী ঋষি থেকে আত্মসাৎ করা, এ কথা কখনও 'কবিতা' পত্রিকাখ্যাত বুদ্ধদেব বসু প্রমাণ করতে পারেননি) কলকাতা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু বলে গেছেন কিনা। মনে পড়ে তিনি 'রেডিও'র বাংলা করেছিলেন 'আকাশবাণী'। এই বাংলা করবার সময় বাণীকুমারের কথা তাঁর মনে ছিল কি না জানি না, কিন্তু শ্যামল এবং নীলিমা যে তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন ঃ শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল। সাধারণ লোকে জানে না, কিন্তু আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ আসলে কলকাতা বেতার-কেন্দ্রকে উদ্দেশ করেই এই পংক্তিটি লিখেছিলেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র এখন যে সত্যই শ্যামল এবং নীলিমায় ছেয়ে গেছে, বেতার-যন্ত্রের চাবি ঘোরালেই তা টের পাওয়া যায় ঃ শ্যামল মিত্র (স্ত্রীলোকপ্রিয় গীতশিল্পী), শ্যামল গুপ্ত (রম্যগীতিখ্যাত গীতিকার), শ্যামল ঘোষ (উদীয়মান শ্যামল গুপ্ত) ; নীলিমা সান্যাল (ভূতপূর্ব বেতার-অভিনেত্রী-ও-গায়িকা, অধুনা 'বাংলায় খবর পড়ছেন') নীলিমা সেন ('শরৎ মেঘে জাগে' রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী), নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (আধুনিক পল্লীগীতি-গায়িকা, হাস্যার্ণব ভানু বন্দোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী)।

এই শ্যামলে শ্যামল এবং নীলিমায় নীল কলকাতা বেতারকেন্দ্রের উপর আমি আপনি যতই রাগ করি না কেন, বেতার কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের তাতে কিছু যায় আসে না। যদি আসত যেত তবে দিনের-পর-দিন, রাতের-পর-রাত, দিন-রাত অজস্র অশ্রাব্য কর্মসূচি দিয়ে তাঁরা আমাদের উত্যক্ত করতেন না। উত্যক্ত হবার ব্যবস্থা প্রাতঃকাল থেকেই, কাক-ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই (আহা কাকগুলো রেডিওতে প্রোগ্রাম করে না কেন!) ঃ মাঙ্গলিকী সানাই (নাই দিয়ে দিন শুরু), তারপর কিছু গান-বাজনার পর কর্ণ-কর বা ইয়ার-ট্যাক্স—হিন্দি শিক্ষার আসর এবং সংবাদে প্রথম অধিবেশনের বিরতি। তারপর দুপুরে পুরোনো রেকর্ডের গানে দ্বিতীয় অধিবেশনের অর্ধেক সময় কাটাবার সুব্যবস্থা, কোন-কোন-দিন সঙ্গীতগোষ্ঠী নামে এক পাঁচমিশেলী অনুষ্ঠান-উঠতি-গাইয়ে বাজিয়েদের উত্থান-পতন। এবং প্রায় প্রত্যহ 'বিদ্যার্থীদের জন্য', যে-অনুষ্ঠানের আয়োজন আসলে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর বন্ধুবান্ধবদের (যাঁরা অধিকাংশই স্কুল-মাস্টার) জন্যে, যাঁরা বিদ্যার পরিবর্তে অর্থপ্রার্থী ; এবং যে-অর্থ তাঁরা পান তা তাঁদের পরিশ্রমের চেয়ে অনেক বেশি—অনেক অনেক বেশি। বিকেল ও রাতের প্রোগ্রামগুলি বেতার কর্তৃপক্ষের মতে সুনির্বাচিত। অন্তত সেরা সেরা শিল্পীর সাহায্যে কর্তৃপক্ষ প্রোগ্রামগুলিকে আকর্ষণীয় করতে চান। নানান ধরনের প্রোগ্রাম থাকে—মার্গ সঙ্গীত, লঘু সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, নজরুল-গীতি, গীটার, সেতার, বেহালা, প্রতি—শুক্রবার নাটক, তাছাড়া ক্রমশঃই নানা কথিকা (ইংরেজী টক), অখিল ভারতীয় কার্যক্রম, প্রতি রবিবার তবলা-শিক্ষার আসর প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার রম্যগীতি ইত্যাদি। কত বিচিত্র অনুষ্ঠান, কিন্তু আমাদের বেতার-কেন্দ্র গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

'সর্বত্রগামী' অনেক বড় কথা হল, আমাদের বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলি সামান্য কিছুও যদি, আর কিছু না হোক, শুধু হৃদয়গামী হত, তা হলে খুশি হতে পারতাম। কিন্তু বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলি হৃদয়গামী, তো নয়ই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে হৃদয়বিদারক। এবং এ সত্য আর কেউ না বুঝে থাকুন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলি যে শ্রাব্য নয়, অনুষ্ঠেয় মাত্র, এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রচারই যে মুখ্য, তা তিনি খুব ভালো করে বুঝেছেন। তাই প্রতি রবিবার 'সঙ্গীত শিক্ষার আসরে' তিনি যা যা করেন ও বলেন রীতিমত তা কৌতুকাবহ। যেমন গত রবিবার (৯/৭/৬১) সঙ্গীত শিক্ষার আসরে ঃ

একজন প্রশ্ন করেছেন, তবলা শিক্ষার কোনো বই আছে কি না, থাকলে লেখকের নাম জানাবেন।

পঁচিশ সেকেণ্ড থেমে পঙ্কজ মল্লিক উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ আছে, যে-কোনো বইএর দোকানে জিগগেস করুন।

মাঝে-মাঝে পঙ্কজ মল্লিককে শ্রোতাদের বাংলা বানান শেখানোর দিকেও উৎসাহিত হতে দেখা যায়। কেউ হয়তো কোনো-একটি গানের, বিশেষত রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাঠ জানতে চেয়েছেন (লক্ষ্য করার বিষয়, গানগুলি প্রায়ই সুপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত), স্বভাবতঃই পঙ্কজবাবু সেই গানটি পড়ে শোনান তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে। সেই গানটি পড়বাব সময় পঙ্কজবাবু গানের শক্ত শক্ত কথাগুলি বানান করে দেন। উদাহরণ ঃ

এমন দিনে তারে বলা যায়। লিখেছেন? হ্যাঁ, লিখুন--। এ-ম-ন, অ্যা-ম-ন নয়। এমন দিনে তারে-ত-আ-তা-র-এ রে। 'যায়' বর্গীয় 'জ' নয় অন্তঃস্থ 'য' লিখুন অন্তঃস্থ য-আ যা; কি হলো? যায়।

অমুক গানটা কবে গেয়ে শোনাবেন? উত্তর ঃ পরের রবিবার চেষ্টা করব, না হলে পরের পরের পরের কিংবা তার পরের রবিবার ; যদি সুযোগ পাই এর মাঝের কোন একটা রবিবার চেষ্টা করব।

যাই হোক, এ ছাড়া আছে চিঠি পত্রের উত্তর। অজস্র চিঠি। কেউ লিখেছে, কয়েক দিন যাবৎ আমার গলা খারাপ যাচ্ছে। কি করি? উত্তর, ভবিষ্যতে ঠাণ্ডা লাগাবেন না, ইত্যাদি। এই ভাবে সঙ্গীত শিক্ষার আসরের মধ্যে পনের থেকে বিশ মিনিট চলে যায়। বাকি সময় পঙ্কজবাবু অনুরোধের গান করেন। আর বাকি সময়টা নির্দেশ সহ সঙ্গীত শিক্ষা। যেমন গান শুরু করার আগে—হুঁ, হুঁ, হচ্ছে না, হচ্ছে না, গা ধরুন, গায়ে পা লাগান ; হুঁ। এবার ধা মা ধরুন, তাতে পানি দিন। ইত্যাদি।

তারপর—তাল বিশ্লেষণ। তারপর গান। কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড, সেই সঙ্গীত শিক্ষার্থী ততক্ষণে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে ম্যাটিনি শো-র টিকিট কাটতে।

[১ম বর্ষ, সাপ্তাহিক, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৮]

।। পাশাপাশি ।।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সুধীন্দ্রনাথকে স্বীকার ।।

'আমার রচনা তোমাদের কালকে
স্পর্শ করবে আশা করে তোমার
হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম।
তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে
একে গ্রহণ করো।'
।। উৎসর্গ ঃ আকাশপ্রদীপ ।।

সুধীন্দ্রনাথ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে শিকার !

'That in course of time
he and the wife of his
brother Jyotirindranath fell
desperately in love with
each other did not mend
matters at all ; and when
the family married him
off presumably to prevent
scandal, bad got worse and
worse until his sister-in-law
killed herself.'

—Quest ঃ রবীন্দ্রসংখ্যা '৬১
।। পৃষ্ঠা ঃ ২১ ।।



—ও মশাই! সাড়া শব্দ নেই কেন, কোথায় গেলেন..



হাসপাতাল থেকে বলছি

ছেলেবেলায় আমার মাথায় আজগুবি মন্ত্রটি কে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো আমার মনে নেই। তার জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা। সেই অগ্নিযুগের কেউ হবে, আমাকে বলেছিলো এবং আমার মতো আরও অনেককে ঃ আদেশ পাওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়বে ; কে-কি-কেন-কবে-কোথায় অত সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনার জন্যে যে অপেক্ষা করবে জানবে সে কাজ করতে চায় না; সে পুরুষ নয়, কাপুরুষ। পুরুষ সম্পর্কে কেউ কিছু বললে আমার গায়ে তেমন লাগে না ; বস্তুত আমি বুঝতেই পারি না কার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু কাপুরুষ বললেই বুঝি ; বেশ বুঝতে পারি, আমার কথাই বলা হচ্ছে। তাই অগ্নিযুগের সেই উপদেশ আমি ভুলিনি। এবং না ভোলার ফলেই না আজ আমার এই হাল। আজ বুঝেছি যেমন করে তেমনি করে যদি আগে বুঝতাম যে, ওটি মন্ত্র না ; আসলে মন্ত্রণা, তাহলে আজ নাজেহাল হতাম না এমনভাবে বোধ হয়। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই হতাম না।

বুঝতে আমার সাদা চুল লোমায় কালো হবার বয়স হয়ে গেছে এদিকে। কলেজে সারাদিন পরের ছেলের খবর করে বাড়ি ফেরার পর দেখি নিজের ছেলে ফেরার। তার খোঁজ করি অতঃপর তার মায়ের কাছে ঃ কাবলু কোথায়? তার মা জবাব দেয় ঃ হাসপাতালে গেছে। শুনেই মনে পড়ে য়ায় অগ্নিযুগের উপদেশ ঃ আদেশ পাওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়বে। বেরিয়ে পড়লাম ফতুয়া গায়েই। প্রথমে গেলাম যে হাসপাতালে সেখানে শয্যাগত একটি রুগীকে ডাক্তার আশ্বাস দিচ্ছে যখন ভয় নেই বলে তখন রুগীর খাটের পায়ের দিকে দুটো শকুন দেখি উড়ে এসে বসেছে কখন! দেখে ভয়ে পালিয়ে গেলাম যেখানে সেখানে নিদারুণ সংঘর্ষ নার্সের অপেক্ষমান একজন বাবা-র সঙ্গে। লম্বা কিউয়ের একেবারে শেষে দণ্ডায়মান একজন, তাকে এসে নার্স যেই বলেছে ঃ যান, আপনার একটি মেয়ে হয়েছে,—ব্যাস! আগুন ধরে গেছে কিউয়ের মাথায়। সেখানে অপেক্ষমান বাবা আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে এসেছে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের দিকে ঃ এ কিরকম পার্শিয়ালিটি মশাই, [মেয়েছেলেকে মশাই বলতে শোনা আমার এই প্রথম মশাই!],—আমি দাঁড়িয়ে আছি ভোররাত থেকে। আর ও ভদ্রলোক এসেছেন সবে। ওর বাচ্চা আগে হলো কেন? বুঝলাম, ভুল করে মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ঢুকেছি।

সেখান থেকে যে হাসপাতালে এলাম সেখানে রুগী আছে ; ডাক্তার নেই। শুনলাম ডাক্তাররা সব হাসপাতালে গেছে। সে কি? তাহলে আবার ভুল করেছি? না। বেরিয়ে দেখলাম বাইরে সাইনবোর্ড ; হাসপাতালেরই বিজ্ঞাপন, কারণ তলায় নোটিশ ঝুলছে ঃ জীবন আছে এইরূপ রুগী আগামী শুক্রবার পর্যন্ত লওয়া হইবে না। আবার ভেতরে যাই ; আবার প্রশ্ন করি ঃ কোন্ হাসপাতালে গেছেন সব? দারুণ হাসির মধ্যে শুনি,—হাসপাতাল নামে যে ছবি মিনার-বিজলী-ছবিঘরে চলছে দারুণ জোরে সেইখানে।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কোথায় তার জবাব পাই। মনে পড়ে যায় ছেলে জন্মের সময়েই ঠিক টাইমে বেরুচ্ছিল না।

ডাক্তাররা তার কারণ খুঁজে খুঁজে যখন হয়রাণ তখন বোঝা গেল ছেলের না বেরুনো অকারণে নয়। ভূমিষ্ঠ হতে দেখা গেল মায়ের পেট থেকে পড়বার আগেই সে সিনেমা জগতের কোন্ কাগজ পড়ছিলো যাতে সিনেমার লেখকরা সাহিত্য এবং সাহিত্য লেখকরা সিনেমা করে থাকেন। এবং যদ্দুর মনে পড়ে এই ছেলে প্রথম 'মা' ডাকেনি, 'সিনেমা' বলে ডেকে উঠেছিল।

সেই ছেলে বড় হয়ে হাসপাতালে গেছে শুনেই আমার বোঝা উচিত ছিলো। এ হাসপাতাল সে হাসপাতাল নয়। এ হাসপাতাল বায়স্কোপের হাসপাতাল।

হাউসফুল বোর্ড দেখে ঘাবড়াই। কিন্তু টিকিট বিক্রেতা ঘাবড়ায় না। টিকিট হাতে নিয়ে বোর্ডটা দেখাই। সন্দেহ নিরসন করে বক্স অফিস ঃ এটা খোলা যায় না! ঢোকবার মুখে আমায় জানায় ঃ ছবি প্রায় শেষ হতে চললো যে ; যান, যান,—!

শুনে ভরসা পাই। ছবি দেখা আমার উদ্দেশ্য নয় ; ছেলে আছে কি না দেখতে এসেছি। এক্ষুণি শেষ হলে বেঁচে যাই ; আলো জ্বললে দেখতে পাই ছেলে বসে আছে কিনা। আধ ঘণ্টা যাবার পর আলো জ্বলে। কিন্তু পর্দার ওপর জ্বলজ্বল করে, একি? ইণ্টারভ্যাল? কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখি ছেলেকে হুড়মুড় করে ভীড়ের সঙ্গে বেরুতে। প্রাণ ফিরে পাই আবার। ভাবি বাকি ছবিটা দেখেই যাই। টিকিট কিনেছি যখন!

ঠিক সেজন্যেও নয়। ঠাকুর্দার বাবার সঙ্গে বাড়িতে এক গ্রুপ ফটোতে অশোককুমারকে দেখেছি। সেই অশোককুমারই হাসপাতালের এই অশোককুমার কিনা দেখবার জন্য বসে থাকি।

।। দুই।।

একজন বৃদ্ধকে দেখি ছবির পর্দায়। পরচুল পরা। ঠাকুরদার বাবার আমলের সময় বিচার করে আশ্চর্য হই ; তেমন বৃদ্ধ হতে পারেনি তো। তারপর শুনি, না; ইনি নন। এনার নাম ছবি বিশ্বাস। তারপর দেখি একজন ছবির পর্দায় দেখা দেওয়া মাত্র সবাই হাসিতে ফেটে পড়ছে। এবার বুঝি ইনিই অশোককুমার। অশোককুমার না হয়ে যায় না আর। তারপর আবার শুনি। না ইনিও নন। ইনি পাহাড়ি সান্যাল। তারও পরে স্পট করবার চেষ্টা করি অশোককে। দেখি, একজন এলেই লোকের হাসি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাশের লোককে আবার প্রশ্ন করায়, ভদ্রলোক আমার ফতুয়ার দিকে তাকিয়ে গেঁয়ো লোকেদের দিকে শহুরেরা যেমন করুণার চোখে তাকায়, তেমন দৃষ্টি হেনে বলেন ঃ না ; ইনি হাস্যার্ণব ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশোকের আশা ছেড়ে রূপালী পর্দার তামাসা দেখি। আর আশা ছেড়ে দিলেই যেমন আশা ফলবতী হয়, তেমনই এসে দাঁড়ায় অশোককুমার। অশোককুমার বলে বুঝি কি করে? বোঝা আর শক্ত কি? এতক্ষণ বোঝা উচিত ছিল আমার। নিজে থেকেই হাসছে সে। মুক্তোর মত দাঁত ঝকঝক করছে ; কারণে অকারণে হাসছে। এমন হাসি এতক্ষণ ধরে যার দেখাচ্ছে লোককে সে অশোককুমার ছাড়া আর কে? এই এক হাসিতেই তো সব কাজ

হাসিল। বক্স অফিসের জয়জয়কার। ঠাকুরদার বাবার সঙ্গে ছবিতেও তো অশোককুমারকে এমনিই হাসতে দেখেছিলাম। তবুও নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞেস করতেই, পাশের ভদ্রলোকের হাত থেকে আমার ফতুয়াও আর বাঁচাতে পারলো না। আর তারই ফলে এখন আমি হাসপাতালে ; সত্যিকারের হসপিট্যালে। অবশ্য আমারই দোষ। কেন জানতে গেছিলাম?

জ্ঞান হারাবার আগে শেষ কথা কানে এসেছিলো : অশোককুমার নয় ; ওই ভুবনভোলানো হাসি যার তার নাম নাকি সুচিত্রা সেন।

[১ম বর্ষ, সাপ্তাহিক, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৮]



—নাঃ! ছোট্টুর বোনটা এবার বোধ হয় এগজামিনে গাড্ডু মারবে..
—কেন পড়াশোনায় তো ভাল!
—কিন্তু অনেকগুলো মাষ্টার জুটেছে যে...!

সত্যমেব জয়তে ॥
'খবর' জানি গুলকে বলে, ছাপা হলেই দৈনিকে,
লেবেল মোড়া হলেই সিগার বলে সবাই খৈনিকে।।

Man can be destroyed but not defeated

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

(১৮৯৯-১৯৬১)

সুনীল দত্ত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আশাভঙ্গের বেদনা ও নৈরাশ্য বিপুলভাবে ধাক্কা দিয়েছিল হেমিংওয়েকে এবং সেই সঙ্গে তাঁর সমকালীন আরও দুজন মার্কিন ঔপন্যাসিক জন্ ডস্ প্যাসস্ ও উইলিয়ম ফক্‌নর্‌কে। তবে হেমিংওয়ে ও প্যাসেসের রচনাতেই যুদ্ধের বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা ও অর্থহীনতার বর্ণনা পাওয়া যায় বেশী। যুদ্ধের সংঘাতে মানুষের ধ্রুপদী বৃত্তিগুলি যখন বিলুপ্তির পথে, তখন হেমিংওয়ে হয়ে উঠলেন একাধারে যুদ্ধবিরোধী ও অদৃষ্টবাদী। তবে পরবর্তী জীবনে তাঁর মনে হয়তো এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, মানুষের পাশবিকতা যেহেতু ধ্রুব সত্য, সেই হেতু যুদ্ধ ও যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সর্বপ্রকার বীভৎসতাও সনাতন। তিনি এইটুকু বুঝেছিলেন যে, মানুষকে যুগে যুগে কালান্তক নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে হবে নিছক অস্তিত্বরক্ষার খাতিরেই, তাই মানুষকে হতে হবে কঠোর, ভাববিলাসবর্জিত এবং পেশল পৌরুষসম্পন্ন। এইটাই হল হেমিংওয়ের জীবনদর্শন এবং এই জীবনদর্শনই তাঁর সমগ্র রচনার অস্থিমজ্জায়। তাঁর সাম্প্রতিকম উপন্যাসে 'দি ওল্ড্ ম্যান্ অ্যাণ্ড্ দি সী'-র শেষে তিনি বলেছেন ; Man can be destroyed but not defeated'। মানুষের ধ্বংস অনিবার্য নয় এমন আশ্বাস তিনি দেননি বা দিতে পারেন নি, কিন্তু তার ধ্বংস যদি একদিন অনিবার্যও হয় তথাপি সে যে তার অপরাজেয় পৌরুষ নিয়ে নিয়তির বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এমন নির্ভীক বাণী তিনি অবশ্যই প্রচার করে গেছেন। হেমিংওয়ের সুদীর্ঘ জীবনের ইতিহাস কুচক্রী নিয়তির বিরুদ্ধে এক পুরুষ শ্রেষ্ঠেব একক সংগ্রামের ইতিহাস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ওপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের আকস্মিক, মর্মান্তিক মৃত্যুতে বিশ্ববাসীর কতখানি মোহ্যমান হওয়া উচিত ছিল তার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব ভবিষ্যতের। যদিচ হেমিংওয়ের বিশিষ্ট রচনারীতির দ্বারা বর্তমান শতাব্দীর বহু লেখকের সাহিত্যকৃতি সবিশেষ প্রভাবিত, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বসাহিত্যে তিনি বেশ কিছু দিন জিজ্ঞাসার চিহ্নরূপে সমালোচকদের এক চমকপ্রদ লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকবেন।

আশ্চর্য মানুষ এই হেমিংওয়ে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়কদেরই মত তিনি দুঃসাহসী ও দুরন্ত প্রাণশক্তিসম্পন্ন। বিপদের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছেন তিনি আজীবন, যমের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন একাধিকবার, মৃত্যুকে বিদ্রূপ করার মত পর্বতপ্রমাণ পৌরুষও ছিল তাঁর। হেমিংওয়ে আহত হয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ফ্রাঙ্কো-বিরোধি সংগ্রামেও আমরা দেখেছি তাঁকে, এমন কি দ্বিতীয় মহাসমরের সময় একটি ফরাসী রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ পরিচালনা করেছিলেন তিনি নিজের ঝুঁকিতে। লেখা তাঁর পেশা হলেও নেশা ছিল তাঁর দুটি—গভীর অরণ্যে হিংস্র জন্তু শিকার এবং বুল্‌ফাইট দেখা। যে-কোন ভয়াবহ, বিপজ্জনক ও উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রতি হেমিংওয়ের অনুরাগ ছিল অসামান্য ও একাগ্র! এ-হেন লেখকের রচনায় যদি একটা ঝাঁজালো গন্ধ—গুলি বারুদ মদ মাংস পেঁয়াজ রসুনের গন্ধের অনুরূপ একটা ঝাঁজালো গন্ধ—পাওয়া যায়, তাতে অবাক হবার

কিছুই নেই।

হেমিংওয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি নানাভাবে ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্প উপন্যাসে। অনেক সময় মনে হয়, তাঁর বহু রচনাই আত্মজীবনীমূলক। হেমিংওয়ের গোড়ার দিকের দুখানি গ্রন্থ 'ইন্ আওয়ার টাইম' এবং 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্' রচিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেই। 'ফর হুম্ দি বেল্ টোলজ্' উপন্যাসখানি স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথম কয়েক বৎসর হেমিংওয়ে অতিবাহিত করেন ফ্লোরিডায় এবং আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে। এই সময়ের বহু অভিজ্ঞতা পুষ্ট করেছে তাঁর 'টু হ্যাভ্ অ্যাণ্ড্ হ্যাভ্ নট', 'উইনার টেইক্ নাথিং' এবং 'দি স্নোজ অফ্ কিলিমানজারো' এই তিনখানি রচনাকে। ১৯৫৯ সালের কয়েক মাস তিনি কাটান স্পেনে—বুলফাইটের অনুরক্ত দর্শক হিসাবে। বুলফাইট্ সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডেথ্ ইন দি আফ্টারনুন্'-এর পরিশিষ্টটি এই সময়ই লে· হয়।

মানুষ হেমিংওয়ে এবং শিল্পী হেমিংওয়ে বহুলাংশে অভিন্নহৃদয়: তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর সাহিত্য-সন্তান-সন্ততিতে এতই প্রকট যে ল্যাম্ব্-এর রচনা সম্পর্কে যে কথাটি অহরহ বলা হয়ে থাকে সে কথাটি হেমিংওয়ের রচনা সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য, অর্থাৎ স্টাইল ইজ্ দি ম্যান্। হেমিংওয়ে ভাববিলাসিতাকে পরিহার করেছেন সযত্নে, যদিচ ভাবসম্পদে তাঁর রচনাসম্ভার কোনক্রমেই দেউলিয়া নয়। তাঁর রচনাভঙ্গি সংযত, সংলাপ সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাময়, ভাষা তাঁর ভাবেরই মত সরল, ঋজু ও অনাড়ম্বর। তবে হেমিংওয়ে আদৌ ভাববিলাসী নন এমন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বস্তুতঃ, যদিও তাঁর চেষ্টা ভাববিলাসিতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করারই দিকে, তবুও পরিণামে তিনি ভাববিলাসী। অবশ্য ভাবের বিলাস বলতে অক্ষম আত্মরতিকে বোঝাচ্ছে না।

Bonamy Dobree তাঁর Modern prose style গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

'Mr. Hemingway gets his effects largely by repetitions, and by using the simplest words and ideas. And, oddly enough, he gives the impression of being sentimental by his avoidance of the sentimental, by being as matter-of-fact as possible.'

[১ম বর্ষ, সাপ্তাহিক, ১ম সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ, ১৩৬৮]

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

—তুমি দুদিনের জন্যে ছুটি চাইছ কেন? কোথাও যাবে?

—না

—তবে?

—বিপ্লব করব!

তিনটে, ছুটা, নটায়

সত্যজিৎ-এর তিন কন্যা রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প রূপবাণী-অরুণা-ভারতী।।

সত্যজিতের ছবিই নয় কেবল, তাঁর ছবির বিজ্ঞাপনও বটে। প্রথমটা আমার মাথা এবং দ্বিতীয়টি আমার ভাষা ভোলায়। এর আগে একবার তাঁর ছবির বিজ্ঞাপনে পরশুরাম অবলম্বনে সত্যজিৎ কৃত এই বিকৃত বাঙলা পড়ে ভাববার চেষ্টা করেছিলাম, ব্যাপারটা কি? পরশুরামের কাহিনী অবলম্বনে লিখলে যাকে তবু ছবি বলে মনে হয়, পরশুরাম অবলম্বনে লিখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কুঠার মনে হয়, এবং আরোও মনে হয় পরশুরাম স্বয়ংও এতটা পারেননি। পরশুরামের কুঠার মাতৃঅঙ্গেই পড়েছিল ; মাতৃভাষার অঙ্গে, প্রায় সর্বাঙ্গে পড়বার দুঃসাহস করেনি কখনও।

এবারে আবার কাছাড়ে বঙ্গভাষান্দোলনের শহীদের ১১টি শবের ওপর বসে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবে-র বছরেই সত্যজিতের বিজ্ঞাপনের ভাষা মাতৃভাষার ওপরে বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইলো। বঙ্গভাষার পকেটাভিধানকার রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁর অভিধানের ১৩৫০ সালে প্রকাশিত ৬ সংস্করণের ৬৩৭ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্টাংশে অশুদ্ধ শব্দ শিরোনামায় বানানে বা শব্দের গঠনে ভুল-এর তালিকা দিতে গিয়ে ৭নং ভুল বলেছেন ঃ

(শুদ্ধ)	(অশুদ্ধ)
একত্র	একত্রিত।

বৃথাই বলেছেন অবশ্য তিনি। কারণ রাজশেখর বসু এখন যেখানে, তাঁর মতে এই অশুদ্ধ বানানের আকর্ষণে তাঁকে সেখান থেকে আর নামিয়ে আনার চেষ্টাও বৃথাই। কিন্তু আমার কি হবে? ছাত্রদের এতকাল 'একত্রিত' লিখলে নম্বর কেটেছি ; এখন তারা যে আমার কি কাটবে বলার চেয়ে কি না কাটবে বলা বোধ হয় সহজ। কারণ সত্যজিৎ বাঙলা ছবির কত হাজারী জানি না প্রযোজক, পরিচালক, সুরকার, চিত্রনাট্যকার ; আর আমি? মফঃস্বল কলেজে সব চেয়ে অবহেলিত বঙ্গভাষার অধ্যাপকও নই পুরো ; উপাধ্যাপক মাত্র। মাইনের কথা না বলে এটুকু বললেই চলে যে আমাকে পরীক্ষার হলে দারোয়ানগিরি করতেও বাধ্য করা হয় কখনও! কখনও আবার বিনা পয়সায় খাতা দেখার যূপকাষ্ঠে বলি

হতে বাধ্য করা হয়। কারণ সব কালেজ-কোডেই মুড়ি এবং মুড়কির একই দর, একই রকম সমাদর [যেহেতু সবাই দেখে সেই হেতু আমাকেও জবাই হতে হবে! যেহেতু সবাই পরীক্ষার হলে পাহারা দেয় সেই হেতু ট্রেন না চালাই ক্ষতি নেই, গার্ডের ডিউটি চালাতে হবে, চালিয়ে না গেলেই বরং হবে না]!

কাজেই আমি তো সেই প্রভাত মুখুজ্যের মাস্টার মশাই, যে 'I donot know'-র বাঙলা 'আমি জানি না' বলায় 'Ignorant' অর্থাৎ অজ্ঞান বলে বিবেচিত হয়েছিলো। সুকুমার রায়ের পুত্র, উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র ; শান্তিনিকেতনের ছাত্র ; চলচ্চিত্রকার হিসেবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-প্রাপ্ত, আমার থেকে সত্যজিতের আসন তত দূরে, মানুষের তুলনায় ফানুষ আজ যত সুদূরে।

তবুও এই বছরটায়, যে বছরে আমাদের পাপে রবীন্দ্রনাথ নির্বংশ হলেন সেই বছরেই, রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর [বি] চিত্ররূপ দিতে গিয়ে বাঙলা ভাষার ওপর এই জুলুম তিনি না করলেও পারতেন [সত্যজিৎ আর যাই হোন, কোনও কালে আর আসামী নন কিছু ; কিছুতেই নন]।

কিন্তু আমি জানি। আমি জানি যে আসলে হোয়্যার দ্য শু পিঞ্চেস্। পাগলের কোথায় গোল, তা আমার অজানা নয়। সেই আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, সত্যজিৎ, যিনি বর্তমানে ভারতের অভূতপূর্ব চলচ্চিত্রী, তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না যে তিনিই আবার ভারতের ভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনচিত্রী। তার ফলে, বিজ্ঞাপন দেবার মুহূর্তে থেকেই তিনি সাঙঘাতিক রকমে আত্মসচেতন হয়ে এমন সব বার্তা এমন বিশেষভাবে জ্ঞাপন করতে থাকেন যে তাতেই তাঁর ভক্তরা ছবি দেখার অনেক আগে থাকতেই এমন সব বস্তু দেখতে থাকেন যার পর আর ছবি দেখার তাদের প্রয়োজন হয় না ; ছবিই তখন দেখতে থাকে তাদের। ছবিই তাদের মুখ দিয়ে ছবি সম্পর্কে যা বলবার তা বলায় ; যা বলবার নয় তা-ও বলায় না যে কখনও কখনও এমন কথা বলা শক্ত। ফলে সত্যজিতের এখন দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল ছবিতে নয়, ছবির বিজ্ঞাপনেও সেই ডি. এল. রায়ের—'নতুন কিছু কররে ভাই নতুন কিছু কর!' নিওর‍্যালিস্টিক ছবি এখন যে কেউ করতে পারে, কিন্তু নিওর‍্যালিস্টিক বিজ্ঞাপন এক সত্যজিতেই সম্ভব। বস্তুত, এরই ফলে সত্যজিৎ রায় এবং জহর রায়ে আর কোনও তফাৎ থাকে না। হাসানো যেমন জহর রায়ের এখন কেবল পেশা নয় ; দায়!—এখন জহরের প্রত্যেক কথায় লোকের হাসা এবং স্ত্রীলোকের হেসে গড়িয়ে পড়া চাই। সত্যজিতের দায়ও তার চেয়ে কম নয়। তাঁর বিজ্ঞাপনও আলাদা হওয়া চাই। আঁকায়, লেটারিং-এ, কখনও বাঙলা ভাষাকে স্যাক্রিফাইস করেও তাঁর বিজ্ঞাপন যদি তাঁর বিজ্ঞাপন না হলো, আর কারুর বিজ্ঞাপন হয়ে গেলো যদি, তাহলে আর তা সত্যজিৎ রায়ের তিন কন্যা হলো কি করে? তাহলে তো রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পের একত্র চিত্ররূপ হতো তিন কন্যা এবং সত্যজিৎ রায় হতেন তার চিত্ররূপদাতা। কিন্তু তাহলে যে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হতো এবং সবাই-এর মর্মগত হতো অল্পায়াসেই, কিন্তু তাহলে তা সত্যজিৎ রায়েরই বা হতো কি করে? আর কি করেই বা নিওর‍্যালিস্টিক ছবির বিজ্ঞাপন হতে পারত? পারত কি,—আপনারই বলুন!

আমার তো এমন ভয় হয়েছিলো যে কি বলবো! সত্যজিৎ যখন কেবল তিন অথবা ৩ লিখতে না পেরে তিনটি গল্পের নাম তিন-এর মতো করে লিখলেন, তখন আমার ভয় হলো যে, এই রে, এবার বোধহয় সত্যজিৎ আর শুধু 'ৎ' লিখতে পারবেন না ; তার বদলে হাসিখুসী-র 'ৎ' বোঝাতে বেড়ালের লেজ-এর নতুনতর কোনও ইলাস্ট্রেশন না করে বসেন [শান্তিনিকেতনের ছাত্র হলেও হাসিখুসী পড়ে থাকা তাঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব বলে আমি মনে করিনে]!

কি প্রলাপ কহে কবি, নও ছবি, নও ছবি...

রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পের চিত্ররূপ বলে বিজ্ঞাপিত হলেও সত্যজিতের তিন কন্যা আসলে রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিচিত্ররূপ ছাড়া কিছু নয়। কারণ, তিনটির কোনটিতেই রবীন্দ্রনাথের গল্প অবিকল উপস্থিত নয়। বহুদিন আগে শুনেছিলাম একবার, বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের দেবকীকুমার বসু-কৃত চলচ্চিত্র রূপদানের সময় যে, জাতীয় গ্রন্থের বহুজাতীয় পরিবর্তন বরদাস্ত করা হবে না। এখন হাওয়া উল্টো দিকে বইতে আরম্ভ করেছে। এখন শুনছি চিত্রের, না কি বি-চিত্রের খাতিরে যেকারুর যে কোনও রচনারই সংস্কারসাধন শুধু প্রয়োজনীয় নয় ; বাঞ্ছনীয় বটে ! চমৎকার!

যদি কেউ বলেন, কোনো সত্যজিৎ ভক্ত যে, রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পের চলচ্চিত্রায়ণে তিনি তেমন গুরুতর পরিবর্তন ঘটাননি ; সামান্য বদলে দিতে বাধ্য হয়েছেন যখন তখন তা নিয়ে আর এমন সোচ্চার আপত্তির কি আছে? তাহলে তার উত্তর হবে, অবধারিত এক উত্তর হবে, আছে। এর আগেও ছিলো, যখন নাকি বিভূতিভূষণের ইহলীলা সংবরণের সুযোগে তিনি লীলাকে বাদ দিয়ে অপরাজিত তুলে দেখান। এখনও আছে। আপত্তি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলেই, আরো বেশি। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পান থেকে চুন খসাবার অধিকার রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনি নিতে পারতেন কি?

সবচেয়ে আপত্তিকর অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রের রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম পরিবর্তনের কারণে। সত্যজিতের তিন কন্যার এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার কন্যা জুজুর কাছে শুনলাম, সে নাকি কোথায় পড়েছে যে সত্যজিতের তিন কন্যার অন্যতম নায়ক বিভূতিভূষণের অপু-চরিত্রের রূপ দেওয়ায়, লোকে যাতে সেই অপু ভেবে না বসে তাই, রবীন্দ্রনাথ গল্পে যার নাম অপূর্ব দিয়েছেন সত্যজিৎ তাকে নতুন নাম দিয়েছেন অমূল্য। এই অমূল্য যুক্তি সত্যজিৎ-এর বলে বিশ্বাস করিনে, কারণ এ যুক্তি এতই সিলি যে সত্যজিৎ-এর পক্ষেও দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু যুক্তি যাই থাক বা যতই থাক—এ অনধিকার চর্চার অধিকার তিনি কোথায় পেলেন কে তা বলবে? কেউ বলবে কি? এ যদি যুক্তি হয় তাহলে এরপর, কোন্‌দিন সত্যজিতের নায়ক রবীন্দ্রনাথের ছবিতে পরপর অভিনয় করার পর আবারও সত্যজিৎ যদি রবীন্দ্রনাথের গল্পেই তাকে নায়ক নির্বাচন করেন তাহলে লোকে অথবা স্ত্রীলোক যাতে না গুলিয়ে ফেলে সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের নাম বদলে, সত্যজিৎ 'রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে' না লিখে, 'ইন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে', বলে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন দেখব, স্বচক্ষেই দেখব হয়ত।

এক কন্যা রাঁধে বাড়েন...

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বিশবছর বাদে, [মাফ করবেন, ভুল বললাম, রবীন্দ্রনাথের নতুন করে মৃত্যুর এই দুর্বৎসরেই], তাঁর গল্পের অপমৃত্যু তাঁর পরম প্রীতিভাজন স্বর্গত প্রতিভাবান বাঙালী লুই ক্যারল সুকুমার রায়ের পুত্রের হাতে আমাকে মর্মাতিগ পীড়িত করেছে ; কারণ রবীন্দ্রনাথকে আমি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটো গল্পকার জ্ঞান করি,—মাত্র এই কারণে নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গায়ের ওপর স্টিমরোলার চালানোয় একবার নয়, বারবার প্রতিবাদ করেছিলেন ; আজ তাঁর অবর্তমানে তাঁর দেওয়া চরিত্রের নাম পরিবর্তনে, নতুন চরিত্র আমদানীর বিমৃষ্যকারিতায় এবং সর্বোপরি এই [বি] চিত্রের শেষ কাহিনী 'সমাপ্তি'র-সমাপ্তি দৃশ্যে মায়ের মুখের ওপব দরজা বন্ধ করে দেবার গতানুগতিক বাঙলা ছবির অশোভন, অশালীন অরুচিকর, অসভ্য, অভদ্র, অমর্যাদাকর, অনড়ানত্বয় কতদূর বিচলিত হতেন অথবা তিনি এখন অশরীরে যেখানেই থাকুন সেখানে কি পরিমাণ আঘাত পেয়েছেন, সেই ভাবনাই, সেই দুর্ভাবনা আমার মর্মপীড়ার সব চেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পোস্টমাস্টার, রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা এবং ক্ষুধিতপাষাণ, দুয়ের চেয়েই অনেক

দুরূহ বিষয়ের অনেক সার্থকতর শিল্পরূপায়ণ। বস্তুত মপাসাঁর নেকলেস, ও' হেনরির গিফ্‌ট অফ দ্য ম্যাজাই-এর চেয়ে ততখানি উচ্চস্তরের ক্রিয়েস্যান্‌ পৃথিবী থেকে সূর্যের স্তর যত উচ্চে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের 'বি'-চিত্ররূপে আমার দুঃখ অনেক কম হবে সেই তুলনায়, যে কষ্ট আমার পোস্টমাস্টার, অথবা সমগ্র রবীন্দ্রগল্পসাহিত্যেও তুলনা বিরল সেই সৃষ্টি, জীবিত ও মৃত'-র সংহারপর্ব ঘটতে দেখলে চলচ্চিত্রের অশিক্ষিত, অরসিক পটে, হত।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গল্পের বিষয়ে যখন বলেন, 'আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি, যা কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা'। --তখন আমার স্বভাবতঃই এই জিজ্ঞাসা জাগে যে রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর গল্পের সত্যজিৎ-[বি]-কৃত এই অপরূপ রূপমাধুরী দেখে যেতেন তাহলে তাও তাঁর পক্ষে কি আরেক অভিজ্ঞতা হত না? আরেক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা? সত্যজিতের অজ্ঞতা, তার আরেক নাম সর্বজ্ঞতা, দেখে পোস্টমাস্টারের স্রষ্টার কি ফিল্মমাস্টারের এই অনাসৃষ্টি অভিজ্ঞতার অতীত বস্তু হত না?

তপন সিংহ-বিরচিত ফিল্‌মি ক্ষুধিত প্যাসান দশ মিনিট দেখে আমি পত্রাঘাত করেছিলাম ওই ছবির প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলীকে ঃ তপনকে এককপি গল্পগুচ্ছ যাতে ওই গল্পটির অবিকৃত রূপ আছে সেটি পড়তে দিতে অনুরোধ জানানোই ছিল সে চিঠির উদ্দেশ্য। সত্যজিৎ-এর পোস্টমাস্টার দেখবার পর সত্যজিৎকে কি দিতে পারি ভেবে পাইনি এখনও। সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী, বিদেশ তাঁকে পুরস্কার, [সাপ্তাহিক] দেশ কখনও পুরস্কার, কখনও তিরস্কার এবং সিনেমাজগৎ অস্কার দিয়েছেন। আমরা তাঁকে কি দিতে পারি? পোস্টমাস্টার গল্পের শেষ অংশটি, তার অশেষ অংশটুকু উপহার দেওয়া ছাড়া ঃ

'যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন--একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, "ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি"।--কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে'।

এই শ্মশান থেকে রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহকে তুলে আনতে না পেরে তাঁর অবিনশ্বর আত্মাকে আবার খাঁচাছাড়া করেছেন। একবার তিন কন্যায় ; আরেকবার রবীন্দ্রজীবনীর সরকারী [পার] ভার্সান মারফৎ।

পোস্টমাস্টারে সত্যজিতের কন্ট্রিব্যুশান দুটি। এক--একটি সং--এর আমদানী ; দুই,-- একাধিক সংলাপের ছবি থেকে রপ্তানী। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পে, সংলাপ এবং চরিত্র দুই অত্যন্ত অল্প। কিন্তু সেই চরিত্র এবং সেই সংলাপ রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

"দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে"?

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কি করে হবে"। ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল--'সে কী করে হবে'।

রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবারে নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, 'রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন ; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না'।..রতন অনেকদিন প্রভুর অনের তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এই

নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাইনে"।

বেদনায় বিস্ফারিত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা এই কটি কথায় রবীন্দ্রনাথ যে ছবি তুলে ধরেছেন কোটি কথা ব্যয় করেও রবীন্দ্রকাহিনীব সত্যজিৎ ছবি কি একটি বারও তার কোটি মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে?

পারেনি যে সেকথা বোধ হয় সত্যজিৎকে বলাও এতদিনে বাহুল্য হবার কথা। না পেরে এছবিই অনবদ্য সংলাপের পরিবর্তে এনে হাজির করেছে এক সং-কে ; বাঙলা ছবির সেই অবশ্যম্ভাবী কমিক রিলিফ। সত্যজিৎ কি বলতে চান যে পাগল অথবা সং কেবল গ্রামেই থাকে? শহুরে সত্যজিতের অন্তত এ ধারণার সঙ্গত কারণ নেই যে তা নির্ভয়ে না হলেও দূর থেকে এখনও বলা চলে।

* * * *

অন্যপক্ষে মণিহারা গল্পের একটি সংলাপের জন্যে সত্যজিতের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওই কাহিনীর কথক যেখানে বলেছে : 'মশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'—বস্তুত সেখানেই আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। নিও র‍্যালিস্তিক ছবির প্রেস্টিজ-এর দায়বদ্ধ দর্শকের কথা স্মরণে রেখে তিনি যে ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না চরিত্র মারফৎ জিজ্ঞেস করেছেন একবার এজন্যে তাঁকে বারবার নমস্কার। কারণ ওই নিদ্রানিবারণী আহ্বানে সময়মত জেগে উঠতে না পারলে আমার পোস্টমাস্টার দেখা হত না।

আর তাহলে? তাহলে পাখীর ওড়াকে তেলাপোকার ওড়বার চেষ্টা কি পরিমাণ ক্যারিকেচার করতে পারে সে অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মতোই আমারও অজানা থেকে যেত!

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

[১ম বর্ষ, সাপ্তাহিক, ২য় সংখ্যা, ২৫ শ্রাবণ,১৩৬৮]

এন্যুয়াল রেগেটা!

সেই পরমাশ্চর্য মেয়েটি তার দুজন অনুরাগীকে বললে ; 'আমাকে যে বড় গাড়ি চড়াতে পারবে, আমি তার। দুই ভক্তের একজন ধনকুবের ; আরেকজন ভিখিরিদের চেয়েও গরীব অর্থাৎ মধ্যবিত্ত : বড়লোক তনয় মস্ত বড় ফোর্ড গাড়িতে এসে হাজির পরের দিন। এসেই মেয়েটিকে বলল : 'চল'। মেয়েটি বলে : না ; যদিও জানি ওর গাড়ি নেই, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত সময় আছে অপেক্ষা করবই। ছেলেটি আসে ; দ্বিতীয়, মধ্যবিত্ত ছেলেটি ভাঙা একখানা গাড়ি বলদ দিয়ে টানতে টানতে।

বিস্মিত মেয়েটি বলে : 'এ কি?' মধ্যবিত্ত উত্তর দেয় : 'আমাকেই বিয়ে করতে হবে তোমায়।' 'কেন'—মেয়েটির আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা।

'কারণ', মধ্যবিত্ত অনুরাগীর উত্তর। 'কারণ, ওর গাড়ি হচ্ছে শুধু ফোর্ড ; আর আমার? আমারটা অক্সফোর্ড!'

॥ রবীন্দ্রহত্যবার্ষিকী ১৩৬৮ ॥

আসামে বঙ্গভাষা আন্দোলনে নিহত এগারটি শবের ওপর বসে আমরা রবীন্দ্র-উৎসবে উন্মত্ত হয়েছিলাম। পাপের ফল ফলতে, ধর্মের কল বাতাসে নড়তে প্রায়ই দেরী হয়। এবার তার ব্যতিক্রম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আমাদের পাপে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষেই রবীন্দ্রনাথ নির্বংশ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিবসে তাঁর দাড়ি আমাদেরই যেসব ছেলেরা ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ছেলেরা আজ রবীন্দ্রহুজুগে মেতেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে যতেক জ্ঞানীগুণী। এই রবীন্দ্রহিস্টিরিয়াগ্রস্ত দেশে একদিকে মাতৃভাষার জন্যে প্রাণ দিচ্ছে সংগ্রামীরা, অন্যদিকে স্নাতক পরীক্ষায় মাতৃভাষা জ্ঞানের যে নমুনা বাঙালী ছেলেরা দিচ্ছে তাতে, শুধু এক সেই কারণেই বাঙলা ভাষার সঙ্গে বাঙলা ভাষাভাষী ও রবীন্দ্রনাথকে কোনও রকম শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অধিকার আর নেই। রবীন্দ্রশ্রদ্ধাও নয় ; আমরা যাতে মেতেছি, তা রবীন্দ্রশ্রাদ্ধ।

মৃত্যুদিবসে রবীন্দ্র-অঙ্গকে অপমান করবার স্পর্ধা যারা দেখিয়েছিল তারা অপরিণত বয়স্ক অর্বাচীন। আজ যারা রবীন্দ্রহত্যবার্ষিকীতে কবির তিরোভাবের কুড়ি বছর পর আবার রবীন্দ্রহত্যায় পাণ্ডা পুরুত দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ তারা বয়সে প্রাচীন। তারা কেউ রবীন্দ্রনাথ পড়েনি। পড়লে তাঁরা জানতেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই অবস্থার, তাঁর এই চরম দুরবস্থার চিত্র অনেক কাল আগেই ধ্যানে অবলোকন করে লিখেছেন ঃ

'সভাপতি থাকুন বাসায়
কাটান সময় তাসে পাশায়
নাইবা হলো নানা ভাষায়
আহা, উহু, ওহো'।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় আজও হয়নি, না হোক! রবীন্দ্রজীবনকাব্যের সঙ্গে যদি তাদের যোগ থাকত তাহলেও তারা জানত, জানতে পারত যে ঃ

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

এ কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের কথা নয় ; তাঁর জীবনকাব্যের মর্মবাণী। অন্যায় যে করে তার চেয়ে অনেক অন্যায় সে করে, যে সেই অন্যায়কে সহ্য করে। অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী, কেউই রবীন্দ্রযজ্ঞের যোগ্য নয়। ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ, এদের কারুরই উত্তরাধিকার অব্যাহত নেই আর বিপুল রবীন্দ্র-চিন্তা-শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প সম্পত্তিতে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ভারতবাসীকে হত্যার প্রতিবাদে কবি তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন, বাঙালী মাত্র এইটুকু জানে। সেই সঙ্গে যে প্রতিবাদপত্র আজ ইতিহাস হয়ে গেছে, তার একটি অক্ষরও বাঙালীর জানা নেই ; আরও জানা নেই তার যে, রবীন্দ্রনাথের এর চেয়ে অনেক বড়, এত অসামান্য ত্যাগ আছে যে, নাইট উপাধি ত্যাগ সে তুলনায় সামান্য ত্যাগও নয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে বিধবাবিবাহ আন্দোলন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আন্দোলন। ঠিকই বলেছিলেন। সেদিনকার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে বিধবাদের আবার বিবাহের কথা বলা যে কত বড় দুঃসাহসের কথা বলা তা আজ আর নেহেরু নাইলনের হুজুগে ধারণায় আনাও অসম্ভব। কারণ আজ টাকা থাকলে বিধবাকে বিবাহ না করেও বিবাহিতের মতো থাকা-শোয়া-খাওয়া-দাওয়া, সবই একসঙ্গে

চলে। শুধু আগামী সেই কাল দুয়ার হতে অদূরে যখন, অর্থনীতির নয়, নীতির অভাবে কেবল এরকমই চলবে। দুর্দান্ত রকমে চলবে।

বিদ্যাসাগর নিজের অর্থ, সামর্থ্য, প্রতিপত্তিকে বিপন্ন করে কেন বিধবাবিবাহ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন? ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ লেখবার আগেই বিদ্যাসাগর নিজের জীবন দিয়ে জাতির জীবনে যে লেখা লিখেছিলেন তা-ও ওই, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে!"

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আন্দোলন, বিশ্বভারতী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি। বালবিধবার জীবনের দুঃখ অনুভব করেছিলেন বিদ্যাসাগর ; নিজের বাল্য জীবনের স্মৃতি বিস্মৃত হতে পারেননি কবি। আর কোনও বালকের জীবনে আনন্দহীন শিক্ষার এবং শিক্ষাহীন নিরানন্দের ছায়া যাতে না পড়ে, তারই জন্যে নিঃস্ব হয়েও রবীন্দ্রনাথ তৈরী করেছিলেন, অনেক স্বপ্ন আর অনেক অনেক সাধনা দিয়ে, বিশ্বভারতী। তিনতলার ঘরে নীল আলো জ্বেলে রবান্দ্রসংগীত-রচনা তাঁর একমাত্র কবিকর্ম নয় যে তা জানা যেত, যদি রবীন্দ্রহুজুগেদের জানা থাকত যে, বাঙলার গ্রাম এবং গ্রামবাসীদের সম্পর্কে এই,—

'আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই। তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনমতে একটা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে ; সমস্ত দিনের দুঃখধান্দার রিক্তপ্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।'

—কথাগুলোও অভিজাত রবীন্দ্রলেখনীজাতই!

রবীন্দ্র কাব্যজীবনের সঙ্গে কণা মাত্র পরিচয় থাকলে আজ বাঙালী আরো জানতো যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম নেহরুর নিঃস্বপ্রেম নয়। নিজের মা-কে যে ভালবাসতে পারল না পৃথিবীসুদ্ধ মা-কে ভালোবাসায় তার প্রেম বিশ্বপ্রেমে উত্তীর্ণ হয় না ; নিঃস্বপ্রেমেই নিঃসংশয়ে পরিণত হয়। রিলিজিয়ন অফ ম্যান-এর প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ ; জাপানী কবি নোগুচির ন্যারো ন্যাশনালিজম-এর বিরুদ্ধে জাগ্রত প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ। গান্ধী ন্যাশনালিস্ট, রবীন্দ্রনাথ ইন্টারন্যাশনালিস্ট, আবার ঃ 'I shall be born again and again in India. With all her poverty misery and wretchedness, I love India best,—এই উক্তির বক্তাও সেই রবীন্দ্রনাথ।

পুনর্বার। পরাধীন ভারতে বাঙলা-ভাগ বন্ধ হবার জয়যুক্ত মুহূর্তে এই রবীন্দ্রনাথই সেই গান গেয়েছিলেন ঃ

"বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক এক হউক, হে ভগবান"—বাঙালীর এই জয়গান,—এও রবীন্দ্রনাথের। প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় যিনি লিখেছেন ঃ

> '—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
> অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
> ভয়ঙ্করী।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকায় যিনি লিখেছিলেন ঃ

> 'মানুষের দেবতারে
> ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
> তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব—এ প্রহসনের
> মধ্য অঙ্ক অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের :'

এই রবীন্দ্রনাথ আসামে মানুষের দেবতাকে যখন অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে হত্যা করতে উদ্যত, তখন নেহরুর কাছে করজোড়পত্রের পরিবর্তে বলতেন ঃ

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

এই রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন ঃ

'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি!'

আজ, দ্বিখণ্ডিত, আসামে রক্তাক্ত, বেরুবাড়িতে বঞ্চিত, ক্ষতবিক্ষত, কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট প্রবঞ্চিত বাঙলা এবং বাঙালীর চরম দুর্দিনে বিশ্বকবি ওই দুটি পংক্তির পাঠান্তর করে বলতেন।

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
মানুষ করেছ হায়, বাঙালী করনি!

এই রবীন্দ্রনাথ বাংলার সব চেয়ে বাঙালী কবি। এই রবীন্দ্রনাথ আজকের বাঙলা দেশে আর কারুর নয় ; আমার। আমার একার!

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

[১ম বর্ষ, সাপ্তাহিক, ১ম সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ, ১৩৬৮]



-আহা! দুদিন কিছু খাওনি—তা' খান কতক চপ ভেজেছি খাবে?
-চপ! ভেজিটেব্‌ল্ না মটন?

রবীন্দ্রনাথ

ও

আমি

[রবীন্দ্র শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে কবিকে উপলক্ষ্য করে 'আমি'ই যে রচনার লক্ষ্য—তারই সার সংকলিত হলো]

'রবীন্দ্রনাথ অনেকবার আমাকে বলেছিলেন তাঁর গানগুলো প্রচারের ভার নিতে।'

—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[রবীন্দ্রনাথের গান ঃ কৈফিয়ৎ, পৃঃ ১]

'অনেকদিন পর্যন্ত—আমার বিয়ে হবার আগে—ওঁর কি রকম একটা ধারণা ছিল যে আমার খাওয়া-দাওয়া বা শোয়া সম্বন্ধে কিছু খেয়াল থাকে না। তাই সর্বদা ওঁর সঙ্গেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আর শুতামও প্রায়ই ওঁর পাশে বা কাছাকাছি কোনো ঘরে।'

—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

[রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ঃ বৈশাখ ১৩৬৮]

ক। ...আমার সবুজ পত্রে লেখা প্রবন্ধ-সংগ্রহ সবে-ধন নীলমণি 'নারীর উক্তি' বইখানি তখনকার কালে অনেকের ভালো লেগেছিল।

খ। আমার সাহিত্যস্মৃতি সম্পূর্ণ করতে হলে রবিকাকার রচনার ইংরেজী অনুবাদের উল্লেখও করতে হয়। তাঁর গুটিকতক কবিতা ও গান আমি তর্জমা করেছি, যা পড়ে তিনি খুশি হয়েছিলেন।

গ। আমি আরেকটু বড় হ'লে আমাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলো সাহিত্য-স্মৃতির একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে।...এই চিঠিগুলির উপলক্ষ্য হওয়া ছাড়া আমার এই সামান্য কৃতিত্বটুকু আছে যে, সেই অল্প বয়সেই তার মর্যাদা বুঝে.....

ঘ। প্রভাত সঙ্গীত (১২২০) আমাকে স্নেহ উপহার' দিয়ে উৎসর্গপত্রে আমার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখেছিলেন, প্রথম সংস্করণ বইতে যেটি আছে।

ঙ। তার নকলের অংশটা আমার হাতের লেখা,

চ। সেটি আমার দাদার হাতের কারিগরি। তাঁর প্রতি আমাদের ভাইবোনের ভালবাসার নিদর্শন

সে যুগের ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তখন আমাদের নিষ্ঠা

—শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ঃ রবীন্দ্রস্মৃতি

ক। তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলেন যে, প্রমথ যদি একটা কাগজ বের করে তাহ'লে আমি তাতে লিখতে রাজী আছি। আমি বল্লুম—আপনি যদি লেখেন তো আমি কাগজ বের করতে রাজী আছি।

খ। 'মণিলালের' একটি কাগজ ছিল। কথা ঠিক হয় যে, সেই কাগজই সবুজ পত্র নামে

ছাপানো হবে। এই নতুন নাম আমিই দিয়েছিলুম।

—প্রমথ চৌধুরী ঃ আত্মকথা

ক। "[রবীন্দ্রনাথ] বললেন, 'আর কত লিখব? 'লেখা তো লিখেছি ঢের'। তোমার একটা গুণ আছে যে তুমি আমার কাছ থেকে কথা টেনে বের করতে পারো। তাই তোমার কাছে আমি এত বকে যাই।"

খ। "রাণী তো রয়েছে, সেই তো দেখাশোনা করতে পারে"

গ। 'বললেন, "এই জন্যেই তো তোমাকে কাছে রাখতে চাই ; আমাকে এই রকম ক'রে ভরসা দেবে ব'লে। আমি খুশী হবো বলে আমাকে দেখে বললেন,

'এই দেখো তোমার দেওয়া কাপড়ই পরলুম।'

নির্মলকুমারী মহলানবীশ

॥ 'বাইশে শ্রবণ' ॥

[রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন রাঁচি থেকে করাচি, রাণী থেকে কেরাণী তক্ সবাই, মা থেকে সিনেমা কেউ বাদ যায় নি, এই রবীন্দ্রনাথ তেনাদের মতে কে এবং কী, তাই জানাবার মহোচ্ছবযজ্ঞে।]

ক। 'আমার কালের প্রচলন অনুযায়ী মাইকেলকে আমি বর্বর মনে করতেম আর রবি ঠাকুরকে আলোক প্রাপ্ত।"

খ। আশী বছরের দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্যটি আমাকে সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট করে তা তাঁর ব্যালান্স, নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য ও পরিমিতিবোধ (জীবনে ; রচনায় নয়, যেখানে তিনি প্রায়শ প্রগল্ভ)।

—রঞ্জন ঃ দ্বিতীয় মত

সাপ্তাহিক দেশ ঃ 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা' ৬৮

'স্টাইলের দিক থেকে বিচার করলে ইংরিজী গীতাঞ্জলি কখনো নোবেল পুরস্কার পেত না ;....পড়লে মনে হয়, গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত 'গীত'গুলি প্রথমে বাংলাতেই লেখা হয়েছিল ;

—হারীতকৃষ্ণ দেব ঃ রাষ্ট্রভাষা ও
রবীন্দ্রনাথ ঃ দেশ, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী
॥ সংখ্যা ঃ ৬৮ ॥

...তাঁকে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে স্মরণ না করেও আমরা অনুভব করি তাঁরই ভাষা, তাঁরই সুর আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত। আমাদের প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে তিনি স্পন্দমান, তাঁরই আদর্শ-প্রেরণায় আমরা সাধ্যমত উদ্বুদ্ধ।

—শ্রীঅশোক সরকার ঃ
দেশ ঃ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যা ঃ ১৩৬৮

[১ম বর্ষ, সাপ্তাহিক, ১ম সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ, ১৩৬৮]

কালি ও কলম ছেড়ে তেড়ে গেল যবে টলিউড
হিট ছবি করে ভুলে গেলে লেখা ফরগুড্
তখন তোমায় দিচ্ছে সবায় তৈল যা—
আজকে তারা হায় কোথায় জানতে যদি থাকতে সমায়
শৈলজা!

সত্যজিৎ রায়-কৃত STILLBORN 'রবীন্দ্রনাথ'

একটি নিখুঁত খুনের কাহিনী!

যা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই হল, আমার সাত বছরের ছেলে জিজ্ঞেস করে বসল একদিন, বাবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে? সে কি এক রকম ঠাকুর?

বলতে সঙ্কোচ নেই, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার ধারণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ মস্ত কবি ছিলেন, নাচ গান করতেন, দেশের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইত্যাদি মোটামুটি খবর আমার জানা আছে। সরকারী প্রকাশনা রবীন্দ্ররচনাবলী আমিও কিনেছি। সবই ঠিক। কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞেস করে রবীন্দ্রনাথের জীবনী দু'কথায় গুছিয়ে বলতে তাহলে আর আমার মুখে কথা বেরোবে না।

অথচ, আমি জানি রবীন্দ্র-জীবনী নানা আকারে বাজারে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি বা ছেলেবেলা যে আমার বাড়ির আলমারীতেই পাওয়া যাবে না, এমন কথা নয়। তবু রবীন্দ্র-জীবনী ধারাবাহিকভাবে বলে যাওয়া আর যাই হোক আমার কাজ নয়। তাছাড়া, আমার ধারণা যাঁরা সংস্কৃতির কারবার করেন, এটা তাঁদেরই আওতার মধ্যে পড়ে। আমার মত অর্থনীতির ছাত্রের পক্ষে এটা অনধিকারচর্চারই সামিল।

জীবন-স্মৃতি বা ছেলেবেলা থেকে দু'চার পাতা ছেলেকে পড়িয়ে শোনালুম কয়েকদিন। কিন্তু তাতে মন ভরল না। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষার খেলা সাত বছরের ছেলের পক্ষে তারিফ করা ঠিক সম্ভব নয়। হঠাৎ মনে হল, সত্যজিৎ রায়ের ছবিটা দেখালে হয় না?

সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্পর্কে আমার উৎসাহ বাড়ন্ত বলা চলে। সেই যে হুজুগের মাথায় 'পথের পাঁচালী' দেখে বেরিয়ে এসেছিলুম, তারপর সত্যজিৎ রায়ের কোনও বড় বিজ্ঞাপনই আর আমায় আকর্ষণ করেনি। কেন জানি না, এতদিন পর আজ আবার ফাঁদে পা বাড়ালুম।

টাইটেল দেখেই মনটায় খটকা লাগল, বড় বড় করে লেখা Rabindranath Tagore। মনে হল, Tagore কথাটা যেন বেমানান, অতিরিক্ত। রবীন্দ্রনাথ শুধুই রবীন্দ্রনাথ, তাতেই যেন তাঁর পূর্ণ পরিচয়। যাক, ছবি শুরু হল। প্রথমেই কবির জীবনাবসানের ছবি। রবীন্দ্রনাথ অমর, কাজেই প্রথমে মৃত্যু দিয়ে ছবি শুরু করেছেন পরিচালক। ভালই লাগল। পাশ থেকে ছেলে প্রশ্ন করল, কে মরে গেল বাবা? রবীন্দ্রনাথ? এখনই মরে গেল? রাগ হল আমার। দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, বাজে কথা বোল না, দেখ বসে চুপ করে।

ইতিমধ্যে রামমোহন এলেন, দ্বারকানাথ এলেন, দেবেন্দ্রনাথ এলেন..ছেলে খোঁচা দিতে লাগল, বাবা রবীন্দ্রনাথ কই?...সাড়া দিলুম না। সতীদাহের অপ্রাসঙ্গিক বীভৎস ছবিটা দেখে ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, কালীঠাকুর কেন বাবা?

শীগ্‌গিরই বালক রবীন্দ্রনাথ এসে পড়ায় নিশ্চিন্ত হলুম। যাক্ এবার ঠিক রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাবে। কিন্তু অবস্থা হল ঠিক বিপরীত। ছেলের প্রশ্ন আরও তীক্ষ্ণ হতে লাগল, হ্যাঁ বাবা ব্রজেশ্বর কই? শ্যাম কই, যে রবীন্দ্রনাথের চারিদিকে গণ্ডী টেনে দিত?

আশপাশের লোক ছেলের দিকে ফিরে ফিরে দেখছিল। বললুম, যা হচ্ছে চুপ করে দেখ।

কিন্তু কি দেখবে? খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে একবার পুকুর, ইস্কুলের জানলা দিয়ে দুবার আকাশ, আর ডালহৌসী পাহাড়ের একটা লং শটের কেরামতিতেই বালক রবীন্দ্রনাথ খতম। ভাবছিলুম এই বুঝি আরাম করে কিশোরী চাটুজ্জের পাঁচালী শুনব, শ্রীকণ্ঠ সিংহের সেতারের আলাপ মাত করে দেবে, ফেরিওলা হেঁকে যাবে রাস্তায়...। বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর মলাটের ছবিতে বঙ্কিম একবার দেখা দিলেন কিন্তু রমেশ দত্ত এলেন না মালা নিয়ে, মোরান সাহেবের বাগানে সাধনা দেখতে পেলুম না, গঙ্গাব ঘাটে 'বউ ঠাকুরাণী হাটে'র অপূর্ব পরিবেশ ফুটে উঠল না, কারোয়ার উপকূলে লেখা হল না 'প্রকৃতির পরিশোধ'...। জ্ঞানদানন্দিনীর চেহারা-দেখল না কেউ।

যুদ্ধের কতগুলো স্টক্ শটে রবীন্দ্রনাথ ধামাচাপা পড়ে গেলেন। ছেলেও চুপ হয়ে গেছল প্রায়। একবার বাঙালী ছেলের বোমা ছোঁড়ার ছবিটা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠে পুত্রবর বললে, কি বাজে বল দিল ছেলেটা, না বাবা?

খবরের কাগজে হেডিং দেখা গেল যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। কিন্তু কেন পেলেন? গীতাঞ্জলির মলাট দেখা গেল। কিন্তু সেটি কি বস্তু? গান্ধীজীকে দেখা গেল কিন্তু কেন গান্ধীজীর নাম হল মহাত্মা, রবীন্দ্রনাথ কেমন করে হলেন গুরুদেব যেসব কথা পরিচালক জানতে দিলেন না। নেতাজীকে অস্পষ্ট দেখা গেল, কিন্তু পরিচয় হল না ["সেই, ওকি এলো, ওকি এলো না, বোঝা গেল না"] "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো"...শোনালো না কেউ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রধান অধ্যাপকরূপে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ অশ্রুত রয়ে গেল ; অজ্ঞাত রইল শান্তিনিকেতনের জন্ম ইতিহাস।

সহস্রাধিক গানের জন্মদাতা কবিকণ্ঠ মর্মকে স্পর্শ করল না। বাংলা গানে পশ্চিমী সুরের যে সব মিশেল তিনি দিয়েছিলেন তার দুর্বল একটি নমুনা, ততোধিক হাস্যকর এক মার্গীয় সঙ্গীতের নমুনা বোম্বাই সেটের কলাকৌশলে সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞাপনের লে-আউট রেখে গেল পর্দায়। তারপর পর পর পঁচিশখানা রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি তাঁর সমস্ত কাব্যকীর্তিকে ঢেকে দিল পর্দার আড়ালে। আর কানে এসে কেবলই বাজতে লাগল বিকৃত উচ্চারণে ইংরাজী ধারা বিবরণী।

সবশেষে, থিয়েটারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে রবীন্দ্রনাথ কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন, প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলতে লাগলেন, মনে রেখো, মনে রেখো...। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক তা না হলে আশি বছর সাধনার শেষে শুধুই প্রাগু প্রিন্সের ক্যামেরা ট্রিক্সের সাবজেক্ট ম্যাটার হয়ে যেতে হত তাঁকে।

শো ভাঙ্গল। আলো জ্বলতে দেখলুম পাশের চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছে আমার ছেলে। ধমক দিয়ে জাগাতে সে-ই আমায় ধমক দিয়ে উঠল, তুমি একটা মিথ্যুক, তুমি ভারী দুষ্টু। তুমি বলেছিলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক পদ্য লিখেছে, অনেক গান গেয়েছে, কই সেই সব পদ্য? একটুও ভাল না রবীন্দ্রনাথ। অতগুলো লোককে গুলি করে মারছিল, হাত পা ভেঙে দিচ্ছিল, ছোট বাচ্চাটার জন্যে মা কাঁদছিল আর তোমার রবীন্দ্রনাথ পচা পচা ছবি আঁকছিল...বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আমার সাত বছরের ছেলে। আমার মনে পড়ে গেল সাত বছর আগে আমার স্বপ্নের শিশু অপুকে হত্যা হতে দেখে ঠিক এমনই করেই কান্না পেয়েছিল আমার।

ফিরবার সময় ট্রামে বসে বসে অবাক হয়ে ভাবছিলাম কত বড় পরিচালক এই সত্যজিৎ রায়। গোড়াতেই কবির মৃত্যু দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আসলে কবিকে মারবার জন্যেই এই ছবির অবতারণা। পাঁচ হাজার ফুটেও কবিকে অস্ফুট করে রাখার মহান

প্রচেষ্টা মাত্র। লোক যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাতে, আপনার আমার কাছে যদি অপ্রিয় হয়ে যান পরিচালক, যদি তাঁর খ্যাতি মুছে যায়, তাই বুঝি সব শেষে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন—তবু মনে রেখো। কিন্তু যাঁরা এ ছবি দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে কথাটা বলবার সময় ভদ্রলোকের কি কষ্টই হচ্ছিল!

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

শিখ্ খা [য়] বটে!

এক শিখ বিলেতে রোজ তিরিশখানা ব্রেড আর তিরিশ প্লেট মাংস ওড়ায়। একজন সাহেব তাই দেখে আর একজন সাহেবের কাছে গল্প করে। দ্বিতীয় সাহেব অবিশ্বাস করে। বাজি ধরে প্রত্যক্ষদর্শী ; পনের পাউণ্ড,—যদি শিখটা খেতে পারে তবে সে পাবে আর নইলে সে দেবে দ্বিতীয় সাহেবকে।

প্রথম সাহেব শিখকে বলে, 'খাবার খরচা এবং বাজির টাকা দুইই তুমি পাবে। আমাকে কিন্তু ডুবিও না ; এসো ঠিক।' শিখ না এসে ডোবায় না ; বরং বলা চলে, নির্দিষ্ট দিনে শিখটা এসেই ডোবায়। চব্বিশ প্লেটের পর ফাউল কারি আর টানতে পারে না।

দ্বিতীয় সাহেবটা তখন বলে সে এরকম খাওয়াও দেখেনি, তবে যেহেতু তিরিশ প্লেট খাবার কথা সেহেতু বাজির টাকা তাকে দিতেই হবে! প্রথম সাহেব টাকা বের করে দেয়। তারপর শিখকে বলে : 'রোজ তুমি তিরিশ প্লেট মাংস খাও দেখে তবে আমি বাজি ধরেছি ; আজ না খেতে পারার মানে বুঝলাম না—'

'আমিও না' প্রত্যুত্তর করে শিখ প্লাটন, 'এই আধঘণ্টা আগেও আমি একবার ট্রায়াল দিয়েছি ; তখনও তিরিশ প্লেট মাংস ওড়াতে পারলাম। অথচ তার আধঘণ্টা পর, এখন কেন পারলাম না। কি জানি?'

ধনুক থেকে তীর একবার বেরিয়ে গেলে আর কখনো ফেরৎ আসে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে। 'ব্যুমেরাং' কথাটার তাহলে অর্থ হয় না। কথা একবার দিয়ে আর ফেরৎ নেওয়া যায় না—এটাও সচল ছিল শুধু ঋষিদের যুগে, আজ ওর উল্টোটাই সত্যি। একটি জিনিসই শুধু এরকম তুলনায় বলা যেতে পারে ; সে হল, টুথপেস্টের টিউব থেকে টুথপেস্ট একবার বেরিয়ে গেলে তাকে টিউবে আর ঢোকানো সম্ভব নয়। সে চেষ্টা আমি করে দেখেছি।

—সম্পাদক, 'অচলপত্র'

টীকা : যখন দী, কু, সা, এ কথা লিখেছিলেন, তখন টুথপেস্টের টিউব প্লাস্টিকের হত না ; এখন প্লাস্টিক টিউবে পেস্ট চেষ্টা করলে আবার ঢোকানো যায়।

অ.স.স.

।। রেখ মা—ড্যা সে রে মনে ।।

রেখ, মা—ড্যাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, করি যদি অপরাধ,
দুষো না এ বাঙলার রাজনীতি-বিশারদে।
এবারে দৈবের বশে, নাম তারা যদি খসে
নেতৃত্ব-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
দাঁড়ালে হারিতে হবে অজেয় কে কোথা কবে,
জনমত কবে স্থির বল রাজনীতি-নদে?

কিন্তু ভোট পেলে পরে বস্তির ঘরে ঘরে
যেতে পারি ক্রাইসলারে জনতার সুদরদে!
সেই ধন্য নেতৃকুলে ভোটান্তে ভোটারে ভুলে
গদি পেয়ে সেবে যত আত্মীয়স্বজন;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন ভোট যাতে নেতা ডোবে ক্ষমতার মদে।
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ নাহি ধর
লিডার করিয়া মোরে দেহ গদি সুবরদে।

ভোটারের মাথাটিতে চাঁটি মেরে যেন জিতে
এবার বসিতে পারি মাগো যেন মসনদে!

(১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৬৮) হু. ক ।।

জীবনটা গণিতের অঙ্ক নয় ; নাটকের অঙ্ক

।। এক ।।

এক সের লোহা আর এক সের তুলো এর মধ্যে কোনটা ভারী?

মাস্টারের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র বলে ঃ লোহা। ছাত্রের টাক মাথা প্রবীণ পিতা উত্তর শুনে ছেলেকে বলেন ঃ বলেই তো দেওয়া হচ্ছে যে দুটোই এক সের ; তাহলে লোহা ভারী হবে কেন? ছেলে তখন বাপকে দাঁড় করায় এক তলায় ; নিজে উঠে যায় দোতলায়। তারপর বলে, বাবা, প্রথমে তোমার মাথায় এক সের তুলো, পরে এক সের লোহা ফেলবো—। বাবা তখন বাপ্ বাপ্ করে বলে ঃ ফেলতে হবে না ; তোর কথাই ঠিক ; লোহাই ভারী!

।। দুই ।।

সাত আর নয় যোগ করলে অঙ্কের খাতায় ষোল ; কিন্তু জীবনের পাতায় সব সময় নয়। কেউ যদি ষোড়শী বিবাহের বাসনায় সারা গ্রাম টুঁড়ে ষোলো বছরের একটাও মেয়ে না পেয়ে, একটা সাত বছরের, আর, আরেকটা ন'বছরের মেয়ে এই দুজনকে বিয়ে করে আনে তাহলে কি তা ষোড়শী বিবাহের বাসনা মেটাবে?

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

সেকুলার স্টেট নয় ; পেকুলার স্টেট।

—ডি, এল, রায়।

সত্যই আশ্চর্য এক দেশে বাস নয়. উপবাস করছি আমরা অসংখ্য কোটি লোক একদিকে ; অন্যদিকে ক'টি লোক শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে বক্তৃতা দিচ্ছে, ধৈর্য ধর। সত্যই আশ্চর্য এই এক দেশ, যেখানে অসংখ্য বেকার একদিকে ; অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ঝকঝকে নতুন স্ট্রিমলাইন স্টুডিবেকার। আশ্চর্য এক দেশ,—যেখানে নিজেকে হিন্দু বললে অসুবিধা অনন্ত ; হিন্দি বললে কিন্তু সুবিধার অন্ত নেই ; সেকুলার নয়! পেকুলার স্টেট এই India that is Bharat। সেকুলার স্টেটে মাইনরিটি মেজরটির কাছে অনিগৃহীত ; পেকুলার স্টেটে মেজরিটি যেন মাইনরিটির কাছে সর্বদাই অনুগৃহীত!

সেকুলার স্টেটে মুসলমান গুণ্ডার বিচার গুণ্ডা বলে, মুসলমান বলে নয়। হিন্দু গুণ্ডার বিচার হিন্দু বলে নয় ; গুণ্ডা বলেই। কিন্তু পেকুলার স্টেটে তা নয়। এখানে হিন্দু মহাসভা বললেই জাত যায় ; কিন্তু মুসলিম লীগ বললে বজজাত ছাড়া পায়। সেকুলার স্টেটে সব ভাষার এবং সব ভাষাভাষীর সমান সুযোগ ; পেকুলার স্টেটে আসামে বাঙলা বললে বাঙলা ভাষাভাষীদের ভাগ্য গগনে গভীর দুর্যোগ। সেকুলার স্টেটে, সব প্রদেশে সব প্রদেশীর চাকরি করবার অধিকার কেবল অক্ষুণ্ণ নয় ; ন্যূনতম চাকুরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ নয় কোনও মতেই [জামসেদপুর ঃ বিহারী] ; কিন্তু কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডক্টর রায় অসহায়।

সেকুলার স্টেটে নিরক্ষরকে অক্ষর দান, অশিক্ষিতকে শিক্ষা দান, নিম্নশিক্ষিতকে উচ্চশিক্ষা দান এবং উচ্চশিক্ষিতকে বিশ্বশিক্ষার সর্বসুযোগ দানই বিধেয়। পেকুলার স্টেটে বড় কলেজে বড়িয়া পাস না দিলে প্রবেশ নিষেধ ; মামার জোর থাকলে অবশ্য আলাদা কথা ; তখন প্রায় ফেল করা ছাত্রের জন্যে সব চেয়ে বড় কলেজের দরজাও খাইবার পাস! সেকুলার স্টেটে ছাত্রের তৃতীয় শ্রেণীতে পাস অথবা পাস না করতে পারার সব দায় ছাত্রেব নয় ; শিক্ষকেরও। পেকুলার স্টেটে ছাত্ররা কি রকম ভুল শিখেছে খবর কাগজে তাই পড়ে হাসা, হেসে গড়িয়ে পড়াই রেওয়াজ!

সেকুলার স্টেটে সরকারের উচিত নিজে থেকেই সরে আসা দায়িত্ব পালন করতে না পারলে ; এবং বিরোধীদলের কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি না করে দায়িত্ব নিতে পারার যোগ্যতা প্রদর্শন। পেকুলার স্টেটে 'এবছর অনাবৃষ্টি কেন,'—এ প্রশ্নের উত্তরেও সরকার পক্ষে শুনবেন, এর জন্যে দায়ী কম্যুনিস্ট পার্টি ; এবং এবছর অতিবৃষ্টি কেন,—তার কারণ শুনবেন কম্যুনিস্ট পার্টি বুলেটিনে, সরকারি কারসাজি।

সেকুলার স্টেটে জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যকে ভোট দেবার কথা প্রাপ্ত বয়স্কের! পেকুলার স্টেটে অযোগ্যকে ভোট দেবার ব্যবস্থা, বয়সে প্রাপ্ত, বুদ্ধিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের!

সেকুলার স্টেটে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো সাহিত্যিকের প্রথম ও প্রধান কাজ ; কলম যে তলোয়ারের চেয়েও ধারালো তার প্রমাণ দেওয়া। পেকুলার স্টেটে সাহিত্যিকদের একমাত্র কাজ তেল দেওয়া উপযুক্ত পদে যাতে প্রাইজের সিকে বেড়ালের

ভাগ্যেই ছেঁড়ে।

সেকুলার স্টেটে ঘরের লোককে পেট ভরে খেতে, পরতে বা পড়তে দেবার পর তবেই বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করার কথা। পেকুলার স্টেটে আমাদের পান্নালালের ঘরের লোক খেতে পায় না শুনলেই তেতে ওঠা এবং তক্ষুনি বাইরে ছোটাই দস্তুর।

এই সেকুলার স্টেট চালু হবার আগে আমরা শুনেছিলাম যে, কালো বাজারিকে সবচেয়ে কাছের ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দেওয়া হবে ; পেকুলার স্টেটে এখন দেখছি ল্যাম্পপোস্ট তুলে দেওয়া হচ্ছে যাতে তার অভাবেই কালোবাজারিদের ফাঁসি দেওয়া না যায় আর।

সেকুলার স্টেটে সকলের জন্যে এক আইন : পেকুলার স্টেটে বোম্বাই মহারাষ্ট্রের জন্যে এক, দার্জিলিংয়ের নেপালী পাহাড়ীদের জন্যে অন্য, কাছাড়ে বাঙালীদের জন্যে সম্পূর্ণ আরেক আইন।

সেকুলার স্টেটে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় আয়কর মারফৎ প্রত্যেক প্রদেশে সমান ব্যয় করার দায়িত্ব ; পেকুলার স্টেটে,—বাঙলাদেশ থেকে আয় কর বেশি, কিন্তু ব্যয় কর সবচেয়ে কম,—কেন্দ্রীয় পলিসি।

চৌষট্টি বৎসরের রক্তাক্ত সংগ্রাম—অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হবার মুহূর্তে,—গদির লোভে, গদার প্রলোভনে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাবকে অপূর্ব বিশ্বাসঘাতকায় বলিদানের বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভের দুঃসময়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি,—উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব সরকারের,—সেকুলার স্টেট আজ পেকুলার স্টেটে দাঁড়াবার পর দেখছি সে প্রতিশ্রুতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি নেই। উদ্বাস্তুরা গলগ্রহ ; একবার এ প্রদেশের আর একবার ওপ্রদেশের লাথি ঝাঁটা, এঁটোপাতা চেটে বেড়াবার মর্মাতিগ দৃশ্য অবলোকন করছি আমরা যারা,—তারা শুনছে যে এত বড় উদ্বাস্তু সমস্যা পৃথিবীর আর কোনও রাষ্ট্রকে বহন করতে হয়নি কখনও। যারা বলছে সেই বাস্তুঘুঘুদের, কেউ একথাটা শোনাচ্ছে না, উদ্বাস্তুদের হয়ে, যে, জাতির জনক এই অঙ্গচ্ছেদে রাজি ছিলেন না ; কেউ একথাটাও একবার বলছে না যে, অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা অর্জন করত কংগ্রেসের অভিনেতৃত্ব ছাড়াই আর কয়েকদিনের মধ্যেই ; জার্মান এবং জাপানী গুঁতোর চোটে ব্রিটিশ সিংহ বাবা, বাবা বলছিল এমনিতেই ; নেতাজীর ঘা মণিপুরে এসে পড়তেই, ব্রিটিশ সিংহ যখন আবার পুনর্মূষিক হবার লগ্ন আগতপ্রায় তখনই দেশভাগ করে যাতে নিজেদের মধ্যে সব পদগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় তারই জন্যে যে এই তাড়াহুড়ো এবং তারই ফলে দুরারোগ্য উদ্বাস্তু—ক্যান্সারের সৃষ্টি যে একথাও শুনছি না প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে যারা আজ কাঁদছে তাদের কারুর মুখে!

সেকুলার স্টেট হলে ভারত দ্যাট ইস ইণ্ডিয়া, কেবল রাণীর জন্যে আলো জ্বালত না ; পেকুলার স্টেট বলেই এখানে রাণীর জন্যে আলোর মালা ; কিন্তু কেরানীর ঘরে এখনও শুধুই আঁধারের রূপ!

সেকুলার স্টেটে কারুর জন্যে কারুর অসুবিধা হবার কথা নয়। পেকুলার স্টেটে রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে, প্রধান মন্ত্রী ভায়া সরকারি চুনো পুঁটিদের আগে যাবার জন্যে, সর্বাগ্রে পাবলিককে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, যানবাহন রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সেকুলার স্টেট হবার আগে গান্ধী বলেছিলেন রাষ্ট্রপতির বাসা হবে দরিদ্র ভারতের প্রতীক চারখানা ঘরে ; পেকুলার স্টেটে পৃথিবীর সবচেয়ে আলো ঝলমল প্রাসাদের পাশে দাঁড়াতে পারে এমন পর্ণকুটীরে (!) বাস করেন এমন এক রাষ্ট্রের প্রতীক, যে রাষ্ট্রের একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জনেরও বেশি লোক, একখানা ঘরে দশজন করে, পশুর

অধম অবস্থায় খোঁয়াড়ে উপবাস করে দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোথায় নয়?

সেকুলার স্টেটের আদর্শ হওয়ার কথা, বন্দীর নিরপেক্ষ বিচার ঃ পেকুলার স্টেটে, বিচার ছাড়াই বন্দী করার ব্যবস্থা,—পি ভি এ্যাক্টের অকল্যাণে।

এহ বাহ্য। অতীত ভারতে একদিন চুরি করলে শূলে চড়তে হত। সাহেবদের ভারতেও দেখেছি, চুরি করলে জেল খাটতে ; মোসাহেবদের ইণ্ডিয়া দ্যাট ইস ভারতে দেখছি আজ, পরাধীন ভারতবর্ষে যারা একদিন জেল খেটেছে, স্বাধীন ভারতে তারাই আজ চুরি করছে!

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

[১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৮]

বৈরাগ্য ॥

কহিল গভীর রাত্রে সাহিত্য বিরাগী
"দিল্লী যাবো পুরস্কার খেতাবের লাগি
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে বাংলায়?"
সাহিত্য কহিলা "আমি" শুনিতে না চায়।
দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ, কলম টেবিলে
কাগজের সাথে সুখে ঘুমাইছে মিলে।
কহিল "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?"
সাহিত্য কহিলা, "আমি"।—কেহ শুনিল না।
বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে বলে, "কোথা প্রভু?"'
প্রভু বলে "আমি দিল্লী, পুরিবে না কভু
বাঞ্ছা তব—যদি মোরে তেল নাহি দাও,
(জেনো) সাহিত্যিক হওয়া যায় সাহিত্য ছাড়াও।"

সাহিত্য নিঃশ্বাস দীর্ঘ ছাড়ি বলে "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত দিল্লী চলে যায়।"

অরুণা কর

"May you my son! grow up
dumb and stupid,
And free from Calamities,
end up as a premier."

–The Gay Genius

লেফট রাইট লেফট রাইট

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

সকাল দশটার স্টেটবাস।। অর্থাৎ যখন তার গায়ে সেই অলিখিত নির্দেশ ঝোলে ঃ ৩২ জন বসিবেক। ৬৪ জন দাঁড়াইবেক! ১২৮ জন বেঁকিয়া দাঁড়াইবেক! এবং ২৫৬ জন ঝুলিবেক! সেই অফিসযাত্রী স্টেটবাসে মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি, কে যেন কাকে বলছে, জানিস যতীনের ডান হাত কাটা গেছে এক্সিডেন্টে? যার উদ্দেশে বলা এবার তার কণ্ঠস্বর কানে বাজে নেপথ্য থেকে ঃ ইস্ ডান হাত? কি করবে যতীন তাহলে এখন? উত্তর, লেফটিস্ট্ হবে!

নিষ্ঠুর উক্তি হলেও কথাটা সত্য। আমাদের এই দেশে যাদের ডান হাত দুর্ভাগ্যবশতঃ কাটা গেছে, অর্থাৎ কোনও কারণে যাদের কক্ষে জোটেনি দক্ষিণে তারাই বামপন্থী হয়েছে। হতেই হয়েছে বাধ্য হয়ে। আমাদের সরকারই যে কেবল অপদার্থ তা নয় ; আমাদের বিরোধী দলও সমান অপারচুনিস্ট, এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান ট্র্যাজেডির মূর্তিমান কারণ। আমাদের কংগ্রেস আসলে ডিসগ্রেস ; কিন্তু আমাদের কম্যুনিস্টও আমাদের কম অনিষ্টের নয় কিছু। আমাদের ডানে এবং বাঁয়ে, লেফট এবং রাইটে রাইট এণ্ড লেফট্ চুরির প্রবৃত্তিই আমাদের পেশাদার রাজনীতিকদের প্রথম ও প্রধান বৃত্তি। আমাদের ডাঙায় বাঘ ; জলে কুমীর। দক্ষিণে কংগ্রেস ; বামে কম্যুনিস্ট। কংগ্রেস থেকে কম্যুনিস্টদের দিকেই আমাদের ঝোঁক ক্রমশঃ বাড়ছে। যদি কংগ্রেস সরকার থেকে কম্যুনিস্ট সরকারের হাতে আমরা যাই কখনও, যদি সেই দুর্ভাগ্য সত্যি সত্যি কখনও আমাদের কপালে হয় তাহলে মাত্র সেইদিনই আমরা বুঝব, From frying pan to fire-এর খাঁটি বঙ্গানুবাদ হচ্ছে, সিপাইয়ের হাত থেকে C.P.I.-এর কবলে পড়া।

কংগ্রেসী রাজত্বে অনেকেই সৎ নয় ; কম্যুনিস্ট রাজত্বেও বেশীর ভাগ হবে অসৎ। কংগ্রেস রাজত্বে তবু দর্পণে মাঝে মাঝে চোরদের স্বরূপ উদঘাটন করে দেখানো যাচ্ছে ; কম্যুনিস্ট রাজত্বে জোচ্চরদের ছবি দেখাবার দর্প করলে কম্যুনিস্ট মধুসূদন কেবল সেই দর্প নয়, দর্পণও ভেঙে চুরমার করে দেবে যে, সে বিষয়ে যার এখনও সন্দেহ আছে সে ব্যক্তি ভারতীয় হলেও তার নাম রিপভ্যান উইঙ্কল!

কংগ্রেস কম্যুনিস্ট ছাড়া দেশে আর যে সব দল আছে তারা কেউ পলিটিক্যাল পার্টি নয় ; সব সার্কাস পার্টি। তাই তাদের কথা থাক।

যখনই রাস্তায় মিছিল দেখি অথবা দেখতে পাই না তখনই বা তখনও শুনি ঃ কংগ্রেসকে পরাস্ত কর। আর নয় কম্যুনিস্টকে পরাস্ত কর। কেন? একথা কখনই শুনি না কেন যে, অন্যায়কে পরাস্ত কর। কংগ্রেস অন্যায় করলে তা ন্যায় নয় ; কিন্তু কম্যুনিস্টরা অন্যায় করলে তা ন্যায়,—ন্যায় শাস্ত্রর নামে এই অন্যায় শাস্ত্র ভারতীয় নয় ; হয় ম্যারিকান নয় রাশ্যান। কেন এই স্লোগান তা আমি জানি। স্লোগান নয়, আসলে এই মেসিনগান, প্রচারের এই মেসিনই বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় SIN ; অসভ্যতার অবসিন আসলে। লোককে চিরকাল এই ভাঁওতায় ভোলানো সহজ। Islam in danger কথাটা চালু বটে কিন্তু কংগ্রেস ইন ডেঞ্জার, কম্যুনিস্ট ইন ডেঞ্জারও শেষ পর্যন্ত ওই দুই দলেরই অশেষ অস্ত্র।

আজ নয়। রাজারা একদিন প্রজাদের ভগবানের নামে দুয়েছে। পুরোহিত সেই পুরো

অহিতকার্যে রাজাদের প্রধান সহায় হয়েছে। আজ রাজার বদলে এসেছে গজারা। ধর্মের বদলে ধর্মঘটের নামে, নরবলির বদলে বানরবলি দেবার কাজে তাদের সহায় হচ্ছে নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতিজ্ঞরা। জনগণ সেদিনও যেমন আজও তেমনই অসহায়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধত সেকালে ; প্রাণ যেত উলুখড়ের। এযুগে ইস্‌মে-ইস্‌মে বিবাদ ; তার জন্যে পরস্পরকে খুন করতে উদ্যত, পরস্পরের বিরুদ্ধে যাদের ব্যক্তিগত কণামাত্র অভিযোগও নেই! অথচ রাশ্যায় বাস করে ম্যারিকার নাম নিলে আজ, হয় তার পরিণতি হয় রেরিয়া, নয় সাইবেরিয়া! ম্যারিকায় বলে রাশ্যার দিকে তাকালে, আরাম-চেয়ার থেকে ইলেকট্রিক চেয়ার তৎক্ষণাৎ ; তদ্দণ্ডেই প্রাণদণ্ড!

দেশ বলে আজ কিছু নেই ; আজ কেবল 'Ism'-এর বেনামে বিদ্বেষ!

সেই বিদ্বেষের ছায়া আজ আমাদের দেশেও কায়ারূপ ধরে অপরূপ মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই এই বিদ্বেষের প্রথম পদধ্বনি শ্রুত হয়েছিল বহুদূর থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই তার দাপাদাপি এখন ঘরে বাইরে সমান সরব। এবং আমরা কেউ আর কেবল ভারতীয়, জার্মান, রাশ্যান, ম্যারিকান বা ইংলিশম্যান নই। আমরা Man-ই থাকতে চাইছি না আর। আমরা কেউ সোস্যালিস্ট, কেউ কম্যুনিস্ট, কেউ ক্যাপিটালিস্ট, কেউ ইম্‌পিরিয়ালিস্ট ; কেউ হিউম্যনিস্ট, কেউ র‍্যাডিক্যালিস্ট, অথবা আমরা সবাই অপারচুনিস্ট।

সাধারণ মানুষ কোনও কালেই মানুষ হয়নি বলেই অসাধারণ মানুষ তাদের 'দুয়ে দুয়ে সব দুধটুকু' নিতে পেরেছে ; সাধারণের জন্যে [আঁখি]-নীর এবং অসাধারণদের জন্যে কেবল ক্ষীর,—চিরকালের ইতিহাসই এই।

মানুষ আমরা নহি তো মেষ, এ তো নিছক কবিকল্পনা। পাঁচশালার পরিকল্পনা। গুঁতোয় আমরা আর মানুষ নেই ; আমরা সবাই মেষ না। মেষও নই। মেষের চেয়েও অধম ; আমরা Mass।

এই Mass-এর হাড়মাস নিয়েই যুগে যুগে যা হয়েছে তারই নাম ম্যাসাকার! কখনও নেপোলিওঁর, কখনও হিটলারের, কখনও স্তালিনের অভি-নেতৃত্বে! কখনও কুরুক্ষেত্রে, কখনও বার্লিনে সেই পুনরাবৃত্তিরই পূর্বাভাস!—

ফুটবল খেলায় যেমন আজকে খেলা দেখবার জন্যে আর কেউ যায় না ; মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল কে লিগ নেয় [বাঙলার প্রিয়দল মোহনবাগানে এবার অবাঙালী খেলোয়াড় সংখ্যায় কম নয় ; যদিও এই পদ্ধতির প্রবর্তক কিন্তু বাঙালদের প্রিয়দল ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কীর্তি]—এই হচ্ছে যেমন ফুটবল খেলার মাঠে একমাত্র দ্রষ্টব্য, তেমনই পলিটিক্যাল খেলার মাঠে, কংগ্রেস না কম্যুনিস্ট, কে সিট নেবে তাই একমাত্র কৌতূহলের বিষয়। এই দলের কারুর প্রতিই লোকের, এমন কি স্ত্রীলোকেরও শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধা নেই তার কারণ, দেশ-এর চেয়ে এই দুয়ের কাছেই দল বড়। কম্যুনিস্টদের নামে এবং বেনামে যারা আছে তাদের একমাত্র লক্ষ্য গদি এবং গদা। ছলে, বলে, কৌশলে একবার POWER পাওয়ার সুযোগ খালি। তারপর কংগ্রেস এখনও বলতে দিচ্ছে তবু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে. এরা ভাবতেও দেয় না। কংগ্রেসের কাছেও দেশ-এর চেয়ে বড় আজ উদ্দেশ্য। যেনতেন উপায়েন গদা হাতে গদি রক্ষা আজ কংগ্রেসের কাছে বাঙালীকে রক্ষা করার চেয়েও অনেক বড় আত্মরক্ষা। ফলে যেই জিতুক ASHES কিন্তু ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো জনতার। কারণ কংগ্রেসও জানে, কম্যুনিস্টদেরও অজানা নয় যে, জনতা মানেই ASSES।

তবু ভোট, নাকি ভেট, দিতেই হবে! যেমন, খেলা যাই হোক, তবু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা হলেই মাঠ ভেঙে জুটতে হবে। তেমনই লাভ যাই হোক, কংগ্রেস কম্যুনিস্ট গদি যুদ্ধে, গদানন্দের সদাদ্বন্দ্বে আমাদের মাততেই হবে। কারণ আমাদের বয়স একুশ ; বুদ্ধি যতই

নাবালিকা হক, আমরা প্রাপ্তবয়স্ক। ভেট দিতেই হবে আমাদের। আমাদের মধ্যে যারা ফ্রাস্ট্রেটেড, যারা কংগ্রেসে অথবা কালোবাজারে সুবিধে করতে পারেনি তারা দেবে কম্যুদের ভেট। কারণ আমাদের মধ্যেও আবার মনের ভাবখানা হচ্ছে, কংগ্রেসের চেয়ে আর এমন কি খারাপ হবে কম্যুনিস্টরাজ। অভাবখানা থেকেই জাত এই বজ্জাত ভাবখানা। কম্যুনিস্টদের প্রতি শ্রদ্ধায় নয় ; কংগ্রেসের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধায় আজ বিধি বাম। তুলনা? অতুলনীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর। একদিন কংগ্রেসের হয়ে ল্যাম্পপোস্ট দাঁড়ালেও জিততো সে-ই ভোটযুদ্ধে : আজ কোলকাতায় কোথাও কোথাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় সেই জেতে, ল্যাম্পপোস্ট অথবা সিদ্ধার্থশঙ্কর যেই দাঁড়ায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সেই বাজি মারে!

আবার আমাদের মধ্যে যারা পার্মিটটা, চাকরিটা, অথবা এট-ওটা-সেটার আশা রাখে তারা কংগ্রেসকে ভেট দেয়ই এবং দেবেই। তাছাড়া নিদারুণ ঘুস, চুরি, জোচ্চুরি সত্ত্বেও এখনও সম্পূর্ণ অরাজকতার বাকী আছে তবুও। এখনও ট্রাম-বাস চলছে, আলো জ্বলছে, নিভছে, জ্বলছে, দশটা-পাঁচটা করা যাচ্ছে, কম্যুনিস্ট রাজত্ব হলে হয়ত অনেক দূর গতি হবে তার, আরও অনেকতর 'দুর্গতি' অবশ্যাম্ভাবী হবে সেদিন। অর্থাৎ কম্যুনিস্টকে যারা ভেট দিচ্ছে না তারা কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসের জন্যে নয় ; কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে চরম বিশ্বাসঘাতকতার আশা রাখে বলেই। কংগ্রেসকে ভেট দেয় কিংবা দেবেই তারা ; এবং কম্যুনিস্টকে ভেট দিচ্ছে না এবং কিছুতেই দেবেও না তারা! আসামে বঙ্গ নিধনের পরেও না ; বেরুবাড়ি খয়রাতি করবার পরেও না।

একদিন রক্ত দিয়ে, জেলে গিয়ে, ফাঁসীর মঞ্চে উঠে, দ্বীপান্তরের অন্ধকারে রাত্রির তপস্যায় আজ যারা এনেছে কংগ্রেসের 'দিন'—আজ তাদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। না, নেহরুর পাশে ; না, ডক্টর রায়ের আশেপাশে কোথাও। এবং সারা ভারতে সব চেয়ে বেশি দিয়ে সব চেয়ে কম যারা পেল তারা বাঙালী! কম্যুনিস্টদের জন্যেও যারা রক্ত দিচ্ছে, গুলি খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে, কম্যুনিস্ট পার্টি যেদিন তক্‌তে বসবে, মাথায় তাজ পরবে, যদি বসে কোনও দিন, পরে কোনও দিন, সেদিনও আজকের রাত্রির তপস্যায় যারা আনবে কম্যুনিষ্টদের 'দিন' এবং আমাদের দুর্দিন, সেদিনও তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। না, সেদিনকার ডাঙের পাশে ; না, ডক্টর জ্যোতি বসুর পাশে। এবং সেদিনও সারা ভারতে সব চেয়ে বেশি যারা দিয়ে সবচেয়ে কম পাবে তারা বাঙালী [বাঙালী নামও থাকবে না সেদিন বাঙালীর ; তাদের নতুন নাম হবে কাঙালী]!

এই এক জায়গায় কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্টে আশ্চর্য মিল। এই এক নাম,—বাঙালী, শুনলেই সাহেবদের হৃৎকম্প হতো : আর এখন?

মোসাহেবদের নিশীথ রাত্রির নিদ্রাভঙ্গ হয় এখনও।

বাঙালীকে হাতে মারো, ভাতে মারো! দিনে মারো, রাতে মারো! যাতে পারো তাতে মারো,—এই হচ্ছে কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্টদের একমাত্র বন্ধনের সূত্র।

এই জট থেকে, এই জুটি থেকে মুক্তির জন্যে, বাঙালীর জন্যে তৃতীয় দল ! সেই তৃতীয় দল প্রথমে বাঙালীর কথা বলবে ; তারপর বলবে ভারতের কথা। কারণ BENGAL suffers to day for what India did yesterday একথা তিনিই আজ বলতেন যে মহৎ অবাঙালী একদিন একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি যে, BENGAL thinks TODAY what India thinks TOMORROW.

সেই তৃতীয় দল আজও আসেনি ; কিন্তু তারা আসবে। আমরা অপেক্ষা করে আছি ; আমরা অপেক্ষা করব।

[১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৭ভাদ্র, ১৩৬৮]

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব আছে ছাই-পাঁশ
তা সবে (চালাক আমি অবহেলা করি)
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু তালাশ
বিদেশী সাহিত্য যাহা স্বভাষে আবরি'
স্বকীয় রচনা বলে ঘুরাইব ছড়ি,
পদ্যকার রূপে করি আত্ম পরকাশ
সৌরকরোজ্জ্বল মোর প্রতিভারে ধরি',
হস্তিযূথে পদ্মবন করি সর্বনাশ।

স্বপনে রবীন্দ্রনাথ কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা খ্যাতিমান হতে চাস যদি
বাহিরে খ্যাতিতে মোর কালি ঢেলে ঘরে
আপনারে বল্ শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-দরদী।"

পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম হালে
সুধীভোগ্য বোদ্‌লেয়ার র‍্যাঁবো বৃদ্ধকালে।।

বু.ব.

[১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ভদ্র, ১৩৬৮]



—এই দেখ ভাই, আমার মীনু, শিব পুজো করে শিবের মতো বর পেয়েছে...

তৃতীয় দল চাই!

চার্বাক

সোসাইটিতে যেমন ককটেল পার্টি, দেশে তেমনই পলিটিক্যাল পার্টি। একটা সেন্সবিহীন উন্মত্ততা, অন্যটা কনসেন্স-বিহীন প্রমত্ততা।

এগুলি শুষ্ক ও অনর্থক প্রথা বই নয়। তবু এগুলো আরও কিছুদিন থাকবে, শুধু প্রথা হিসাবে আরও কিছুদিন বাঁচবে ককটেল এবং পলিটিক্যাল পার্টি ; ক্রমে ছিঁড়ে আসা পোশাক পরা, জুতোর বদলে খালি পা, সাটিনের বদলে প্লাস্তিক-লাঞ্ছিত, জীর্ণ শীর্ণ ব্যাণ্ড পার্টি যেমন টিকে আছে এখনও হ্যারিসন রোডের সি-আই-টি-ভাঙা বস্তিতে বিউগল টাঙানো দুটি চারটি ঘরে।

আর যতদিন পার্টি আছে, ততদিন পার্টি দিয়েই করতে হবে পার্টির প্রতিবাদ ; কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যেমন, গরুর গাড়িতে গরুর চামড়া ঢোলাই করা যেমন, যেমন ফিন্যান্স কমিশনের বাঙালী চেয়ারম্যানকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে প্রবঞ্চনা।

অর্থাৎ পার্টি-আশ্রিত রাজনীতির সর্বনাশ থেকে সমূহ উদ্ধার পেতে হলে বাঙালীরও একটি অস্থায়ী পার্টি প্রয়োজন। অস্থায়ী, কারণ এ চিকিৎসা শুধুই অন্তর্বর্তী কালের জন্য। বাঙালীর জাতীয় মুক্তি, বাংলার আত্মার প্রকৃত স্ফূর্তি শেষ পর্যন্ত পার্টির হাতে আসতে পারে না, কোন জাতিরই না। বোনাপার্টি যেমন ফ্রান্সে, পার্টি তেমনই সর্বদেশে শুধু সঙ্কট-সমুদ্র-উত্তরণের ভেলা মাত্র, তাতে চড়ে প্রকৃত মুক্তির সুমেরুতুঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কিন্তু সে কথার আলোচনা ভবিষ্যতে করব।

অস্থায়ী পার্টি কিন্তু দুর্বল পার্টি নয়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।' অক্ষম নায়ক কেন, অশক্ত ভিলেন নিয়েও মহাকাব্য রচিত হয় না। কার্ল মার্কস্—রাজনীতির অশিক্ষিত মূঢ়তার জগতে যিনি প্রথমতম, হয়ত বা একতম, দার্শনিক-স্টেটের উচ্ছেদ ঘোষণার সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন প্রচণ্ড স্টেট মেশিনারিও প্রেসক্রিপশন করেছিলেন যেমন, তেমনই পার্টি উত্তীর্ণ রাজনীতির প্রশস্ত রাজপথে পৌঁছবার জন্য বাঙালীকে সম্প্রতি এমন এক প্রচণ্ড প্রবল, দুর্দণ্ড-দুর্বার পার্টি গড়ে তুলতে হবে, প্রয়োজনের সম্মুখে দাঁড়াবার প্রয়োজন হলে যে হতে পারবে বিশ্বের বিস্ময়।

আমাদের প্রস্তাবিত, আমাদের স্বপ্ন-দৃষ্ট, আমাদের সঙ্কল্পে ও প্রচেষ্টায় আসন্ন-সম্ভব থার্ড পার্টির এই হল ভূমিকা। তৃতীয় পাণ্ডবের মত শুধুই জন্মমুহূর্তের পূর্বাপর্যে এ দল তৃতীয় দল, নূতন মহাভারতের মহাকাব্যে—ইতিহাস সপ্রমাণ করবে—তৃতীয় পাণ্ডবেরই মত নেতৃত্বে এরই হাতে। তৃতীয় নয়, এই প্রথম, সর্বাগ্রগণ্য।

॥ দুই ॥

প্রথম পার্টি, বয়স ও স্ফীতি উভয় নিরিখে প্রথম পার্টি, নিঃসন্দেহ কংগ্রেস ; যার গত দুই দশকের কার্যকলাপ দেখে ভারতীয় রাজনীতির সকল pros and cons বিচার করে স্বীকার করতেই হয় pro এবং con দুই ; একান্তই বিপরীতধর্মী, progress এবং congress যেমন। ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে যোগ দিলে যেমন পরীক্ষায় গ্রেস প্রতিশ্রুত, তারও চেয়ে নিশ্চিন্ত ফলশ্রুতি ন্যাশনাল কংগ্রেস কোরে যোগ দিলে ইলেকশনে গ্রেস

পাবার। যদিচ সে গ্রেস অনেক সময় ডিস্‌গ্রেসকে পরিস্ফুট করে মাত্র।

একদল কর্তাভজা সর্বদেশে সর্বকালে থাকে যারা সমকালীন কর্তৃত্বের মূর্তিপূজা ভিন্ন অপর ধর্মে অজ্ঞ ঃ এদেশে এরা এককালে ইংরেজকে, পরবর্তীকালে মুসলিম লীগকে, সম্প্রতি কংগ্রেসকে পিতা এবং পরিত্রাতা-জ্ঞানে প্রতিমুহূর্তে প্রণিপাত করে চলেছে। যদি আগামীকাল কম্যুনিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয় দেশে অথবা মনে করা যাক একদল ছুঁচো হঠাৎ প্রকৃতির খেয়ালে শক্তিমত্ত হয়ে দেশের শাসনকর্তৃত্ব অধিকার করল তবে সেই কম্যুনিস্ট দল অথবা ছুঁচোর দলকেও এরা সমান আগ্রহে পাদ্য-অর্ঘ্য দান করবে। কিন্তু কংগ্রেসের আধিপত্য শুধুমাত্র সেই কর্তাভজাদের জন্যেই তো নয়।

কংগ্রেসের আধিপত্য প্রধানত আমাদের জন্য, যে--আমরা congress-কে progress-এর বিপরীত ও disgrace-এর সমার্থক শব্দ বলে জানি।

কেন এই বিমূঢ় নিষ্ক্রিয়তা?

কারণ আমরা অপরিচিত শয়তানের ভয়ে শঙ্কিত। তাই Known Devil কংগ্রেসকে ছাড়া কাউকে ভোট দিতে আমাদের হাত কাঁপে, উপনির্বাচনের বি-ডিভিশন লীগের খেলায় ছাড়া ভরসা করে আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করি না। "কংগ্রেস প্রণিপাত" ধ্বনি যদি না-ও বা তুলি, কংগ্রেস নিপাত" ধ্বনি তুলতেও পুরো ভরসা খুঁজে পাই না কিছুতেই।

কিন্তু এতদিনে কি বাঙালী বুঝতে পারেনি, যাকে পরিচিত শয়তান বলে নিশ্চিত হয়েছিল সে এতদিন, তার কতটুকু শয়তানি তার সত্যই পরিচিত? ভীমকায় আইস্‌বর্গের মত তার শয়তানির এক-দশমাংশ মাত্র দৃশ্যমান, বাকী নয়-দশমাংশ শুধু যথাকালে পরিচয়িতব্য--বাংলার জাতীয় টাইটানিকে মর্মঘাতী শেষ মর্মাঘাত পেয়েও কি বঙ্গদেশ কংগ্রেসকে চিনতে পারেনি?

সম্ভবত চিনতে শুরু করেছে।

তাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বাংলার জাতীয় দল নয়, সে নয় বাঙালীর জাতীয় আশার প্রতীক, আকাঙ্ক্ষার প্রতিশ্রুতি। যদিও সে বাংলার রক্তের সৃষ্টি, যেমন ভারতবর্ষও সৃষ্ট বাঙালীর রক্তাক্ত স্বপ্নে।

'যাও লক্ষ্মী অমরায়, যাও লক্ষ্মী অলকায়।' কংগ্রেস যাও উত্তর প্রদেশে, বিহারে, কংগ্রেস যাও কেরল কিংবা আসামে। এসো না এসো না এ দীনজন কুটিরে। বাংলায় এসো না আর।

যে অর্থে কংগ্রেস প্রথম পার্টি, কম্যুনিস্ট দ্বিতীয় পার্টি তার চেয়ে ভিন্নতর অর্থে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের মূল সূত্র অনুযায়ী, কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসীন হওয়া মাত্র. পরিণত হয় অদ্বিতীয় পার্টিতে, একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। তাই যতদিন সে ক্ষমতা হাতে না পাচ্ছে, হতে না পারছে অদ্বিতীয়, ততদিন তাকে হতেই হবে অনদ্বিতীয়, ব্যাকরণ অনুযায়ী যার অর্থ দ্বিতীয়, পার্টি। পঞ্চমবার বিয়ে করতে যাওয়া কুলীন পাত্র যেমন দোজবর মাত্র, প্রথম বিবাহোত্তর ডাইভোর্স-অতিক্রান্ত সকল বিবাহই যেমন দ্বিতীয় বিবাহ, কম্যুনিস্ট পার্টি তেমন সেকেণ্ড পার্টি অর্থাৎ সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পার্টি।

কিন্তু বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে, কম্যুনিস্ট পার্টি সম্ভবত আয়তনেও দ্বিতীয়, কংগ্রেসের পরেই তার স্থান। কলকাতার পরেই যেমন আসানসোল দ্বিতীয় নগর ; রবীন্দ্রনাথের পরেই যেমন বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন দত্ত বা প্রেমেন্দ্র মিত্র বা কৃষ্ণধন দে দ্বিতীয় কবি ; টাকার পরেই যেমন নয়া পয়সা মুদ্রার দ্বিতীয় একক ; চার্লিচ্যাপলিনের পরেই যেমন সত্যজিৎ রায় দ্বিতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ; সত্যজিতের পরেই যেমন দ্বিজেন দত্ত দ্বিতীয় প্রচারবিদ ; দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের পরেই নারায়ণ দাশ শর্মা যেমন--অচলপত্রের দ্বিতীয় লেখক ;

কংগ্রেসের পরেই কম্যুনিস্ট পার্টি তেমন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পার্টি।

কম্যুনিস্ট ও তার উপগ্রহ পার্টিগুলি সম্পর্কে সুষ্ঠু আলোচনা পৃথক প্রবন্ধের পরিসর দাবী করে ; সে আলোচনার সূত্রপাত মাত্র এখানে করে লাভ নেই। পশ্চিমবঙ্গ ও জাতি হিসাবে বাঙালীর পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, যে-দলের অধিনায়ক বাঙালী হয়ে (এবং পেশাদার রাজনীতিক হয়ে) বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতে হাস্যকর উচ্চারণে বারংবার ব্যাহত হয়, সে দলের বাঙালীর জন্য কুম্ভীরাশ্রুপাত সন্দেহের বস্তু।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে প্রশ্নটিতে অন্য এক কোণ থেকে আলোকপাত করা সহজতর হবে। কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট উভয় পার্টির ভূমিকা ভারতীয় দল হিসাবে, বাংলার পার্টি হিসাবে নয়। ফলে, অপর সকল জটিলতার এবং কুটিলতার দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখেও (সেরূপ দৃষ্টিপাত আমরা অচিরেই করবার আশা রাখি) একথা বুঝতে কোন বির্তকের প্রয়োজন থাকে না যে বাংলার স্বার্থ ও অন্য যে কোন রাজ্যের স্বার্থ নিয়ে আপাত বিরোধ দেখা দিলে সর্বভারতীয় পার্টি হিসাবে এদের পক্ষে সৎ-চিন্তা ও সত্যভাষণ পর্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। তখন এদের আত্মা দ্বিধাবিভক্ত হয়, এদের ভাষা ও কর্ম হয় খণ্ডিত।

আসামের রক্ত-আলোকে এই পুরাতন সত্য আর এক বার উদ্ভাসিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও অসংখ্যবার হবে।

॥ তিন ॥

উপরের পরিচ্ছেদে বাংলার স্বার্থ ও অপর রাজ্যের স্বার্থের বিরোধকে আমি আপাতবিরোধ বলেছি। কারণ বাংলার স্বার্থেই সমগ্র ভারতের স্বার্থ নিহিত। যেমন, ভারতের স্বার্থে প্রাচ্যভূমির। এবং রবীন্দ্রনাথ সাক্ষী, প্রাচ্যের স্বার্থে সমগ্র বিশ্বের, তাবৎ মানুষ জাতির।

কেননা, 'স্বার্থ' শব্দটি আমি এখানে মহত্তর অর্থে প্রয়োগ করেছি।

এই স্বার্থ সঙ্কীর্ণ selfishness নয় ; বাংলার স্বার্থ মানে বাংলার স্বকীয় অর্থ, বঙ্গদেশের মৃত্যোত্তীর্ণ তাৎপর্য। ভারতবর্ষ শব্দটিই নিরর্থক যদি বাংলার ও বাঙালীর নিজস্ব অর্থ পূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত না হয় ; শুধু বাংলায় নয়, পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল—বঙ্গ প্রত্যেকটি পৃথক অস্তিত্বের পৃথক তাৎপর্য আছে, রয়েছে পৃথক পৃথক বর্ণসুষমা ; সেই বর্ণালী সংশ্লিষ্ট হলে মহাভারতের মহান শুভ্র ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাসিত হয়, আবার বিশ্লিষ্ট হলেও রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত নয়, ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ দি জিওগ্রাফিক্যাল পেনিনসুলা কমপ্রাইজিং দি নোবল নেশন্স্ অব বেঙ্গল এট্সেট্রা মানুষ জাতির ভবিষ্যৎ প্রেরণা হয়েই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উল্লিখিত হতে পারে। কিন্তু ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত অর্থাৎ ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ উত্তর প্রদেশ, ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ কংগ্রেস কিংবা ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ কম্যুনিস্ট পার্টি হয়ে বাংলাকে বাঙালীকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করলে সে মৃত্যু বাংলার হবে না, হবে ইণ্ডিয়ার। বাঙালী ও বাংলা অমর ; পাকিস্তানের ধর্মীয় রাষ্ট্র বাংলার আত্মাকে হত্যা করতে পারেনি, ভারতের অধর্মরাষ্ট্রও তা পারবে না। Bengal will live in spite of India!

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিন বিশ্বের সর্বত্র মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক হয়েছিল। বাংলার প্রাতিস্বিকতা রক্ষার সংগ্রাম তেমনই প্রত্যেকটি ভারতীয় জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক। এই জন্যই বাংলার স্বার্থ ভারতের স্বার্থ।

কিন্তু কোন ভারতের? যে-ভারতের শাসন—ক্ষমতা অধিকারের হানাহানিতে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় দল নীচতার যে-কোন গহ্বরে নামতে প্রস্তুত, সেই ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারতের? না। সে-ভারত এখনো অজাত, সে-ভারত এখনো বাংলার স্বপ্নে সম্ভাবনা মাত্র।

আমাদের প্রস্তাবিত, আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট, আমাদের সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টায় আসন্নসম্ভব থার্ড পার্টি সেই অনাগত ভারতের অগ্রদূত, সেই মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডবগাণ্ডীবধারী অর্জুন। বাংলাকে বাঁচানো তার প্রথম কাজ কারণ বাংলা না বাঁচলে ভারত বাঁচবে না ; যদিও ভারত না বাঁচলেও বাংলা বাঁচতে পারে। বাংলা স্বয়ংপ্রভ, ক্ষণরাহুগ্রাসে ঈষৎ মলিন মাত্র ; ভারত প্রতিফলিত আলোকে আপাত-উজ্জ্বল।

আমাদের থার্ড পার্টি না হলেও বাংলা বাঁচবে, শেষ পর্যন্ত বাংলা অমর--কেননা সে আত্মা ঃ বাঙালীর আত্মা। কিন্তু থার্ড পার্টি না হলে বাংলার উজ্জীবন হবে ইতিহাসের সুদীর্ঘ ও নিষ্ঠুর ক্ষুরধার পথে--যে-উজ্জীবন ভারতের পক্ষে সুখদ হবে না মনে করাই যুক্তিসিদ্ধ। আমরা থার্ড পার্টির পরিকল্পনা করেছি শুধু এইজন্যে যে তার সৈনাপত্যে বাংলার উজ্জীবন হতে পারে অপেক্ষাকৃত বেদনাহীন পথে, ভারতের পক্ষে বেদনাহীন। আর সেই উজ্জীবনেই অনাহত মহাভারতের সম্ভাবনা এখনো অনাহত!

তৃতীয় দল—বাংলার দল!
বাংলা অমর—বাঙালী অমর।
বাংলার মাটি বাংলার জল--পুণ্য হোক হে ভগবান্

বিশ্বের আশা ভারত--ভারতের আশা বাংলা। এই আমাদের ধ্বনি, যার প্রতিধ্বনি উঠবে কোটি কোটি বাঙালীর কণ্ঠে—এবং, অচিরে একদা, ভারতের কণ্ঠে।

কংগ্রেস নয়, কম্যুনিস্ট নয়, বাংলার এই সংক্রান্তি লগ্নে এমন পার্টি চাই, চাই এমন বোনাপার্টি, যার প্রথম পরিচয় বাঙালী, শেষ পরিচয়ও বাঙালী।।

[১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১ ভাদ্র, ১৩৬৮]



--আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? ভাল কথা! হাজার দুয়েক টাকা ধার দাও তো বাবাজী!

TEACHING
বনাম
CHEATING

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

মাত্র কয়েকদিন আগে, ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার মধ্যে 'সর্বাধিক' অথবা 'বহুল প্রচারিত'-তে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা কিরকম উত্তর দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় তাই পড়ে বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা হেসে গড়িয়ে পড়েছে এ ওর গায় (সুকুমার রায় বৃথাই বলেছিলেন রামগরুড়ের ছানাদের নাকি হাসতে মানা!) হাওড়াগামী বাসে যখন দেশের অসংখ্য অশিক্ষিত জনের কেউ, [কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদবী, মালী] বালিগঞ্জ গমনেচ্ছু কেউ উঠে বসে এবং স্ট্র্যাণ্ডরোড বরাবর পৌঁছে কণ্ডাক্টার পয়সা চাইলে বালিগঞ্জের টিকিট কাটতে চায় তখনও আমরা শিক্ষিত সহুরেরা ['তখন শহরে শিক্ষাভিমানীর দল ট্রামে চেপে বৈদ্যুৎ আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে'।—বিশ্ববিদ্যালয়] অনুরূপ হেসে গড়িয়ে পড়ি এ ওর গায়ে। শুধু হেসেই ক্ষান্ত হই না ; মন্তব্যও করি কেউ কেউ। সেই বিপজ্জনক মন্তব্য,—দীর্ঘকাল ধরে উচ্চারিত, পুনরুক্ত, কারণে-অকারণে প্রযুক্ত যে বিপজ্জনক মন্তব্য বাঙালীর প্রতি সর্বভারতীয় ভয়ঙ্কর বিরাগের অন্যতম জনক।

রামসান্নার সেই 'যত হাসি তত কান্নার কথাও যে বিস্মৃত হই তখন, হেসে গড়িয়ে পড়ি এ ওর গায়ে আমরা তা নয় ; ওই দুই ক্ষেত্রেই আমরা আরও যা বিস্মৃত হই তা হচ্ছে, উত্তরপত্রে হাস্যকর উত্তর এবং বাসে উত্তর দক্ষিণ জ্ঞানের অভাব,—এই দুয়ের জন্যে সব দায়িত্বই ছাত্র অথবা অশিক্ষিত সাধারণের নয় ; আমাদেরও কিছু দায় আছে। আমরা যারা ছাত্র-নিধন-যজ্ঞের পুরোহিত এবং দেশজুড়ে অশিক্ষার সুযোগে টিচিং-এর পরিবর্তে চিটিং-এ ব্যস্ত।

তিনবছর আগে মফঃস্বলের কলেজে ঢুকেছিলাম দেখতে ছাত্ররা এত সংখ্যায় ফেল হয় কেন? তিনবছর সম্পূর্ণ হবার আগেই আমার জ্ঞান হয়েছে যে ছাত্রদের নাম বেরোয় বটে ফেলিওরের লিস্টে, আসলে ফেল করেন মাস্টাররাই। শুধু যে ফেল করেন তা নয় ; আমাকে কখনও কখনও ব্যাফ্‌ল্‌ও করেন রীতিমত। টিচ্ করার কথা যাঁদের তাঁরা কি ভাবে চিট করেন, আমার এই সম্পাদকীয় তারই উদঘাটনায়োজনে একটি ছোট্ট চিট্ মাত্র। বাকী অংশ ক্রমশ প্রকাশ্য।

ক্লাস ফাইভের আগে কোনও স্কুলে ইংরেজি শেখানো চলবে না,—এই হচ্ছে বোর্ডের নির্দেশ। স্কুল কর্তৃপক্ষ তার ফলে ক্লাস ফাইভের আগেই ইংরেজী পড়াতে শুরু করেন ; তবে, কম্পালসারি না করে ইংরেজি পড়ানো হয় এলেবেলে ভাবে. ইংরেজিতে পাস না করলে যেমন কিছু এসে যায় না, তেমনই ইংরেজিতে বেশি নম্বর পেলেও লাভ নেই, কারণ ইংরেজীর নম্বর রিপোর্টে লেখা হয় কিন্তু যোগ হয় না ; যোগ হলে বোর্ড থেকে

যদি গোলযোগ করে! টিচিংএর নামে চিটিং-এর শুরু হয় এই ভাবে। সরকারী চাকরে অভিনয় করে ; টাকাও নেয় ; কিন্তু ব্রাকেটে লেখে 'এঃ'! লাঠিও ভাঙ্গে না ; সাপও মরে।

স্কুল থেকে কলেজে এসে তাই আজ ইংরেজীতে পড়াতে গেলে বাঙালীর ছেলেরাই বলে, ['I dream in English'—মাইকেল] বাংলায় বলুন স্যার! হতভাগ্যরা জানে না যে যাঁরা তাদের পড়ান তাঁরা সেই রবীন্দ্রনাথ উবাচ, 'ইংরেজিটাও শিখলিনি ; বাঙলাটাও ভুলে গেলি'-র দলের। সমস্ত বিষয় তারা বাঙলায় শুনতে পায় ; বাঙলায় জবাব দিতে পারে। ইংরেজির বেলায় তারা বাংলায় শুনতে পায় কিন্তু লিখতে পারে না। ফলে তারা যে ইংরেজি লেখে তা পড়বার সুযোগ পেলে, ৪২-এর আন্দোলন, সুভাষ বসুর গুঁতো, বিশ্বপরিস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ কিছুরই প্রয়োজন হত না ইংরেজ বিতাড়নের ব্যাপারে। ইংরেজ এমনিতেই 'QUIT INDIA' করত ; করতে বাধ্য হত ; অগত্যাই।

ইংরেজিপত্রের উত্তর ইংরেজিতে লিখতে বাধ্য না হলে অনেক ছেলেমেয়েই পরীক্ষা দেবার পরই অতঃপরই বলত না, সেই ডিসগ্রেসফুল প্রশ্ন করত না, এবারে গ্রেস্, দেবে কত?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্গত উপাচার্যকে বলেছিলাম, ইংরেজি প্রশ্নপত্রের উত্তর বাংলায় দিতে দিলে ফল ভাল হবে। তিনি চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন ঃ যেটুকু ইংরেজি শিখেছে সেটুকুও যে শিখবে না তাহলে!

আমার উত্তর হচ্ছে, সেক্সপীয়ার তারা যেটুকুও বোঝে সেটুকুও বোঝাতে পারে না ইংরেজিতে এক্সপ্রেস করতে না জানার ফলেই ; এবং ওই এক ইংরেজিতে ফেল করবার আতঙ্কেই অন্য সব বিষয়েও পাস করতে পারেনা ; সমস্ত পরিশ্রমটাই বিফলে যায়।

আমি বলি যে, হয় ইংরেজী ভালো করে শেখাও ; নয়, ইংরেজির পাট তুলে দাও! ইংরেজের সঙ্গেই আমাদের লড়াই ছিল ; ইংরেজি ভাষার সঙ্গে নয়!

আমাদের দেশে ঘুম ভাঙে একটু দেরীতে ; সব ব্যাপারেই তাই। যারা আজ বেকুফের মতো হাস্যকর উত্তর দিচ্ছে বি-এর খাতায়, কেউ প্রশ্ন করছে না তাদের সম্পর্কে যে তারা স্কুল ফাইন্যালের বা আই-এ-র বেড়া টপকালো কি করে?

কোনও বাড়ি একদিনে ভেঙ্গে পড়ে না প্রাকৃতিক বিপাক ছাড়া ; এই শিক্ষা ব্যবস্থাও এক দিনে ভাঙ্গেনি ; এর অঙ্গে অঙ্গে, স্বার্থ, বঞ্চনা, প্রতারণার ঘুণ ধ্বসিয়েছে একে ভেতরে ভেতরে দিনের পর দিন ; সেনেটের ওই বাড়ি ধুলিসাৎ হবার অনেক আগেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে কলিকাতা নিঃস্ববিদ্যালয়ে! কেমন করে,—এখন তাই বলি!

কেউ কেউ বলতে পারেন যে কাগজে যেসব হাস্যকর ভুলের নমুনা বেরিয়েছিল সেগুলি তো বাংলার উত্তরপত্র থেকে সংকলিত, ইংরেজি প্রশ্নপত্রের উত্তরে তো বিরচিত নয় ; তাহলে বলি যে অন্তত ইদানীং একটি ছেলে আমাকে একদিন 'প্রকৃষ্ট' বানান কি জিজ্ঞাসা করল। বানানটি বলবার পর, অতঃপর সে আমার খাতা খুলে দেখিয়ে দিলে যে সে-ও সেই বানানেই 'প্রকৃষ্ট' লিখেছে তবু আমি তা কেটে দিয়েছি। সে মনে করে নিয়েছে আমার কাটা থেকে যে আমি কেটেছি যখন তখন বানান্ ভুলের জন্যেই কেটেছি; অন্য কোনওরকম ভুল যে হতে পারে; প্রকৃষ্ট কথাটা যে ওখানে ব্যবহারযোগ্য নয় ; ব্যবহার করলে সমস্ত বক্তব্যের চেহারাই যে পালটে যেতে পারে ; এ তার মাথায় আসেনি। ছাত্রের এই প্রশ্নের মধ্যেই আজকের পড়ানোর সমস্যার অনেকটারই সমাধানের সূত্র পাওয়া যাবে। যে ভাবে খাতা দেখা হয় তা ছাত্রদের কোনও কাজে লাগে না। ধরুণ, একটা জায়গায় কাটা দাগ পড়ল, যদি গ্লেয়ারিং কোনও বানান্ ভুলের জন্যে কাটা না হয়ে থাকে তাহলে ছাত্ররা কি বুঝবে, কেন সেই কথাটা ভুল এবং কোন্ কথার জন্যে নম্বর কাটা গেল?

কলেজে পরীক্ষা নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়েব পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি হিসেবে। কিন্তু

কলেজে পড়ানোর চেয়েও যেখানে ফাঁকি দেওয়া হয় অনেক বেশি সে হল এই, খাতা দেখার ব্যাপারে। এই খাতা দেখে অধ্যাপকরা এক পয়সাও পান না ; এবং দেখবার সময়ও অনেক সময়েই খুব কম পান। কলকাতা সিটির বড় কলেজে ইতিহাসের পরীক্ষক লজিকের খাতা নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন ভুলে অথচ লজিকের মার্কসিটে নম্বর বসেছে যথারীতি,— এমন ম্যাজিকের কথা আমি শুনেছি। এমনকি কোনও ছাত্র ওই বিগ্ কলেজের, আমাকে এমনও বলেছে যে, সে একই প্রশ্নের উত্তর একবার খাতার আরম্ভে, আরেকবার খাতার শেষে ইচ্ছে করেই দুবার লিখেছে ; এবং তার আন্দাজমতো দুবারই নম্বর পেয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র, য়ুনিয়ান, অভিভাবকবৃন্দ কারুরই কণ্ঠে আজ পর্যন্ত এই গভীর জলের 'মাছ'-দের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ শুনিনি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহীত পরীক্ষার খাতা দেখার জন্যে পরীক্ষকরা দুপয়সা পান। দুশো আড়াইশো খাতা দেখার জন্যে ২১ দিন ; পাঁচশো খাতা দেখার জন্যে ২৭-'দিন' সময় পাবার অস্বাভাবিক রীতিই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষার ফল বেরুতে কিন্তু সাধারণের চিঠির জবাবে সরকারী উত্তর আসতে যে সময় নেয় তার চেয়ে কম সময় নেয় না। এই সময়ে এত খাতা দেখা যায় না যে—এর বিরুদ্ধে পরীক্ষকদের মুখে কখনও একটা কথাও শুনবেন না। একজন পরীক্ষক আপত্তি জানালে পঁচিশজন পরীক্ষক আগেই আবেদন জানিয়ে বসে আছেন যাতে বাড়তি খাতা [না] দেখে তাঁরা দুপয়সা আরও পান।

ছেলেদের খাতা থেকে হাস্যকর ভুলের লিস্টি কাগজে ছাপার হরিষ মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হতে পারে, যদি পরীক্ষিত খাতাগুলি একবার নিরপেক্ষ দৃষ্টির সামনে অবারিত হবার সুযোগ [বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দুর্যোগ] কখনও উপস্থিত হয়।

আমি যতদুর জানি পরীক্ষার খাতা সম্পর্কে সাঙ্ঘাতিক গোপনীয়তা রক্ষা পরীক্ষকদের পবিত্র দায়িত্ব ; তা সত্ত্বেও এই খাতার অংশ বিশেষ কাগজে প্রকাশিত হয় কি করে? যারা এই দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত তারা আজও কেন অভিযুক্ত নয়, আমার সেই প্রশ্নের 'উত্তর'-এর জন্যে, ছাত্রদের কাছ থেকে নয়, কলিকাতা নিঃস্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে সেই কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে আছি ; আমি অপেক্ষা করব।

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৪ আশ্বিন, ১৩৬৮]



—বাবা! হঠাৎ যদি ঐ বাঘটা বেরিয়ে পড়ে তোমায় মেরে ফেলে তাহলে ক'নম্বর বাসে বাড়ী যাবো?

TEACHING
বনাম
CHEATING

[দুই]

উল্লিখিত শিরোনামায় গত সংখ্যার মূল সম্পাদকীয় রচয়িতা স্বয়ং অধ্যাপক। কলেজী শিক্ষাদানের প্রতারণা তাই তাঁকে সর্বাধিক পীড়া দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতারণা ছিল তাঁর মূল আলোচ্য ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীতে তারা পৌঁছলো কী করে, যারা আজ বেকুফের মত হাস্যকর উত্তর দিচ্ছে বি. এ-র খাতায়, তারা স্কুল ফাইন্যালের বেড়া টপকালো কী করে—এ সম্বন্ধে শুধু প্রশ্ন উত্থাপন করেই নিরস্ত থেকেছেন অধ্যাপক সম্পাদক। এবারে আমরা একটু গোড়া থেকে প্রশ্নটির প্রতি আলোকপাত করব।

শুষ্ক যে প্রথার তাড়নায় শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতারণা ব্যবসার শুরু, সে প্রথার মূল রয়েছে প্রথম বর্ণপরিচয় থেকে। বর্ণ—পরিচয় থেকে আমাদের শিক্ষানীতি বিবর্ণ সুবর্ণ-ভিত্তিক, অর্থই যে শিক্ষাদানের প্রেরণা। Borncrammer আমাদের ছাত্ররা আত্মস্থ নয়, মুখস্থ করতেই শিখে আসে। আর তাই কে-জি ওয়ানের ছাত্র ও বি-এ ক্লাসের ছাত্রের মধ্যে তারতম্য হয় গুণগত নয়, পরিমাণগত ; কে-জি ওয়ানে যে একখানি বই মুখস্থ করে, বি. এ—তে একাশিখানা।

কিন্তু কেন? কেননা, তার শিক্ষকও মুখস্থ করেই শিক্ষক হয়েছেন, শিক্ষাকে আত্মস্থ করার শিক্ষা তিনিও পাননি কোনদিন।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমার ছেলে যখন কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ছিল, তাকে বাৎসরিক পরীক্ষায় লিখিত প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ শূন্যস্থান পূর্ণ কর—নদীর দুপাশে সবুজ [গ্যাপ] ছিল। আমার ছেলে শূন্য স্থানে "মাঠ" কথাটি বসিয়েছিল ; আর তার শিক্ষিকা সেটি লাল পেন্সিল দিয়ে কেটে "গাছ" লিখে অশুদ্ধি (?)

সংশোধন করেছিলেন। ব্যাপার হচ্ছে, ওদের কোন একখানি পাঠ্য পুস্তকে 'নদীর দুপাশে সবুজ গাছ ছিল' বলে একটি বাক্য আছে ; সবুজ মাঠ ছিল, লিখলে তাই মুখস্থ শাস্ত্রের রীতি বিরুদ্ধতা ঘটে। আমি বলছি না যে সেই শিক্ষিকা এক মুহূর্ত ভাবলে এমন অসঙ্গত সংশোধন (?) করতেন ; সম্ভবত তিনি কিছুই ভাবেননি, যান্ত্রিক ভাবে বই মিলিয়ে পত্র পরীক্ষা করে গিয়েছেন।

কিন্তু উদাহরণটি ব্যতিক্রম নয়, দেশের শিক্ষা-রীতির একটি গড়পড়তা দৃষ্টান্ত মাত্র।

অপর এক শিক্ষিকা ঐ এক ছাত্রেরই অঙ্ক পরীক্ষার উত্তর পত্রে অনুরূপ সংশোধন (?) করেছিলেন। টাকা ও নয়াপয়সা যুক্ত মিশ্র রাশিকে ভাগ করতে গিয়ে ছাত্রটি টাকায় ভাগশেষের সঙ্গে সোজাসুজি নয়া পয়সার অঙ্কটিকে টেনে বসিয়ে ভাগ করে গিয়েছিল ও ভাগফল যথারীতি নয়া পয়সায় রেখেছিল। শিক্ষিকা অঙ্কটা কেটে দিয়ে আদর্শ হিসাবে

দেখিয়ে দিয়েছিলেন, টাকার ভাগশেষকে ১০০ দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে নয়া পয়সা যোগ করতে হবে। অর্থাৎ ৫ টাকা ৫০ ন. প. যে ৫৫০ ন. প. এটা সোজাসুজি দেখানো শিক্ষিকার মতে গর্হিত, ৫×১০০ = ৫০০ এবং ৫০০ + ৫০ = ৫৫০ কষে দেখাতে হবে, এই ওঁর মত। মুদ্রার দশমিক-রীতি প্রবর্তনের প্রধানতম একটি কারণ যে ঐ গুণনটিকে নিষ্প্রয়োজন করে দেওয়া তিনি জানেন না ; তিনি টাকা আনার বেলায় ১৬ দিয়ে গুণন, জানেন, নয়া পয়সার বেলাতেও ১০০ দিয়ে গুণন তাই তাঁর কাছে অপরিহার্য।

কোনো কোনো অনুমোদিত (?) পাঠ্যপুস্তকেও আমি একই নির্বুদ্ধিতার অবতারণা দেখেছি।

আগেই বলছি দোষ কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে লাভ নেই। দোষ শিক্ষারীতির সেই অভিব্যক্তির, যে রীতির পশ্চাতে মূলনীতি হল—শিক্ষাদান চক্ষুদানের নামান্তর মাত্র!

একবার যে কোনও পল্লীর নবজাত কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী বিদ্যালয়গুলির প্রতি তাকিয়ে দেখুন। এক সময়ে যেমন সুবিধে মতন জায়গায় খালি ঘর পেলেই ম্যাসাজ হোম প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছিল এখন তেমন কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের। কিণ্ডারগার্টেন ও টিউটোরিয়াল হোম। প্রায় বিনা মূলধনে যত রকম ব্যবসা সম্ভব, শুধু সম্ভব কেন, যথেষ্ট লাভজনক, কিণ্ডারগার্টেন ও টিউটোরিয়াল বর্তমান বঙ্গদেশে তার মধ্যে প্রধানতম।

কিণ্ডারগার্টেন কথাটি মূলত জার্মান ভাষার, ইংরেজিতে ঋণাগত। শব্দটির ব্যাসবাক্যে 'উদ্যান' কথাটি সুস্পষ্ট। অথচ বর্ষার জলে ব্যাঙের ছাতার মত অশিক্ষার অস্বাস্থ্যকর মন্‌সুনে যে কিণ্ডারগার্টেনগুলি প্রতিদিন গজিয়ে চলেছে আমাদের চতুর্দিকে, একখানি আটফুট বাই দশফুট আলোহীন হাওয়াহীন স্যাঁতসেঁতে কামরা হলেই যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তার সম্পর্কে 'গার্টেন' শব্দটির প্রয়োগ নিতান্তই জার্মান রসিকতা। বাগান নয়, এ প্রতিষ্ঠানগুলি দেখলেই যা মনে পড়ে তা হচ্ছে বাগানো। ছলে বলে-কৌশলে এরিস্টোক্রেসির প্রলোভন crazy পিতাদের (বহুলাংশে মাতাদের) সন্তানদের বাগানো। সাত টাকা থেকে সতেরো টাকা (প্রায়শ কুড়ি-পঁচিশ পর্যন্ত) মাইনে বাগিয়ে শিক্ষার নামে সাত-সতেরো।

টিউটোরিয়াল হোমগুলির অবশ্য প্রিটেনশন কম। শিক্ষাদানের বড়াই তারা প্রায়শ করে না। তাদের মটো পাস করানো। মুখস্থ করিয়ে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে, প্রয়োজন হলে ক্ষেত্রবিশেষে পরীক্ষককে ফাঁসিয়ে, তারা ছাত্রকে পাস করিয়ে দেয়। একটি টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা (ব্যক্তিগত ভাবে তিনি একজন তন্নিষ্ঠ শিক্ষক বলেই জানতাম) একদিন আমার কাছে সখেদে স্বীকারোক্তি করেছিলেন, আমরা আর বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিনা—পাস করতে শেখাচ্ছি মাত্র।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তো সব নয়, উত্তরকালে যে জীবনের পরীক্ষায় উত্তরণ করতে হবে সেই ছাত্রদের ; তখন তাদের সঙ্কট মুহূর্তে তাদের আকুল জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারবে কোন্ কোচিং ক্লাস? জীবনের হোমে আহুতি দেবার লগ্নে বিস্মৃতমন্ত্র হোতাকে পৌরোহিত্য দিতে এগিয়ে আসবে কোন্ টিউটোরিয়াল হোম?

অথচ এ পাপচক্রের আশু বিনাশ সুকঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-উত্তরণ সমূহ সমস্যা। তার শর্টকাট রাস্তা খুলে দিয়েছে এই কোচিং ক্লাসগুলি। শর্টকাট যখন শর্ট-সার্কিট হয়ে সেফ্‌টি ফিউজ কেটে দেবে, তখন আলো থাকবে না, হাওয়া থাকবে না, থাকবে না আর কোন ফাঁকির পথ।

সেই চরম বিনাশ, পরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসার আগে দেশের যাঁরা শিক্ষানীতির কর্ণধার, যাঁরা শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব, জন-শিক্ষার অধিকর্তা, কিংবা যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সেনেটের সুদৃশ্য, বৃহৎ কলেজের অধ্যক্ষ, এঁদের প্রতি আমার নিবেদন : আপনারা দয়া করে নিজেরা প্রথমে আপন-আপন শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করুন ; প্রকৃত শিক্ষা—মুখস্থ নয়—আত্মস্থ

করুন ; ফাঁকি দিয়ে নয়, নিষ্ঠা-সহকারে।

যদি আর কিছু করতে না পারেন, আপনারা দল বেঁধে ঐ টিউটোরিয়াল হোমে ভর্তি হয়ে যান না কেন? আর একবার স্কুল ফাইন্যাল বা বি.এ. পাস করার চেষ্টা করে দেখুন, কোচিং ক্লাসের মুখস্থ-বিদ্যাতেই করুন সে করুণ অপচেষ্টা, তবে বুঝতে পারবেন, হয়ত তবে বুঝতে পারবেন আমাদের বেদনা ; অংশত পারবেন বুঝতে।

কিম্বা কিণ্ডারগার্টেনেই ঢুকে আর একবার বর্ণ পরিচয় থেকে পুনরারম্ভ করুন। ‘অজগর আসছে তেড়ে’ থেকে। তাহলে হয়ত বুঝবেন, এ অজগর অশিক্ষার অজগর।

॥ চার্বাক ॥

[১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১১ আশ্বিন, ১৩৬৮]



—এতদিন ধরে চেষ্টা করে একটা পাত্র যোগাড় করতে পারলে না। না হয় একটা প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা কর....

বলির বাজনা বাজাও!

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

ভক্তের নয় ; মত্তের। উন্মত্তের দুর্গাপূজা আজ দেশ জুড়ে। দুর্গতি নাশ করবার জন্য নয় এ পূজা। এর গতি আরও অনেক দূর নিয়ে যাবে আমাদের ; আমাদের 'অনেক দুর্গতির' বাকী এখনও। কলি [কাতা]-র এই তো সবে সন্ধ্যে। 'মা' বলে বাঙালীর আজ কেউ নেই ; আছে সিনে-'মা'। সিনেমার ছবি, সিনেমার গান, সিনেমার কাগজ। কাগজ খুলুন, উত্তমকুমারের সুচিত্রা সেনকে কমলালেবু খাওয়ানোর ছবি। রেডিও খুলুন, বায়স্কোপের গান ; 'এমন বন্ধু আর কে আছে তোমার মতো মিস্টার?' গল্প-উপন্যাস খুলুন, বায়স্কোপ হয় যাতে সেই দিকে এক চোখ রেখে আরেক চোখ বিশ পাতার গপ্পোকে কি করে ৪২০ পাতার উপন্যাস বলে চালানো যায় তারই দিকে নিবদ্ধ। চোখকান খুলুন, আরও চোখেকানে পড়বে কিছু। সিনেমাস্টারের কমলালেবু খাওয়ানোর ছবি এপাতায় ; ওপাতায় ল্যাঙ্গট পরা সাহিত্যিকের যৌগিক ব্যায়ামের ছবি। বড়-ছোট-মেজ বলে কিছু নেই। সব শেয়ালের মতো সাহিত্যিকের এক্ রা ঃ এবার পুজোয় ক'খানা উপন্যাস লিখছেন সিনেমার কাগজে?

পূজো বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল ; এখন আছে কেবল পূজো সংখ্যা।

'মা'র বদলে সিনে-'মা' নয় কেবল। [পুরুষ]-সিংহের বদলে গর্দভচর্মাবৃত সিংহের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদই আজ 'উল্টো-বুঝলি' [সাপ্তাহিক] দেশের একমাত্র আহার। গজে কি নৌকায় বা দোলায় নয় ; মা আসছেন বাংলা দেশে কাগজের ফুটো নৌকায় চড়ে ; DOLE-আয়ই যার একমাত্র ভরসা,—সেই নিরুপায়ের সুরে চণ্ডীপাঠ নয় ; অসুরে [ওলাই] চণ্ডীপাঠ করছে মহা ['প্র']-লযায়। পুরুতের পরিবর্তে রাজনৈতিক [অভি] নেতা। শাঁখঘণ্টার বদলে মাইক ; মন্ত্রের বিকল্পে মন্ত্রীর বোধন-এর নামে নিজের ইলেকশান ক্যাম্পেনের উদ্বোধন।

দেবী ভারতী বলতে এখন সরস্বতীকে বোঝায় না; বোঝায় শীততাপনিয়ন্ত্রিত ছবিঘরকে। 'লক্ষ্মী'-ছাড়া বাঙালীর গণেশ উল্টেছে অনেককাল ; কার্তিক চিরকুমার নেই ; উত্তমকুমার হয়েছেন ; 'কলা'-বৌ সিনেমা প্রোডিউসার আর সিনেমা কাগজের ঘর করছেন। রবিশঙ্কর টু তারাশঙ্কর, একজন বায়স্কোপে মিউজিক দিচ্ছেন ; বায়স্কোপের কাগজে অন্যজন লিখছেন উপ [!] ন্যাস! শিল্পী ছবি আঁকা ছেড়ে ধরেছেন ছবি করা। আর্ট-এর চেয়ে অনেক বড় আজ আর্ট-ডিরেকশান!

এই হচ্ছে এক দিক। আরেক দিকে দেখছি, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহ'-র 'সু'-নীতি ত্যাগ করে শিক্ষক সরকারের লাউড স্পিকার হয়েই কৃতকৃতার্থ! বিশ্ববিদ্যালয় আজ নিঃস্ববিদ্যালয়ে পরিণত। সিনেট-এর বাড়ি ভেঙেছে ; কিন্তু সিনেটের মেম্বারদের চক্রান্ত,—জাল ভোট এবং নির্ভেজাল 'ভেট'-এর চক্রান্ত ভাঙেনি মোটেই। অ্যাডভান্সমেন্ট অভ লার্নিং নয় ; অ্যাডভান্সমেন্ট অভ আর্নিং-ও নয় [তাহলেও বুঝতাম!] ; অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ওয়ার্নিং শুনছি সেখানে ঃ যদি এমন কেউ এখনও থাকে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজের আনাচেকানাচে যে সত্যি সত্যি পড়াতে চায় ছাত্রদের, মানুষ করতে চায় অমানুষদের তাহলে তার উদ্দেশ্যেই পাগলা মেহের আলির এই চীৎকার ঃ তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! সব ঝুট হায়! সব ঝুট হায়!

তবুও মা আসছেন ; এবং 'মার'-ও আসছে। আসাম ও বেরুবাড়িতেও যার শিক্ষা হয়নি তাকে মারবার নয়, বাঁচাবার জন্যেই মা আসছেন 'মার্' হয়ে। মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষরূপে এবার তুমি এসো অপরূপে। মারের মধ্যেই আমার দেশ জাগুক! সে বলুক ঃ আরো, আরো, আরো! আরও আঘাত সইবে আমারো! দশভুজে তোমার দেখানো ভয়ের মধ্যেই আছে বরাভয়। মৃত্যু দিয়ে করো বাঙালীকে মৃত্যুঞ্জয়! বন্যায় ভাসিয়ে দাও যুগসঞ্চিত পাপ বাঙালীর! ভূমিকম্পে বিদীর্ণ হোক, চোরাকারবার, লাম্পট্য, ঘুষ ও প্রতিকারহীন ধনীর অত্যাচারের বেদনায় দ্বিধাগ্রস্ত ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের বসুন্ধরার বুক!

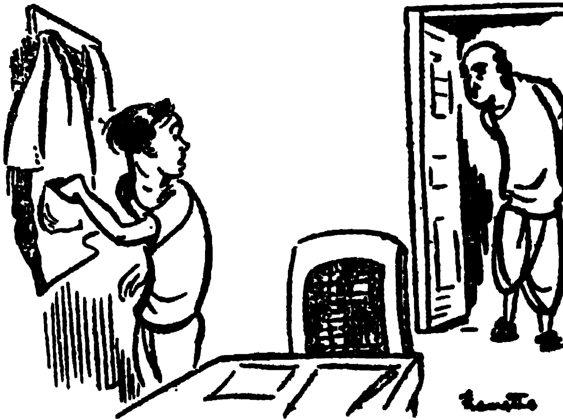
আর সেই মৃত্তিকা থেকে তৈরী হোক নৃসিংহ মূর্তি! হিরণ্যকশিপুর হোক মৃত্যু! মা, একবার, আরেকবার বলো ঃ ম্যাঁয় ভূখা হুঁ! তোমার তৃষ্ণা মেটাই এবারে পাঁঠা বা মোষের রক্তে নয়। চোরাকারবারী, ভেজালব্যবসায়ী, উদ্বাস্তু মেয়েদের অভাবের সুযোগে যারা লাম্পট্যের নববৃন্দাবন বসিয়েছে কখনও বাড়িতে, কখনও বাগানবাড়িতে, আর যারা রাজনীতির নামে ছেলেমেয়েদের পুলিসের গুলির সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেরা হয়ে আছে মন্ত্রী অথবা বাম [আ]-পন্থী [অভি], নেতা। এবার তাদের রক্ত পান কর তুমি মা ঃ--এই তোমার অনুরক্ত ভক্তের একমাত্র প্রার্থনা।

মাঠে, ময়দানে, হোটেলে, এমপ্‌টি হাউসে, ট্যাক্সিতে, বাগানবাড়িতে, বাড়িতে পয়সার আর প্রতাপের জোরে **'নারীবলি'** দিচ্ছে যারা, **নরবলিতে** হোক এবার তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বলির বাজনা বাজছে! নারীবলির শোধ নিতে নরবলির বাজনা!

আমরা অপেক্ষা করে আছি ; আমরা অপেক্ষা করব!

[১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (পূজা-সংখ্যা-নয়), ২৮ আশ্বিন, ১৩৬৮]



কি? এখন থেকেই Public Leader হবার চেষ্টা?

তেইশকোপ

নীলকণ্ঠ

সম্পাদক গদাধর হোড়ের ঘর। পুজো সংখ্যার কাজ চলছে। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত লেখার গাদা ; ছবির তাড়া। অ্যাসট্রে হা হা করছে ; ঘরময় সিগারেটের টুকরো আর দেশলাইয়ের কাঠি। ফ্যানের হাওয়ায় সিগারেটের ছাই ঘরময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

গদা ঃ গোবর্ধন, গোবর্ধন,—দূর [কলিং বেল বাজাতে গিয়ে দেখল বেলটা বাজে না ; অর্থাৎ বেলটা একেবারেই বাজে!]—গোবর্ধন—

গো ঃ যাই স্যার—

গ ঃ এই যে এসেছ,—এমাসের কাগজে ক্ষেমঙ্কর দত্তের জীবনীতে কি যা তা লিখেছ? উনি চিঠি পাঠিয়েছেন যে কস্মিনকালেও যেসব ঘটনা ওঁর জীবনে ঘটেনি সেই সব কথা তুমি ক্ষেমঙ্করের জবানীতে বসিয়েছ এবং সেই সঙ্গে ওঁকে একেবারে পথে বসিয়েছ। তাছাড়া ত্রিপুরাশঙ্কর বলে এক ভদ্রলোক ক্ষেমঙ্করবাবুকে একসময়ে বাঁচান টাকাকড়ি দিয়ে, এই কথা ক্ষেমদা তোমাকে ইণ্টারভুর সময়ে বলেছিলেন আর তুমি বিলাসপুর থেকে ফিরে ক্ষেমঙ্করের লেখক পরিচিতি লিখলে কি না যে তিনি ত্রিপুরাশঙ্করের কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে ত্রিপুরায় তাকে নাচান—! তুমি আমায় পথে বসাবে গোবর্ধন, তুমি আমার সর্বনাশ করবে ; কি, কথা বলছ না কেন?

গো ঃ আমাকে কিছু বলছেন স্যার?

গ ঃ ভগবান!

[দৌড়তে দৌড়তে একজনের প্রবেশ]

তারিণী ঃ কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে স্যার!—সামথিং ডেনমার্ক ইন দি স্টেট অফ রটন স্যার—

গ ঃ থামো ছোকরা! বাঙলা কাগজের আপিসে ইংরিজি ঝাড়ছে,—রটন স্যার! রটন স্যার!

তারিণী ঃ দেখুন গঙ্গাধর গাঙ্গুলী কি লিখেছে?

গ ঃ দেখবার সময় নেই,—পড় শুনি—

তারিণী ঃ লিখেছে যে বায়স্কোপের কাগজ দেশের ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছে ; এগুলো সরকারের উচিত আইন করে বন্ধ করে দেওয়া।

গ ঃ তারিণী, দেখি তুমি কি রকম তৈরী হয়েছ? বল তো এর জবাবে আমাদের কি করা উচিত?

তা ঃ অরণ্য উপনিষদের কঠোপ অধ্যায় বলছে ঃ জাগ্রত প্রাপ্যত উত্তিষ্ঠ নিবোধবরান্ অর্থাৎ নির্বোধ জেগে উঠে বর প্রাপ্য হও—

গ ঃ অরণ্য উপনিষদ?

তা ঃ কেন নয় স্যার? আপনি বাঙলা কাগজের অফিসে ইংরিজি বলতে বারণ করেছেন ; তাই সংস্কৃত বললাম! বাঙলা হচ্ছে সংস্কৃতের আদি জননী—

গ ঃ তোমাকে এতদিন তাড়াই নি তারিণী,—কিন্তু—[কাগজ চাপা কাচের হরিণ হাতে তুলে নিল]

তা ঃ আর বলতে হবে না! আমি বুঝেছি স্যার,—বলুন আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় কি?

গ ঃ গঙ্গাধর কি বলেছে? কাগজ পুলিসের বন্ধ করে দেওয়া উচিত,—তাই না?

তা ঃ হ্যাঁ, স্যার?

গ ঃ আমাদের উচিত হবে গঙ্গা গাঙ্গুর মুখ বন্ধ করা—

তা ঃ কি ভাবে?

গ ঃ উপন্যাস ছেপে,—এবারের পূজা সংখ্যাতেই—

তা ঃ তা কখনও হয়?

গ ঃ হয় না কেন শুনি? রাজ্যপালের সাহায্য ভাণ্ডারে মেয়ে নাচিয়ে বেশ দুপয়সা হয় দেখেছি এক সময়ে ; শ্রীঅরবিন্দের মত মহামানবের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে নাচগানের জলসাতেও টিকিট বিক্রী হয় দেখছি আর এটা হয় না কেন? গদাধর হোড়ের অভিধানে আজকের দিনে পয়সা খরচ করলে হয় না এমন কোনও কথা হয় না জেনো ;—এক্ষুণি যাও গঙ্গাধরের কাছে, বলো, সাড়ে এগার পাতার মধ্যে এবারের পূজোয় একখানা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস চাই—

তা ঃ সাড়ে এগার পাতার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস?—বলেন কি স্যার?

গ ঃ ঠিকই বলি ; সাড়ে এগার পাতার মধ্যেই হওয়া চাই,—বারো পাতাও নয়—

তা ঃ কেন?

গ ঃ কারণ বাকী আধ পাতার মধ্যে নধরকুমারের একশো একচল্লিশ নম্বর ফোটো যেটায় বিচিত্রাকে কমলালেবু খাওয়াচ্ছে,—সেইটে যাবেই—! তাছাড়া দুখানা উপন্যাস দিতে হলে সাড়ে এগার পাতার বেশি দিচ্ছি কি করে?

তা ঃ কিন্তু পাঠক কি ভাববে?

গ ঃ বাঙলা দেশের পাঠক কিছু ভাবে না ; ভাবলে 'তেইশকোপ' বিক্রী হত না এক কপিও ; আব আমাদের দ্বিতীয় কাগজখানা অর্থাৎ 'লে হালুয়া' বিনে পয়সায় এবং তার সঙ্গে Free হালুয়া এক প্লেট করে দিলেও কেউ ছুঁতো না!

তা ঃ বেশ,—কিন্তু তাই বলে আমরা পাঠকদের ঠকাবো কেন?

গ ঃ কারণ,—ভালো জিনিস দিলে যারা প্রশংসা করবে প্রচুর কিন্তু কিনবে না এক কপিও ; আর নোংরা লেখা, নোংরা ছবি ছাপলে গালাগাল দেবে যেমন, কিনবে তেমনি প্রত্যেকে দুখানা করে, তারা পাঠক নয় ; তারা ঠগ!—তাদের ঠকালে পাপ হয় না! স্বয়ং চাণক্য বলে গেছেন ঃ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। নাও বকিও না ;—এক্ষুণি যাও, নইলে 'ভয়সা' কাগজের লোক বসে আছে দেখবে—গিয়ে যা বললাম অবিকল সেইভাবে বলবে—

তা ঃ না স্যার! মাফ করবেন,—ওভাবে বলতে পারব না,—লেখক মানুষের কাছে যাচ্ছি ; একটু কাব্য করে না বললে হবে কেন?

গ ঃ স্যাম্পল শুনি একটু—

তা ঃ গিয়ে বলব ঃ গালাগাল দিয়েছেন, বেশ করেছেন ; তা বলে লেখা চাইব না কেন আপনার? মেরেছ প্রেমের কাণা তা বলে কলসী দেব না?

গ ঃ বড় ভালো কথা বলেছ হে তারিণী,—কলসী,—হ্যাঁ—কলসীই আসল। টাকার কলসী গলায় বেঁধে ন্যায়, বিবেক, হৃদয়, সতীত্ব, চরিত্রর সমাজের গঙ্গায় ডুবে মরার দুঃসময় এখন,—আর আমাদের পক্ষে এই হচ্ছে চরম সুসময় লুটেপুটে খাবার—যাও—এগিয়ে পড়— কোনও ভয় নেই—

তা ঃ জয় তারিণী!

[তারিণীর প্রস্থান]

গদাধর আবার বেল বাজাতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন বেলটা বাজে, তাই বাজে না।

তিনি স্বগতোক্তি করছেন ঃ বেলটাই আমাকে ডোবাবে ; বেলটাই দেখছি সর্বনাশ করবে!— এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে পুরাতন কম্পোজিটর পুলিন।

পুলিন ঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে কর্তা—

গদাধর ঃ সে আর তুমি থাকতে এমন অসম্ভব কি?

পু ঃ কাজের সময় বড় বাজে কথা বলেন আপনি,—এই কর্তাবাবু আপনার বড় দোষ ; মনিব আপনি, আমি ভৃত্য! তবু একথা না বলে পারলাম না,—

গ ঃ আর তোমার দোষ হচ্ছে কাজের কথা বলতে এসে বাজে কথার ভণিতায় সময় নষ্ট করা। তুমি আমার সবচেয়ে পুরানো কম্পোজিটর পুলিন, তোমাকে না হলে আমার চলে না। তবু একথা না বলে পারলাম না—

পু ঃ অমরেশ মিত্রের উপন্যাসের খানিকটা ছাপা হয়ে গেছে আমাদের 'লে হালুয়া'র পূজো সংখ্যায়—খানিকটা 'তেইশকোপে',—কি হবে কর্তা?

গ ঃ যা হবার তাই—

পু ঃ এ তো রাগের কথা হয়ে যাচ্ছে বাবু!

গ ঃ না, এর চেয়ে অনুরাগের কথা কেউ আজ সকাল থেকে আমাকে শোনায়নি পুলিন—

পু ঃ একটা দোষ করে ফেলেছি বলে ঠাট্টা করছেন?

গ ঃ তোমার দোষে এটা হয়নি পুলিন, হয়েছে আমার গুণে।

পু ঃ কি যে বলেন আপনি কর্তা!

গ ঃ ঠিকই বলি পুলিন, ঠিকই বলি—

পু ঃ কি রকম?

গ ঃ তাহলে মন দিয়ে শোন ; আমি ইচ্ছে করেই অমরেশ মিত্রের খানিকটা তেইশকোপে ছেপে, বাকীটা হালুয়াতে ছেপেছি ; কেন জান?

পু ঃ জানলে আর জিজ্ঞেস করছি?

গ ঃ তেইশকোপ আমাদের এমনিই যায়,—'লে হালুয়া'কে খাওয়াতে হয় ; অমরেশ মিত্র লিখছে ভাল,—তেইশকোপে একটু পড়ে বাকীটুকুর জন্যে লে হালুয়া কিনতেই হবে!— একেই বলে Two stones killed with one bird!

পু ঃ কিন্তু পাঠকরা আপত্তি করবে না—?

গ ঃ এখানে তোমাদের সকলকে ওই এক দোষে খেয়েছে।—পাঠকরা আপত্তি করবে? আরে পাঠকেরা আপত্তি করলে 'তেইশকোপ', 'লে হালুয়া' বার করাতেই আপত্তি করত! বাঙালী পাঠক কিছুতেই আপত্তি করে না এখন ; বাঙালী মধ্যবিত্ত যেমন চালে কাঁকর, দুধে ভেজাল,—সবই মেনে নেয়। বরং কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে বলে ঃ দরকার কি গোলমাল করে?—এরপর আর কাঁকরও পাওয়া যাবে না তা জান কি?

পু ঃ আপনার কি বুদ্ধি কর্তাবাবু! [বাইরে থেকে কর্কশ কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হল ঃ লে হালুয়া—তেইশকোপের অফিস? ভেতরে আসতে পারি?—বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই মারমূর্তিতে ভেতরে প্রবেশ করেন]

ভদ্রলোক ঃ গদাধর হোড় কার নাম?

গ ঃ আমার।

ভ ঃ আপনিই সম্পাদক?

গ ঃ হ্যাঁ—

ভ ঃ আপনি ভদ্রলোক?

গ ঃ আজ্ঞে?

ভ ঃ আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি ভদ্রলোক?—ভদ্রলোক কেউ কোনও ভদ্রলোকের মেয়ের এই সর্বনাশ করে?—[পকেট থেকে সে মাসের লে হালুয়া বার করে টেবিলের ওপর খুলে ধরলেন ; একটি মেয়ের ছবি, ছবির তলায় লেখা তণিমা দাস, ফিল্মে অভিনয়েচ্ছু বিদুষী তরুণী]

গ ঃ কিন্তু এ ছবি ছাপবার জন্যে তো উনিই—

ভ ঃ থামুন! উনিই,—উনি কে বট? একটা সতের বছরের বাচ্চা মেয়ে।—বিদুষী তরুণী?—ফিল্ম ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছে যত না তার চেয়ে অনেক বেশি খাচ্ছে এই সব ফিল্মের কাগজ! কে চুলে কোন্ তেল দেয়, কে কাকে কমলালেবু খাওয়ায়,—কার সপ্তাহে রোজগার কত,—এই সব হচ্ছে খবর? বাপঠাকুর্দার নাম জানে না অথচ কোন্ মেয়ে প্রথম কোন্ ছবিতে নেমে কত টাকা পেয়েছিল জিজ্ঞেস না করতেই গড় গড় করে বলে যায়! যত নষ্টের মূল এই সব 'লে হালুয়া' কাগজ। এর চেয়ে সখের কাগজ না করে মেয়েমানুষের দালালী করুন,—কচি কচি ছেলেমেয়েগুলো অন্তত বাঁচে তাতে—

গ ঃ এক মিনিট বসুন—আপনি বড্ড রেগে গেছেন—

ভ ঃ এক মিনিট বসুন মানে? আমি এক মিনিটও এ জায়গা ছেড়ে উঠছি না,—যতক্ষণ না আপনি আমার মেয়ের এই ছবি ছাপার কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারছেন—

[সম্পাদক গদাধর হোড় পাশের ঘরে গিয়ে একজনের কানে কানে কি সব বলে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসলেন এঘরে]

গ ঃ কি বলছিলেন? কৈফিয়ৎ—উঁ?

[এমন সময় গদা! গদা!—চীৎকার কানে এলো]

পাশের ঘরের সেই লোকটি ঢুকল ঃ এই যে গদা? তণিমা দাস কে রে?

গ ঃ তণিমা?

সেই লোকটি ঃ হ্যাঁ রে বাবা। যার ছবির তলায় বিদুষী তরুণী না কি সব বড় বড় এ্যাডজেকটিভ ঝেড়েছিস?

গ ঃ তোর কি দরকার তাতে পলাশ—

পলাশ ঃ বেড়ে চেহারা!—সত্যি ছবিতে নামবে?—এক্ষুণি শর্মাদার বইতে heroine-এর রোল পেয়ে যাবে—প্রোডিউসারও শাঁসালো ; প্রথম চান্স দিচ্ছে বলে সে টাকা কম দেবে তা নয় কিন্তু—

গ ঃ না, মেয়েটি ছবিতে নামবে না—

প ঃ তোকে বলেছে? ছবিতে নামবে না তো ছবির কাগজে ছবি ছাপবে কেন?

গ ঃ মেয়েটি বলেনি ; মেয়ের বাবা এখন বলছেন যে আমাদের কাগজে তাঁর মেয়ের ছবি ছাপার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পেলে—বলছিলেন না আপনি?

ভ ঃ—ইয়ে—হ্যাঁ-আচ্ছা শর্মাদা কে?

প ঃ শর্মাদা হচ্ছে বাঙলা দেশের ডিসিকা।

ভ ঃ আপনার সঙ্গে আলাপ আছে শর্মাবাবুর?

প ঃ আলাপ? মেয়ের বাপ হয়ে কি আনসান্ বকছেন স্যার? আমার ভাল নাম পলাশ ; কিন্তু ডাক নামেই আমার নামডাক! কলকাতায় যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে শর্মাদা আজও আমাকে না জিজ্ঞেস করে কিছু করেন না। দুপুর বেলায় যাবেন কফি হাউসে,— মাইণ্ড ইউ, সবাই যেটায় যায় সেটায় শর্মাদা যায় না,—যেটায় দাম বেশি পাশের লর্ডস্-এ যান শর্মাদা ; গিয়ে দেখবেন শর্ম্মাদার ডাইনে বসে আছে বোঁচা আর বাঁয়ে,—[নিজেকে দেখিয়ে] এই অধম,—। লোকে যদিও বলে বোঁচা ওঁর ডান হাত,—কিন্তু আমি কনফিডেনসিয়ালি আপনাকে বলছি,—কাউকে ফাঁস কোরবেন না ;—শর্মাদার ডান হাত নেই

; He is real leftist,—এই বাঁহাতই তাঁর সব—

ভ ঃ প্রথম নামলে কত দেয়—?

গ ঃ ওসব কথা এখানে নয় ; পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে এপয়েন্টমেন্ট করে শর্মাবাবুকে দেখিয়ে দাও ওঁর মেয়ে—তারপর টাকাকড়ির কথা উনিই বলবেন—

প ঃ আসুন স্যার—

গ ঃ দাঁড়ান। আপনার মেয়ের কয়েকখানা ছবি পুজো সংখ্যায় ছাপব ভেবেছিলাম ; ছাপব কি?

ভ ঃ আমাকে আর কেন লজ্জা দিচ্ছেন স্যার—

[গদাধর হোড় ঠোঁটের কোণে হাসছে। টেলিফোন এল এমন সময়]

গ ঃ তেইশকোপ।

গো ঃ স্যার আমি গোবর্ধন,—গঙ্গা গাঙ্গুলী বলছেন যে উনি লিখতে রাজি আছেন ; তবে এখনি নয়। কারণ টাটকা টাটকা 'তেইশকোপ' 'লে হালুয়া'র নিন্দে করবার পরই সঙ্গে সঙ্গে লিখলে বড় দৃষ্টিকটু দেখাবে—

গ ঃ কত দেবে বলেছ?—[শুনলো টাকার অঙ্ক]—আরও আড়াইশো বাড়াও--দেবে না কে?—চাঁদির জুতো মারব আর লেখকদের নিয়ে আসব তেইশকোপে! টাকা দিলে লিখবে না? বাবা লিখবে।

গো ঃ ওঁর বাবা লেখে?

গ ঃ তুমিই আমায় ডোবাবে গোবর্ধন—তুমি আমায় পথে বসাবে!

[চারজন একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল]

গ ঃ কি সংবাদ ভগ্নদূত?

১ম জন ঃ গেছিলাম স্যার মিত্রা সেনের ইণ্টারভ্যু নিতে—

গ ঃ কি হল?

১ম ঃ ওঁর সঙ্গে কথা বলছি মনে করে সব লেখালেখির পর জানলাম--যে যার ইণ্টারভ্যু নিয়েছি তিনি উনি নন; সে ওর ঝি রঙ্গিনী—

গ ঃ চেহারা দেখেও সন্দেহ হল না?

১ম ঃ কি করে হবে? Make-up ছিল না যে! মিত্রা সেনকে তো মেক-আপ ছাড়া দেখিনি কখনও। ভাবলাম Make-up ছাড়া এরকমই দেখতে হবে বোধহয়—

গ ঃ যাক! নধরকুমারের সঙ্গে কবে ইণ্টারভ্যুর ডেট ঠিক হয়েছে?

১ম ঃ ডেট দিচ্ছে না স্যার!—অনবরত ঘুরোচ্ছে—

গ ঃ দরকার নেই নধরকুমারের ইণ্টারভ্যু করে।

১ম ঃ কি বলছেন স্যার?

গ ঃ যা বলছি তাই শোন! You are not to answer why,-you are only to question and die.

১ম ঃ তাহলে কার ইণ্টারভ্যু এবারে যাবে?

গ ঃ মিত্রা সেনের ঝি আর নধরকুমারের চাকরের!

সবাই একসঙ্গে ঃ গ্রাণ্ডিফ্লোরা!—দারুণ হবে স্যার!

গ ঃ শোন,—ঝিদের বস্তী আর চাকরদের বাসায় বিশ হাজার হ্যাণ্ডবিল ঝাড়ো ঃ মিত্রা সেনের ঝি আর নধরকুমারের চাকরের ইণ্টারভ্যু পড়ুন—ঝি চাকরেরা এখনও সেরকম 'তেইশকোপ' আর 'লে হালুয়া' পড়ছে না। এবার ওদেরও চাই।—যাও—[প্রথমজন বেরিয়ে গেল]

গ ঃ [দ্বিতীয় জনকে] কি খবর তোমার?

২য় জন ঃ এবারে 'এলেবেলে' কাগজটাই বাজি মেরে দেবে স্যার।

গ ঃ কি রকম?

২য় ঃ এই দেখুন [খবর কাগজের পাতা দেখায়] ; 'এলেবেলে'তে হলধর দাস উপন্যাস লিখছেন ; অথচ আমাদের কাগজ ছাড়া কোথাও লিখবেন না কথা দিয়েছিলেন—

গ ঃ এখনই হলাবাবুর কাছে গিয়ে জান কত টাকা এলেবেলে দেবে—যতই দিক,—বলবে আমরা আমাদের লেখার জন্যে যা দিয়েছি তা ছাড়া 'এলেবেলে'র লেখাটা বন্ধ করবার জন্যে তিনগুণ দেব—

৩য় জন ঃ আমাকে ডেকেছিলে?

গ ঃ শোন ভয় এবারে কেবল 'ভয়সা' কাগজকে।—'এলেবেলে' কাগজকে নয়। 'ভয়সা বেরুনো মাত্তর তুমি ১০০ কপি কিনে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে হাঁকবে ঃ তিন টাকার কাগজ সাড়ে ছ' আনায় নিয়ে যান যে চান যত চান!

৩য় ঃ কিন্তু ওরাও তো আমাদের কাগজ নিয়ে ওই কেলেঙ্কারী করতে পারে—

গ ঃ না, পারে না—

৩য় ঃ কেন?

গ ঃ কারণ,—তুমি এ কাগজের সম্পাদক নও ; তুমি হলে ওই কেলেঙ্কারীই হত!

৩য় ঃ তাহলে আপনি কোনও ব্যবস্থা করেছেন বোধ হয়—

গ ঃ বোধ হয় নয়, নিশ্চয়ই করেছি—

৩য় ঃ বলুন—

গ ঃ দুশো লোক রেডি করে রেখেছি,—কাগজ বেরুনো মাত্তর যারা পাতিরামের দোকানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাগজ পাঁচশোর বেশি একসঙ্গে কখনই Stall-এ দেব না। প্রত্যেক পাঁচশোয় কভারের রং পাল্টে যাবে ; তার সঙ্গে ওপরে বড় বড় টাইপে ছাপা রইবে ২য় মুদ্রণ, ৩য় মুদ্রণ ইত্যাদি। দশজন রেডি থাকবে হাত বোমা নিয়ে ; পুলিসকে আধঘণ্টার মধ্যে অকুস্থলে আনবার আয়োজন সম্পূর্ণ। প্লাস আরও একটা মতলব লুকিয়ে রেখেছি আস্তিনের মধ্যে, ইংরেজিতে ওরা যাকে বলে Some sleeve thing my up!

৩য় ঃ তাহলে—

গ ঃ কাগজ বেরুবে কুড়ি দিন আগে—

৩য় ঃ বুঝেছি! যাতে 'ভয়সা' কাগজ নিশ্চিন্তে ঘুমোয় আমাদের কাগজ বেরুতে দেরী আছে মনে করে ;—আর ইতিমধ্যে কচ্ছপ মেরে দেয় বাজি!

গ ঃ এবং তখন মালুম হয় যে সত্যি সত্যি 'ভয়সা' করে কার! আর কার?

[৩য় জন বেরিয়ে গেল ; মুখোমুখি বসে আছে তখন ৪র্থ ব্যক্তি ও গদাধর হোড়]

গ ঃ Now, bring the bag out of the cat।—লজ্জা কিসের? দেখি কি মাল এনেছ?

৪র্থ ঃ এই যে স্যার!

[কতকগুলো মারাত্মক রকমের উত্তেজক এবং প্রায় উলঙ্গ নারীদেহের ছবি বার করল]

গ ঃ গ্রা ল্যাণ্ডি!—মেরে দিয়েছি কেল্লা!

৪র্থ ঃ একটা কথা ছিল স্যার—

গ ঃ বেশী টাকা চাও,—এই তো? পাবে।—যেমন জিনিস তেমনই দাম, এই তো আমার জীবনের পলিসি! শরৎচন্দ্র বলে গেছেন মহৎ কার্য দ্বারা কখনও চালাকী করা যায় না!—তাঁর এই বাণীই আমার জীবনের মর্মবাণী—

৪র্থ ঃ না ;-সে কথা নয়—

গ ঃ তবে?

৪র্থ ঃ বলছিলাম কি স্যার, এধরনের ছবি ছাপলে অশ্লীল বলে পুলিসে ধরবে না তো?

গ ঃ আবার? একবার নাকে খৎ দিয়ে এসেছি কোর্টে। বেলতলা ন্যাড়ার কাছে কবার যায়? না। ক্যাপসনে মেরে দেব ;—বুঝলে? ক্যাপসনে মেরে দেব কোর্টে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা—

৪র্থ ঃ ক্যাপসনে?

গ ঃ হ্যাঁ! যেগুলো কম মারাত্মক ছবি, সেগুলোর তলায় পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই বলে যে শহরের রাস্তায় প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে কি ধরনের অশ্লীল উত্তেজক, ছোট ছেলেপিলেদের মাথা চিবিয়ে খাওয়া পোষ্টার, হোর্ডিং ইত্যাদি দেখা যায় তারই কয়েকটি নমুনা—

৪র্থ ঃ আর যে ছবিগুলো এর চেয়েও মারাত্মক?

গ ঃ সেগুলির তলায় পাঠক এবং ফটোগ্রাফারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই বলে যে, এই ধরনের ছবি কেউ যেন না পাঠান,—এ ধরনের ছবি 'তেইশকোপে' ছাপা হয় না কারণ এগুলি উত্তেজক চিত্র এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক! আমরা এ নমুনা ছাপলাম সতর্কবাণী উচ্চারণের কারণেই ; অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়—! পুলিসের বাবা কিছু করতে পারবে না কোর্টে নিয়ে গেলে—

৪র্থ ঃ কি বুদ্ধি স্যার আপনার!

গ ঃ তুমি এখন আসতে পার,—ওঘর থেকে পলাশকে ডেকে দাও।

[পলাশ ঢুকলো]

গ ঃ পলাশ,—সোল এজেন্টকে টেলিফোনে খবর দাও কাগজ বেরুচ্ছে।

প ঃ ২০শে সেপ্টেম্বর!

গ ঃ তুমি আমাকে ডোবাবে পলাশ ;—তুমিই আমায় পথে বসাবে!

প ঃ কেন?

গ ঃ কারণ? কাগজ বেরুচ্ছে ৭ই সেপ্টেম্বর—

প ঃ বুঝেছি,—'ভয়সা' চোদ্দ তারিখে বার করবে বলে বসে আছে আমাদের ২০শে বেরুবে এই বিজ্ঞাপনের ওপর ভরসা করে—

গ ঃ যাও, যা বললাম তাই করো, আমাকে আর বকিও না—

৭ই সেপ্টেম্বর বিকেল

হকার ঃ এই মাত্র বেরুল!—এই মাত্র বেরুল! তেইশকোপ! তেইশকোপ! সুন্দরী চিত্রতারকা হরণের চাঞ্চল্যকর সংবাদ!—আভি নিকালা। তেইশকোপ।

একজন পথচারী ঃ কিনবেন না। কিনবেন না।—চিত্রতারকা হরণের কোনও খবর ওতে নেই, আমাকে ওই বলে গছিয়েছে—

[ততক্ষণে হাত থেকে দামটা ছিনিয়ে নিয়েই ছুট দিয়েছে হকার চিৎকার করতে করতে]

হকার ঃ আউর একঠোকো ফাঁসায়া—চব্বিশ কোপ। এইমাত্র বেরিয়েছে,—সুন্দরী চিত্রতারকা হরণের চাঞ্চল্যকর সংবাদ। তেইশকোপ। তেইশকোপ। তেইশকোপ।

[বল্গাহীন জনতার মধ্যে হারিয়ে গেল হকার]

[১ম বর্ষ, পূজা-সংখ্যা-নয়, ২৮ আশ্বিন, ১৩৬৮]



মন নেই ভ্রমণে

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

পূজোর সময় দিল্লী-হিল্লী করে বেড়ানো প্রতি বছর যাদের পেশা আমাদের দেশের তারাই বড়লোক। "এবারে ছুটিতে কোথায় গিয়েছিলেন?" তার উত্তরে দারজিলিং কি পুরী, মুসৌরী কি রাঁচী, কিম্বা অন্তত শিমূলতলা, যশিডি অথবা বিকল্পে মধুপুর যাঁরা না বলতে পারবেন তাঁদের লজ্জা রাখবার জায়গা কোথায়? এবং ফিরে এসে বলতে পারা এবারে বেড়ানো কিছুই হোল না, আমার বাতের ব্যথাটা চাগালো, তার ওপর বিশেষ তার করে ওঁকে ফিরে যাবার তাগিদ জানালো সেক্রেটারিয়েট, এদিকে খরচা হয়ে গেলো একটা মেয়ের বিয়ের-- পূজোর ছুটিতে দেশ দেখার আনন্দের চেয়ে দেশ না-দেখার গালভরা কৈফিয়ৎ দিতে পারাতেই মিসেসদের চতুর্গুণ আত্মতৃপ্তি। বেড়াতে এঁরা যান না, ফিরে এসে না-বেড়াতে পারার গল্পটুকু রস দিয়ে বলতে পারলেই এঁদের পূজা-ভ্রমণ সার্থক। আরেকদল আছেন যাঁরা সাইকেলে কি পায়ে হেঁটে দেশভ্রমণে বার হন, শুধু মাত্র খবর কাগজে ছবি ছাপা হবে এই প্রত্যাশায়। এঁরা সকলেই কিছু রাঁচী যান না, কিন্তু পাগল প্রায় এঁরা সকলেই। দেশভ্রমণ নয়, কিসে করে গেলাম সেইটাই এঁদের কাছে বড়। রাঁচীতে সবাই ট্রেনে করে যায়, পায়ে হেঁটে রাঁচী না পৌছলে ঐ-জায়গায় বিশেষ করে যাওয়ার সার্থকতা কী?

আমি আশ্চর্য রকম ভ্রমণ-বিমুখ। তারও চেয়ে যা আশ্চর্য তা হোল, আমি এর জন্যে মোটেই লজ্জিত নই। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কোনও সাম্প্রতিকতম বই (আসলে আমি তিন-পেনির মজেদার ইংরেজি বই-এর উর্দ্ধে কোন কিছু পড়িনে কখনও কিন্তু প্রবন্ধের সময় ত' আর সেকথা লিখতে পারিনে) বাজারে বেরিয়ে গেছে কিন্তু আমি পড়িনি, সে জন্যে আমার অশেষ লজ্জা, কিন্তু আমি যে কখনো দার্জিলিং যাইনি, সে-জন্যে আমি কিছুমাত্র বিচলিত নই। পড়ার টেবলে জ্ঞানার্জনের জন্য যা কিছুই সংগ্রহ করি না কেন, টাইম-টেবলের সেখানে কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখিনে। রাঁচীতে বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে যাওয়া আমার কাছে ভয়াবহ। যদি রাঁচীর বায়ু কলকাতায় ফিরেও অপরিবর্তিত থাকে! না, রাঁচী কেন যাব? রাঁচীর বাইরে যারা আছে তারা কি রাঁচীর ভেতরে যারা আছে, তার চেয়ে কম পাগল? অভিজ্ঞতার জন্যে যার দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়, তার মত দৃষ্টিহীন লোক-আর

কে? কবিতার জন্যে চাঁদের মুখ চেয়ে থাকে যারা আজকের দিনেও, চাঁদা করে তাদের মাথায় চাঁটি মারা, ছাড়া সেই সব বিমূঢ়দের জন্যে, আমাদের আর কিং কর্তব্য? বর্নার্ড শ, 'এভারিবডিস পলিটিক্যাল হোয়াট্‌স্ হোয়াট' বইয়ের লেখক হওয়া সত্ত্বেও, অন্তত একটি কথা বুদ্ধিমানের মত বলেছেন যে, পৃথিবীর সবদেশের লোকই সমান, কাজেই দেশঘুরে বেড়ানো অভিজ্ঞতার জন্যে নেহাতই অনর্থক।

To Err is human—মানুষ মাত্রেই ভ্রম করে। কিন্তু মানুষমাত্রকেই ভ্রমণ করতে হবে, এ কেমন কথা? যেদিন থেকে মানুষ তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছে, সেদিন থেকেই সব তীর্থে পাণ্ডা এবং ষাঁড়েদের আগমন এবং দেবতার বিদায়। সারাজীবন ধরে যতরকম অপকর্ম সব করবার পর বুড়ো হলে যাদের তীর্থে যেতে হয়, মারা গেলে যে তাদের নরক যেতে হবে না এ-আশীর্ব্বাদ আর যেই করুক না কেন তীর্থ থেকে বিতাড়িত তীর্থের দেবতা নিশ্চয়ই সে-গ্যারান্টি দেন না। পৃথিবীর সেই সব আশ্চর্য দেশ যেখানে একটু কম লোক, আরেকটু হাত পা ছড়িয়ে বসবার মত জায়গা এখনও আছে, তারা আর থাকবে না ট্রাভেলিং ব্যুরো, রেল আর উড়ো-জাহাজের বিজ্ঞাপনে শহরের লোক যেই ভ্রমণে বেরুতে-শুরু করবে-এবং যত বেতো রুগী ভীড় করতে থাকবে পূজোয়, বড়দিনে, ইস্টারে। শেষের কবিতার অমিত রায় যত বড় ক্লাউনই হোক, সে যে বলেছিল তাজমহলকে ভাল লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার এই তার একটি মন্তব্য তার স্রষ্টার পক্ষেও মর্যাদাহানিকর হোত না। আগ্রা গেছি কার্যোপলক্ষে অনেকবার, তাজমহল দেখিনি আজও। পূর্ণিমার রাতে যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে প্রথাগতভাবে তাজমহল নিরীক্ষণ করিনি আজও বলে আমার মনে পূর্ণিমায় এখনও পাগলামী আসে, যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কাঁপন জাগায় এবং তার চেয়েও যা বড় কথা রবীন্দ্রনাথের সেই অপরূপ কবিতা তাজমহল (যার পরে নাম দেওয়া হয়েছিল সাজাহান) এখনও 'দেবতার গ্রাসে'র মত শুনলেই বিরক্তি আসে না। পুরীতে গেছি ছেলেবেলায়—মুখোমুখি ছিল সমুদ্র, জানালা পর্যন্তও বুঝি বা সমুদ্র তার সমস্ত হৃদয় বিস্তৃত করতো, কিন্তু তার বহুদিন বাদে যখন আবার গেলাম তখন আমার সেই সমুদ্র সম্মুখ বাড়ির সামনে আরো তিন সার অট্টালিকা, পুরীকে সেবার থেকে পরিহার করে চলতে শিখলাম মনুষ্য মধ্যে ভোজপুরীকে যেমন করি।

একদিন আমার দেশের লোক তীর্থে বেরুতো সম্পত্তি উইল করে দিয়ে। সেদিনও তীর্থ ভ্রমণে বেরবার একটা মানে হোত। তখন পথে ভয় ছিল, তাই পথে বেরুবার রোমান্স মরেনি। এমন কি বাণিজ্যে বেরিয়েছিলেন চাঁদ সদাগর, তার মধ্যে কবিতার উপাদান ছিল, ময়ূরপঙ্খী নামটার মধ্যেই যাদু আছে, সে ভাসবার আগেই আমাদের মনকে ভাসায়। যেমন উজ্জয়িনী নামটিতেই যেন কালিদাসের সব কবিতার শেষ কথা। কিন্তু আজ?—সাতদিন আগে থেকে আসন রিজার্ভ করে, বিপদের আগেই চেন টেনে বিপদ ডাকবার ব্যবস্থা করে পথের থেকে পাথেয়কেই আমরা বড় করেছি। স্টেশন থেকে চার মাইলের পথ অতিক্রমের জন্যেও তাই চার শত দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। ভাবলেও রোমাঞ্চ লাগে দীপঙ্কর বেরিয়েছেন দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের রৌদ্ররুক্ষপথে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে ; চৈতন্য গান গেয়ে নেমেছেন ঘর ছেড়ে পথে ; সেদিন পুরীর নাম যথার্থই ছিলো নীলাচল। কিংবা সুদূর চীন থেকে দূত এসেছে ক্রিডেন্সিয়াল হাতে নিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নয়, চোখে দেখবার নেশা নিয়ে বুকে জ্বালিয়ে রেখে দেখা-না-ফুরোবার আগুন ; আজকের রেল-যাত্রায় দুর্ঘটনার নাম শুনলেই লোকে আঁৎকায়, খবরকাগজ লম্বা সম্পদকীয় লেখে। অথচ মানুষের জীবন থেকে যেদিন দুর্ঘটনা বিদায় নেবে সেদিনই মানুষের সত্যিকারের মৃত্যু। যা ঘটবার নয় তাই সময়ে সময়ে ঘটে বলেই সাহিত্যের মত এত বড় দুর্ঘটনার জন্ম।

ট্রেনে করে বেরুবার মধ্যে যদি বা কিছু ভ্রমণের মাধুর্য আজও থেকে থাকে

উড়োজাহাজে বিহার থেকে সে মাধুর্য, সম্পূর্ণ উবে গেছে। জানবার আগেই না-জানা জায়গায় পৌঁছনর মধ্যে আর যাই থাক পথের আনন্দ নেই। ট্রেনে যেতে যেতে মাঠের মধ্যে বসে চাষার ছেলে যে অপকর্ম করে পৃথিবীর যে কোন ফিলমের চেয়ে আজও তা অনেক বেশি দ্রষ্টব্য কারণ তা অভাবিত ; আজকের সমাজের সাজানো মাপা বিধিনিষেধের তোয়াক্কা-না-রাখা বলে আপাতদৃষ্টিতে তা ভালগার কিন্তু Raw বলেই অনেক বেশি-রং তাতে ; মেসিনে কাটা নিখুঁত কিছুর চেয়ে হাতে কাটার এবড়ো-খেবড়ো যেমন অনেক বেশি মনোরম, এবড়ো-খেবড়ো বলেই।

ভ্রমণ খুবই খারাপ কিন্তু ভ্রমণের ওপরে লেখা বই ভ্রমণের চেয়েও খারাপ। বিলেত গেলেই ফিরে এলে বিলেতের ওপর বই লিখতে হবে,-সে আপনি লিখতে কলম ভেঙে ফেললেও, কারণ ব্যক্তিগত জীবনে আপনি একটুর জন্যে হয়ত টিপসই দেওয়ার হাত থেকে, বেঁচে গেছেন (অর্থাৎ ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ার ফলে সইটাই করতে শিখেছেন), তবুও বিলেত-বেড়ানো আপনাকে লিখতেই হবে, চেঁচিয়ে আর কজনকে জানাবেন, লিখে জানান তাই দশজনকে কিন্তু আপনার নীরেট অথবা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মত মাথায় একথা ঢোকে না যে চেঁচালে যদি বা দুচার জন শুনতে বাধ্য হত টেলারের লেখা বিলেতের ওপর বই দর্জিরাও পড়তে চায় না। এদানিং ভ্রমণের ওপর বই লেখার বাতিক বড় বেড়ে গেছে। সংবাদপত্রে ছোটদের পাতায় মেয়ে বা ছেলের দিদির বা মায়ের সঙ্গে ফোটো সহযোগে কলকাতা থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে দুর্গ দেখতে যাওয়ার প্রবন্ধ ছাপাবার অর্থ ভেদ অর্থাৎ দুর্গ ভেদ করা শক্ত নয়। কিন্তু হিন্দু হয়েও কবরে-এক-পা-দেওয়া বুড়ো যখন ফিরে এসে ইয়োরোপের সমস্ত মাধুর্য হরণ করতে থাকেন ইয়োরোপের ওপর প্রবন্ধ লিখে তখন করুণা হয় লেখকের ওপর, পত্রিকার ওপর, পত্রিকার সম্পাদকের ওপর, বইএর প্রকাশকের ওপর, এবং সবচেয়ে বেশি পাঠকের ওপর। ডিটেকটিভ গল্পের শেষে কি হোল তাই যদি কেউ আগে থেকে বলে দেয় তাহলে সে-গল্প পাঠককে ফের পড়তে দেওয়ার কী অর্থ হতে পারে? ইংল্যাণ্ডের কোথায় কি দ্রষ্টব্য আছে তা যে ইংল্যাণ্ডে যাবে সে ত নিজেই জেনে নিতে পারবে—তার জন্যে গাইডরূপ গোদের ওপর আবার সাময়িক পত্র প্রকাশিত অথবা বই হয়ে বেরুনো ইংল্যাণ্ড-ভ্রমণের বিষফোড়া কেন?

ভ্রমণের বই যারা লেখে তাদের তবু ক্ষমা করি। জানি স্বাভাবিক দুর্বলতা, নতুন বিয়ে করলে, বৌকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোর চেয়ে কম মারাত্মক ব্যাধি নয়, কিন্তু ভ্রমণে না গিয়ে যারা ভ্রমণের বই পড়ে বেড়াবার তৃষ্ণা মেটায় তাদেরকে আমার অশ্বত্থামার চেয়েও হতভাগা বলে মনে হয়। পিটুলিগোলা খাইয়ে দুধের তৃষ্ণা মেটাতে হয়েছিলো দ্রোণ-পুত্রের। আপনার আমার ছেলে অবশ্য আজকের দিনে কংগ্রেসের মহিমায় পিটুলিগোলা জল খেতে চাইলেও অন্য আরো কোন্ গোলা দিয়ে তা মেটাতে হবে ভগবান জানেন, কিন্তু সে-কথাও নয়—বিলেত না গিয়ে বিলেতের গল্প পড়ে রোমাঞ্চিত হওয়া কি অনেকটা বাস্তবে অভিজ্ঞতাহীন থেকে সেক্সের বই পড়ে উত্তেজিত হওয়ার মত নয়? ঘোলের অভাব কি কোন দিন দুধে মিটেছে?

অম্লমধুর

হেঁই মা,—

এবারেও তুমি এলে?

আমাদের বিজ্ঞাপন জুটছে না (অন্যান্যবার অনুরোধ-উপরোধে এক-আধ পাতা দিত। এবারে চাইতে গেলে অভদ্র ব্যবহার করছে), কাগজ বিক্রি নেই, পুলিসের গুঁতো, তবুও তুমি এলে? চালের দাম জান (খাদ্যমন্ত্রী যে জানেন না তা তাঁর বক্তৃতার তোড় থেকেই বোঝা যায়)? গজে তুমি আসছ—সেই জন্যেই নিউ থিয়েটার্স—আমাদের বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির অতীত—ট্র্যাডিসনের ট্রেডমার্ক গজ-টি বেসামাল নাকি? নৌকোয় যাচ্ছ?—রবিঠাকুরের 'নৌকাডুবি' এতদিনে সম্পূর্ণ হোল তা হলে? যে-রকম উপদ্রব চারদিকে, মনে হচ্ছে এবার অসুরই তোমার সিংহের মুখে-চোখে থাবা বসাবে—সিংহ তাকে কাৎ করতে গিয়ে নিজেই কুপোকাৎ। লক্ষ্মীর চেয়েও এবারে সরস্বতী চঞ্চলা, ব্ল্যাকমার্কেটে অব্যাহতি এখনও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশের হার হঠাৎ একদম প্রায় শূন্যিতে এসে ঠেকেছে! বাঙলার গণেশ উল্টেছে—তাঁর কথা ছেড়ে দাও। কার্ত্তিক জানে না তাঁর ময়ূরটি আসলে দাঁড়কাক—ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত! আর তুমিও মা জান না এবারে আমাদের দুর্গা পূজা নয়—এবারে আমাদের মা দুর্গতি—র পূজা!

তোমার

দ্বিখণ্ড পিতৃভূমি



—হ্যাঁরে! কাল রাত্রে এক প্লেট সন্দেশ আর এক প্লেট রসগোল্লা রেখেছিলাম রসগোল্লার প্লেটটা দেখতে পাচ্ছি না—কি করে এটা হোল বলতো?

—বোধ হয় অন্ধকারের জন্য অন্য প্লেটটা দেখতে পাইনি।



খবরকাগজ—খবরদার!

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

যে-কাগজে সত্যিকারের খবর ছাড়া আর প্রায় সব কিছুই থাকে তাকেই সব দেশে বলে খবর কাগজ। যেমন শুধু শাড়ি পরেন—মাত্র এই কারণেই আমরা অনেককে মহিলা বলে থাকি, তেমনি শুধু মাত্র দৈনিক একবার প্রকাশিত হয় বলেই অনেক কাগজ যা পত্রও নয়, সংবাদ বলতেও মাত্র দেশে দেশে, রাজায় রাজায় বিসম্বাদ বোঝে, তাকেই আমরা দৈনিক সম্বাদ পত্র বলতে একরকম বাধ্য হই। যাঁরা একথাকে অত্যুক্তি বলে মনে করবেন তাঁদের জন্যে আমার একটি গল্প মনে পড়ছে। গল্প আমার নয়, কার তা মনে নেই, তবে পড়েছি ঐ খবর কাগজেই। এক ছোকরা হকার রাস্তায় টেলিগ্রাম হাঁকছে 'জোর খবর, বাইশ জনকো ফাঁসায়া' শ্রোতাদের মধ্যে একজন টেলিগ্রাম কিনে রোজ ঠকে ঠকে কাগজ কেনা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলো, কিন্তু বাইশ জন ফাঁসাবার খবরে সে একটু উতলা হোল। বাইশকোপের চেয়েও আকর্ষণীয় বলে সে একানার একটি কাগজ কিনলে। কিন্তু হা হতোস্মি, ২২জন ছেড়ে একজনেরও ফাঁসবার খবর কাগজের কোথাও নেই। এমন কি আইন-আদালতের পৃষ্ঠাতেও নয়। ভারি রাগ হোল ক্রেতাটির। কিন্তু হকার তখন সেখান থেকে আরেক মোড়ে চেঁচাচ্ছে ঃ ২৩ জনকো ফাঁসায়া, জোর খবর। বাস্তবিকই ফাঁসবার জন্যে তবুও আমরা সকালে একদিন চায়ের সঙ্গে কাগজ না পেলে হাঁসফাঁস করছি।

মাসিক পত্রের বুঝি, সাপ্তাহিক পত্রেরও বুঝি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদ-চিত্রের তলায় বিজ্ঞাপনের অভাবে সম্পাদকের নাম দিয়ে জায়গা ভরাট করতে হয় বলেই একজন সম্পাদকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দৈনিক পত্রের কেন একজন সম্পাদক নিযুক্ত হয়, দৈনিক সম্বাদপত্র পড়েও আমি আজও তা বুঝতে অক্ষম। খবর কাগজ রোজ যত লোক পড়ে তার মধ্যে কজন খবর কাগজের সম্পাদকীয় পড়ে? তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই দৈনিক পত্রের সম্পাদকের মত যিনি সম্পাদকীয় ছাড়া খবর কাগজের আর প্রায় সবই পড়েন। দৈনিক পত্রের হোলো মানুষের হাতের মত head line-এই যা কিছু পড়বার। খেলার খবর, ঘোড়ার এবং সিনেমা স্টারের খবর এসবের খদ্দেরও অবশ্য কম নয় ; কিন্তু সম্বাদপত্র কি মূলত ঐ জন্যে রোজ বেরোয় না? পৃথিবীর ঘটন-অঘটনের ওপরে সাধারণের

প্রতিক্রিয়া যাতে সমাজের পক্ষে শুভ হয় সেই পক্ষে জনমত গঠন করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য প্রধান উদ্দেশ্যেই যে ব্যর্থ তার আবার অন্য সার্থকতা কী? বার্নার্ড শর নাটকের মত ভূমিকা পড়বার জন্যে যার নাটক পড়তে বাধ্য হওয়া, আসলে এ্যাপিল বিহীন একটী বাই-প্রোডাক্ট মাত্র। অসংখ্য লোকের হাস্যকর বাই ছাড়া খবর কাগজ আর কিসের প্রোডাক্ট বলুন?

আমি পৃথিবীতে আসবার পর এত বছর বয়সে দুতিনদিন যে সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করিনি এমন নয়, কিন্তু পুরো খবর কাগজ একদিনও পড়েছি, এমন কথা অশ্বত্থামাকে মারবার জন্যে আমি যুধিষ্ঠির হলেও বলতে পারতাম কি না সন্দেহ! কিন্তু খবর কাগজ পড়বই বা কেন? খবর কাগজ খুললেই পড়ছি জহরলাল ; অলইণ্ডিয়া রেডিও না খুললেও শুনতে পাচ্ছি জহরলাল ; সিনেমাতে আসল ছবি দেখবার আগেই দেখাতে হচ্ছে জহরলাল ; এমন কি কলেজ স্ট্রীটে যদি কখনো কোন দোকানে ঢুকছি তাহলেও সাইনবোর্ডে অঙ্কন জ্বল জ্বল করছে ঃ জহরলাল পান্নালাল। খবর কাগজ কেন পড়ব? এমনিই কি আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট কিছু কম আছে?

পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় এবং খবরের কাগজে কী না লেখে? খবরের প্রয়োজন আছে, কাগজও মানুষের দরকার, কিন্তু খবর কাগজ কেন? No-USE PAPER মানেই ত News Paper ; যারা লেখাপড়া শেখেনি, তারা খবর কাগজ পড়তে পারে না কিন্তু আশ্চর্য, যারা লেখাপড়া শেখেনি তারাই খবর কাগজ চালাবার সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র। পৃথিবী জুড়ে জীবিকার List-এ বেকারের পরেই জার্নালিস্ট। জার্ণালিষ্ট মানে সাংবাদিক। পৃথিবী জুড়ে মানুষের যতরকম বাতিক আছে, সাংবাদিকতার মত মারাত্মক কোনটাই নয়। গান্ধীজির ছবি ছাপতে হবে বিশেষ সংখ্যায়--ছবির ব্লক বার করে দেখা গেলো কপালের ওপর একটা গোল দাগ হয়ে গেছে। আপনি, আমি, মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই ঐরকম ছবি ছাপার চেয়ে বাতিল করে দেব। কিন্তু সাংবাদিক অমন ছবি লুফে নেবে। ছবি ছেপে, তলায় ক্যাপসনে কেল্লা মেরে দেওয়ার নামই ত সাংবাদিকতা। গোলদাগ পড়া গান্ধীর ছবির তলায় তাই পড়তে হয় আশ্রমের দ্বারে গান্ধীজী--প্রভাতের প্রথম রশ্মি তাঁর কপাল স্পর্শ করিয়াছে।

খবর কাগজের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক গুণ হোল হিরো ওয়ারশিপ ; আজকের যুগে--সিনেমা এবং টেলিভিসনের দিনে হিরোইন ওয়ারশিপ তবুও চলে কিন্তু হিরো ওয়ারশিপ নেহাৎই অচল। জহরলাল থেকে জহর গাঙ্গুলী অব্দি প্রত্যেক চুনোপুঁটিকে রুই-কাৎলা বানিয়ে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা একমাত্র খবরের কাগজেরই। আর এর জন্যে নির্লজ্জতার সীমা মানার ব্যাপারে খবর কাগজেরা প্রায় পাকিস্তান সরকারের মত--অর্থাৎ সীমানা অতিক্রম করাতেই বাহাদুরি আমরা নেহেরু যখন? নিশ্চিত করে জানি কালকেই তাঁর আজকের ঘোষিত কোন মত বদলাবেন--তখন খবর কাগজ সেইটে বোঝাবার জন্যে লেখে, Nehru firm in his stand ; হিরো ওয়ারশিপের চরম হোল খবরকাগুজে শোক-সংবাদ। কোন বড় একজন লোক মরে যাওয়া দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্য ; খবর কাগজের পক্ষে মস্ত একটা দাঁও। যেকোন সত্যিকারের সিচুয়েশানাল হিউমার সিনেমা-ডিরেক্টরের বাহাদুরিতে প্রায়ই ঐ গল্পের লেখকের পক্ষে অব্যক্ত ট্র্যাজেডীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে কোন সত্যিকারের শোক-সংবাদ শুধুমাত্র খবর কাগুজে পরিবেশন গুণে--লরেল হার্ডির গোপাল ভাঁড়ামোকেও হার মানায়। আপনি যখন দেশের নেতার জীবন সংশয়ে গান্ধীজীর নির্দেশ মত প্রার্থনা করে মরছেন--তখন কিন্তু খবরকাগজের শোক সংবাদ কম্পোজ হয়ে আছে শুধু খবরটা এলেই হয়, মুসলমানদের ঈদের চাঁদ ওঠবার জন্যে খাই-খাই-প্রতীক্ষার মত। আর বড় জুতোর--ব্যবসায়ীর মৃত্যুতেও যা সম্পাদকীয়--বড় নেতার মৃত্যুতেও সেই

জুতো-অর্থাৎ সেই জুতো-ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে যা লেখা হয়েছিল তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অদলে বদলে কালো বর্ডার দিয়ে ছাপা।

মানুষের কান--চোখের মাথা খাওয়ার জন্যে যেমন ইয়ার-স্পেশালিস্ট, 'I' স্পেশালিস্ট তেমনি খবর কাগজেরও এস্পেশাল সংখ্যা--শারদীয়া দোল ইত্যাদি। দুর্গাপুজো বন্ধ হতে পারে কিন্তু পূজো স্পেশাল?--রামচন্দ্র! যতদিন বাটা-টাটা টি বিজ্ঞাপন আছে--রবীন্দ্র নাথের অপ্রকাশিত রচনা আছে ততদিন বন্ধ হবার নয়। পাঁজি সম্বন্ধে লোকের ধারণা, কতকগুলি বিজ্ঞাপনের বাণ্ডিলের সঙ্গে কতকগুলি সময়ের ঘণ্ট-নির্ঘণ্টের আণ্ডিল মাত্র,--পাঁজি যদি তাই হয়, খবর-কাগজের পূজো স্পেশাল তবে কি?--পঞ্জিকার 'প' স্থানে 'গ' বসালেই তবে পূজো-স্পেশালের নেশাটা কি তা বোঝা সম্ভব হয়। তাই বলি পাঁজি বছরে একবার নয়, দুবার বেরোয়--একবার গুপ্ত প্রেস, পি. এম. বাকচি এঁরা বার করেন--আরেকবার দৈনিক কাগজওয়ালারা। প্রথমটায় শুধু তথ্যের বোঝা--দ্বিতীয়টায় তথ্যের ওপর তত্ত্ব, বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

অনেক লোকের, অনেক স্ত্রীলোকেরও কাছে খবর কাগজ না পড়া মানে দুনিয়ার অগ্রগতির থেকে পিছিয়ে থাকা। বার্নার্ড শর নাটক না পড়ার মানেও তাই। অন্তত বিজ্ঞাপন দাতা তাই বলছেন। আগে এসব শুনলে আমি ঘাবড়াতাম। প্রাণপণে চেষ্টা করতাম প্রোগ্রেসিভ হবার জন্যে। "আজ সকালে কাগজে বেরিয়ে গেছে--তুই পড়িসনি?"--শোনবার ভয়ে আমি না পড়েও মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বলতাম। জানতাম যে বলেছে সেও পড়েনি! কাজেই ভয় নেই। কিন্তু আর নয়। খবর কাগজ বা বার্নার্ড শর নাটক পড়লে লাভ কি হয় জানি না, তবে ক্ষতি যে হয় না এখন তা বুঝি। স্পেনের ফ্র্যাঙ্কোর সঙ্গে কে বন্ধুত্বের সাঁকো গড়তে চায় আর কে পাঞ্জা লড়বার বাসনা পোষণ করে--এ-খবর আর রোমাঞ্চ সিরিজের সাঙ্কো পাঞ্জার লড়াই--দুই আমার কাছে আজ সমমূল্যের।

খবর কাগজের প্রথম পাতা হলো প্রেমের উপন্যাসের ছিঁড়ে যাওয়া শেষ পাতার মত--না পড়েই বলে দেওয়া যায় ওতে কি আছে। আজ সকালে চার্চিল কোথায় কি বকে মরেছেন--তা পড়ার চেয়ে হাজার বারের বার রবি ঠাকুরের কোন পুরনো কবিতা আবার পড়ি ঃ যেদিন হিমাদ্রি শৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়। এ কবিতা কখনো পুরোনো হয় না। আর খবর কাগজ পুরোনো না হলে কোন কাজই দেয় না--এমন কি বিক্রী করাও চলে না ওজন দরে।

জাত সাহিত্যের জাত গেছে সেই দিনই, যেদিন রবিবারের জন্যে ম্যাগাজিন সেকসন আবিষ্কৃত হয়েছে দৈনিক পত্রে। রবিবারের সমস্ত মাধুর্যও গেছে সেইদিন থেকে। ঘোড়ার, খেলার, সিনেমার, রাজনীতির পাত্রঅপাত্রের জবডজঙ্গের মধ্যে একটি কবিতা, গল্প, আর দুর্বোধ্য প্রবন্ধ, যেন এক বালতি গোময় মধ্যে এক ফোঁটা দুধ ফেলে দেওয়ার অবিমৃষ্যকারিতা। বিষফোড়ার তলায় গোদও আছে ; ছোটদের পাতা মেয়েদের পাতা,--এঁটো পাতার মতোই নাকি বমনোদ্রেক কারী। আজকাল আবার হাত পা দেখার জন্যেও ফিচার শুরু হয়েছে--যাতে রাশি লগ্ন, কোন বিচারই বাদ নেই। বুড়ো থেকে সদ্যোজাত সবাই এসে খোঁজে অমুক দিনের কাগজটা পাওয়া যাবে মশাই। বলি,--কী দেখতে চান?--এ শতাব্দী কেমন যাবে--ওইটে ত? দন্তবিহীন গণ্ড বেলুনের মতই ফুলে ওঠে--বোধ হয় একটু বাদে চুপসে যাওয়ার জন্যেই হবে।

খবর কাগজের যা কিছু মজা, তা বিজ্ঞাপনে, যা কিছু মজানোরও--তাও ঐতেই। সেখানে সাবানের বিজ্ঞাপনে সার্টিফিকেট নেই কোন চর্মবিশেষজ্ঞের--দন্তমধুর ছবি আছে কোন অভিনেত্রীর। ব্রেডের বিজ্ঞাপনে রবি ঠাকুরের মতই হয়ত কোন কবির সার্টিফিকেট--কিন্তু বই পড়ে অভিমত জানান সেখানে রাজনৈতিক নেতা। বগলের চুল কিসে সাফ হয়

বিনা ক্ষুরে—তারই সুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপনের পাশেই—অর্থাৎ বগলের কলমেই সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে লম্বা আধ কলম মজাদার বিজ্ঞাপন। আমাদের মা-বাবারা যে আমরা নিরুদ্দেশ হলেই-মৃত্যুশয্যায় একজন এবং আরেকজন উন্মাদ অবস্থায় থাকে, এ-খবর একমাত্র খবরকাগজ পড়েই তবে জানা যায়। নিরুদ্দিষ্ট ছেলে ফিরে এলে তার পিঠে কতগুলি পাখা যে ভাঙে সে খবর অবশ্য খবর কাগজে বেরয় না। তবে নিরুদ্দেশ—কলমে বিজ্ঞাপনের যা রেট—তাতে অকালকুষ্মাণ্ড ছেলের জন্যে বিজ্ঞাপন দেবার পর মৃত্যুশয্যায় শোয়া বা উন্মত্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

কতকগুলি ক্যাবলাকান্ত আজকাল খবর কাগজের পাতায় রস পরিবেশনের নামে ওয়েশিশকে মরুভূমিতে রূপান্তরিত করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবোলতাবোল বকবার প্রেরণায় বদ্ধপরিকর। খবর কাগজের বাংলা এবং ইংরেজি পড়ে আমাদের এমনিই যথেষ্ট হাসি পায় —হাসির ওপর আবার এই অতিরিক্ত হাসি—রাশি রাশি হাসি—(কিম্বা হাসি রাশি রাশি) বড়ই করুণ। ভগবান কিম্বা খবর কাগজের ইল্লিটারেট মালিক করুন যেন এই রসিকতা কখনো না বন্ধ হয়।

আমাদের দেশে সাধারণত দুধরনের কাগজ ; এক—সাহেবদের, দুই মোসাহেবদের। সাহেবদের কাগজে তাদের স্বার্থে কিছু কিছু সত্য কথা বেরোয়। মোসাহেবদের কাগজে কখনই নয়। কলকাতায় স্ট্রাইক হয়ে ট্রাম চললনা—আমরা দাঁড়িয়ে দেখলাম—সাহেবদের কাগজ তারই ছবি ছাপলো—কিন্তু মোসাহেবদের কাগজে বেরলো শতকরা ৪৫খানি ট্রাম স্বাভাবিক ভাবেই চলিয়াছিল—অর্থাৎ শতকরা ৯৫টি মিথ্যা সংবাদ ছাপা মোসাহেবদের কাগজের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছুই নয়। সাহেবদের কাগজে যদি সুপরিকল্পিত একটি নোতুন ফিচার আরম্ভ হয়—কলকাতার কি আর কোন জায়গার অল্পপরিচিত মানুষ বা দ্রষ্টব্য বিষয় নিয়ে-মোসাহেবদের কাগজে তার পরিকল্পনাহীন একশো একটি অনুকরণ সঙ্গে সঙ্গে।

ভূত পৃথিবীতে আছে কি না সত্যিই—এ-প্রশ্ন বাহুল্য মনে হয় ছাপাখানায় ঢুকলে। ছাপাখানার ভূত আসলে ভূতের চেয়েও বেশি-অদ্ভুত। শুধু ডেভিল আজকের মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে শহরের সব চেয়ে ভাল রেষ্টুরেন্টেও আট—দশানার বেশি নয়, কিন্তু সামান্য প্রিন্টার্স ডেভিলও সময়ে সময়ে কারু কারুর পক্ষে কত costly হতে পারে তা আপনাদের জানা নেই।

খেলার খবরের কলমে খেলার খবর ত বেরুলই—একদিন সেই সঙ্গে আরোও একটি অতিরিক্ত খবর বেরুলো ঃ গাগলু বাবুর অতি অবশ্য যাইবে। "অর্থাৎ Newsটা খবর কাগজের কোন ইম্পর্টান্ট লোকের মারফৎ এসেছে, খবরটা ছাপা হতেই হবে—সব এডিটর গাগলুবাবুকে খুশী করবার জন্যে Press matter-এর ওপর নোট দিয়েছিলেন, কম্পোজিটার সাব-এডিটরকে খুশী করবার জন্যে কি গাগলুবাবুকে সাবোটাজ করবাব জন্যে কি জানি—সেটা শুদ্ধু কম্পোজ করলে এবং পরের দিন সকালে—।

কুকুর মানুষকে কামড়ালে কোনও খবর হয় না—মানুষ কুকুরকে কামড়ালে তবেই 'খবর' বলেছেন এ-লাইনের একজন প্রাতঃস্মরণীয়। আজকেব দুনিয়া জুড়ে দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ কুকুরকে কামড়ালেও কি সত্যিকারের কোন খবর হয়? হয় না। বরং কুকুর যদি আজ মানুষকে কামড়ায় তবে একটা খবর সত্যিই এই হয় যে ক্যালপার্টি মানুষকে নির্বাচনে জেতার জন্যে শুধু রাজনৈতিক দলের অতি উৎসাহী সাপোর্টাররাই আজকাল আঁচড়ায় কামড়ায় এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

তিনটে, দুটো, নটায়

আর কাঁহাতক? ছবি দেখানোর নাম করে শুধু জলছবি দেখানো!

'অনুপ'-ম খারাপ অভিনয়ে সমৃদ্ধ বাংলা ছবি! **পলাতক**

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

বাড়ি নিয়ে গিয়ে কেউ খাবার ঠিক আগে যদি বলে, মাছ-মাংস যোগাড় করতে পারিনি, মাফ করবেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করা যায় যদিবা, নিজেকে মার্জনা করা চলে না বে আন্দাজের অবিমৃষ্যকারিতার কারণে। গলায় তুলসীর মালা, কপালে ফোঁটা-তিলক, গায়ে নামাবলী দেখেই বোঝা উচিত ছিলো যে মাংসাশী লোকের পাতাপাড়ার জায়গা আর যেখানেই হোক, কোনও বৈষ্ণব-গৃহ তার উপযুক্ত স্থান নয়। যাত্রিক নামে কারা জানি না, (পলাতক) ছবির গোড়াতেই লিখে দিয়েছে, অবাস্তব ও অতিনাটকীয় কাহিনী। বাংলা ছবি, মনোজ বসুর গল্প, তাতেও, অবাস্তব ও অতিনাটকীয় কাহিনী লিখে দিতে হবে কেন বুঝলাম না। রবীন্দ্রসংগীত বলবার পর, রচনা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এতটা আকাশবাণী, কলকাতা কেন্দ্রকেও বলে দিতে হয় বলে শুনিনি। যাত্রাওলা, না কি যাত্রিকওলারা এর আগে 'কাচের স্বর্গ' বলে একটা ছবি করেছিল যেটি কিছুটা দেখে আমি লিখেছিলাম, অবাস্তব ও অতিনাটকীয় কাহিনী। এবার আমাকে নিরস্ত করবার জন্যেই কি না কে জানে, পর্দা জুড়ে প্রারম্ভেই তাই বুঝি দেগে দেওয়া ওই কটি কথা ঃ অবাস্তব ইত্যাদি।

কিন্তু সত্যি সত্যি যদি অবাস্তব আর অতিনাটকীয় একটি কাহিনী বাংলা বই অথবা ছবিতে সাক্ষাৎ করতে পারতাম, তাহলে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ, বর্তমান লেখনী যার, সে নিজেকে লুটিয়ে দিতো সেই সৃষ্টির পায়ে। বাস্তব ও নাটকীয় কাহিনী বলতে গিয়ে অবাস্তব ও অতিনাটকীয় গপ্পোই এযাবৎ বাংলা ছবির কপাল! যদি সত্যি সত্যি আগে থেকে বোলে কেউ, অবাস্তব ও অতিনাটকীয় কাহিনী জন্ম দিতে পারত, তাহলে বাংলা ছবির কপাল এবং আমার কলম প্রথম ফিরে যেত। তা হয় না। অন্তত মনোজ বসু এবং যাত্রিকের তা কম্মো নয়। এই দুয়ের যোগসাজসে যা হয়, পলাতক তাই হয়েছে। ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত। বাড়ির বাচ্চা ছেলেরা গোঁফ-দাড়ি পরে রবি ঠাকুরের রিডিক্যুলাস Raw চোনা, বিসর্জনের পালায় নামলে যা মানায়, ধেড়েরা যখন তার উল্টোটা করে, মাকুন্দ সেজে হ-য-

ব-র-ল আওড়ায়, তখন ইচ্ছে করে দিই কানটা মুলে। বাংলা ছবির যারা কর্ণধার তাদের কান মুলবারও উপায় নেই। দুকান যাদের কাটা তারাই ফিল্ম করে। দুকান নেই এবং নাকটা পর্যন্ত যাদের ক্ষয়ে গেছে তারা করে বাংলা ফিল্মের কাগজ।

'পলাতক' ছবির পেছনে পয়মাল আছে যারা তারা যদি অবাস্তব ও অতি নাটকীয় কাহিনী নিয়ে ছবি করবার ক্ষমতা রাখতো, তবে এছবির নাম হতো, আংটি চাটুজ্যের ভাই। তাতে যে অবাস্তবতা ও অতিনাটকীয়তা থাকত, পলাতক ছবির আদ্যন্ত তা কোথাও নেই। পলাতক সিনেমাটিক, গতানুগতিক নাম। তাছাড়া, পলাতক নামের মধ্যে কাহিনীটাই বলে দেওয়া হয়েছে। নাম দেবার ক্ষেত্রে যা কখনও সাহিত্যের ব্যাকরণসম্মত ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথ তিন পুরুষ গল্পের নাম যোগাযোগ দিতে গিয়ে নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছিলেন, বিষবৃক্ষ নাম ঠিক হয়নি। কারণ গল্পের মর‍্যাল সেনামে গল্পকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করেছে। কিন্তু, কৃষ্ণকান্তের উইল,—এ নাম ঠিক হয়েছে। কারণ সমস্ত দুর্ঘটনার মূলে ওই উইল অথচ ওই নাম থেকে গল্পটা কি, তা বোঝা যায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা কোন্ বেনাবনে ছড়াচ্ছি। বিদ্যাসাগরের সংগে বর্ণপরিচয় এই তো সবে হোলো বাংলা ছবির। রবীন্দ্রনাথের সংগে পরিচয় হতে পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এবং আমরা যখন অপেক্ষা করবই, তখন সেকথা এখন থাক!

তার বদলে এখন হোক সেই কথা, পলাতক কেন বোহেমিয়ানের উজ্জ্বল ছবি হতে গিয়ে, সেই, চিরন্তন নাকে কাঁদার জলছবি হলো! সেইটেই আসল কথা। তবে প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আংটি চাটুজ্যে নামে এক অপুত্রক দোর্দণ্ডপ্রতাপের ভাই এই চির পলাতক বসন্ত চাটুজ্যে। ঘর তাকে বাঁধতে পারে না। বারবার সে পালিয়ে যায় বৌদির স্নেহ, দাদার শাসন থেকে। কেন পালাতে চায়, তার কোনও হেতু নেই কেন? একমাত্র এই কারণ হতে পারে যে তার মরা মায়ের চোখ দুটো খুঁজে বেড়াতে। যদি কোথাও পাওয়া যায়। এহেন পলাতককে ছবিতে কোথাও পালাতে দেখলাম না। এক জায়গায় গেল এবং সেখানেই গেড়ে বসল! মাঝখানে একবার মাতাল ঝুমুরুলিকে বললো তার চোখ দুটো বসন্তর মায়ের চোখের মতো। একথা বলবার আগে পর্যন্ত সেই মেয়েটার সংগে বসন্তর ব্যবহার যা, তা কোনও মায়ের সংগে কোনও ছেলে করতে পারে প্রফুমো-স্ক্যাণ্ডালের পরেও আমার তা ধারণার বাইরে। এবং সমস্ত মানবজাতি সম্পর্কেই তা ভয়ের কারণ বলে আমি মনে করি।

যাই হোক। চির পলাতক বসন্ত চাটুজ্যে সেই এক জায়গায় থেকে গেল না শুধু, সেখানকার কবিরাজের কন্যাকে বগলদাবা করে বাড়ি এসে বললো, বিয়ে করেছি। তারপর বসন্তকে বাঁধবার পরামর্শ দিচ্ছে যখন বড় বউ ছোটো বউকে, তখন তা শুনলো এবং রাতে গান শোনানোর অছিলায় পালালো। ফিরে এলো মুখে রক্ত তুলে ঝুমুরুলির গাড়িতে। ফিরে এসে দেখলো তার বাচ্চার অন্নপ্রাশন হচ্ছে এবং বউ মারা গেছে! ওই অবস্থাতেই গরুর গাড়ির চাকাকে কাদায় বসে যাওয়া থেকে মুক্তি দিলো, বাচ্চাকে তুলে নিলো তুলোর মতো হাল্কা করে, সাংঘাতিক হাসলো এমন যা শুনে আমারই হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগলো এবং তারপর নৌকায় গিয়ে পড়তেই মরে গেল। মরা লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে বেহুলাহীন নৌকা ভেসে চললো।

এই গল্পের মধ্যে যত অসংগতি তত তারা আকাশে অথবা অত পকেটমার ধর্মতলায় নেই। যে লোক ঘরের বাঁধন মানে না, পথ যাকে টানে, সে এমন কোনও বেদনা নিশ্চয়ই বহন করে যা সাধারণের দুঃখ নয়,—এটা হওয়া চাই-ই। এ না হলে খামোকা একটা লোক যার অন্নবস্ত্রের সমস্যা নেই সে পথেবিপথে বেঘোরে মারা পড়ার রিস্ক নেবে কেন। রবীন্দ্রনাথ এমন এক পথক্ষ্যাপার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। শোভনলাল। কিন্তু সে-ও কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়ে তবেই পথে ছিটকে পড়েছিলো। যৌবনবেদনারসে উচ্ছল দিন ক্ষইয়ে দিতে চেয়েছিলো পায়ে পায়ে। শোভনলালের মানে হয় ; বসন্ত চাটুজ্যের মানে

হয় না। যদিও মেয়েদের কাছে, অবাস্তব ও অতিনাটকীয় কাহিনী লিখে দেওয়া পলাতকের বসন্ত চাটুজ্যেকে উপস্থিত করার অর্থ হয় প্রচুর।

যদি লেখক বা পরিচালক বলেন যে আংটি চাটুজ্যের ভাই জন্মেই বলতে চেয়েছে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে, তাহলে বলব যে, তার প্রস্তুতিপর্ব ছবিতে দেখানো উচিত ছিলো। বস্তুতঃ এ ছবিতে নায়কের গানে এবং কথায় ছাড়া আর কোথাও বসন্ত যে চিরপলাতক বালক তার কোনও পরিচয় আমি পাইনি। বরং আমার মনে হয়েছে মেয়ে হ্যাংলা একটা ছেলে সারাক্ষণই মরা মায়ের চোখ খোঁজার নামে নোংরামি করার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দাদা-বউদির শাসন ও সোহাগ, মায়ের মাতৃবেদনা, বসন্তর অস্থিরচিত্ততার উৎসকে অবারিত করার সুযোগ দেয়নি চিত্রনাট্য এবং তাতেই মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে এছবির। তা হবারই কথা। কারণ চিত্রনাট্য সেই কেবল করতে পারে, এজগতের বিচিত্রনাট্যের সংগে যার যোগ অন্তরের। চিত্রনাট্যই এযুগের সাহিত্যকর্ম।

কিন্তু এসব আমি ক্ষমা করি। সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে ছাড়া এসব কথা তোলার কোনও অর্থ হয় না। কারণ ডিটেলসের পার্ফেকসান সত্যজিৎ-সামর্থ্য ছাড়া অসম্ভব। তাই বাংলা ছবিতে ও ত্রুটি এখনও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু 'অনুপ'-ম খারাপ অভিনয়, তার কি? অনুপ কখনও খারাপ অভিনয় করেছে, এত খারাপ, এ আমার স্বপ্নের অগোচর ছিলো। এই কি বোহেমিয়ানের রোল? জীবনপুরের মানুষ বলেছে যতবার হাত পা ছুঁড়ে অনুপ, ততবার আমার মনে হয়েছে অনুপ বলতে চাইছে, একবালপুরের চ্যাংড়া আমি।

পরিশেষে পাঠকের কাছে, পাঠিকার কাছে নয়, আমার কিছু প্রাপ্য আছে। সম্প্রতি এক বৌদ্ধভিক্ষু আগুনে বসে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার ছবি ও ত্যাগের বিবরণ বেরিয়েছে জগৎ জুড়ে খবরকাগজে। আড়াই ঘণ্টার ওপর সিটে বসে পলাতক দেখেছি আমি। বৌদ্ধভিক্ষুর চেয়ে আমি কম কিসে?

[৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ আগস্ট, ১৩৭০]



রাতকানা ঃ এই মিনু! কালরাতে ভুল করে আরেকটু হলেই তোমার মাকে জড়িয়ে ধরেছিলুম আর কি....।

অতিরিক্ত সুসমাচার

একজন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনারা যে 'সুসমাচার' বলে একটা ফিচার ছাপেন তা মশাই সুসমাচার মানেটা কী?

তাকে বলিনি কিন্তু বলা উচিত ছিল, মানে নেই কিছু। মানে নেই বলেই ছাপা হয় ; মানে থাক্‌লে সেটা ছাপবার মানে হতো না কিছু। মানেও থাকবে আবার ছাপাও হবে এরকম অতিপক্ষপাত করতে আমরা রাজি নই কিছুর ওপর। বিশেষ এই ইমারজেন্সির বাজারে, যখন সব কিছু সঞ্চয় করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য, যখন ওয়েস্টেজের চাইতে বড় অপরাধ কিছু নেই, যখন নেতাদের পর্যন্ত শ্যাম ও কুলের মত পার্টি এবং গোবরমেণ্টের দুটিকেই বজায় রাখতে দেওয়া হচ্ছে না—একটিকে তালাক দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

কংগ্রেসের চাইতে ঢের আগেই আমাদের wrong race-এ অর্থাৎ লেখকগোষ্ঠিতে কামরাজ নাদার প্ল্যান চালু হয়ে গেছে ; লেখার যদি মানে থাকে তো ছাপা হবে না, আর যদি ছাপা হয় তবে মানে থাকা চলবে না। লেখাতেও অর্থ থাকবে আবার তা ছেপে এবং বিক্রি করে পুনরায় অর্থ আসবে এরকম ডবল ট্যাক্সেশন আমরা অনেকদিন আগে রদ করে দিয়েছি।

কাজেই 'সুসমাচার' কথাটার মানে থাকা নীতিগতভাবে অসঙ্গত। কিন্তু মানে না থাকলেও মানের ইঙ্গিত থাকতে দোষ নেই। অর্থ না থাকুক অর্থাভাস। মন্ত্রীত্বের বদলে কমিটির মেম্বারশিপ!

সুসমাচারের অর্থাভাস শব্দটির মধ্যে দৃশ্যত উঁকিঝুঁকি মারছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সুসমাচার আসলে একপ্রকার আচার বই নয়।

আচার কী দিয়ে তৈরি হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকে না। আম কিংবা আমড়া, কুল কিংবা তেঁতুল, এমন কি উচ্ছে কিংবা বাঁধাকপি দিয়েও আচার বানানো রীতিসম্মত। মিষ্টি এবং টক, ঝাল এবং নোনতা, কোষ্টে এবং তেতো সব রকম আস্বাদের সংমিশ্রণ একমাত্র আচারেই সম্ভব! ভারততীর্থ এবং আচার—দুনিয়াতে মাত্র এই দুটি ক্ষেত্র আছে যেখানে সব কিছুর ব্লেণ্ডিং দ্বারা পাতে দেবার মত একটা হরেকরকম্বা জগাখিচুড়ি বানানো হয়ে থাকে।

অতএব বুঝতে পারছেন যে সুসমাচার—যা আসলে অচলপত্রের মেনুকার্ডে একমাত্র আচার—বলতে কখন কী পরিবেশন হতে পারে তা আগে থাকতে আন্দাজ করা অসম্ভব। আপনি যখন আমের আচারের প্রত্যাশায় জিভ টক্‌টক্ করে লালাসিক্ত হয়ে আছেন তখন হর্তুকির আচার মুখে পড়লে বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু প্লীজ, ক্রুদ্ধ হবেন না যেন। কারণ, আমরা কেবলমাত্র আচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিসের আচার সেকথা কদাপি বলিনি।

।। ভূমিকা ২।।

এখন পর্যন্ত না বললেও এইবারে আমি বলতে উদ্যত হব। অবিলম্বে আপনাদের কাছে নিবেদন করব আমার অদ্যকার আচারের রিসিপি। সায়ন মতে লক্ষ্মীপুজোর মুখোমুখি এবং নিরয়ণ মতে পিতৃপক্ষ শুরু হব হব এমন 'ঘরেও নহে পারেও নহে' [রাষ্ট্রভাষায় অনুবাদ : না ঘরকা না ঘাটকা] পূজা মরশুমে প্রকাশিত পূজা-সংখ্যা-নয় অচলপত্রে এবারকার সুসমাচারের বিষয়বস্তু হল...আচার।

বিবেকানন্দ অথবা রবি ঠাকুর অথবা আর কেউ হবে সেই যে বলেছিলেন, বাঙালী আচার-সর্বস্ব জাতি—তাতে আমার ক্রমেই বেশি করে বিশ্বাস হচ্ছে। আগে ভাবতাম বাঙালী

নয়, বাঙালিনী সম্বন্ধেই ও-কথা খাটে। ব্যাটাছেলে কবে আবার আচারের নামে আছাড় খায়? লোকাচার এবং লঙ্কার আচার দুই-ই তো লেডিজ স্পেশাল। এই জন্যই তো আচারকে সাধু ভাষায় বলে স্ত্রী-আচার! আচারের চার ফেলে মেয়েদের বঁড়শীতে গেঁথে ফেলা—আমার এক বহুদর্শী বন্ধুর কাছে শুনেছি—খুবই সোজা কাজ। কিন্তু পুরুষমানুষের? আচার কেন আচার্য দেখেও পুরুষ সহজে ইন্টারেস্টেড হয় না। পুরুষরা স্বভাবতই অতিমাত্রায় অনাচারী জীব। এই কথাই বহুদিন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন আর নেই।

নেই কারণ পুরুষ মানুষকেও আমি আজকাল মাঝে মাঝেই আচারের প্রতি লোলুপ হতে দেখছি। না, আম-জাম-তেঁতুল-জলপাইয়ের আচারে নয়, সে-সকল আচারে অভিনিবিষ্ট পুরুষের সংখ্যা এখনও নগণ্য ; কিন্তু সাহিত্যের আচারে জিহ্বা-লেহন করতে এখন পুরুষকেও কম দেখছি না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাহিত্যের আচারও ছিল আমের আচারের মত ; শোভনানন্দ ব্রহ্মচারীর মত এদের ভক্তকুল ছিল প্রমীলাবাহিনীতে পরিপূর্ণ ; কিন্তু সম্প্রতি মফঃস্বল হাসপাতালে মেল নার্সের মত সাহিত্য-আচারের সেবকবৃন্দের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুংলিঙ্গ শব্দের ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে। আচার আর বেশিদিন স্ত্রী-আচার থাকবে বলে মনে হয় না।

আপনি যদি এখনও সাহিত্যের আচার বস্তুটি চিনতে না পেরে থাকেন তবে বুঝতে হবে আপনি সাহিত্য-আচারের তেমন কিছু ভক্ত নন ; অথবা আপনি কেবলমাত্র আচার-সাহিত্যেরই পাঠক, যার ফলে এর শ্রেণীসংজ্ঞাটি জানবার কোন প্রয়োজন হয়নি আপনার।

তাই সরল বাংলায় বলছি, সাহিত্যের আচার হল সেই বস্তুগুলি যাকে ভুল করে একদা "বেলে লেৎরস" নাম দেওয়া হয়েছিল।

বেলে লেৎরস কথাটি ফরাসী, তা বুঝতে হলে কথঞ্চিৎ ফরাসী মেজাজ প্রয়োজন। বাংলা দেশে লেখককুলের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (এবং কিয়ৎ পরিমাণে প্রমথ চৌধুরী) বিগত হবার পরে ফরাসী মেজাজ খুঁজে পাওয়া ততখানি দুরূহ, যতখানি দুরূহ মধ্যবিত্ত ফরাসী কাফেতে নরম পানীয় খুঁজে পাওয়া। বাংলা দেশে একমাত্র খড়িমাটি এবং টুপি ছাড়া আর কিছুতে ফরাসী কালচার তো দূরস্থান, নামেরও প্রভাব আমার চোখে পড়েনি।

কাজেই গত পনের কুড়ি বছরের মধ্যে হঠাৎ বাংলা সাহিত্যে বেলে লেৎর্স কথাটি ফ্যাশানদুরস্ত হয়ে ওঠাতে আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করেছিলাম। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংরেজ-রাজত্ব অবসান হতে না হতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফরাসী উপনিবেশ গড়ে ওঠা সেকালে (যখন আমিও সেকেলে ছিলুম, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন একেলে হবার চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছি!) আমি খুব কিছু স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করিনি।

কিন্তু বেলে লেৎর্স-এর চরিত্র নিয়ে আর যদি বেশি লেকচার কপচাই তবে আমার পাঠক সন্দেহ করবেন, আচার পরিবেশন করব বলে আমি বুঝি ত্রিফলার আচার বানাতে বসেছি। তাই তাত্ত্বিক কচকচির কথা থাক। মোদ্দা, এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে বেলে লেৎর্স সংজ্ঞাটি রচনার টেকনিক-বিচারে দেওয়া হয়, বস্তু-বিচারে নয়। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে টেকনিক বহুলাংশে বিষয়কে প্রভাবিতও করে।

বেলে লেৎর্স-এর প্রথম কথা 'বেলে'—অর্থাৎ মনোহর, রমণীয় ; কিন্তু প্রথম কথাটিই শেষ কথা নয়, শেষ এবং প্রধান কথা হল 'লেৎর্স'—অর্থাৎ সাহিত্য। যে রচনা সাহিত্যের প্রয়োজনে সুখপাঠ্যতা গুণ বিসর্জন দিল তা বেলে লেৎর্স হতে পারল না বটে কিন্তু সাহিত্য হতে তার বাধা নেই। কিন্তু যে-রচনা মনোহারিত্বে চমৎকার কিন্তু সুলভ প্রয়োজনে সাহিত্য-সত্তা বিসর্জন দিল তা বেলে হলেও লেৎর্স হল না ; আর সাহিত্য-বাদে শুধুই মনোহারিত্ব মনিহাবি দোকানের পসরা হলে ক্ষতি নেই, সাহিত্যের দাবিদার হলেই তা বিপজ্জনক।

গত পনের বছর ধরে বাংলা ভাষায় তথাকথিত বেলে লেৎর্স—যার বাংলা অনুবাদ করা

হয়েছে রম্যরচনা—নামে যে বস্তুগুলি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে শতকরা আশিটিতে অল্পবিস্তর 'বেলে'-গুণ রয়েছে 'লেৎর্স'-গুণের কণামাত্র নেই। আর বাকি কুড়িটিতে—না কুড়িটির কথা বলা ঠিক হবে না, পনেরটিতে—বেলেও নেই লেৎর্স-ও নেই। এই শতকরা পঁচানব্বুইটি রম্যরচনার নাম বলা চলে সাহিত্যের আচার ; আশিটি লঙ্কা-তেঁতুল ইত্যাদির আচারজাতীয়, যাতে স্বাদ আছে কিন্তু পুষ্টি নেই, আর পনেরটি উচ্ছের আচারজাতীয়, যাতে স্বাদের গরজে পুষ্টি আবার পুষ্টির গরজে স্বাদ দুইই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

এই আচার-সাহিত্য, অর্থাৎ বাংলাভাষায় সম্প্রতি ফ্যাশানেব্‌ল্ হওয়া রম্যরচনা নাম দিয়ে যে তথাকথিত সাহিত্যকর্ম অনুশীলিত হচ্ছে তাতে, বুদ্ধির চাইতে চাতুর্য, ব্যক্তিত্বের চাইতে মুদ্রাদোষ এবং চিন্তার মৌলিকতার চাইতে বাক্‌ভঙ্গির লঘুত্ব ক্রমেই অধিকমাত্রায় আদৃত হতে থাকছে।

আসলে রম্যসাহিত্য নামে নতুন হলেও এক হিসাবে বস্তুটি কিছু আর নতুন নয়। প্রত্যেক যুগে প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিক বৃহৎ সাহিত্যকর্মের অবসরে লঘুভঙ্গির রচনাতেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। রঘুবংশের মহাকবি ঋতুসংহার, এমন কি সম্ভবত শৃঙ্গারতিলকও, রচনা করেছেন ; বিষবৃক্ষের স্রষ্টা মুচিরাম গুড় রচনায় লজ্জিত হননি ; গোরা এবং পূরবীর রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রবন্ধ এবং ক্ষণিকারও রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লঘুরচনা হলেই তা রম্যসাহিত্য হয় না। রম্যসাহিত্য সেই শ্রেণীর লঘু রচনা যাতে লেখকের ব্যক্তিত্ব লঘু ভঙ্গির অন্তরালে সর্বদা উপস্থিত। রম্যসাহিত্য লেখকের সেই মুহূর্তের সুগভীর চিন্তা পরিবেশিত নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্ব পরিবেশিত ; আর চিন্তার ভিত্তিভূমিতে ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব।

যে-সাহিত্যিক প্রকৃত রম্যসাহিত্যে সক্ষম হবেন, তাঁকে তাই চিন্তাশক্তিতে, মনস্বিতায় অক্ষম হলে চলে না ; মনস্বিতার অতল সমুদ্রে, ব্যক্তিত্বের অগাধ জলরাশিতে, সহজ স্বতঃস্ফূর্ততার তরল তরঙ্গ ভঙ্গির নাম রম্যসাহিত্য। গণ্ডূষজলমাত্রে শফরীর অঙ্গসঞ্চালনে রম্যসাহিত্যের ক্যারিকেচার মাত্র সম্ভব—তার বেশি নয়।

সেই ক্যারিকেচারের সাম্প্রতিক নাম রম্যরচনা, ওরফে সাহিত্যের আচার। লঙ্কা-তেঁতুলের আচারের মতই সাহিত্যের আচারও প্রথমে মহিলা-খদ্দের নিয়েই আসর জমিয়েছিল, কিন্তু—আগেই বলেছি—এখন পুরুষরাও যথেষ্ট পরিমাণে এর অ্যাডিক্ট হয়েছেন। বাংলা দেশ এতদিনে সত্যই আচারসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।

।। ভূমিকা ৩।।

আচার-বানানোতে এক্সপার্ট যে-কজন লেখক সম্প্রতি বাংলাদেশের বাজার মাত করে বসে আছেন তাঁদের মধ্যে তরুণতম ব্যক্তির নাম মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'শংকর' ছদ্ম নামে যিনি পরিচিত।

শুনেছি, ইনি ভাগ্যবান ব্যক্তি—পাতাচাপা এঁর কপাল। যাতে ছোঁয়া লাগান তাই নাকি সোনা হয়ে যায়। যে কখানি বই লিখেছেন সব নাকি হু হু করে বিক্রী হয়েছে, লেখা ছাড়া চাকরির বাজারেও নাকি সাঁই সাঁই করে মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় উঁচুতে উঠেছেন। খুব ভাল কথা। ভাগ্যবান ব্যক্তির নাম করলেও পুণ্য হয়।

হবে না-ই বা কেন? ওঁর নামটাই যে পয়মন্ত নাম। নামের মধ্যিখানে 'শঙ্কর' থাকলেই বুঝতে হবে কুষ্ঠির নবমপতি দশমে আর দশমপতি নবমে আছেন। তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর, সিদ্ধার্থশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, যতগুলো শঙ্করান্ত নামের লোক দেখলাম কেউই কিছু কম ওঠেননি ; মণিশঙ্করও উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। আর এই বীজমন্ত্রটি বুঝেছেন বলেই মণিশঙ্কর ছদ্মনাম বাছাই করার সময় আলতুফালতু নাম না নিয়ে ওই পয়মন্ত নাম 'শংকর'-ই

বাছাই করেছেন। বুদ্ধিমান লোক।

এই সব কারণে শঙ্করের লেখা চৌরঙ্গী পড়তে শুরু করেছিলাম খুবই আশা নিয়ে। একাধারে ভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান লেখক তো আর হামেশা চোখে পড়ে না। এমন মণিকাঞ্চন যোগ একটি যখন পেয়েছি তখন এর লেখাটি মন দিয়ে পড়তে হবে, এই ভেবে বইখানি চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করে এনেছিলাম।

কিন্তু শংকরের কুষ্ঠির সঙ্গে আমার কুষ্ঠির বোধহয় বড় বেশি অমিল। নির্বিঘ্নে পড়তে পারলাম না।

প্রথম ধাক্কা খেলাম বিজ্ঞাপন পাঠে। তখনো বইটি পড়া শুরু করিনি, সবে হাতে পেয়েছি, এমন সময় কী এক পত্রিকায় এ বইয়ের একটি বিজ্ঞাপন দেখলাম। বিজ্ঞাপনে একটি চিঠি ছাপানো হয়েছে, গ্রন্থকারের কাছে সে-চিঠি লিখেছেন আচার-সাহিত্যের হেড শেফ সৈয়দ মুজতবা আলি। তাতে প্রথম লাইনেই আছে : "ব্রাদার, যা মাল ছাড়ছো 'দেশে'—সে মাইরি ইটের থান"!

দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। ব্রাদার, মাল, মাইরি,—এ সব দেখে ঘাবড়ালে রম্যরচনা পড়ার লোভ করাই উচিত নয় ; তাতে ভয় পাইনি আমি ; রম্যরচনার লাইনের লোকদের—মুজতবার বিশেষতঃ—ও কথাগুলো মেজাজের লক্ষণ, মাইরি, মাল, এ সব কথা ওঁদের লেখায় না থাকলে সন্দেহ হবে ওরা বুঝি অনন্ত-বিষ্যুৎবারের রাজ্যে নির্ব্বাসিত হয়েছেন ; তাতে নয়, ভয় লেগেছিল ওই 'ইটের থান' শুনে।

আমি মশাই রোগা-পটকা লোক, দাঙ্গাহাঙ্গামার ছায়া মাড়াতে ভয় পাই। জন্মে ফুটবল খেলার মাঠের ত্রিসীমানায় যাইনি। সিনেমাঘরে ফোর্থক্লাস কাউন্টারে নম্বর লাগাইনি। বাসের ভিড়ের ভয়ে এগারটার আগে অফিস যাইনি। স্ত্রীর কথায় কখনো প্রতিবাদ করিনি। এ হেন শান্তিপ্রিয় লোক আমি কিনা শেষ পর্যন্ত রম্যরচনার লোভে থান ইটের ঘা খাব? না মশাই, অত রিস্ক নিয়ে কাজ নেই।

ভয়ে ভয়ে অনেকদিন শংকরের চৌরঙ্গী কেন, কলকাতার আসল চৌরঙ্গীকেও এড়িয়ে চলেছি।

তারপর, অনেক দিন পরে, মুজতবার চিঠি সম্বলিত সেই মাইরি-মাইরি বিজ্ঞাপন বেরোনো যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন আবার একদিন সাহস করে বইখানিতে হাত লাগালুম। সাহস করে টাইটেল-পৃষ্ঠা উল্টেও ফেললুম শেষ পর্যন্ত। আর তখন, ঠিক তখনই, দ্বিতীয়বার ধাক্কা খেলুম অল্টারনেটিং কারেন্টের মারাত্মক শকের মত। টাইটেল পেজের পরেই আছে : উৎসর্গ। আমার সাহিত্য-জীবনের প্রযোজক, পরিচালক ও সুরকার শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুকে মনিশঙ্কর বাবুরও একটা 'সাহিত্য জীবন' আছে এ রকম সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও টের পেলে আমি ও-বই পড়ার কথা ভাবতামই না। সাহিত্য নয়, রম্যরচনার লোভে 'চৌরঙ্গী' পড়ার দিকে ঝোঁক গিয়েছিল আমার। কিন্তু চৌরঙ্গীর পেছনে সাহিত্য-জীবন শুনে একটু গা ছমছম করে উঠল। অনেকের সাহিত্য-জীবনের পেছনে একটা চৌরঙ্গী জীবন আছে, এমন শুনেছি। কিন্তু চৌরঙ্গীর পেছনে সাহিত্যজীবন এই প্রথম শুনলাম। চৌরঙ্গীর পেছনে—আমি যতদূর শুনেছি—মেট্রোর ফোর্থ ক্লাস বুকিং কাউন্টার আছে, পাঞ্জাবীদের শিককাবাবের দোকান আছে আর কলকাতার সবচেয়ে সস্তা শুঁড়িখানা এম এল শ'য়ের দোকান আছে। শংকর বাবুর সাহিত্য-জীবনও তার কাছাকাছি কোথায় ঘাপটি মেরে আছে, এমন কথা আগে শুনিনি।

কিন্তু তাতে ঘাবড়ানোর কি আছে। তারাশঙ্করের লেখা 'আমার সাহিত্য জীবনে' দোষ না থাকলে মণিশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবনে' দোষ দেওয়া চলে না। না হয় তারাশঙ্কর কখানা বেশি বই লিখেছেন, শঙ্করে-শঙ্করে তো মিল আছে। ঘাবড়ে গেলাম ঐ 'প্রযোজক, পরিচালক ও সুরকার' দেখে। তবে কি শংকরবাবু তাঁর নিজের সাহিত্যজীবনের কথা

বলছেন না? তারাশঙ্করের লেখা 'আমার সাহিত্য জীবন' কি তবে সিনেমা হয়েছে আর তারই প্রয়োজক-পরিচালক-সুরকারকে এ বইখানি উৎসর্গ করছেন উনি? হতেও পারে। তারাশঙ্করের সব বই সিনেমায় যে রকম হিট্ করছে তাতে 'আমার সাহিত্য-জীবন' সিনেমা হলে আশ্চর্যের কী আছে? কিন্তু একাধারে প্রযোজক, পরিচালক ও সুরকার বাংলাদেশে তো একজনই জীবিত আছেন, তাঁর নাম তো শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু নয় ; সত্যজিৎ রায়। তাহলে ইনি আবার কে? কে এই শঙ্কর-প্রযোজক শঙ্করী?

খুঁটিয়ে পড়া আমার দীর্ঘকালের বদ অভ্যাস। এক জায়গায় খটকা লাগলে সেটা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত আর এগিয়ে যেতে পারি না আমি। শঙ্করীপ্রসাদকে না চেনা পর্যন্ত শঙ্করচন্দ্রের লেখা আর ফারদার পড়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। আর এই দ্বিতীয় ব্যাঘাত কাটিয়ে উঠতে উঠতে পূজা-সংখ্যা-নয় প্রকাশের আর মাত্র তিন দিন অবিশিষ্ট রইল!

ইতিমধ্যে শঙ্করীপ্রসাদের কয়েকখানি বই আমি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছি। শংকরের তুলনায় শঙ্করী কম পরিচিত, কিন্তু মুজতবা আলীর ভাষায় বলতে গেলে তিনি মাল হিসাবে অনেক বেশি মাইরি!

কিন্তু সে-আলোচনা এখানে নয়, যথাস্থানে করা হয়েছে। এখানে শুধু এটুকুই বলা প্রয়োজন ছিল যে শঙ্করীপ্রসাদের কারণে আমার শঙ্কর-ভাষ্য রচনায় কিঞ্চিৎ দেরি হয়ে গেল।

।। এক ।।

চৌরঙ্গী পুস্তকের শুরু এইভাবে :

"ওরা বলে—এস্‌প্ল্যানেড। আমরা বলি—চৌরঙ্গী।"

এটা একটা সংবাদ। এস্‌প্ল্যানেডকে ট্রামের কন্‌ডাকটাররা ধরমতল্লা বলে শুনেছি। কারা যে এস্‌প্ল্যানেডকে চৌরঙ্গী বলে জানি না। নিশ্চয় কেউ বলে। আর না বললে চলে কী করে? বইয়ের নাম চৌরঙ্গী, অথচ সমস্ত বইটির অকুস্থল হল কাল্পনিক শাজাহান হোটেল, যার অবস্থিতি সেণ্ট্রাল এভিন্যুতে। অতএব এস্‌প্ল্যানেড এলাকাকেই আমরা বলব চৌরঙ্গী। যতক্ষণ চৌরঙ্গী পড়ছি, ততক্ষণ নিশ্চয় বলব।

কিন্তু কী দরকার ছিল বইয়ের নাম চৌরঙ্গী দেবার? ছিল বই কী। চৌরঙ্গী বলতে তো খালি এস্‌প্ল্যানেড বোঝায় না, ওর অর্থে যে বহু স্তর।

চৌরঙ্গী বলতে চতুরঙ্গের আভাস আসে। চতুরঙ্গ মানেই চতুর এবং রঙ্গ, অর্থাৎ রম্যরচনা। আবার, চৌ-এন্-লাইয়ের চৌ এবং এন্, জি, রঙ্গের রঙ্গ—অর্থাৎ কমিউনিস্টকুলের সবচেয়ে বেঁয়ো আর ফ্রী এণ্টারপ্রাইজ দলের সবচেয়ে ডানঘেঁষা দুজনকার নামের অংশ জুড়ে চৌরঙ্গী। এ থেকে বোঝা যাবে সব রকম হরেকরকম্বা এর মধ্যে ককটেল করা হয়েছে।

বাস্তবিক 'চৌরঙ্গী'র মধ্যে কী যে নেই বলা শক্ত। ভাল লেখা আছে, নোংরা লেখা আছে ; দর্শনশাস্ত্র আছে, খিস্তি আছে ; মজাদার গল্প আছে, করুণ-কাহিনী আছে ; হুইস্কি এবং বীয়ার, ধেনো এবং সিদ্ধি—সবেরই রেফারেন্স আছে ; মোজার্ট-ব্রাহ্‌ম-বীটোফেন-হাণ্ডেল-বাক্-ভাগনার আছে ; শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ আছে, জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র-সমর সেন আছে ; আরও যে কতকিছু আছে তার আর কী বলব। কিন্তু এত থেকেও সুদ্ধু একটি জিনিসের অভাবে চৌরঙ্গী রম্য Raw-চোনা ছাড়িয়ে সাহিত্য হতে পারল না। সেই একটি বস্তু হচ্ছে কয়েক ডোজ হজমী গুলি।

শংকর সব কিছু গিলেছেন, হজম করতে পারেননি। হজম না হয়ে চৌরঙ্গীর সব

প্রিটেনশন গুলো পাতায় পাতায় গিজগিজ গজগজ করছে, আর মাঝে-মাঝে হাজার সাবধানতা সত্ত্বেও সেই বদহজমের দুর্গন্ধ ঢেঁকুর অশ্লীল এবং কুশ্রী একটি-দুটি মন্তব্য হয়ে বইটির অফ্‌সেটে ছাপা সুন্দর মলাটকে ছাপিয়ে অস্বস্তির আবহাওয়া তৈরি করে ফেলছে।

।। দুই।।

জীবনানন্দ দাস এবং সমর সেনের উল্লেখ এবং তাঁদের কবিতার পংক্তি উদ্ধার চৌরঙ্গীর মধ্যে এত বেশিবার আছে যে প্রথমে একটু অবাক লাগবারই কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উদ্ধৃতি নেই, কিন্তু উল্লেখ আছে।

কিন্তু ওই যে বলেছি, হজমী ওষুধের অভাব। তাতেই শংকরের সব বৈদগ্ধ্যের স্টাণ্ট হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মত অবিলম্বে চুপসে গিয়েছে।

একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক ঃ

"কনির [ক্যাবারে নাচিয়ে] দেহে এবার কোনো কাপড় নেই। শুধু বেলুন। অসংখ্য রবারের বেলুন ওর লজ্জা নিবারণ করছে।...নাচতে নাচতেই সে তার বেলুন শরীর নিয়ে অতিথিদের মধ্যে নেমে এল।...'বললে, একটা বেলুন ফাটাও।'...বেলুনের সংখ্যা যতই কমছে কনির নিরাবরণ দেহের তত বেশী অংশ দেখা যাচ্ছে। ততই যেন হলের উন্মাদনা বাড়ছে। পুরুষ হরিণদের বুকে আজ যেন কোনো স্পষ্ট ভয় নেই। সন্দেহের ছায়া নেই কিছু। কেবল পিপাসা আছে। আর আছে রোমহর্ষ। আজ এই বসন্তের রাতে লালসা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ, স্বপ্ন যেন সব দিকে স্ফুট হয়ে উঠেছে।"

এই অংশে মাল-টেনে চুর মাতাল হওয়া ক্যাবারের মাইফেল করতে আসা কদর্য মানুষদের উপমায় জীবনানন্দের অপরূপ কবিতা "ক্যাম্পে" থেকে কয়েকটি পংক্তির ঈষৎ বিকৃত উদ্ধৃতিতে রোমাঞ্চিত পুরুষ হরিণ উপস্থাপিত। জীবনানন্দের কবিতায় আছে ঃ

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন ;
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে ;
তাহাদের হৃদয়ের বন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে
জ্যোৎস্নায়—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে,
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন ;
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু ;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়ত চিতারও বুকে জেগেছে
বিস্ময় ;
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে
উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে,...

এবং সে-কবিতার সকরুণ সুরের গভীরে বিজড়িত রয়েছে এই ট্রাজিক সমাচার যে

ইনোসেন্সের প্রতীক হরিণকে লোভী মানুষ প্রেমের মিথ্যা হাতছানি দিয়ে প্রতারিত করেছে ; "কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ; (সকালে—আলোয় তাকে দেখা যাবে) পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা পড়ে আছে।"

প্রেমের সাইরেন আহ্বানে মৃত্যুপথযাত্রী জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ হরিণের সঙ্গে মাইফেল-লোভী মাতালের উপমা আজ জীবনানন্দ বেঁচে থাকলে তাঁর বুকে যতখানি বাজত, ন বছর আগের এক শেষ অক্টোবরের করুণ শীতরাত্রে ট্রামের চাকাও বুঝি তাঁর স্বপ্নভরা বুকে ততখানি জোরে আঘাত করতে পারেনি।

এবং এই অপরাধ অজ্ঞতাবশত নয় ; তা হলে "লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন" এই শব্দগুলির মধ্য থেকে শুধু 'প্রেম' বাদ দিয়ে বাকিগুলি চুরি করতেন না শংকর।

জীবনানন্দ দাশের নাম পুস্তকটিতে একবার মাত্র উল্লেখিত, কিন্তু তাঁর কবিতা থেকে উদ্ধৃতি আছে বহুবার। 'রাত্রি' কবিতার চৌদ্দ পংক্তি উদ্ধৃত করার সময় শংকর লিখছেন, "সেই রাত্রেই এই কলকাতার এক নাগরিক কবিকে মনে পড়ে গিয়েছিল।"

হায় জীবনানন্দ, শংকরের হাতে পড়ে তুমি—নির্জনতার নেশায় আত্মগত, জনতার স্থূলতায় ক্লান্ত তুমি—কলকাতার নাগরিক কবি আখ্যায় ভূষিত হলে। কিন্তু সে-কারণে দুঃখ কোরো না জীবনানন্দ ; তোমার ভাগ্য তো তবু ভাল—শংকরের হাতে না পড়ে তুমি যদি তাঁর গুরুদেব শঙ্করীর হাতে পড়তে তবে কী হত জানো কি? তাঁর হাতে বিদ্যাপতি হয়েছেন নাগর কবি, জয়দেব হয়েছেন প্রাণহীন দেহসর্বস্ব, আর অন্য সব বৈষ্ণব কবিদের কী হাল হয়েছে তা অনুমেয়।

সমর সেনের রচনা থেকে কিছু কিছু কড়া ভাজা আমিষের ছোট ছোট টুকরো অবশ্য শংকর ঠিক জুতসই ভাবেই জুড়েছেন ; ফেনোচ্ছল raw-চোনার সঙ্গে সেগুলো জুতসই ভাবেই সার্ভ করেছেন বারম্যান মণিশঙ্কর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আবার টানাটানি করার দরকার কী ছিল। কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, রবি ঠাকুর ছাড়া কি তেমনি কোটেশন হয় না?

এবং সে কী কোটেশন! মাল টেনে চুর হবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাতালের অবস্থা-বর্ণনায় বেচারি রবি ঠাকুরকে স্মরণ করা হল : হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে। [শেষ 'রে' শব্দটা বাদ দেওয়া হয়েছে, বোধহয় ততক্ষণে নেশাটা আরও জমাট হয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে।]

কিন্তু রবি ঠাকুরের আসল দুর্গতি আছে অন্যত্র। যেখানে তিনি শরৎচন্দ্র এবং ডিকেন্সের সতীর্থ হয়ে এক ব্র্যাকেটে উপস্থাপিত, এইভাবে—

"সেই কান্নার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।...কোনো শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা ডিকেন্স হয়ত কানে শুনলে কলমে তার বর্ণনা দিতে পারতেন।"

ওই সঙ্গে কামিনী রায়ের নামটা থাকলেই ষোলকলা পূর্ণ হত। কান্নার বর্ণনায় তিনিও কিছু কম ছিলেন না। [নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ?]

।। তিন ।।

এই সব টুকরো কোটেশন নিয়ে যদি মন্তব্য করতে থাকি তবে আমার লেখা শেষ হতে কালী পুজো পার হয়ে যাবে। তাই ওসব ছেড়ে দিয়ে বইটির টুকরো টুকরো গল্পের আলোচনায় আসা যাক।

রম্য raw-চোনায় স্টান্ট-ধর্মী টুকরো গল্প জুড়তে হবে, এটা রম্য-হুজুগের পুরোধা যাযাবর তাঁর দৃষ্টিপাতে প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন। সেই বিষবৃক্ষে এখন ফল ফলেছে। এখন

রম্যরচনা বলতে রচনা হবার দরকার নেই, রম্য না হলেও চলতে পারে, কিন্তু গল্প চাই, অনেক গল্প এবং তার প্রত্যেকটি স্টাণ্ট-ধর্মী হওয়া চাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে রম্যরচনা নাম বলার দরকার কী, গল্প তো গল্প বললেই হয় সোজাসুজি।

না তা হয় না। রম্যরচনায় একশোটা গল্প থাকতে পারে কিন্তু তার কোন একটাও আলাদা ছোট গল্প বা বড় গল্প হিসাবে পাঠকের পাতে দেওয়া যায় না ; সেগুলি গল্প হলেও তাতে গল্পের গঠনভঙ্গি থাকে না, শুধু স্টাণ্ট থাকে। অথবা, তার মধ্যে গল্প তৈরির মত মশলা থাকতে পারে কিন্তু তা দিয়ে খাঁটি গল্প বানাতে যতটা পরিশ্রম তার চাইতে ঢের সহজে বৈঠকী ঢঙের কপচানো বুলি জুড়ে জুড়ে অনেক মোটা আর অনেক বেশি চম্‌কিলা চেহারার রম্যরচনা বানানো কমারশিয়াল প্রপোজিশন হিসাবে ভাল!

অজ পাড়াগাঁয়ের হালুইকর যেমন অরিজিন্যাল মেঠাই হিসাবে রসগোল্লাই তৈরি করে, তারপর সাত-দশ দিন বিক্রীর শেষে যেগুলো পড়ে থাকে তাতে গাঢ় রস ঢেলে শক্ত করে দানাদার বানিয়ে ফেলে, এ-ও তেমনি। গল্পের রসগোল্লা যখন পচে যাবার উপক্রম, অথবা যখন তাতে লেক্‌চারের ময়দা পরিমাণে বেশি পড়ে যাওয়াতে বিস্বাদ হয়ে গেছে, তখন তাতে কিছু ইতিহাস, কিছু দর্শন, কিছু কোটেশন, কিছু খিস্তি, কিছু রকবাজি—এই সবের গাঢ় রস ঢেলে একসঙ্গে জমিয়ে দেওয়া হল : রম্যরচনার দানাদার তাজা মাল হিসাবে ভিয়েন থেকে বেরিয়ে এল এই ভাবে।

রম্যরচনার গল্পে আর কিছু না থাক, স্টাণ্ট হচ্ছে sine qua non. স্টাণ্ট ছাড়া রম্যরচনার দানাদারের গল্প-রসগোল্লায় পাক ধরানো যায় না।

চৌরঙ্গীতে যতগুলি ক্যারেক্টার, ততগুলি গল্প এবং ততগুলি স্টাণ্ট। স্টাণ্টের মাথায় দিব্বি দিয়ে রাখার ফলে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে গল্প শুরু হলেই পাঠক বুঝতে পারে শেষটায় কী হবে।

শুনতে প্যারাডক্স মনে হতে পারে কিন্তু লেখকের শক্তির তুলনায় স্টাণ্টের মাত্রাধিক্য হলে এমন হতেই হবে।

গোড়ার থেকে শেষ পর্যন্ত চৌরঙ্গী একই ফরমুলার স্টাণ্ট। যাকে দেখে যা মনে হবে তারা প্রত্যেকেই তার বিপরীত চরিত্রের লোক। যে-ঘটনার যা অর্থ মনে হবে সে-ঘটনার আসল অর্থ ঠিক উল্টো! এ-যেন আগের দিনে হাওয়া অফিসের ভবিষ্যদ্বাণীর মত ; বৃষ্টি হবে বললে অনায়াসে আপনি বিনা ছাতায় বেরোতে পারেন, হবে না বললে ছাতা-রেনকোট-গামবুট না নিয়ে খবরদার বেরোবেন না। এ রকম ফরমুলা বাঁধা স্টাণ্টের চেষ্টায় ফরমুলাই থাকে, সার্প্রাইজ থাকে না।

একেবারে শুরুতে শংকর যখন বেকার অবস্থায় চার আনা কমিশনে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট বেচছেন (তারই গোটা কতক যদি নিজে কিনে রাখতেন! প্রেসের চাইতে সেখানেই ওঁর বেশির ভাগ লেখা মানায় কি না!) তখন যে-সায়েব প্রথম শংকরের ঝুড়ির প্রতি আগ্রহী হলেন পাঠক স্বভাবতই তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন ; অমনি শংকর প্রথম স্টাণ্টযোগে জানালেন যে লোকটা আসলে চামার—শংকরের কমিশনের পয়সা পুরোটাই তিনি ঘুস নিয়ে তবে ছাড়লেন। এরপর যখনই দেখলাম আর এক অফিসের দারোয়ান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছ'টা ঝুড়ি বেচিয়ে দিল এবং নগদ দাম পাইয়ে দিল আর শংকর যখনই স্বগতোক্তি করল, "দারোয়ানজীদের আমার চেনা আছে, কমিশনের ভাগ দিতে হবে"—তখনই আমরা বুঝতে পারছি এ লোকটা আসলে একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির ; একে পয়সা দিতে চাইলে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করবে।

এই থেকে শুরু। তারপর সাড়ে চারশো পৃষ্ঠা ধরে আগাগোড়া এই এক ফরমুলা চালিয়ে গেছেন শংকর। যাকে যা মনে হবে সে তার ঠিক উল্টো। করবী গুহকে যদি মনে হয় পেশাদার ফ্লার্ট তবে জানবেন এই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত পবিত্র প্রেমের জন্য আত্মহত্যা করবে। ক্যাবারের নাচিয়ে কান যদি তার কদাকার বামন অ্যাসিষ্ট্যান্ট ল্যাম্বার্টের সঙ্গে এক কামরায় রাত্রিযাপন করতে চায় তবে তক্ষুনি বুঝতে হবে যে এরা আসলে ভাই বোন। মিসেস পাকড়াশী যখনই ঘোমটা টেনে সভায় বক্তৃতা করবেন, "আর পাঁচজনের মতো আমি সামান্য একজন গৃহবধূ।...আমরা যেন কখনই না ভুলি যে স্বামীরাই আমাদের সব।...আমরাই...স্বামীকে জড়িয়েই বড়ো হব।"—তখনই পাঠকের জানা কথা যে এর ছ লাইন পরেই জানা যাবে যে একটি ইংরেজ ছোকরা উপপতির সঙ্গে মিসেস পাকড়াশী প্যারিস বেড়াতে গেছেন।

এককথায় চৌরঙ্গী গ্রন্থটির মূল সুর হচ্ছে—হিপোক্রেসি। ভণ্ডামি।

এর ভালোগুলো ভণ্ড, আসলে তারা মন্দ। এর মন্দগুলোও ভণ্ড, কারণ আসলে তারা ভালো।

আর এই ভণ্ডামি বীজমন্ত্রের একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ী জপ-প্রকরণ হল মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের ক্ষণস্থায়ী সাক্সেসের সিক্রেট।

ক্ষণস্থায়ী—কেননা রম্যরচনার পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক চরিত্রগতভাবে অস্থিরচিত্ত। তাদের চরিত্রে একনিষ্ঠতা থাকলে raw-চোনার ভক্ত হতে যাবে কোন দুঃখে। তাদের মনে রম্যরচয়িতার প্রতি যে উন্মাদ আকর্ষণ তা ক্যাবারের দর্শকদের মনে "ল্যাংটা মেম-সায়েব" [ক্যাবারে পারফরমারদের শাংকরিক তর্জমা] সম্পর্কে উন্মাদনার সগোত্র। এবং যে-কারণে ক্যাবারের বাজারে যৌবনপসারিণীর হে-ডে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত সেই একই রম্যরচনার বাজারেও যাযাবর থেকে শংকর পর্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী হট ফেভারিট। তারপর বিস্মৃত।

হলই বা তারপর বিস্মৃত। জগতে চিরস্থায়ী কী আছে? যৌবন যদি জীবনের পরিপ্রেক্ষিত দুদিনের, জীবনই বা তবে সময়ের রঙ্গমঞ্চে কতক্ষণের খেলা?

রম্যরচনার ক্ষণপ্রভা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার দ্যুতিতে মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় উজ্জ্বল হোন। আশ্বিনের কৃপণ রৌদ্রে শুকিয়ে নিন তাঁর রয়ালটির ধান। আমরা তাঁকে কংগ্র্যাচুলেট করব।

তারপর যেদিন রম্যরচনার ক্যাবারেমঞ্চে শংকরোত্তর ল্যাংটা মেমসায়েব আবার নাচতে আরম্ভ করবে তখন যদি কোনো তীক্ষ্ণস্মৃতি একদাভক্ত আমাদের জিজ্ঞেস করে ঃ শংকরকে মনে আছে আপনাদের?

তাহলে আমরা বিরক্ত মন্তব্য করব : সে আবার কোন হরিদাস পাল?

জানব না যে এই মন্তব্যও আমাদের চাইতে ঢের আগে ছাপার হরপে শংকর করে গেছেন—চৌরঙ্গী পুস্তকে!

নারায়ণদাশ শর্মা

[৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (পুজো-সংখ্যা-নয়), ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৩৭০]

তিনটে, ছুটা, নটায়

মালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান...

বিজলীতে গত শুক্রবার কালস্রোত ছবির প্রেস-শোতে গিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি এত খুশি কদাচ কোনও ছবির প্রেস-শোতে মেলে। না গেলে সিজার্স সিগারেটের বিজ্ঞাপনই সত্যি হতো। আমি জানতাম না আমি কি 'হারাইতেছি'। কালস্রোত ছবির প্রচারকার্যে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত অমল সেন সকালে এসেছিলেন প্রেস শোতে যাবার জন্যে বলতে। অভয় দিয়েছিলেন, যে আমি যা খুশি তাই লিখতে পারি ছবি দেখে, তবু ছবি দেখতে যেতে একবার। উনি জানেন না যে, যে কোনও ছবি সম্বন্ধে আমি অচল পত্রে মন্তব্য করি না। কালস্রোত ছবি সম্পর্কেও করতাম না।

না গেলে ঠকতাম। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজলীতে গিয়ে দেখি ছবি দেখানো বন্ধ। গড়িয়ার কালেজের ছাত্রকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের বন্দুক হত্যা করায়, বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা দক্ষিণ কলকাতার সব কটি ছবিঘরে শো বন্ধ করে দিয়েছে। মরা গাঙে আবার প্রাণ ডাকার প্রমাণে প্রদীপ্ত হলাম। লজ্জা পেলাম যে ওই দিন ছবি দেখতে গেছি। মনে হলো ছাত্রদের এই প্রতিবাদ আমারই উদ্দেশে প্রেরিত।

এ গেল এই প্রেস শো-র একদিক। আরেকদিক আরও বর্ণমনোহর।

একজন চিত্রসাংবাদিক শুনলাম অমল সেনকে বলছেন ঃ ফোন করে জানাতে পারেননি? ইচ্ছে হলো ঠাস করে এক চড় দিই। কিন্তু হিন্দুর গোবধ নিষিদ্ধ হেতু সাহস করলাম না। ওই চিত্র, বিচিত্র-সাংবাদিকের যা স্বাস্থ্য তাতে আমার এক চড়ে গোহত্যার দায়ে পড়তাম না, এমন কথা বলা শক্ত। প্রেস শো-র পরই ছিলো এক্স-প্রেস শো। বিজলীতে কালস্রোত, ফিরপোয় ডিনার। শুধু ডিনার অথবা ককটেল সহ ডিনার সেকথা কার্ডে লেখা ছিল না। তবে যারা এসেছিলো, তারা দুয়েকজন বাদে প্রায় সবাই কালস্রোত দেখতে নয়, ফিরপোয় মালস্রোত বয় কিনা তাই দেখতেই এসেছিলো।

ভেবেছিলাম যে অবস্থায় এ ছবি বন্ধ হয়েছে সে অবস্থায় ফারপো ডিনারের প্রসংগ আর উঠবে না। আমার অন্য সব ভাবার মতোই এ ভাবাও যে ভুল তা প্রমাণ হলো অচিরেই। যে সাংবাদিক, গুলিতে নিহত ছাত্রের সম্মানে হঠাৎ শো বন্ধের খবর ফোনে কেন জানানো হয়নি, জিজ্ঞেস করতে পারে, সে সাংবাদিকের কাছে, যে, দেশের মানুষের প্রাণের চেয়ে ফির্পোর ডিনার অনেক বড়, বিস্মৃত হয়েছিলাম সে বার্তায়।

গাড়ি করে, কোম্পানীর মোটর গাড়ি করে, একের পর এক সবাইকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো ফার্পোয়। সেখানে শুধু ডিনার হয়েছিলো না, কালস্রোত ছবির পরিচালক ও প্রযোজকের সম্মানে মালস্রোতও বয়েছিলো এবং তারপর চ্যাংদোলা করে বাংলা দেশের চিত্র-র নামে বিচিত্র সাংবাদিকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হয়েছিলো জানি না, কারণ আমি

তার প্রত্যক্ষদর্শী নই।

শকুনের দৃষ্টি যেমন ভাগাড়ে নিবদ্ধ সর্বদাই, বাংলা দেশের ছবির সমালোচনা যারা করে, তাদের দৃষ্টি তেমনই ডিনার-ককটেল-লাঞ্চ-এ আটকে আছে। ছবি চুলোয় যাক, ছবিওলা কি খাওয়াচ্ছে সেইটেই কথা। তারই ওপর পরের শুক্রুরবার কাগজে কতখানি প্রশস্তি গাইতে হবে তা নির্ভর করছে।

চলচ্চিত্র সেবার ব্রত যারা নিয়েছে সেই সব নির্মল চরিত্রের জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের মহা ইন্দ্র তুল্য মনীষীদের ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ! এদের সংগে সেদিন অনেকদিন বাদে মোলাকাৎ হবার মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো, শিক্ষিতা এক পতিতার সেই পরমাশ্চর্য স্বগতোক্তি : কেন এপথে এলাম!

—দী-কু-সা।

* হেডলাইনে নির্ভুলক্রমে মালস্রোত ছাপা হয়ে গেছে। ওটাকে ভু করে কালস্রোত পড়তে হবে। *

[৩য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, ১৭ জানুয়ারি, ১৩৭০]



—কাল রাতে যে চোর আমার বাড়ী ঢুকেছিল তার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?
—কেন?
—কি করে আমার স্ত্রীকে না জানিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। সেই উপায়টা জানতে চাই!

২৩শে জানুয়ারি : জাগো বাঙালী!

"আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ আর নেই ; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত।...এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে..তবে মানুষ!...কাপুরুষ দয়ার আধার!"

—বিবেকানন্দ।

বাংলা দেশে পুরুষ নেই আর, আছে অসংখ্য নির্বীর্য, ক্লীব কাপুরুষ কাঙালী একথা শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর সুনিশ্চিত প্রমাণ হয়ে গেছে বহুবার। নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত শুধু ভয় দেখিয়ে গোলমাল করে কেন্দ্রীয় সরকারকে নতি স্বীকার করিয়েছে। নেহরু বলেছিলেন, ভারত আর ভাগ হবে না। নাগাল্যাণ্ড দেখিয়ে দিলো যে ভারতে আবার নূতন প্রদেশ গঠন করা যায়। এবং ফিজো আবার দেখিয়ে দেবে যে নেহরু শক্তের ভক্ত। পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলি জিন্নাহ জানতো যে গান্ধী, নেহরু— যেখানেই রক্ত আঁখি সেখানেই অহিংসার নামে অসম্মানজনক আপসের অনুরাগী। তাই জিন্নাহ্ বলেছিলো যে "Every Muslim has five hundred times more gutts than every Hindoo has।" পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো জিন্নাহ্‌র বক্তৃতায় নয়, সুরাবর্দির ডিরেক্ট অ্যাকসানে। তারপরও সুরাবর্দির প্রাণ এবং সম্মানরক্ষা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। পাকিস্তানকে অনশনের হুমকি দিয়ে টাকা পাইয়ে দিয়েছিলেন গান্ধী। হায়দ্রাবাদ অধিকারও অসম্ভব হতো গান্ধী বেঁচে থাকলে।

গান্ধী জানতেন নেহরু ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষে নেই যে তাঁর মতো পাকিস্তান-তোষণকে কার্যকরী করতে পারবে। তাই নেহরুকে দিয়ে গেলেন উত্তরাধিকার। নেহরু বেগম লিয়াকতের চটি বওয়া থেকে শুরু করে, কাশ্মীর-এর জল যুনোয় নিয়ে গিয়ে ঘোলা করে শ্যামাপ্রসাদকে আবদুল্লার কাশ্মীরে মরতে দিয়ে, বেরুবাড়ি খয়রাতি করে একটির পর একটি গান্ধীজনোচিত দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

জিন্নাহ্ বলেছিলেন যে পপুলেশান এক্সচেঞ্জ ছাড়া পার্টিশানের মানে হয় না। ৬৪ বছর ধরে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে মুহূর্তে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে যারা গদা হাতে গদিতে বসল, তারা কথা দিয়েছিলো, কালোবাজারীকে সবচেয়ে কাছের ল্যাম্পপোস্টে তারা ঝুলিয়ে দেবে। একটি কথাও তারা রাখেনি। আজ পূর্ববংগে হিন্দু বাঙালী অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হবে আর পশ্চিম বংগে হিন্দু বাঙালী পিটুনী ট্যাক্স দেবে প্রফুল্ল সেনের হুকুমে,—কেন? দেবেই—তার কারণ কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে গদিতে আসীন রেখেছে বাঙালীই। এবং এরপরেও ১৯৬৭-র নির্বাচনেও দেখবেন বাঙালী আবার কংগ্রেসকে এবং তারপর কম্যুনিস্টকে ভোট দেবে। কাজেই কংগ্রেস যদি বলে যে আমাকে দেশের লোক চাইছে বলেই তো আমি গদিতে, তাহলে আর যার যা বলার থাক, বাঙালী যেন একটি কথাও না বলে। এ তার পাপের অনিবার্য পরিণতি।

যে একটি মাত্র লোক সেদিন ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকলে দেশ ভাগ হতো না অথচ স্বাধীনতা আসত, ২৩শে জানুয়ারী তাঁর পুণ্য পবিত্র, পরমাশ্চর্য ৬৭তম জন্মদিন। সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকলে গত ১৫ বছরে এদেশের চেহারা পালটে যেত। ১০০ কামাল পাশার যা কর্ম নয়, এক সুভাষচন্দ্রেই সে কার্য সম্পন্ন হতো। পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমান জানতো যে ওই একটি লোক পারে হিন্দু-মুসলমানকে একসংগে বসে খাওয়াতে, এক ধমকে ওঠাতে এবং বসাতে।

সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে বাঙালী যদি কংগ্রেসী ঘাতক এবং কম্যুনিস্ট বিশ্বাসঘাতককে জবাব দেবার জন্যে জান লড়িয়ে দিতে না জানে তাহলে বাঙালীর মৃত্যু অবধারিত! আজ অথবা কাল!

সংখ্যালঘু কারা?

পূর্ববংগে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের জবাব পশ্চিমবংগের মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করা নয়,—পণ্ডিত ব্যক্তিরা একবাক্যে বলেছেন। আমরা মূর্খ লোক। আমাদের দুর্বিনীত প্রশ্ন এই যে তাহলে জবাবটা কি? পিটুনি ট্যাক্স দেওয়া, পুলিসের গুলিতে মরা, প্রফুল্ল সেনের শান্তির বাণী শোনা, পূর্ববংগ ছেড়ে চলে আসা, কলকাতায় পেভমেণ্টের ওপর মরা, নন্দার অসম্মানজনক ব্যবহার সহ্য করা, পুলিস কমিশনারের ছুটিতে যাওয়া, আয়ুবের কাছে শান্তির প্রস্তাব করতে গিয়ে থাপ্পড় খাওয়া, সর্বোপরি বেরুবাড়ি খয়রাতি করা। শান্তির মিছিল যারা কলকাতায় বার করেছে তাদের একজনেরও আত্মীয় পূর্ববংগের দাংগায় বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি?

বংকিমচন্দ্র আজ নেই, থাকলে বিড়ালের মুখ দিয়ে তিনি বলাতেন : আগে পূর্ববংগে মুসলমানের ছুরিতে একজনেরও ভাই বোন, মা, স্ত্রী, বাবা, ছেলে, মেয়ে কেউ মারা যাক, তারপর শান্তির মিছিল বার করার ইচ্ছে তার হয় কিনা দেখা যাবে। নেহরু যখন বাঙালী রমণী আসামী কর্তৃক ধর্ষিত হবার পর বলেছিলেন যে, আসামীরা দারুণ ভদ্রলোক তখন একজন বাঙালীও প্রশ্ন করেনি যে নেহরুর মেয়ে আসামী কর্তৃক ধর্ষিত হলে, তখনও নেহরু বলতেন কি না যে, আসামীরা দারুণ ভদ্রলোক! আজও একজনও বাঙালী নেই যে বলে, নন্দাকে, প্রফুল্ল সেনকে যে, তোমাদের কিছু এসে যায় না পূর্ববংগের বাঙালী মরলে কারণ তোমাদের তারা কেউ নয়, কিন্তু যারা তাদের মুখ ভুলতে পারছে না, যারা তাদের আত্মীয়, কেউ বাপ, কেউ মা, ভাইবোন স্বামী স্ত্রী, তারা এরপরেও শান্তির মিছিল বার করবে এ যারা আশা করে তারা হিন্দুস্থানের মন্ত্রী, হলেও আসলে তারা ম্যান নয় ; তারা পাকিস্তানের মুসলমানেরই পরমাত্মীয়।

পশ্চিমবংগেও কি, বাঙালী হিন্দু শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘু শ্রেণীতে পরিণত হবে?

বাঙাল মনুষ্য নয়...

পশ্চিমবংগের মানুষকে, শিক্ষিত মানুষ, শুধু পুরুষ নয়, মহিলাকেও বলতে শুনছি, এর পরেও, যে বাঙালরা এসেই যত গোলমাল বাধালে। একটি ঘটনা অন্তত জানি যেক্ষেত্রে দোতলার পশ্চিমবংগবাসী একতলার পূর্ববংগবাসীর নামে পুলিসে অভিযোগ করছেন যে, সারা রাত ওরা কাল বাড়ি ছিলো না। নিশ্চয় দাংগা করেছে। এর পর বাঙালীর মাথায় বাজ না পড়লে বুঝব শিশুপালের ১০০ অপরাধ এখনও পূর্ণ হয়নি বুঝি। পূর্ববংগের মানুষদের দান স্বাধীনতা সংগ্রামে সব চেয়ে বেশি। তারা যে আজ উদ্বাস্তু, এ তাদের অপরাধ নয়। কংগ্রেসী নেতাদের, বিশ্বাসঘাতকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে তারা! (Bengal suffers today for what India did yesterday!)

পূর্ববংগের লোক বলেই পশ্চিমবংগে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে তারা। অবাঙালীদের হাত থেকে ব্যবসা যদি বাঙালীর হাতে আসে কোনওদিন তাহলে তা আসবে পূর্ববংগবাসীর জন্যেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররা বেরুচ্ছে ওই রিফুজি কলোনি থেকে। পশ্চিমবংগ যদি পাকিস্তানে যেত এবং হিন্দুর পূর্ববংগে বাস করতে হতো নতুন করে তাহলে এতদিনে মানচিত্র থেকে মুছে যেত পশ্চিমবংগের নাম। কেঁদে কূল পেত না ঘটি (রাম) বাবুরা। পূর্ববংগের মানুষদের জেদ আছে। তারা কষ্টসহিষ্ণু। মার খেয়ে মার দিতে জানে। তারাই বাঙলাকে বাঁচাতে পারে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি বীরের রক্তস্রোত বয়েছে বাংলা দেশেই, মাতার অশ্রুধারাও। সেই বাংলা দেশে আবার পূর্ববংগের বীর এবং বীরপ্রসবিনী অনেক বেশি। বাঙাল মনুষ্য নয় একথা বলবার আগে কোনও কোনও মনুষ্যত্বহীন পশ্চিমবংগের বাবু এবং বিবিরা যেন তা মনে রাখে!

কলিকাতা পুলিস কমিশনারের ছুটি...

কলিকাতার জনপ্রিয় পুলিস কমিশনার শ্রীযুক্ত ঘোষকে ছুটি দেওয়া হয়েছে একমাসের। কারণ, তিনি ক্লান্ত। লোকে একথা বিশ্বাস করেনি। তাদের ধারণা, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নন্দ এবং জয়ন্ত চৌধুরী দুজনেই লোকমুখে শোনা যাচ্ছে, কলকাতায় পুলিসব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। ২৪-পরগণায় কালেজের যে ছাত্র গুলিতে মারা গেছে, তার মৃত্যুর জন্য দায়ী যে-ই হোক, ২৪-পরগণার পুলিসকর্তা তখন কে ছিলেন সেটি আগে জানা দরকার। ১৫-ই জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায় জানানো হয়েছে যে ঃ

"When the present disturbances broke out he (P. K. Sen) was asked to take over-all charge of the 24 Parganas dist."

তাই যদি হয় তাহলে ছাত্রমৃত্যুর জন্যে একজনের প্রমোশান আরেকজনের ছুটি? সাংবাদিকদের ঠেংগানোর জন্যে খ্যাত ও প্রমোটেড পি. কে. সেনের সাড়ম্বর সচিত্র জীবনী সংবাদপত্রের পাতায় প্রমাণ করে দিল যে আমাদের সংবাদপত্রের কোনও চরিত্র নেই।

ভূদেব সেন হত্যা

১৮ বছরের ছাত্র ১৭ বছরের স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী অহিংস পুলিসের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এই হত্যা নিয়ে তথাকথিত তদন্তের প্রহসনও হবে। তাতে যাই প্রমাণিত হোক, ভূদেব সেনের জীবন ফিরে আসবে না। গুণ্ডা দমনের নামে ছাত্র নিধনের মতো নৃশংস ঘটনাতেও কংগ্রেস বিরোধীদের মুখে একটিমাত্র কথা আমরা শুনেছি যে, তদন্ত চাই। তদন্তে কি হবে? একটি ছাত্র, কালেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, নিহত এবং আহত হলো পুলিশের গুলিতে। কালেজের ভেতরে বুলেটের দাগ পাওয়া গেল।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কালেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন যে পুলিশের কোনও কারণ ছিলো না এই অসংগত উদ্ধত ব্যবহারের। পুলিস গুলি করলেও পায়ে করার কথা, হত্যা করার কায়দায় গুলি করার কথা নয়। তদন্তের পরও এর জবাব পাওয়া যাবে না। আমার জিজ্ঞাসা, আসামে বংগরমণী ধর্ষণের সময় পুলিশের বন্দুক থেকে একটি গুলিও কি বেরিয়েছিলো। নন্দর মতো কেউ গিয়ে একদিনের মধ্যে শান্তি চাই বলে চেঁচিয়েছিলো? না। কেন? কারণ, আসামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেও কংগ্রেস ভোট পেত না। বাঙলা দেশে পাচ্ছে এবং পাবে। দোষ কংগ্রেসের নয়। দোষ সেই বাঙালীর যে আজও পার্টি বলতে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট বোঝে। এদের জন্যে, নন্দা, প্রফুল্ল সেন, কংগ্রেসই সত্যিকারের ওষুধ। কংগ্রেস জানে, বাঙালী কেবল কাঁদতে জানে আর তদন্ত চাইতে জানে। তার বেশি করবার, প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাও ক্ষুদিরামের বাংলায় আজ নেই।

থাকলে আরামবাগের গান্ধী বাণী দেবার আগে ভাবতেন যে বক্তৃতা দেওয়া সংগত হবে কি না। শরৎচন্দ্র বসু বেঁচে থাকলেও ভাবতেন, শ্যামাপ্রসাদ বেঁচে থাকলেও ভাবতেন। ডক্টর রয় থাকলে নন্দা কলকাতায় আসতেন কি না সন্দেহ।

বাঙালী আজ বিধবা! এই দেশের একমাত্র অধিপতি আজ নিরুদ্দেশ।

মেরেছ কলসীর কাণা...

মুসলমানদের তোষণ করে পাকিস্তানের জন্ম রোখা যায়নি। পাকিস্তানকে তোষণ করে মুসলমানদের রোখা যাবে না। অদ্য, কল্য, পরশু পাকিস্তান ঝাঁপিয়ে পড়বে হিন্দুস্তানের ওপর। এখানে যেসব মুসলমান আছে, নৌসের আলির মতো মুষ্টিমেয় যারা আগে ম্যান পরে মুসলমান, বাদ দিলে, সব পাকিস্তানের হয়ে নাশকতা মূলক কার্য এখন গোপনে করছে, তখন প্রকাশ্যে করবে। চীনকে বিশ্বাস করে ঠকেছি,—বলেছেন ভারত সরকার। তখনও বলবেন,

পাকিস্তানকে বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। একবার ঠকে যে তার মার্জনা আছে। দুবার ঠকে যে সে চৈতন্য নয় ; বোক্‌চৈতন। জগাই-মাধাইকে চৈতন্য প্রেম দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। চীন ও পাকিস্তান, এই দুই জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করা বোক্‌চৈতনের কর্ম নয়। মুসলমান, হিন্দু, খ্রীশ্চান প্রত্যেকটি নাগরিকের ন্যাশনাল রেজিস্টার রাখা উচিত। ভারতের মতো বিচিত্র বহুভাষী বহু সম্প্রদায় দেশের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এ ছাড়া পথ নেই।

কলকাতা ও অন্যত্র যে সব মুসলমান ছোটো-বড় পদে আছে তাদের ওপর নজর রাখা প্রধান কর্তব্য। গৃহ ও মুসলমান জমায়েৎগুলি তল্লাস করা উচিত। দাংগার সময়ে আপত্তিজনক বহু জিনিস পাওয়া গেছে বলে আমরা শুনেছি।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, ধর্ম নিরপেক্ষরাষ্ট্র হোক ভারত। ক্ষতি নেই। কিন্তু মনুষ্যত্ব ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, রাষ্ট্র নামের অযোগ্য। মুসলমান বলে আমার আপত্তি নয়। দেশের পক্ষে এরা বিপজ্জনক বলেই আমার সতর্ক বাণী। বিবেকানন্দের চেয়ে নিশ্চয়ই এদের উদারতা বেশি নয়। তিনি আজ বেঁচে থাকলে রাষ্ট্রবিরোধী যে-ই হোক, তার গালে দশ থাপ্পড় দিতেন। মার খেয়ে প্রোটেস্ট নোট পাঠাতেন না।

ভারতবর্ষে কি আজ একজনও নেই যাকে দেখে চীন ও পাকিস্তান এর বুক কাঁপে? আছেন একজন। ২৩শে জানুয়ারী তো তাঁরই আবির্ভাব দিন। এখনও কি তাঁর আবার আবির্ভাবের দিন আসেনি?

রাধাকৃষ্ণানের প্রস্তাবের উত্তরে আয়ুবের প্রত্যুত্তর কি ভারতরাষ্ট্রের অপমান নয়? ভারতরাষ্ট্র কি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি? এ অপমান তো প্রত্যেকটি ভারতীয় ব্যক্তির!

স্বামীজী ও নেতাজী

জানুয়ারী মাসে জন্মেছেন দুজনে। দুজনেই সৈনিক, দুজনেই সন্ন্যাসী। দুজনেই বাঙালী দুজনেই বিশ্বপথিক। স্বামীজী বলেছেন, পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার। নেতাজী বলেছেন, অন্যায় এবং অবিচারের সংগে আপস করা সবার বড় অপরাধ। মৃত্যুর বন্দনা করেছেন বিবেকানন্দ জীবন দিয়ে · Worship the terrible! Worship death! নেতাজী বলেছেন ঃ Give me blood I will give you Independence! Total mobilisation for total war! এ যুদ্ধ কেবল সাহেবদের বিরুদ্ধে নয় ; মোসাহেবদের বিরুদ্ধেও!

কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট বাদ দিয়ে বাঙালীর চাই তৃতীয় দল। শিবাজী, স্বামীজী ও নেতাজীর পথে সেই দল ভারতবর্ষের নেতৃত্ব না নিলে, ভারতবর্ষ আবার পরাধীন হবে সুনিশ্চিত।

২৩শে জানুয়ারীতে বাঙালীর প্রতিজ্ঞা হোক, সবাই মিলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব তবু কংগ্রেসী ঘাতক এবং কম্যুনিস্ট বিশ্বাসঘাতকদের দূর করে দিয়ে, তৃতীয় দলের জন্ম দেব।

সেই দল ডিক্টেটোরিয়াল হবে। ডেমোক্র্যাটিক হবে না।

[৩য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৩৭০]

তিনটে, ছটা, নটায়

প্রতিনিধি,--

এই অচিন্ত্য কাহিনী বিদ্যাসাগর মশাই দেখলে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন প্রত্যাহার করতেন...

জহরলাল নেহরুকে কবিরাজ মশাই সজনে ডাঁটা এবং বেগুনপোড়া পথ্য করতে এবং হাস্যকর লোকদের সংগে মেলামেশা করতে বলেছেন। একসংগে এই তিনটি বস্তুই মিলতে পারে পূর্ণতে প্রতিনিধি ছবিটি দেখলে। হাসতে হাসতে মরে যেতে হলে, মরে যেতে যেতে হাসতে হলে প্রতিনিধির মতো পদার্থ আর নেই। ছবির আরম্ভেই নায়ক এবং নায়িকা, অচিন্ত্য-কাহিনীর সজনে ডাঁটা ও বেগুনপোড়া হাসতে লাগলো। কেন, তা অচিন্ত্যই জানেন। একটু বাদে অবশ্য সবাই জানলো। বেগুনপোড়া অর্থাৎ নায়িকা হাসছে তার কারণ নায়ক সজনে ডাঁটা জানে না যে বেগুনপোড়া বিধবা। নায়ক সজনে ডাঁটা হাসছে কারণ নায়িকা বেগুন-পোড়া জানে না যে বিধবা হলেও তার ওপরই নায়ক ঝাঁপিয়ে পড়বে। পড়লোও একটু বাদেই।

কিন্তু নায়িকার আগের পক্ষের ছেলেকে নিয়ে যেতে দিলেন না নায়িকার আগের পক্ষের শ্বশুর। শ্বশুর নন, নায়িকার এবং আগেব পক্ষের ঠাকুরপোর চোখে সাক্ষাৎ অসুর। তাঁর অন্যায় হচ্ছে,--ছেলের বউ আবার বিয়ে করায় নাতিকে যেতে না দেওয়া মায়ের এবং সৎবাবার কাছে। ছেলেটিও যে ভবিষ্যতে বিধবা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে রাজি না হতে পারে, এই ঠাকুর্দা-আতংক কী কারণে অন্যায় লেখক তা বলেননি। বললেও চিত্রনাট্য তা উপস্থিত করেনি। ঠাকুর্দার আপত্তি যে কত প্র্যাকটিক্যাল একটু বাদেই তা বোঝা গেল। সজনেডাঁটা ও বেগুনপোড়াও একটু বাদেই তা হাড়ে হাড়ে বুঝলো। ছেলেটা থাকার ফলে ভূতপূর্ব বিধবা এবং অভূতপূর্ব বৌ-এর সংগে দ্বিতীয় স্বামী ও অদ্বিতীয় নায়ক যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না। হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি, ছেলেটা স্কুল থেকে নায়িকা চুরি করে আনে একদিন। নিজের জিনিসকে নিজে গ্রহণ করলেও তা চুরি, এই প্রথম জানলাম। সেই ক্রিমিন্যাল ওফেন্স দ্বিতীয় স্বামীর ডিক্টেটিত একটি চিঠিতেই ফায়সালা হয়ে গেল। যে শ্বশুর তাঁর বাড়িতে নাতির সংগে মা দেখা করতে গেলেও ফোঁস করতেন, তিনি এখন স্পিকটি নট!

প্রথম স্বামীর ছেলেকে দ্বিতীয় স্বামীর হাত থেকে দূরে রাখবার চেষ্টায় প্রথম পক্ষের ঠাকুরপোর সংগে বচসার মধ্যে ট্রেন এল দেখে নায়িকা তার তলায় পড়ে যেই হাসপাতালে না নার্সিং হোমে মারা গেলো সেই সৎ পুত্র অসৎ বাপের কাছে, না কি, অসৎ পুত্র সৎ বাপের কাছে ফিরে গেলো। বোঝা গেল ছেলেটা সৎ বাপকেই চাইছিলো। মা থাকার জন্যে বাপের কাছে যেতে পারছিলো না।

এই অচিন্ত্য কাহিনী, বিদ্যাসাগর মশাই দেখলে, বিধবা বিবাহ আন্দোলন প্রত্যাহার করতেন। তিনি অবশ্য বাল্‌বিধবার বিবাহ দিতে বলেছিলেন। বালকসুদ্ধ বিধবার বিবাহ দেবার প্রস্তাব তাঁর কাছে অচিন্ত্য ছিলো।

গল্প বাদ দিয়ে ছবি করা যায়। কিন্তু গল্প বলব বলে শুরু করে তারপর গল্প বলতে না পারা অক্ষমতা। প্রথমত, আজকের দিনে বিধবা-বিবাহ কোনও সমস্যা নয়। ছেলেসুদ্ধ বিধবাবিবাহও নয়। বস্তুত ব্যক্তির সুখদুঃখ নিয়ে সাহিত্যের দিন গেছে। সমস্ত পৃথিবী যেখানে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তখন কোন্ বিধবার সংগে তার দ্বিতীয় স্বামী জুৎ করতে পারছে না, মাঝখানে একটা ছেলে আছে বলে, এটা কোনও প্রব্লেমই নয়। এর জন্যে সেলুলয়েড তো বটেই, কাগজ-কালিও নষ্ট করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যক্তিগত বেদনাও দর্শককে ছোঁয় না, কাহিনী, পরিচালনা ও অভিনয় বৈগুণ্যে। গল্প এগোয়নি। দুর্বহ স্লো এই ছবির শেষে, মাঝে দর্শক বিরক্ত হয়েছেন অসম্ভব। ট্রেনের তলায় পড়া নায়িকার মৃত্যুর অনেক আগেই ছবিব অপমৃত্যু হয়েছে গল্পের অপটু বুনুনির ফলে। ছেলে থাকার ফলে একটি প্রেমের পরিণয়ে ব্যর্থতার থিমকে গল্পের মধ্যে দিয়ে বলতে হলে যে ক্ষমতার দরকার তা বাংলা দেশে একটি মাত্র লোকের ছিলো। তাঁর নাম শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি-তে চাবি ছুঁড়ে দেবার একটি সিচুয়েটান আছে। প্রতিনিধিতেও রয়েছে। নিষ্কৃতির ওই দৃশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া চাবি প্রেক্ষাগৃহের বুকে এসে বাজে। আর প্রতিনিধিতে যে ছেলেটি এই চাবি ছুঁড়ে দেয়, সে ছেলেটির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি হয় না। তার ওপর রাগের ফলে রসাভাস ঘটে। শরৎচন্দ্রের গল্প যদি শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কেউ লিখতে পারত তাহলে আর একথাটা চালু হতো না যে, ছাগল দিয়ে যব মাড়াই হয় না। অথবা আরেকটি অভ্রান্ত জনশ্রুতি, যার কম্মো তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।

সমস্ত ছবিটি ঝুলে গেছে, যে বালককে কেন্দ্র করে ঝড় সেই অতি পক্ক বালকটির ব্যবহারে তার প্রতি অসীম বিরূপতার কারণে। র‍্যালিসমের খাতিরেও এ এঁচড়ে পকতা গ্রাহ্য নয়।

ছবিতে কতকগুলি শট কেবল শট নেওয়ার বাহাদুরী ছাড়া আর কোনও কাজে আসেনি। নায়িকার কাছে নায়ক, বেগুনপোড়ার কাছে সজনে ডাঁটার আসার দৃশ্য, যেদৃশ্যে নায়িকা বললে সে বিধবা, অত্যন্ত বিলম্বিত, অকারণে বহুল। এই অর্বাচীন পরিচালকদের মাথায় ঢোকে না কিছুতেই যে অপ্রয়োজনীয় বাহাদুরী সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অবিমৃষ্যকারিতা বই কিছু নয়। একটি দৃশ্যসজ্জা তো রীতিমতো দৃষ্টিকটু। দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম গৃহের ছাদ আর সেই গৃহের নীচের তলার সজ্জার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? ছাদটি মনে হয় হরিপদ কেরানীর বাড়ির ; আর নিচের তলার সজ্জা আকবর বাদশার।

নীল আকাশের নীচে,—হেমন্ত-বেলা প্রোডাকসান্স-এর পরিচালক ছিলেন মৃণাল সেন। মৃণাল সেনের ছবিতে তাই হেমন্ত সংগীত পরিচালক, এবং বেলা প্লে-ব্যাক সিংগার হবে, এ হচ্ছে পরস্পর পিঠ চুলকানো সমিতির অলিখিত নির্দেশ। কিন্তু হেমন্তর সংগীত পরিচালনা এবং বেলার নেপথ্য কণ্ঠদানের ফলে প্রতিনিধির গান গীত হবার সময় কী পরিমাণ নেচারস কল আসে হলে মৃণাল বাবু একদিন পূর্ণ-তে বসে তা দেখেছেন কি? হেমন্তর গলা মাইকে

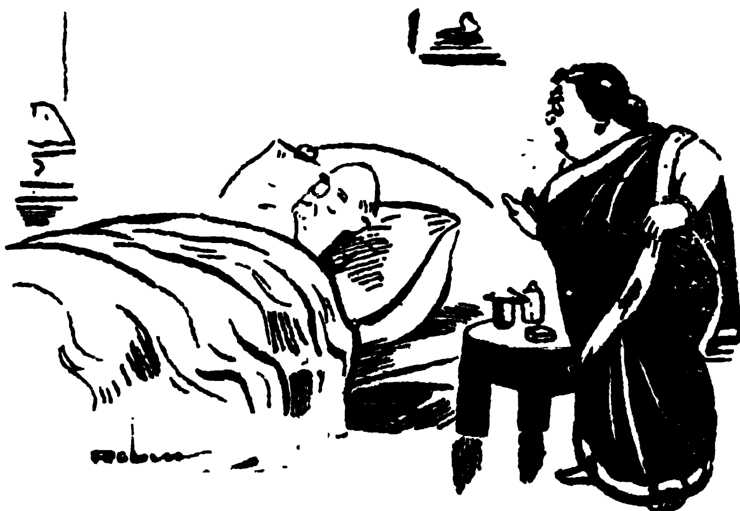
শুনতে ভালো লাগে। মাইক ছাড়া তাঁর গলা শোনা যায় না। সংগীত পরিচালনা আর মাইক ফিটনেস এক বস্তু নয়। হেমন্তকুমার বোম্বাইতে হিন্দি ছবির গানে সুর দিন ; এসে যায় না। কারণ তিনি বাঙালী। ওতে তাঁর পয়সা হলে তা আমাদেরই লাভ। কিন্তু বাংলা ছবিতে সংগীত পরিচালনা হেমন্তর কাজ নয়। গান গাওয়ার চেয়ে গান গাওয়ানো অনেক দুরূহতর ব্রতের উদ্‌যাপনফল। এতে রবীন্দ্রসংগীত ক'টি এত অপটু কণ্ঠে উচ্চারিত যা অশ্রুত থাকলে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হত না। গান ঠিক জায়গায় হয়নি। আবহসংগীত বাদ দিয়ে দু এক জায়গায় মৃণাল সেন কামানসেন্সের পরিচয় দিয়েছেন।

অভিনয়কুশলতায় সাবিত্রী বর্তমানে বাংলা দেশের একমাত্র শিল্পী। তাঁর অভিনয় এ ছবিতে তাঁর যোগ্য হয়নি। রোলে কিছু নেই, একথা অন্য আর্টিস্ট হলে বলতাম। যথার্থ শিল্পী সেই যে যেকোনও রোলে কলরোল আনতে পারে। সাবিত্রী সেই জাতের শিল্পী। তিনি তা পারেননি এছবিতে কারণ গল্পের মেজাজ না থাকলে যিনি সেই গল্পের চরিত্রকে রূপায়িত করেন তাঁরও মেজাজ আসে না।

এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্টের নামই মুড ; অর্থাৎ মেজাজ।

—দী. কু. সা।

[৩য় বর্ষ, সংখ্যা ১১, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৩৭০]



—দেখেছ! লোকটা ঘুমের ওষুধ খেতে ভুলে গিয়ে ঘুমুচ্ছে—।

ওরা যখন...

নীলকণ্ঠ

ওরা যখন অন্ধকারে,
আঘাত করে বন্ধদ্বারে,
চোরের মতো পালিয়ে এসে
নকল দাঁতে করুণ হেসে
আমরা তখন এ-ওর গায়
আবির ছড়াই ফাগুন বায়।

বন্য পশুর মোকাবিলায়
সহর গ্রামে এবং জিলায়
ছিন্ন সতীর ভিন্ন দেহে
কলুষস্পর্শ 'মা'-টির গেহে
রক্তনদী,—অশান্ত বায়
শান্তবাণীর সান্ত্বনায়

আমার ঘরে তখন জানি
সকাল থেকে আকাশবাণী
বলছে কেঁদে 'ছি, বৎস
ও সব কথা বীভৎস
নেয়না কানে ভদ্রলোক ;
কীসের দুঃখ? মিথ্যে শোক!

আসছে 'লতা'—কোকিল-গলা
পাতলা জামা রংগীন তলা
দেখবে চলো 'রঞ্জি' গাঁয়
সংস্কৃতির পঞ্জিকায়
লিখবে নাকি নিজের নাম?
(যাক না বাঙাল জাহান্নাম!)

[৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২৩, ১৩ মার্চ, ১৩৭০]

তিনটে, দুটো, নটায়

একদা Lion-tamer

মঞ্জু দে-র স্বর্গ হতে বিদায় ...

ও হেনরির অনবদ্য অবিস্মরণীয় এক গল্পের নায়ক যে কোনও সিন্দুক না ভেঙ্গে খুলে ফেলতে পারত। এক সময়ে সে অসাধারণ চৌর্যবৃত্তি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে সাধারণ মানুষের মতো একটি নারীকে ভালোবেসে বিয়ে করে। সেখানে শ্বশুরের অভিনব সিন্দুকের মধ্যে তার বালক শ্যালক আটকা পড়ে। ছেলেটিকে বাঁচায় নায়ক। দূরে জানলা দিয়ে দেখে রাস্তার ওপারে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে তাকে হাতে নাতে ধরবার জন্যে। নায়ক তার কাছে যায় ধরা পড়া এড়ানো যাবে না বলে। সার্জেন্ট তাকে ধরে না। বলে, সে অন্য লোককে খুঁজছে।

এ গল্পের কি অপমৃত্যু স্বর্গ হতে বিদায় ছবিতে ঘটেছে তা যিনি সব চেয়ে বেশি জানেন, তার নাম, মঞ্জু দে। তিনি ছবিটি দেখেননি। দেখলে, এছবি তিনি রিলিস করতে দিতেন না।

একদা লায়ন-টেমার সিংহকে পোষ মানানোর খ্যাতিতে দীপ্ত মঞ্জু দে অভিনেত্রী হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর এই পরিচালনার FOOLS PARADISE থেকে যত শীগ্‌গির বিদায় ঘটে, তাঁর অনুরাগীদের পক্ষে তা ততই আশাপ্রদ।

মাধবী মুখার্জিকে সত্যজিৎ রায়ের নেওয়ার মানে বুঝি,—বিজয়া দাশ সত্যজিতের স্ত্রী। কিন্তু মাধবীকে মঞ্জু দের নেওয়ার মানে কি ? স্ত্রীলোক হয়ে একজন স্ত্রীলোককে এভাবে অপদস্থ করা কি কর্তব্য ?

দিলীপ মুখার্জিকে বলি : Look before the Leap ! একগাদা ছবিতে যা-তা রোলে নামলে বাংলা ছবির সব চেয়ে সম্ভাবনা উজ্জ্বল নায়কেরও চলচ্চিত্রের স্বর্গ থেকে বিদায় আসন্ন। এই বালকের কি জেনুইন বন্ধু একজনও নেই যে তাকে এই এলিমেন্টারি সেন্সটুকু দেয় যে কাচের স্বর্গে বেশিক্ষণ বাস করা যায় না। অভিনয় করা আর ছবিতে নামা এক জিনিস নয়।

দিলীপের উচিত বছরে একটি ছবি করা। সেই একটি রোলেই ঠিক মতো করতে পারলে সে কলরোল আনতে পারবে এত যে টাকারও অভাব হবে না।

কিন্তু কাকে বলি? বেনাবনে কেবল মুক্তো ছড়াই আমি ....

দীকুসা

[৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২৭, ১০ এপ্রিল, ১৩৭০]

বিলিভ ইট অর নট !

বামপন্থীরা সোনামুগের ডাল খায় না কারণ সোনা হচ্ছে ক্যাপিট্যালিজমের 'প্রপার্টি ইজ থেফট'-এর প্রতীক। এবং দক্ষিণপন্থীরা মা কালী-র পূজা করে না কারণ কালীর জিহ্বা লাল; এবং জহরলাল ছাড়া আর সব লালই,—কম্যুনিজমের wrong-এ ছোপানো,—তাই!

তিনটে, ছুটো, নটায়

আলোছায়া প্রোডাক্‌সন্সের : সপ্তপদী ; তারাশংকরকে 'উত্তম'-ধোলাই !

মোহনবাগান সেবার বাইরে খেলতে যাবে। ডুরাণ্ডে কি কোথায় মনে নেই, মোহনবাগান তাঁবুতে তাই নিয়ে ছোকরা খেলোয়াড়দের মধ্যে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা। সব চেয়ে যে অর্বাচীন দলের মধ্যে সেই সদ্য গোঁফ-ওঠা বোঝাচ্ছিল যে গোল দেওয়া মোহনবাগানের পক্ষে ইজি ; কারণ, সে হাত-পা নেড়ে সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললো যে, ধরো, আমি দিলাম তোমাকে, তুমি বলটা ঠেলে দিলে সেণ্টার হাফ, সে পাঠালে লেফটাউটে, সেখান থেকে গোলের মুখে এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ডের পা থেকে গোলে। ক্লাবের তাঁবুতে সেই আলোচনার মধ্যে বসেছিলেন নির্বাক গোষ্ঠ পাল। এতক্ষণ বাদে সকলের খেয়াল হয় যে তিনি একটি কথাও বলেন নি। তখন সেই অর্বাচীনতমই প্রশ্ন করলো তাঁকে ঃ আপনি কিছু বলছেন না যে গোষ্ঠবাবু? গোষ্ঠবাবু হাসলেন ; তারপর বললেন ঃ আমার বলবার নেই, জিজ্ঞেস করবার আছে! 'কি, বলুন',—সাগ্রহ অর্বাচীনের পুনরনুরোধে গোষ্ঠবাবু আবার মুখ খোলেন ঃ তুমি যেভাবে বলে গেলে, এই দিলাম, ঠেললাম, তারপরেই গোল ; তাতে আমার মনে প্রশ্ন জাগছে যে, তাহলে ওদের অর্থাৎ প্রতিপক্ষের কোনও প্লেয়ার মাঠে নেই না তারা কাঠের পুতুলের মতো সবাই দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বাধা দিচ্ছে না?

সেই বিখ্যাত গোষ্ঠ পাল যদি আজ ছবির পর্দায়, খেলা দেখতেন, আমি বলছি একটি ফুটবল-ম্যাচের দৃশ্য তাহলে দেখতেন কেবল প্রতিপক্ষের নয়, স্বপক্ষেরও কেউ নেই, সবাই অদৃশ্য! খেলে যাচ্ছেন যিনি একা, তাঁর নাম উত্তমকুমার! আমি সপ্তপদীর কথা বলছি। তারাশঙ্করের লেখা বহু-বিক্রীত বইয়ের বহু-বিকৃত চিত্ররূপ, তার বিচিত্র-রূপ ছবির পর্দায় আরম্ভ হয়েছে একেবারে আচমকা! একটু বাদে সেলুলয়েডের দেওয়ালে আলোছায়ার হরফে পড়তে শুরু করেছে এই ছবির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত, শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তাদের নাম-কামের বিজ্ঞপ্তি। আমিও সপ্তপদীর সমালোচনা একেবারে আচমকা আরম্ভ করে দিলাম, তাই ফুটবল খেলার যবনিকা উত্তোলন করে। এখন ছবির আলোচনা আরম্ভ করি। মূল ছবির

অতঃপর। এবং প্রার্থনা করি, অয়মারম্ভ অশুভায় ভবতু!

তারাশঙ্করবাবুর সপ্তপদীর মূল কাহিনীটি আমি পড়ি নি। কিন্তু আমি শুনেছি যে মূল কাহিনীকে আমূল না হলেও, খোলনলচে বদল না বলা গেলেও তাকে, বদল করেছেন ছবিওলা এমনভাবে যাতে তারাশঙ্কর এবং সপ্তপদীর পাঠক-পাঠিকারা, অনুরাগী পাঠিকারা রেগেছেন। তারাশঙ্কর এই ছবি দেখে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সেন্সার সার্টিফিকেটের গোদের ওপর বিষফোড়া সেই তারাশঙ্করী সার্টিফিকেটও আমি দেখিনি ; কিন্তু আমি শুনেছি তার জন্যও তাঁর পাঠিকারা মর্মাহত। কিন্তু আমি মর্মাহত সম্পূর্ণ অন্য কারণে। এই ছবি প্রথমে নাকি, আমার শোনা, ছিলো পনের হাজার ফিটের ; তারপর দেড় হাজার ফিট ছবি থেকে ছবি কয়েকদিন দেখাবার পর বাদ দেওয়া হয়েছে। আমার বক্তব্য, যে সেই বাদই দিলেন যখন ছবি থেকে ছবি, তখন কষ্ট করে আর মাত্র সাড়ে তের হাজার ফিট ছবি বাদ দিলে প্রথম সর্বাঙ্গসুন্দর বাঙলা ছবি হয়ত 'সপ্তপদী'-ই হত। এতে আর যারই আপত্তি যত সোচ্চারই হোক, আমার বিন্দুমাত্র বলবার থাকতো না কিছু! আমার থাকতো না ; আরও থাকত না একজনের। সেই একজন হচ্ছেন সপ্তপদীর লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাশঙ্করের আপত্তি থাকবার কোনও যুক্তিসংগত কারণ থাকত না বলেই থাকত না তাঁর আপত্তি। এমনিতেই তাঁর কাহিনী যা নাকি বিয়োগান্ত মূলে তা এতে মিলনান্তের ইংগিত বহনে মূলেই হাবাত হয়ে গেছে। শুনেছি তাঁর কাহিনীর নায়ক কৃষ্ণেন্দুর কুষ্ঠ হয়েছিল। কৃষ্ণেন্দুর ভূমিকায় উত্তমকুমার অবতীর্ণ। ফলে ছবিতেও কৃষ্ণেন্দুর কুষ্ঠ দেখাবার মত দুঃসাহস কোনও ছবিওলার থাকবার কথা নয়। না থাক, ছবির গল্পাকারের তাতে বাধা দেবার মত জোর যে এই গল্পলেখকের নেই তার প্রমাণ এর আগে তারাশংকর একবার দিয়েছেন যে অন্তত তা আমিও জানি। আমিও জানি যে তার কারণ তারাশংকরের সেই একটি বই আমি পড়েছি যে বইটির নাম কবি। এবং আমি শুনেছি, হিন্দি চলচিত্ররূপের বেলায় কবি-র মূল কাহিনীর ট্রাজিক অন্তের কমিক এনডিং-এ অপরূপান্তর ঘটেছিল তারাশংকরের বিনা প্রতিবাদেই। এবং তখন, তখনই নয় কেবল যখন রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর 'চার অধ্যায়' হিন্দিওলাদের হাতে অশালীন প্রচ্ছদে আবৃত জালজালা হয়ে নির্লজ্জ দেখা দেয়, তখনও মনে পড়ে তারাশংকর যেন কোন সুদূর অতীতে একবার বংকিমের ক্লাসিক চন্দ্রশেখরের ছায়াচিত্রাবমাননায় বিক্ষুব্ধ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন না দৈনিক সংবাদপত্রে? সে তাহলে কোন্ তারাশংকর যিনি এখন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া চরিত্রের নাম সত্যজিৎ-কারণে পরিবর্তিত হতে দেখলে, বিভূতিভূষণের ইহলীলা সংবরণের সুযোগে তাঁর অপরাজিত কাহিনীর লীলা-প্রসঙ্গ বাতিল হতে দেখলে, বিশ্বপুরস্কৃত ছবিতে, মৃদুতম আপত্তি করতেও নারাজ?

সপ্তপদী ছবিতে তারাশংকরকে এই উত্তম-ধোলাই দেওয়ায় তাই তারাশংকর ছাড়া আর যারই আপত্তি যত তীব্র তীক্ষ্ণ হক তা ধোপে টিকবে কেন? যার পাঁঠা সে-ই যদি যেভাবে খুসী কাটতে দেয় তবে আমার আপনার আপত্তিতে এসে যায় কি? আর যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক স্ত্রীলোক বোধহয় আরও বেশী মাতাল য়্যাংলো মেয়ের ভূমিকায় সুচিত্রাকে এবং তাকে পাঁজাকোলা অবস্থায় উত্তম-বাহিত হতে দেখতে পেলেই টিকিটের চতুর্গুণ পেয়ে গেছে বলে লালাবিগলিত মুক্তকচ্ছ প্রায় সেখানে আমার আপনার প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যত ক্ষীণ নয় আজ নেহেরু-খয়রাতির বিরুদ্ধে বেরুবাড়ী-কণ্ঠস্বরও।

তাই সেই আপত্তি-অগ্রাহ্যকর অপ্রীতিকর আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি থাক! তার বদলে এখন যে কথা তোলা যাক তা হচ্ছে তারাশংকর কাহিনীর যেটুকু ছবিতে আছে সেটুকুতেই আমি চমকেছি। চমকেছি, কারণ, তারাশংকরের গল্প বললেই আমি বুঝি, মুচি-ডোম, পড়ে-আসা-জমিদার, তর্জাকার, নাচনেওলি, গোয়ালিনী, সাঁওতাল, নায়েব, বীরভূমের

পরিবেশ এবং হাফ বাংলা হাফ আঞ্চলিকের মিশ্র ডায়লেক্ট্। সেই তারাশংকরের চরিত্র যখন য়্যাংলো মেয়ে হয় রীণা ব্রাউন নাম নিয়ে গাউন পরে, কোমর জড়িয়ে নেচে কুঁদে. নার্স হয়ে মাল খেয়ে এক কাণ্ড করে তখন আমার খটকা লাগে ; দারুণ খটকা। হঠাৎ মনে হয় যেন চোখের সামনে দেখছি রবীন্দ্রনাথ দাড়ি কর্তন করে হাফ প্যান্ট পরে ফুটবল খেলতে নেমেছেন ; গান্ধীজী চুড়িদার পায়জামা আর গোলাপফুল আঁটা শেরওয়ানী পরে চু এন লাইয়ের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে উদ্যত ; ডাঃ রায় এবং শ্রীঅতুল্য সব ছেড়ে ছুড়ে খোলকরতাল নিয়ে চলেছেন বৃন্দাবনের পথে এবং পেছনে পেছনে অনুগমন করছেন জগাই-মাধাই বেশে জ্যোতি বসু এবং ফকুরুদ্দিন আর তার পেছনে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [স্কুটার চেপে]। সে খটকা অবশ্য কেটে যায় একটু বাদেই ; বুঝি আমি যে দুঃস্বপ্ন দেখছি ; কিন্তু কবি তারাশংকরকে সপ্তপদী-র কাহিনীকার রূপে দেখবার বিসদৃশতার খটকা কিন্তু আমার এখনও কাটতে চাইছে না। সত্যিই, এ কাহিনীর লেখক তারাশংকর, না, শ্রীতারাশংকর?

তারাশংকরের লেখা আমার ভালো লাগে না। তাঁর ভাষা আমার কাছে অপাঠ্য। কিন্তু একটা গুণের জন্যে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি যাদের কথা নিয়ে কথাসাহিত্য রচনা করেন তাঁদের কথা বলবার অধিকার তাঁর আছে কারণ তা কৃত্রিম নয়, কারণ তাঁদের জীবনে জীবন যোগ করার সাধনায় তিনি সিদ্ধ তাই তাঁর গানের পসরা ব্যর্থ নয়। কিন্তু সপ্তপদীর এই মেয়েটিকে তিনি কোথাও দেখেছেন এমন বিশ্বাস তিনি আমার মনে সঞ্চার করতে পারেননি। পারেননি, কারণ, বসন তাঁর দেখা চরিত্র ; ভিন্ন বসনা রীণা ব্রাউন তাঁর শোনা চরিত্র। এ ছবিতে ওই চরিত্রের হাস্যকর সংলাপ তার একমাত্র প্রমাণ নয়। ওই কল্পিত চরিত্রের অকল্পিত ব্যবহারই তার অমোঘ পরিচয়। এই কল্পিত চরিত্র রীণা ব্রাউন যদি জাত্‌ব্রিটিশার অথবা য়ুরোপীয়ান হত তাহলে তার পক্ষে ভারতীয়র প্রেমে পড়া অসম্ভব হত না। কিন্তু য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ইণ্ডিয়ানদের যত ঘৃণা করেছে এত ঘেন্না জাত্‌-সাহেবও কখনও করে নি। এবং সেটা নিতান্তই জীবন-সংগত ব্যাপার। যখন রীণা জানছে তার মা কে,—তখন কল্পিত চরিত্র না হয়ে বাস্তব চরিত্র হলে তার ভারত-বিদ্বেষ বাড়ত বই কমত না। কৃষ্ণেন্দুর প্রতি তার রাগের কারণ কৃষ্ণেন্দু ভারতীয় ; খুব জীবন-সংগত। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর প্রতি তার অনুরাগ বাস্তবানুগ নয় ; গল্পের খাতিরে। ওথেলোর ভূমিকায় কৃষ্ণেন্দুর অভিনয় ; বিদেশী ছেলেটির দেশে প্রত্যাবর্তন, ব্যাডমিণ্টনে কৃষ্ণেন্দুর হেরে যাওয়া এবং পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হওয়া সবই সম্ভব ; কিন্তু তার জন্য রীণার রাগ থেকে অনুরাগে মোড় বদল, রীণা ব্রাউন য়্যাংলো বলেই, জীবন-অসংগত।

আমি জানি। আমি জানি যে, জীবন ছক কাটার দাবার জড় বোর্ড নয়। সে চলিষ্ণু। কাজেই একথা বলা জীবন-অসংগত যে কোনও য়্যাংলো কখনই ভারতীয়র প্রতি প্রেমাসক্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই পারে! এবং না পারলেও লেখক ক্ষমতাবান হলে তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন। এইখানেই আমার বক্তব্য, রীণা ব্রাউনের কৃষ্ণেন্দুর প্রতি হঠাৎ অনুরাগের ঢলকে প্রত্যয়যোগ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাশংকর। কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই যেন গল্পকে ত্বরান্বিত করবার জন্যেই ঝটপট ঘটে গেছে অঘটনগুলো। আমি ছবিতে যা হয়েছে তারই সমালোচনা করছি। তারাশংকরের গল্পে নায়েব যখন চটি খুলে জমিদারের ঘরে যায় ; অথবা কতবার চা খেয়েছে তা গুণে বলতে পারে তখন মুহূর্তের মধ্যে একটি জীবন্ত নায়েব চরিত্র আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেরকম নায়েব একটিও আমার না দেখা থাকলেও কিছু এসে যায় না। যেমন এসে যায় নি শার্লক হোম্‌স্‌-কে কারুর দেখা না থাকলেও জীবন্ত বলে মেনে নিতে।

এই কাহিনীর নাম সপ্তপদী কেন, ছবি দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। এটা ত আমার আরেকটা আপত্তির কারণ। তবুও আমি জানি। আমি জানি যে বৃথাই আমার প্রতিবাদ।

কারণ এ-ছবির যাঁরা দর্শক, সিনেমা-কাগজের যাঁরা পাঠক, তারা মূল কাহিনীর আমূল পরিবর্তন বা সপ্তপদী নামের তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। রীণা ব্রাউন র‍্যাল কি আন্‌র‍্যাল, তা নিয়েও না। তারা কেবল জানে যে গোড়ায় যত গলদই হক, শেষ পর্যন্ত সুচিত্রা-উত্তমকে মিলিয়ে দিয়ে শেষ রক্ষা করা চাই-ই। ইষ্টবেঙ্গল—মোহনবাগান! কে জিতল লিগ তাই হচ্ছে আসল। ফুটবলের উন্নতি-টুন্নতি ওসব বক্তৃতার সম্পাদকীয়র বিষয়। ফুটবলের কর্তারা তাই দু'দলের ভক্তকে হাতে রাখতেই ছমাস একজনকে, এবং ছমাস অন্যজনকে কাপ রাখতে দিয়ে শ্যাম ও কুল দুই-ই বজায় রাখেন ; সেই এক ফর্মুলা ছবিতেও। শেষ পর্যন্ত সুচিত্রা-উত্তম দুজনকেই জেতাও। কারণ ওরাই একমাত্র 'ড্র'।

তাই কাহিনীর চিত্রনাট্যকার, না কি বিচিত্রনাট্যকার যতক্ষণ পেরেছেন, যতবার পেরেছেন, সুচিত্রা-উত্তমের লদ্‌কালদ্‌কির দৃশ্য [বনফুলের ভাষা ঃ আমার নয়] দেখিয়ে অদৃশ্য রেখেছেন আর সব। এবং তাতেই দর্শক-মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ হয়েছে সুনিশ্চিত। আমার কথা যদি না বিশ্বাস হয়, তাহলে এছবি থেকে সুচিত্রা-উত্তমকে তুলে নিন ; ছবির শেষে কৃষ্ণেন্দুর কুষ্ঠ হোক এবং রীণার সঙ্গে মিলন না হোক তার, দেখি তখন কোন্ দর্শক এক কাণা কড়ি দেয় প্রদর্শককে?

সুচিত্রা উত্তমকে জোড়ে বিজোড়ে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ খেয়াল হয়েছে ছবিওলাদের যে ছবি শেষ করতে হয় এবার। তখন দুখানি চিঠির মারফৎ সব ফ্যায়সালা এবং গোঁজামিলন আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে সেই দীর্ঘ হিন্দি ছবির কথা যে ছবির শেষ দু রীলে কেবল টাইটেল লিখে বোঝাতে হয়েছিল যে এরপর নায়ক দিল্লি গেল, সেখানে নায়িকার বাবা হঠাৎ মারা যেতে বসল, তাই শুনে নায়িকা...। তখন আর ছবি দেখালে, ছবি শেষ হয় না ; তাই ছবির বদলে সাইলেণ্ট টাইটেলে বাকী গল্পটা লিখে তবে The End সম্ভব হল।

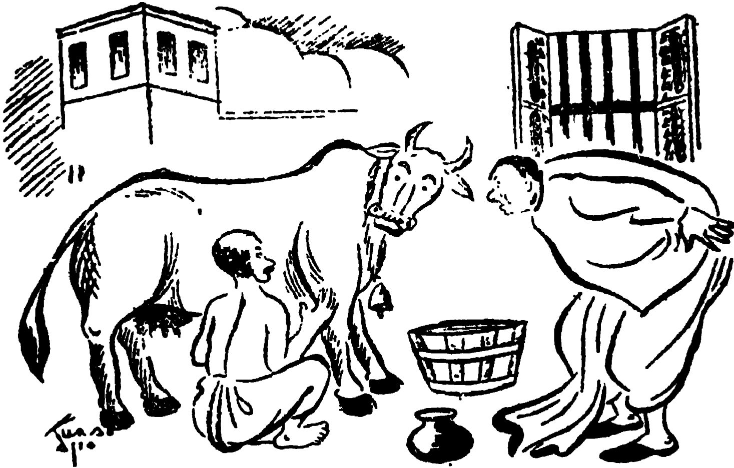
এই চিঠির প্রসংগে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি পরিচালকের। এ ছবিতে শটের কায়দা আছে, যে পরিমাণ, সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবের পরিমাণ তার চেয়ে কম নয়। তার প্রমাণ, চিঠির দৃশ্যটি। চিঠির লেখকের কণ্ঠে সেটি দর্শক-শ্রোতাদের শোনানোর ক্ষেত্রে চিঠির শেষে উল্লিখিত পত্রলেখকের নামটিও কেন পড়ে শোনাতে হবে? গলার স্বরেই তো শ্রোতাদের বোঝাবার কথা যে পত্রলেখক কে। তবে চিত্রনাট্যকার ছবিওলাদের হয়ে ছবি বিশ্বাসের মুখ দিয়ে যে বলিয়েছেন, ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই, তাতেই ক্ষমা করেছি। এই সত্য ভাষণের পর, অতঃপর ক্ষমা করতে বাধ্য হয়েছি মূল কাহিনীর আমূল পরিবর্তন থেকে সুরু করে, তারাশংকরের সার্টিফিকেট দানের অসংগতির অপরাধ পর্যন্ত সমস্ত পাপকে। কারণ আমি শুনেছি মস্ত বড় কে একজন নাকি বলেছেন, পাপীকে ক্ষমা না কর, পাপকে ক্ষমা কর।

তাহলে? তাহলেও প্রশ্ন উঠবে যে এ ছবি দেখতে তাহলে এত ভীড় কেন? তার উত্তর আগে দিয়েছি ; এখন আবার দিই, রবীন্দ্রনাথের সেই কথিকাটি স্মরণ করিয়ে যাতে তিনি বলেছেন রাস্তায় লোক যখন প্রণাম করছে সাষ্টাঙ্গ, তখন পথ, রথ, মূর্তি সবাই ভাবে এ প্রণাম তার পাওনা কিন্তু যাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম সেই অন্তর্যামী তাতে হাসছেন তখন। সেই হাসি,—সুচিত্রা-উত্তমের সেই অট্টহাসি আমার কানে বাজছে যে হাসি তাঁরা মনে মনে হেসেছেন, যখন তারাশংকর ভেবেছেন তাঁর কাহিনীর জন্যে, হেমন্ত তাঁর সুরের জন্যে, অজয় কর তাঁর ক্যামেরার জন্যে, বিনয় চাটুয্যে তাঁর চিত্রনাট্যের জন্যে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি তার লাইট দেবার জন্যে, এমন কি পোষ্টার সাঁটনেওলা তাঁর পোস্টার মারার জন্যেই অথবা রূপবাণী-ভারতী-অরুণার কর্তৃপক্ষ তাঁদের হাউসে চলবার জন্যেই সপ্তপদী হিট এ কথা মনে করে থাকেন যদি তবে সে কথা মনে করে, মনে মনে যে হাসি এখনও হাসছেন সুচিত্রা-উত্তম!—সেই হাসি-ই আমি দুই-ভাইতেও শুনেছি তবে সেখানে সুচিত্রা-উত্তমের নয়।

উত্তম-বিশ্বজিতের সে হাসির কথা অচলপত্রের আগামী সংখ্যায় আপনাদের শোনাব।

পুনশ্চ ঃ সুচিত্রা-উত্তমের অন্তর্যামী অট্টহাসিতে আমার সব খটকা কাটলেও, কেটে গেলেও, একটি খটকা কাটছে না কিছুতেই। এই ছবিতে ওথেলো-অভিনয়ের একটি দৃশ্য আছে। এই ছবির পরিচালক যেমন খুঁটিনাটি ব্যাপারেও নজর রেখেছেন, সতর্ক দৃষ্টি, তাতে আমি আশা করেছিলাম এ দৃশ্যের জন্যে উৎপল দত্ত, ওথেলোখ্যাত উৎপল দত্তের নির্দেশনা বা পরামর্শ অজয় কর মহাশয় নেবেনই। এবং তাঁকে ও সক্কলকে, সংশ্লিষ্ট সক্‌কলকে এ ভরসা দিতে পারি বুক ঠুকে যে এ দৃশ্যটি ছবিতে যা দাঁড়িয়েছে তার চেয়ে অন্ততঃ খারাপ দাঁড়াত না, উৎপল দত্তের পরামর্শ বা নির্দেশনা গ্রাহ্য করলে, এই কথাই আমি বলছি। আমার এই সামান্য খটকা কি দূর করবেন কেউ? এ ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কেউ? যে, কেন উৎপল দত্তের সাহায্য নিতে আটকাল আলোছায়া প্রোডাকসন্সের?

[১ম বর্ষ, সংখ্যা ২০, ১৯ জানুয়ারী, ১৯৬২]



—তোমার গরু ক'সের দুধ দেয় রোজ?
—পাঁচ সের!
—কতটা বিক্রী কর?
—নিজের জন্য সের তিনেক রেখে, বাকী সাত সের বেচি!

‘আবার তোরা বাঙালী হ’!’

আমাদের একজন পরম শুভানুধ্যায়ী আমাদের একটি চরম পত্রাঘাত করেছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন যে আমরা অচলপত্রে, ‘বাঙালী’ ‘বাঙালী’ করে যে বাড়াবাড়ি করছি তা কতটা ফলপ্রসূ হবে তার সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ সুপ্রচুর। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, যে বাঙালীরাই এমন এক জাত যারা বাঙালীয়ানা বরদাস্ত করবে না। যিনি এই পত্রাঘাত করেছেন তিনি একজন বিশিষ্ট বাঙালী। বাঙালীর সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা পুরস্কৃত হয়েছে। এই পত্রে তিনি নিজের নাম পুরো সই না করে, কেবল আদ্যাক্ষরে সেরে দিয়েছেন নিজের পরিচয় ; তা থেকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে তিনি তাঁর পত্র আমরা প্রকাশ করি অথবা করলেও তাঁর নাম প্রকাশ করি, এ তাঁর অভিপ্রেত নয়। এই কারণে আমরা তাঁর পত্রের বক্তব্য তুলে দিলাম ; তাঁর নাম প্রকাশ করে দিলাম না। তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা আমরা অস্বীকার করি না।

শুধু এই খ্যাতনামা বন্ধুই নয় আমাদের ; আরও কেউ কেউ, এমন কি আমাদের লেখক গোষ্ঠীরও কেউ কেউ এই একই কথা অন্য ভাষায় বলেছেন। কেউ কেউ এ-ও বলেছেন যে, অচল পত্রে আমরা কেবলই না, না, অর্থাৎ নেতিবাচক উক্তি করছি। বাঙালীয়ানাই যদি আমাদের বক্তব্য হয়ও বা, তবুও বাঙালীদের কর্তব্য কি, কোন্ পথে তাদের বর্তমান রাহুর দশা ; দারিদ্রদুঃখনিপীড়িত, দ্বিখণ্ডিত, রক্তাক্ত, প্রবঞ্চিত এই পশ্চিমবঙ্গের অবিশ্বাস্য হতাশার আর গ্লানিকর দুর্দশার অভিশাপ মোচন হবে কিসে, সে ব্যাপারে আমাদের কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ সাজেস্‌চান্ কি, তা আমরা স্পষ্ট করে, উজ্জ্বল করে, অনবদ্য অদ্ব্যর্থক ভাষায় উপস্থিত করতে পারছি না কেন ; পারলেও করছি না কেন?

রাজনৈতিক দলাদলি ভক্তরা বলেছেন, কংগ্রেসও না, কম্যুনিস্টও না, যদি, তবে কে? কার প্রতি অথবা কোন্ কোন্ নতুন আদর্শের প্রতি আমাদের আস্থা? সাধারণ নির্বাচনে তাহলে সাধারণ নরনারী কাকে ভোট দেবে? এদের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণ ও বাম-প্রীতিতে কম অন্ধ, তাঁরা বলেছেন, আমাদের যদি নতুনতর কোনও আদর্শ, বাদ অথবা বক্তব্য থাকে তবে তা কার্যকরী করতে হলেও তো দল চাই ; হতে পারে তা নতুন দল এবং নতুন কোনও নেতৃত্ব। দল বাদ দিলে আজকের দুনিয়ায় অথবা যে কোনও কালে, যে কোনও দেশে, দল ছাড়া কোনও নবধর্ম নবতর সত্য, নবীন আদর্শ কার্যকরী হয়েছে কবে? দল তো মেসিন : মেসিন ছাড়া ম্যাস্ স্কেলে প্রোডাক্‌সান, পর্যাপ্ত প্রোডাক্‌সান আর কোন্ জননী প্রসব করতে পারে ; কবে পেরেছে ; কোন্ যুগে?

কম্যুনিষ্ট প্রেমে বেশি মাতোয়ারারা বলেছে যে কংগ্রেসকে সমালোচনা করা আমাদের উপলক্ষ্য মাত্র ; লক্ষ্য,—কম্যুনিষ্টদের অনিষ্ট করা। কংগ্রেসীরা বলেছে আমাদের আসল প্রেম বামের দিকেই ; তাদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ, আপোসে লড়াই মাত্র। যাঁরা এতদূর বেসামাল নন তারা বলেছেন, বামপন্থীদের প্রতি আমাদের আক্রমণকে কংগ্রেসী মহল কাজে লাগাচ্ছে। এতে বামপন্থীদের সংস্কার করার চেয়ে কংগ্রেসের উপকার করা হচ্ছে অনেক বেশি। অনেকে, আমাদের নেতাজীর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় আমরা ফরোয়ার্ড ব্লকের সাহায্য করছি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, এমন অভিযোগও করেছেন।

কিন্তু আমরা কেবল অভিযুক্ত হইনি ; অভিনন্দিতও হয়েছি।

বাঙালীর হয়ে, বাঙলার হয়ে আমাদের এই প্রতিবাদ পত্র সহরে, গ্রামে অন্তর স্পর্শ করেছে অসংখ্যের। শংখের মুখে আমাদের বাঙালী হবাব, আবার বাঙালী হবার আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। কেউ কেউ নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন, যে, বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা, যুগান্তর, [এখনকার

দৈনিক নয়] এর পর এমন আগুনের পরশমণি, পাবকমন্ত্র প্রজ্বলিত হয়নি দীর্ঘকাল।

তবুও। তবুও আমাদের বক্তব্য স্পষ্টতর, যুক্তি তীক্ষ্ণতর এবং আহ্বান উদাত্ততর করবার অবকাশ এখনও আছে।

আমরা বিশ্বাস করি, যিনি একসময়ে লিখেছিলেন, আবার তোরা মানুষ হ'! তিনি আজ, দেশভাগের পর অন্নহারা, বস্ত্রহারা, আশ্রয়হারা লোক ও স্ত্রীলোকদের নেতাদের পাপে অনির্দিষ্ট যুগকাল ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হবার কারণে, নিজের দেশেই এক প্রদেশের নারী আরেক প্রদেশের আসামী দ্বারা ধর্ষিত হবার দুঃসময়ে, আমাদের জমি প্রধানমন্ত্রীর খামখেয়ালের মর্যাদা রাখতে খয়রাতি করে দেবার দুর্মুহূর্তে, নিশ্চয়ই নিজের হাতে ওই 'মানুষ' কথাটি পরিবর্তিত করে 'বাঙালী' কথাটা বসিয়ে দিতেন।

আমরা বিশ্বাস করি, বাঙলার সবচেয়ে বাঙালী কবি আজ বাঙলার চরম দুর্দিনে বিশ্বপ্রেমের কথা শোনাতেন না। জালিয়ানওলাবাগে নিরস্ত্র মানুষে, পশুর মত হত্যার প্রতিবাদে, যাঁর প্রতিবাদ পত্র আজ মুমূর্ষু বাঙালীর সব চেয়ে বড় জাতীয় সম্পত্তি, তিনি আজ নিজের কথা নিজেই প্রত্যাহার করে বলতেন,

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
মানুষ করেছ হায় বাঙ্গালী করনি।

মানুষ হতে গিয়ে সাত কোটি আজ আড়াই কোটিতে এসেছে। আরও মানুষ হলে ক'টিতে এসে ঠেকবে তা বলা শক্ত।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম নিঃস্বপ্রেম ছিল না। যিনি জাপানের ন্যারো ন্যাশনালিজম্-এর প্রতিবাদে গর্জনমুখর, গান্ধীর স্বরাজ-মন্ত্রে অবিশ্বাসী, মানুষের ধর্মের প্রবক্তা, তিনিই আবার লিখতে দ্বিধা করেননি ঃ

'I shall be born again and again in India. With all her poverty misery and wretchedness, I love India best'

এই ভারতপ্রেমিকের কণ্ঠেই আবার রাখীবন্ধনের হাসিকান্নার হীরাপান্নার গাঁথা সেই অনন্তমুহূর্তে গীত, উদ্গীত হয়েছে ঃ বাঙলার মাটি, বাঙলার জল!

একি কণ্ট্রাডিকশান রবীন্দ্র দর্শনে? না। নিজের মাকে ভালবেসেই বিশ্বমাতার ভালবাসা পাবার সুরু হয় সাধনা, [গোরা] এবার্তা যার কানে যায় নি, বাজেনি প্রাণে সে রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক হয়েও বিদেশী ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বললেও রবীন্দ্রনাথের ভাষাও সে হতভাগ্য বোঝেনি!

দুই

আমরা দলে বিশ্বাস করি না। বর্তমান দুই দলে ; কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিতে। যারা এই দলের সমর্থক তারা কেউ বিশ্বাস করে? তারা বিশ্বাস করে কি যে এসেম্ব্লী অথবা পার্লামেন্টে ঢুকে বিপ্লব আনা যায়? কেরালার পরেও করেন? তাঁরা একজনও বিশ্বাস করেন বলে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন, যে যাদের তাঁরা ভোট দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরা যে দলেরই হোক, তাঁরা সত্যি সত্যি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি? বিধানবাবু—অতুল্যবাবু এবং স্নেহাংশু আচার্য—জ্ঞান মজুমদার জনতার দুঃখের ভার নেবার, দুঃখ দূর করবার ব্রতে বিশ্বাস করেন,—একথা দুদলের সমর্থকরা নন শুধু ; ওঁরা নিজেরা বিশ্বাস করেন? দক্ষিণের বদলে বাম বসলে গদা হাতে, গদিতে বসলে এই দেশের কোনও দুঃখ দূর হবে একথা তারাই বিশ্বাস করে যারা বিশ্বাস করতে পারে নি যে, দীর্ঘকাল, সুদীর্ঘকাল ধরে অখণ্ড ভারতের জন্যে বিস্মৃত কত বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে গদিতে বসবার লোভে, গদা হাতে বসবার অশালীন দ্রুততায়, কংগ্রেস দেশভাগে সম্মতি দেবে।

দক্ষিণ অথবা বাম, কংগ্রেস অথবা কম্যুনিষ্ট,—মুখোসের আড়ালে, এরা এক। কংগ্রেস ১৫ বছর লুটেছে ; আরও ৫ বছর লুটতে যাচ্ছে। লোটবার অধিকার পেতেই ওৎ পেতে আছে বামপন্থীরা। দীর্ঘ ১৫ বছরে কংগ্রেস ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও নিঃস্ব করেছে একথা এখনও সৎ কংগ্রেসের মূল আদর্শে বিশ্বাসী কোটীকে গোটিকেরা নিজেরা স্বীকার করেন। বামপন্থীদের মধ্যে যারা Sober Element, তারা মুখে বলতে ভয় পেলেও মনে মনে জানে যে যেহেতু তারা ক্ষুধাতুর বেশি, সেই হেতু তাদের আমলে সাধারণ মানুষের দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।

দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত, দুর্ভাগ্যনিপীড়িত এই দেশে সাধারণ মানুষ কি ভাবে বাস করে, উপবাস করে এবং নেতাদের রাজকীয় বিলাস তাদের কি ভাবে উপহাস করে, কংগ্রেস-লুণ্ঠিত কম্যুনিষ্ট-ধর্ষণোদ্যেত স্বাধীন ভারতের ইতিহাস তারই ইতিবৃত্ত। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাজপ্রাসাদ, লোকলস্কর, খানাপিনা, চলবার ফেরবার জাঁকজমক দেখলে কেউ বলবে এই রাষ্ট্র দরিদ্র? চৌরংগি পার্ক ষ্ট্রিট এই দেখে যেমন বিদেশীরা যেমন মনে করে গোটা দেশটাই বুঝি রাতে এমনই রংগপল্লী হয়ে উঠে ; তারা জানে না যে চৌরংগি আর পার্ক ষ্ট্রীট কলকাতার ততটুকুও নয়, যতটুকু, দিল্লি, বোম্বাই, কানপুর, কলকাতা, মাদ্রাজ [৫টি টেষ্টের অকুস্থল] এই বিপুল ভারতবর্ষের। নেহরু কি খান তার বিবরণ, খেতে দিতে না পারার ফলে ছেলেকে মায়ের কুয়োয় ফেলে মেরে ফেলার দেশ ভারতবর্ষে যখন আমরা পড়ি, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে যেমন নভেল পড়ি, কোনও প্রতিবাদ করি না, রক্ত গরম হয় না যখন এর পরেও তখন বুঝি কি নির্বীর্য কি নিঃসহায় আমরা আজ?

দেশের জন্যে ফকির দেশবন্ধু আজ নিশ্চয়ই, তাঁর নাতি সমেত বামপন্থী নেতাদের প্র্যাকটিশ এবং পলিটিক্স, গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংক-ব্যালান্স এবং দেশসেবা একসঙ্গে চালিয়ে যেতে দেখে, অকুতোভয়ে বক্তৃতা করতে দেখে গরম জামাকাপড় পরে শীতের রাতে জীর্ণবস্ত্রদের সামনে, আঙুল কামড়াচ্ছেন। কি দরকার ছিল তাঁর ফকির হবার? গাছের খাব তলারও কুড়োব—এই—এই বামপন্থী আদর্শ তিনিও গ্রহণ করে দিব্যি রাজার হালে কাটিয়ে যেতে পারতেন শেষ দিন পর্যন্ত।

এসব কথা আমরা জানি ; কিন্তু বলব না। আমাদের আজকের ট্রাজেডি অর্থনৈতিক নয় ; নৈতিক। সেই নৈতিক ট্রাজেডি হচ্ছে, আমরা যা বিশ্বাস করি আমরা তা বলি না ; আমরা যা বলি আমরা তা বিশ্বাস করি না।

তিন

এই কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্ট, এই দুই মাসতুতো ভাই দেশের সর্বনাশ করার সংগে যার সর্বনাশ করতে সর্বাগ্রে উদ্যত, সেটি একটি প্রদেশ। সেই হতভাগ্য প্রদেশের নাম ঃ পশ্চিমবঙ্গ। আমাদের পার্টি-বিদ্বেষ, বোথ কম্যুনিষ্ট এবং কংগ্রেসী বুথকে আক্রমণ বিশেষ ভাবে এই কারণে। দেশের চেয়ে দলের এবং ব্যক্তির স্বার্থ বড়,—কংগ্রেসী এবং কম্যুনিষ্ট বহুবার, বহু ক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিয়েছে ; দিচ্ছে আজ থেকে নয় ; অনেককাল থেকেই। কিন্তু বাঙলার ক্ষেত্রে, বাঙালীর বেলায় সেই কলঙ্কিত উদাহরণ এমন উজ্জ্বল যেমনটি আর কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি। এর প্রমাণ সাম্প্রতিক কালে আসামে, বেরুবাড়ি খয়রাতিতে নিঃশেষিত হবার নয়। কলকাতা থেকে রেলওয়ে দপ্তর, মুজিয়ামের দুর্লভ সংগ্রহ, উত্তর প্রদেশে, দিল্লিতে সরানোয় ; আমাদের প্রদেশ থেকে আয় করো ; অন্য প্রদেশকে দাও আয়কর অংশ,—এই পলিসি রেলওয়ের বেলাতেও সম্প্রসারিত করায় এবং যেহেতু কলকাতাই হবে কংগ্রেসের কবর সেই হেতু কলকাতা এবং বাঙালীকে কাঙালী করে

তোলার কৃতকার্যতায় কংগ্রেস দ্বিতীয় রহিত এবং কম্যুনিষ্টরা অদ্বিতীয়।

সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস তাড়িয়েছে এবং কম্যুনিষ্টরা বলেছে কুইসলিং। তারপরেও তারা বাঙালীর ভোট চায় এবং পায় যখন তখন বাঙলার মৃত্যু, বাঙালীর অপমৃত্যু ঠেকায় কে?

আসামী কর্তৃক ধর্ষিত নারীর বেদনা নয় ; যার কাছে ভোটের কারণে আসামীরাই হয় 'fine gentlemen'। সেই ব্যক্তি যখন এর পরেও কলকাতায় আসেন রামকৃষ্ণ মিশনের আমন্ত্রণে, শান্তিনিকেতনে বক্তৃতা দিতে এবং তার দল যখন আবার ৫ বছরের জন্যে বাঙলা দেশেও লোটবার অধিকার পাবে সুনিশ্চিত তখন বাঙলার মৃত্যু, বাঙালীর অপমৃত্যু ঠেকায় কে?

নিজের বাড়ি অটুট রাখো, প্রত্যেক প্রদেশের নিজের বাড়ি ; শুধু বাড়ি মারো পশ্চিমবঙ্গের মাথায়! বেরুবাড়ি দাও পাকিস্তানকে! কেন,—না, বাঙালী এবং বাঙলাই কেবল ভারতবর্ষে অন্যায় সহ্য করে। অন্যায় যে করে তার প্রতিবাদ না করে যে আরও বেশি অন্যায় করে সেই বাঙলার মৃত্যু, বাঙালীর অপমৃত্যু ঠেকায় কে?

যে কম্যুনিষ্টরা বিয়াল্লিশের বিদ্রোহে 'জনযুদ্ধ' করছিল ; সুভাষকে বলেছিল, কুইসলিং ; সেই কম্যুনিষ্ট পার্টিই আজ আসামে ভাষান্দোলন সমর্থন করো না বলে ফতোয়া দিতে লজ্জা পায় না ; ভয়ও পায় না। কারণ তারা জানে কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধদের ভোট কলকাতায় তাদের বাক্সে যাবে। আর এক দলের আর এক নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুভাষের বিরুদ্ধে যে ৪০টি বাঙালী ভোট সীতারামিয়ার পকেটে যায়, তার উৎস ছিলেন,—যিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একদা কালাকানুনের জন্ম দিয়েছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গে, তিনিও ভোট চাইতে দ্বিধা করেন না। কারণ সাধারণের স্মৃতি বড় দুর্বল। আর স্মৃতি-দৌর্বল্যে বেশি ভুগছে আজ বাঙালী!

এই জন্যেই আমরা, 'আবার তোরা বাঙালী হ'—এই দাবী তুলেছি! এই জন্যেই আমরা চেয়েছি, তৃতীয় দল।

চার

এই তৃতীয় দলের অবশ্যম্ভাবী নেতা যিনি তিনি আজ নেই। নেতাজীর নেতৃত্বেই এদেশ পুনর্গঠিত হতে পারত। যেমন হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী হিটলারের ; ইটালী, মুসোলিনীর, টার্কি, কামাল পাশার, রাশ্যা, স্তালিনের শক্ত হাতে। ভারতবর্ষের জন্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রয়োজন ছিল একটি শক্ত, সমর্থ, নির্দয়, শাসনের ; শাসকের। ভোট নয় ; নির্বাচন নয় ; চাবুক। চাবুক, এবং চাবুক না মানলে গুলির মুখে কালোবাজারী, ভেজালকারবারীদের ব্যবস্থা করতে যার হাত কাঁপত না! ভাষা সম্পর্কে, বা যে কোনও প্রয়োজনীয় সম্পর্কে কারুর মতের অপেক্ষা করত না যে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সব ধর্মের ওপরে স্বদেশ-ধর্মকে যে বড় জ্ঞান করত এবং বাধ্য করত একসঙ্গে কাজ করতে ; দেশকে যে নূতন করে গড়ে পিটে মানুষ করে দিয়ে যেত।

যুদ্ধে পরাজিত জার্মানী ভার্সাই ট্রিটিকে করেছিল অস্বীকার। বর্তমান ভারতের বিশেষ করে বাঙলা ভারতীয় নেতাদের যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হচ্ছে সেটি দেশভাগ। জার্মানী মেতেছিল ইহুদী বিতাড়নযজ্ঞে। বাঙলার প্রয়োজন কালোবাজারী বিতাড়ন।

এই দুটির একটি কর্তব্যও নপুংসক কংগ্রেস বা বিশ্বাসঘাতক কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম নয়। তারই জন্যে প্রয়োজন ছিল একজন নায়কের ; একনায়কের।

আমরা তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি ; আমরা অপেক্ষা করব।

[১ম বর্ষ, সংখ্যা ২৩, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২]

জাগো বাঙালী' নয় ; রাগো বাঙালী !

জেগে আছে যে তাকে জাগানো যায় না ; কিন্তু রাগানো যায়। তাই, জাগো বাঙালী নয় ; রাগো বাঙালী। বাঙালী জাগানো নয়, বাঙালীকে রাগানো দরকার ; রাঙানো দরকার তাকে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, যতীন দাস, বাঘা জ্যোতিন, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের রঙে রাঙাও তাকে আজকে। দেখবে মুহূর্তের মধ্যে একদিন যেমন কেঁপে উঠছিল ব্রিটিশ সিংহের বুক, আসমুদ্র-হিমাচল উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সেই জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন-এর উদাত্ত আহ্বানে, আজও বাঙালী রাগলে এবং রাগালে, কালোবাজারী, ভেজাল কারবারী, ঘুষখোর, লম্পট, কংগ্রেসী আর কম্যুনিস্ট আজনীতি-রাজেরা স্রোতের মুখে তৃণের মত ; ঝড়ের তাড়ায় শুকনো পাতার মত। সিন্ধুগামী নদীর মুখে বালির বাঁধের মত, বাঙালীর সুমুখে কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট কবলিত অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাতিত্ব, দেশ ও ধর্মদ্রোহ নিমেষের মধ্যে অপসারিত হয়ে জন্ম নেবে অবশ্যই সৎ 'বর্তমান' এবং বিচিত্র সম্ভাবনায় স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

রুদ্ধশ্বাস সম্বরণ করে এই ভঙ্গ বঙ্গদেশ আজ তারই প্রহর গুণছে! যদিও স্বাধীনতার প্রত্যুষেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে বাঙালীর জীবনে, তবুও, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

রাগানো দরকার বাঙালীকে। সেই রাগ,—দুর্যোগের ঘন মেঘের গারদ ভেঙ্গে যে পাগ্‌লা রোদ হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে আকাশের বুকে, তারই মতো ফেটে পড়েছিল যে রাগ একদিন রাষ্ট্রগুরুর কণ্ঠে দেশভাগের দুঃসময়ে ; We will unsettle the settled fact ; যে রাগ দেখেছি আমৃত্যু অনশনে বদ্ধপরিকর কারাগারের অন্যায় অন্ধকারে সূর্যকরোজ্জ্বল দিন আনবার প্রতিজ্ঞায় অবিচল রাত্রির তপস্যায় রত মৃত্যুহীন প্রাণ লুটিয়ে দিতে দেশমাতৃকার দু'পায়ে, যতীন দাসের চোখে ; সেই রাগ,—দ্যুতি ফুরোবার নয় দেশবন্ধু থেকে সুভাষচন্দ্রে ; সে অপরূপ রাগ যা, যা কবিকণ্ঠে একবার জালিয়ানওলাবাগে নিরস্ত্র ভারতবাসীকে কুকুরের মত গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে শুনেছি ওই একবার নয় ; বারবার,—শেষবার, অশেষবারের মত উচ্চারিত যা অস্তাচলে যাবার মুহূর্তেও ঃ

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছি বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস...

অনন্ত অম্বরে হে সঙ্গীহীন বিহঙ্গ, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে'।

রাগো বাঙালী! রাঙো বাঙালী! এই রাগে রাগো ; এই রঙে রাঙো! সেই রঙ,—যে রঙে ছোপানো বিবেকানন্দের উত্তরীয় ঃ চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না! সেই রঙ যা লেগে আছে আজও ব্রহ্ম-বান্ধব-বাণীতে 'Whatever you are be a Hindu be a Bengali!' সেই রঙ যা কোনও দিন মুছবার নয়, যা মিশে গেছে বাঙালীর রক্তে, মা কি ছিলেন, মা কি হইয়াছেন,—এই বঙ্কিম কটাক্ষে! তোমার প্রাণে, তোমার গানে, তোমার আকাশে বাতাসে সেই সুরের আগুনে রাঙা রঙ্‌ ছড়িয়ে যাক্‌ সবখানে। তোমার মর্মে লাগুক, তোমার কর্মে লাগুক ধর্মের রঙ,—মানবধর্মের রঙে উজ্জ্বল সেই পাবকমন্ত্র ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য!

আসামে তোমার রমণী ধর্ষিত, বেরুবাড়ীতে তুমি বঞ্চিত দেশের সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি দিয়ে সবচেয়ে কম পেয়েছ তুমি, মনে রেখো তোমার কবি বলেছেন ঃ

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।।

দেশভাগের আসামী অত্যাচারের, বেরুবাড়ী-বঞ্চনার, সুভাষ-নিন্দার, শ্যামাপ্রসাদ-হত্যার অন্যায়ের প্রতিবাদ না করার পাপ দগ্ধ করুক তোমাকে যতক্ষণ, যতদিন না তুমি রাগো ; তুমি রাঙো জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীনের রঙে।

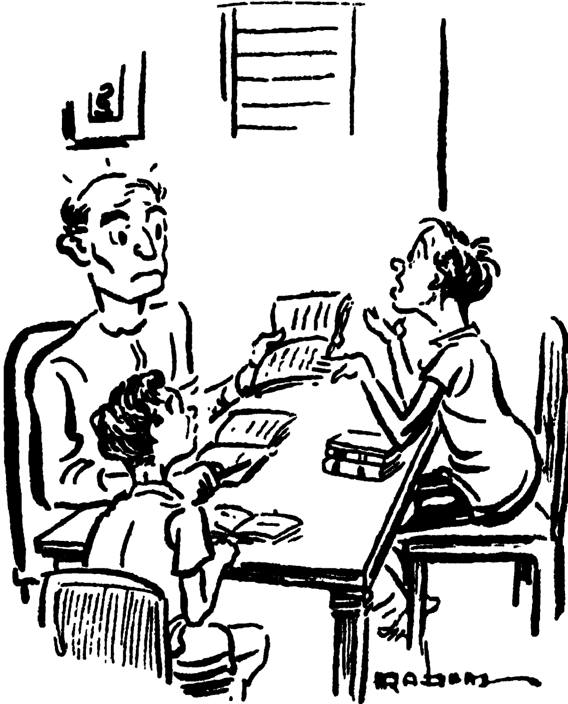
সেই রঙ, সেই রাগের জন্যে তোমার আরও আঘাত দরকার! কবিকণ্ঠে তুমি বলো ঃ আরো, আরো ; আরো আঘাত সইবে আমারো। সেই আঘাতে তুমি চিনবে তোমার 'সত্য' কি ; সত্য যে কঠিন বড়, সে কখনো করে না বঞ্চনা। এই সত্য রাজনীতির নয় ; নীতির। সেই নীতি যা অর্জুনকে গাণ্ডীব ত্যাগের মুহূর্তে নিরস্ত করেছিল মিথ্যা বৈরাগ্যের ছদ্মবেশে সাময়িক ক্লীবত্ব থেকে। ওঠো, জাগো, প্রাপ্য বরান্নিবোধত! বল একবার যে, জবাব চাই!

জবাব চাই, দেশভাগ-বিশ্বাসঘাতকতার! জবাব চাই, আসামীর হাতে বঙ্গদ্রৌপদীর অবমাননার। জবাব চাই, বেরুবাড়ী-বঞ্চনার! জবাব চাই, কম্যুনিস্ট-দেশদ্রোহিতার জবাব চাই কংগ্রেসী মুসলিম তোষণের।

তোমার জবাব দিনে দিনে তৈরী করছে লক্ষকোটি বিক্ষুব্ধ প্রাণের বারুদ! তোমার রাগের অগ্নিশিখা মুখচুম্বন করুক সেই বারুদের! মুখাগ্নি করুক যুগসঞ্চিত পাপের! ভস্মীভূত হয়ে যাক অন্যায়ের শব! জাগুক নবজীবনের উৎসব।

আর? আর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

[১ম বর্ষ, সংখ্যা ২৮, ১৫ মার্চ, ১৯৬২]



—একি! "আমার কুকুর" রচনাটি তোমার লেখা আর তোমার ভাইয়ের লেখা অক্ষরে অক্ষরে একরকম কেন?
—হবেই তো স্যার! কুকুরটা যে একই কুকুর...

আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম...

আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম তাহলে প্রথমেই আমার নাম 'প্রফুল্ল' রাখতাম না। যে দেশে অগুন্তি লোক বিমর্ষ, কেউ খাবার, কেউ পরবার অভাবে, কেউ শিক্ষক হবার অসম্মানকর বেদনায়, সেদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নাম প্রফুল্ল রাখা কানা দেশের মুখ্য ব্যক্তির নাম পদ্মলোচন রাখার মতোই না রাখা উচিত। নাম পালটাতাম না, কেবল, বাসভবন তুলে আনতাম পদ্মজা-ভবন থেকে অনেক দূরে। যে দেশে অসংখ্য লোক এবং অসংখ্যতর স্ত্রীলোক জায়গার অভাবে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের অল্পবয়সে অশালীন দৃশ্যের ঘুমভাংগানো সাক্ষী করতে বাধ্য হয় সেই দেশে রাজভবনের আরাম গান্ধীভক্তকে মানায় না ; আরামবাগের গান্ধীর পক্ষেও একটু বেশি দৃষ্টিকটু আরামের উপলক্ষ্য হয়।

আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম তাহলে আমি অবিবাহিত থাকতাম না। হেড্ অফ দ্য স্টেটের হেড অফ দ্য ফ্যামিলি হবার আনন্দে উজ্জ্বল ও অশ্রুতিক্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। নিজের পরিবারের মধ্যে দিয়েই দেশের সমস্ত লোককে স্পর্শ করা যায়। যার এ অভিজ্ঞতা অনভিপ্রেত তার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হতে চাওয়া উচিত নয়। ডক্টর রায় যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার অব্যর্থ কারণ ওই। তিনি পারিবারিক সুখদুঃখ বঞ্চিত হতভাগ্য লোক। এবং তাই দেশের লোক সমস্ত জীবন তাঁর থেকে দূরে ছিলো। মৃত্যুর পর যারা কাছে এসেছে তারা সেই হুজুগের দল, বাঘ বন্দুকের গুলিতে মারা গেলে, যারা বাঘকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় হৈ-হৈ করতে করতে, তাদেরই মতো ডক্টর রয়ের শোকে বিহ্বল নরনারীর ভিড় আমাকে বিস্মিত করেনি। প্রফুল্ল সেন মারা গেলে যারা কাঁদবে তারা তাঁর পরমাত্মীয় নয় ; তারা ভাড়াটিয়া শোক করার পার্টি। মুখ্যমন্ত্রী বিবাহিত হলে দেশের মানুষ স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে কি কষ্টে বাস করে, কিরকম উপবাস করে দুঃসহ অর্থকষ্টে, তা বুঝতে পারতেন যদি শিক্ষক হয়ে তাঁকে জীবিকা নির্বাহ করতে হোতো।

আমি প্রফুল্ল সেন হলে এতোগুলি মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী রাখতে দিতাম না কেবিনেটে। যে রাষ্ট্র সব চেয়ে দরিদ্র, সব চেয়ে কর্তিত, সে রাষ্ট্রের কর্ণধার কোন লজ্জায় এতগুলি বাহুল্যকে মেনে চলতে বাধ্য হন তা আমরা জানি। দল রাখতে। দলের চেয়ে দেশ বড়—এ কথা যাঁর দিবারাত্রির ধ্যান নয় তাঁর সম্পর্কে সব ধারণা ভুল ; তাঁর সব পরিকল্পনা, অলীক পরীদের অলৌকিক কল্পনা ছাড়া কি হতে পারে আর!

যদি আমি আজ মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসতে রাজি হতাম, তাহলে আমি যাত্রার আসর উদ্বোধন করতে যেতে গররাজি হতাম।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন, দীপেন্দ্র কুমার সান্যাল হলে, তাঁর প্রথম কাজ হতো ডক্টর রয়ের নামে চাঁদা তোলা বন্ধ করা। ডক্টর রয় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিনা ফি-তে রোগী দেখতেন। এখন তাঁর নামে চাঁদা তোলায় লোকে মনে করতে পারে, অনায়াসেই পারে, যে ডক্টর রয় বুঝি এখন বিনা চিকিৎসায় রোগীর কাছ থেকে ফি নিচ্ছেন। তার বদলে রাজভবনকে শিশু হাসপাতালের ভবন করে দিতেন ; কালোবাজারীদের কান ধরে পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার অনায়াসে টাকা আদায় করতে পারতেন। সারা বছর অধর্ম করার পর, ধর্মশালা বানায় যে শালারা তাদের গাঁটকাটায় অপরাধ কোথায়? শঠের সঙ্গে শঠতায় যেমন, তেমনিই শেঠের সংগে ষাটে'-র কোলাকুলি হ'তো এবারের বিজয়ায় শেয়ানে-শেয়ানে আলিংগন। যারা বোঝবার তারা বুঝতো, তাদের বাঁচাবার মা-বাপ বিদায় নিয়েছেন ; এবার তাদের বাপ-মা তুলে গাল দেবার, গলা কাটবার, ভুঁড়ি ফাঁসাবার দুর্দিন এবং বাঙালীর সুদিন এলো

এতদিনে!

প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে শুধু, ওরই সংগে আমার মতো বাঙালী হলে, বাঙলা দেশে যত প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের বাধ্য করতেন বাঙালীদের চাকরি দিয়ে তবে অন্য প্রদেশীকে কাজ দিতে। এবং কোন্ প্রতিষ্ঠানে কত মাইনের কত অবাঙালী এবং কজন বাঙালী আছেন তার ব্যবস্থা করাকে, সোমবারে লোকের সংগে দেখা করার চেয়ে অনেক জরুরী জ্ঞান করতেন। একজন কর্মক্ষম বাঙালীরও কর্মের সংস্থান না করতে পারা পর্যন্ত, প্রফুল্লবাবু বাঙালী হলে, মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে তৃণশয্যায় শুতেন, একবেলা আহার করতেন, গলায় মালা পরতেন না, গাড়ি চাপতেন না এবং সর্বোপরি অভিনন্দন গ্রহণ করতে পারতেন না কিছুতেই।

কলকাতায় গড়ের মাঠে অভিনন্দন সভায় উপস্থিত হতে বাধত, যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মুখ্যত বাঙালী অর্থাৎ দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল হতেন!

কিন্তু সবাই কি সব হতে পারে? না। পারলে, দাঁড়কাকও ময়ূর হতে পারত, ময়ূরের পেখম ধারণ করে।

কিন্তু আমি তো মুখ্যমন্ত্রী হতেই পারতাম না। কারণ কংগ্রেসের হয়ে ভোট চাইতে আমার লজ্জা করত বাঙলা দেশে ; বাঙালীর কাছে। বাঙালীর,—কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট ; কাউকে ভোট দিতেই আত্মঅবমাননাকর, না মনে হলেও কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টকে ভোট দেবার বাঙালীর আর কোনও মানে না হলেও। সুভাষচন্দ্রের কথা আমার মনে পড়ত। কংগ্রেস যাকে তাড়িয়েছে কুটিল চক্রান্ত করে। সেই চক্রান্তের প্রকাশ্য নায়ক ছিলেন গান্ধী। এবং ওই ঘটনার পর নিজেকে আরামবাগের গান্ধী ভাবতেও লজ্জা পেতাম। কম্যুনিষ্টরা যে সুভাষকে পঞ্চম বাহিনীর নায়ক বলেছিলো সেই কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও বাঙালী ভোট দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দেবে যখন, তখন বাঙালীর, আজকের CZAR-জ বাঙালিত্বের ভোটাধিক্যের গর্ব মানায় না। কংগ্রেসেরও না ; কম্যুনিষ্টদেরও না। যে সুভাষচন্দ্রের শেষ আঘাতের কারণেই ইণ্ডিয়া কুইট করেছে সাহেবরা, সেই সুভাষের মূর্তি, আমি প্রফুল্ল সেন হলে, গান্ধীর স্ট্যাচু সরিয়ে বসাতাম এবং দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে দিয়ে তাঁর মূর্তি তৈরী করাতাম না। দেবীপ্রসাদ প্রবাসী বাঙালী হলেও না। ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটেও আমার আপত্তি হোতো সমান সোচ্চার।

শ্যামাপ্রসাদের প্রতি নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছে, একমাত্র এই কারণেই নয়, কংগ্রেসের সংগে আমি সব সম্পর্ক ত্যাগ করতাম! শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর, কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাহ গ্রেপ্তারের অতঃপরও, যে নেহেরুর সৎসাহস হয়নি নিজের অ-মোচনীয় কলংক এবং সময়োচিত সতর্কীকরণ এবং মৃত্যুবরণের জন্যে শ্যামাপ্রসাদের মহত্ত্ব স্বীকারের, সে নেহেরুর নেতৃত্ব মানতে, পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রীত্ব সামান্য কাম্য, জগদীশ্বরের আসনে বসবার আমন্ত্রণও আমি উপেক্ষা করতাম।

আসামে বাঙালীর মা-বোন-বউ ধর্ষিত হবার পর নেহেরু যে বলেছিলেন, আসামীরা দারুণ ভদ্রলোক, আমি, প্রফুল্ল সেন, বাঙালী হলে বলতাম, নেহেরুর মুখের ওপরই বলতাম ; ইন্দিরা গান্ধী এই হতভাগ্য রমণীদের একজন হলে, জহরলাল কি তখনও বলতে পারতেন, যে, আসামীরা নিদারুণ ভদ্রলোক। না। জহরলালও যেমন পারতেন না তেমনই পারতেন না প্রফুল্ল সেনও ওকথা বলতে। আমি জানি, পারতেন না। কারণ, প্রফুল্ল সেন জানেন তিনি কি এবং কে? তিনি আরও জানেন, তিনি 'আমি' নন।

পাকিস্তানে এই মাত্র যে হিন্দু বাঙালীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার হোলো এবং যারা তার ফলে এখানে পালিয়ে আসতে পারল, হিন্দুস্তানের শাহানশার ব্যাডভাইসে, হৃদয়হীনতায়, সেই যারা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে বাঘের মুখে, তাদের মুখের দিকে

তাকালে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবার পশ্চিমবংগের, কোন্ মুখে ডঃ রয়ের গদিতে গিয়ে বসেন, ভাবলে, প্রফুল্লবাবুকে কেবল কংগ্রেসী মনে হয় ; বাঙালী মনে হয় না একবার। মনে হবার মানে হয় না আর!

কিন্তু এসবের মূলে যে পাপ তারই তো প্রতিবাদ করেননি, করবার কথাও ভাবেননি আরামবাগ ট্যু হারামবাগ, কোনও গান্ধী ; কোনও গান্ধী শিষ্য! দেশ ভাগের সেই পাপের অনুষ্ঠান করেছে যারা, তারা নয়, তার প্রায়শ্চিত্ত করবে একা পশ্চিমবংগ কত যুগ ধরে কে জানে। চৌষট্টি বছর ধরে কংগ্রেসের সংগ্রাম, অখণ্ড ভারতের জন্যে। সেই সংগ্রামের সংগে বিশ্বাসঘাতকতার সমস্ত কীর্তির চেয়ে মহৎ যে কংগ্রেসী সরকারের কর্তা বর্তমানে, শোনা যায় তাতে সম্মতি ছিলো না স্বয়ং জাতির জনক গান্ধীর। গান্ধীর আদর্শই যদি প্রফুল্ল সেনের আদর্শ হয় তাহলেও তো তাঁর উচিত ছিলো কংগ্রেসের সংগে সব সম্পর্ক ত্যাগ করার!

কিন্তু তাহলে তো আর মুখ্যমন্ত্রী হওয়া চলে না। এবং সর্বত্যাগী আদর্শ চরিত্র আরামবাগের গান্ধীর নির্লিপ্ত জীবনের মুখ্য এ্যাম্বিশানই গৌণ হয়ে পড়ে! অতএব অগৌণে তা বিস্মৃত না হলে, প্রফুল্ল হওয়া চলে কি করে!

সমস্ত বাঙালী জাত এবং বাঙলা দেশ যদি আজ ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মুছে যায়, সর্বভারতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে, তবু ক্ষতি নেই, কিন্তু সবার চেয়ে বড় যে অপরাধ 'অন্যায়ের সংগে আপোষ করা', তাতেই ক্ষতি আছে। বাঙলার সব চেয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ-এর, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে,—এই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে বলি, আমি বাঙালী, আমি ঘৃণা করি কংগ্রেস কম্যুনিষ্টকে! ঘৃণা করি নেহেরুর কৃপাপ্রার্থী পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী হতে।

এবং প্রার্থনা করি বাঙালীর রক্তে কংগ্রেসী এবং কম্যুনিষ্টদের সর্বনাশ লেখা হোক! দেওয়ালের সেই লেখা প্রায় অন্ধ অতুল্য প্রফুল্লর চোখে পড়ছে না, জানি। পড়লে তাঁরা বুঝতেন, নেসানের চেয়েও কখনও কখনও রেজিগনেশান বড়ো!

যদি আমি মুখ্যমন্ত্রী হতাম তাহলে বাঙালীর প্রতি সর্বভারতীয় অন্যায়ের প্রতিবাদে রেজিগনেশান দিতাম।

[বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২]
'পূজা সংখ্যা নয়'

স্বামী-স্ত্রীর সংবাদ

বিয়ের দুতিনমাস পরেই স্বামীকে অপিসের কাজে এরোপ্লেনে করে বিদেশে যেতে হয়েছিল। ফেরবার দিন স্ত্রী স্বামীকে এগিয়ে আনতে এরোড্রামে গেছেন।

স্বামী নেমে এসে স্ত্রীকে বললেন—জান ঐ লোকটা পাইলট—আর ওর সহকারী ঐ যে নেমে আসছে। আর ঐ যে সুন্দরী মেয়েটি কক্‌পিটের দরজায় দাঁড়িয়ে সে হচ্ছে এয়ার হষ্টেস্—মানে যাত্রীদের যত্ন আত্তি করাই ওর কাজ—ওর নাম অনিতা সোম।

স্ত্রী তীর্যক দৃষ্টি হানলেন। বললেন—তুমি ওর নাম জানলে কি করে?

স্বামী—কি আশ্চর্য, ওদের পাইলট থেকে সবার নামই তো লিষ্ট করে ভেতরে টাঙানো আছে।

স্ত্রী—তাই নাকি? পাইলটের নামটা কি?

স্বামী—নিরুত্তর!!

চিঠি লিখবেন না!

সুবিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক দিলীপ কুমারের বড় বাতিক হল দীর্ঘ পত্রাঘাত করা। তার পত্রে পত্রে ব্যতিব্যস্ত স্বর্গতঃ জলধর সেন একবার লেখেন ঃ দিলীপ, তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ, কিন্তু সংযম শিখ নাই!—

পাঠকদের চিঠির জবাব দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত পাঞ্চ-পত্রিকার সম্পাদক একজনের পাঠান একটি নাটক পেয়ে লেখককে চিঠি লিখে জানান ঃ It is all work & no play!

বার্ণার্ডশকে দুটি ভারতীয় মেয়ে একটি চিঠি লিখে তার উত্তর চায়। শ জানান, তিনি চিঠির জবাব দেন না। চিঠি লিখেই জানান অবশ্য! শকে আরেকবার একজন জানায় যে শয়ের রচনা বিনানুমতিতে সে ছাপছে। শ তাঁকে চিঠি লিখে জানান যে তিনি আইনের সাহায্য নেবেন। শ আবার চিঠি লেখেন এই বলে যে এই তাঁর শেষ চিঠি। এবারে পত্রদাতা জানায় যে, শ যেন অন্ততঃ আর একটি চিঠি লেখেন, কারণ শয়ের লেখা দুটি চিঠি বেচে সে তার দেনা প্রায় শোধ করে ফেলেছে ; আর ওকটি মাত্র চিঠির য়োস্তা,--তাহলেই তার সব দেনা শোধ হয়। শ তাকে আরও একখানা চিঠি লেখেন। তাতে লিখে দেন যারা আগের দুটি এবং এটি কিনবে তারা জানে না যে তারা জালপত্র দাম দিয়ে কিনছে।



—গোল্লায় যাবার আগে তোমার পায়ের ধূলো নিতে এলাম বাবা..

করোনারি থ্রম্বোসিস

উ. চ. ম.

কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ
কোথায় পাবি মান?
সকাল বেলা সাড়ে নটায়
আপিস যাবার তাড়া
ষ্টেটবাস ট্রাম ধরতে লোকে
ছুটছে পাগলপারা
যান বাহনে মানছে না কেউ
ট্রাফিক অনুশাসন
এমন একটি যানের তলায়
পেতে চাস কি আসন?
প্রাণ তা শুনে গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া কহে
নহে নহে নহে।
কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ
কোথায় পাবি স্থান?
স্বাধীন-ভাবে ব্যবসা চালায়
স্বাধীন দেশের ছেলে
চালে কাঁকর ডালে মাকড়
ভেজাল ঘী-এ তেলে
বাজার ভরা বাসি পচা
তরকারী আর মাছ
তাই খেয়ে কি হাড় জুড়োতে
করিস মনে আঁচ?
প্রাণ তা শুনে করুণ হেসে
রহে নিরুত্তরে
যাব যাব করে।
কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ
কোন দিকে তোর টান?
রাস্তা ঘাটে আবর্জনা
রোগ বীজাণু ভরা
ধূলো ধোঁয়া মাছি মশা
গন্ধে মাতোয়ারা
ড্রেনের জল ও খাবার জলে
বন্ধু গলাগলি

তাদের হাতে আপনাকে কি
দিবি জলাঞ্জলি?
কথা শুনে এক পা দুপা
এগিয়ে আসে প্রাণ
লোভে কম্পমান!
কার হাতে তুই মরিতে চাস
ওরে আমার প্রাণ
কোন খানে তোর স্থান?
ইন্‌কাম ট্যাক্‌স ইন্‌সিওরেন্‌সস
বাজার খরচ মোটা
গয়লা মুদি ওষুধ বিষুধ
এটা সেটা ওটা
ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দিয়ে
থ্রম্বোসিসের কোলে
প্রেমাবেশে এক নিমেষে
পড়তে চাস কি ঢ'লে?
কাছে এসে মধুর হেসে
বলে তখন প্রাণ
"সেই দিকে মোর টান"

[বর্ষ ২, ৭ম সংখ্যা, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২]



গৃহস্বামী [অতিথিকে]—ওঃ! আপনি চলে যাচ্ছেন—সমস্ত বাড়ীটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগবে..

[অবাঙ্গালীদের]

বজ্জাতীয় সঙ্গীত

—দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারে দীঘায়
এবং দীঘা থেকে জাহাজে প্রেরিত।

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
শূন্য হউক শূন্য হউক
শূন্য হউক হে হনুমান।
বাংলার গ্যাঁড়া বাংলার কল
বাংলার রাজনৈতিক দল
চূর্ণ হউক চূর্ণ হউক
চূর্ণ হউক হে হনুমান।
বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
ছোট্ট হউক ছোট্ট হউক
ছোট্ট হউক হে হনুমান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
লয় হউক লয় হউক
লয় হউক হে হনুমান।

।। যদু ভট্ট।।

মূল রচনা ঃ ১৪৪৬ হিজরি
[১০০০] রবিউল আউয়াল।। ভাদ্রবাদি ১৭৩০
বিক্রম সংবৎ ২০১০।।

[বর্ষ ২, সংখ্যা ৩৬, ১৭ মে, ১৯৬৩]

মনুষ্যত্ব-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে...

পরাধীন বংগদেশের কাব্যরণরংগভূমে নবজীবনমন্ত্রের উদ্‌গাতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের পতাকা হাতে যাঁরা বেরিয়েছিলেন একদা, শাসনসংযত কণ্ঠে গান গাইতে না পারার বেদনায় বিস্ফারিত তাদের একজনের বক্ষে বেজেছিলো, স্বাধীনতার-সংগ্রামে হীনমনোবৃত্তির শৃংখলমুক্তির ঝংকার; স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে...! আজ জহরলালের ভারতবর্ষে, ওই পরমাশ্চর্য বেদনার অধীশ্বর রংগলাল বেঁচে থাকলে বলতেন ঃ মনুষ্যত্ব হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে...! এ স্বাধীনতা ৪৫ কোটি মানুষের নয়। ১৫ বছরেরও বেশী বয়স যে স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা তো একটি দলের, সে স্বাধীনতা তো একটি মানুষের। কংগ্রেস ও জহরলাল। যা ইচ্ছে তাই করবার; যা ইচ্ছে তাই বলবার। তারই সংগে জুটেছে কম্যুনিষ্ট পার্টি। একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসরের ভূমিকায়। কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট, ভীষণ ও বিভীষণ। একজন চীনকে ডেকে এনেছে ঘরে তলে তলে। আরেকজন চীৎকার করেছে হিন্দি-চিনি ভাই ভাই। তারপর চীনে আক্রমণের মুখে কেঁদে পড়েছে দুনিয়ার পায়; বাঁচাও। চীন বিশ্বাসঘাতক। পুরাতন কংগ্রেস পাপী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেছে ঃ শত্রুকে বিশ্বাসঘাতক বলে লাভ নেই। 'It is the business of enemies to cheat'। গত ১৫ বছরেরও ওপর স্বাধীন ভারতের ক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে এই।

স্বাধীন ভারতের বয়স ষোলো বছর হলো, না কি ছাড়ালো, জানি না। তবে তার পাপের ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে এলো তা জানি। এখনও কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট, ঘাতক ও বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করে যদি ক্ষুদিরাম সুভাষের বাংলা তাহলে ইতিহাসের অমোঘ বিধান অব্যর্থ পুনরাবৃত্ত হবে। কবিকণ্ঠে উচ্চারিত সেই ইতিহাস-বিধাতার অংগুলি-সংকেত ঃ আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান,—সাবধান!—যদি এখনও কানে না নিই তাহলে সাহেবদের যা হয়েছিলো, মোসাহেবদেরও তাই হবে। কারণ ঐতিহাসিকই ভুল করে, যে কখনও ভুল করে না, তারই নাম ইতিহাস!

কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টের ইতিহাস অপদার্থতা ও দেশদ্রোহিতার কর্দমলিপ্ত ইতিহাস! আজ হিসাব-নিকাশের দিন। হয় কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট থাকবে, নয়, বাংলা বাঙালী থাকবে! তৃতীয় দল ছাড়া, সুভাষচন্দ্রের পথ ছাড়া বাংলা ও বাঙালীর বাঁচবার দ্বিতীয় পথ খোলা নেই আজ। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কয়েকটি জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন ছেলেমেয়ে আর কয়েক কোটি টাকা প্রয়োজন সেই তৃতীয় দলের দেশের নেতৃত্ব নেবার পথে। সেই একদল,—সেই এক শতদল যার নাম নেতাজী, একশত দলে যা করতে পারেনি, তা সম্পূর্ণ করে, সরে যাবে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বরে।

সুভাষচন্দ্রের দিন আসছে আর দুর্দিন অবসান হয়ে আসছে বাঙালীর!

এই কি সেই স্বাধীনতা...

এই কি সেই, যে স্বাধীনতার জন্যে ক্ষুদিরাম ফাঁসি গিয়েছিলো গান গাইতে গাইতে, শ্রীঅরবিন্দ দাঁড়িয়েছিলেন কাঠগড়ায়? নিবেদিতা সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিলে তিলে, রবীন্দ্রনাথ বেঁধেছিলেন রাখী ঃ বাঙলার মাটি, বাঙলার জল! তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে এই স্বাধীনতার জন্যে কি অপেক্ষা করে আছেন, ভবভূষণ মিত্র আজও পরমহংস পরিব্রাজক সত্যানন্দর ছদ্মবেশে। এই কি সেই স্বাধীনতা যার জন্যে মণিপুরের প্রান্তে সুভাষচন্দ্র হেনেছিলেন শেষ আঘাত পলাশীর প্রান্তে দ্বিপ্রহরে অস্তমিত দিবাকরকে দিতে

দ্বিগুণতর দীপ্তি। বীরের রক্তস্রোতে মাতার অশ্রুধারায় ভেজা এই পথ দিয়ে যারা গেছে একদিন সেই প্রফুল্ল চাকী, বাদল-বিনয়-দিনেশ-কানাই-সত্যেন-সুনীতি, ফাঁসির মঞ্চে যারা গেয়েছিলো জীবনের জয়গান, তারা কি এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলো কোনদিন? অন্নবস্ত্র আশ্রয় হারা কোটি কোটি মানুষের শবের ওপর বসে কয়েকটি মানুষের স্বাধীনতার নামে উৎশৃংখলতার এই উৎসব!

কিসের জন্যে স্বাধীনতার সংগ্রাম? কিসের জন্যে কংগ্রেস? কিসের জন্যে নন-কো-অপারেশন? সিভিল ডিসওবিডিনেন্স? চৌরিচৌরা? '৪২-এর আন্দোলন? আলীপুরের বোমার মামলার অভিযুক্ত থেকে আরম্ভ করে সুভাষচন্দ্রের আই-এন-এ পর্যন্ত কিসের জন্যে লড়েছিলো? মিলিত হিন্দু-মুসলমানের অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্যে নয়? চৌষট্টি বছর ধরে কত প্রাণ হলো বলিদান, কত দীপ নিভে গেল দ্বীপান্তরে? কত আলো অন্ধকার হয়ে গেল কারাপ্রাচীরের ওপারে, কত স্ত্রীর মুছে গেল সিঁথি থেকে সিঁদুর, কত বোন ভাইকে, কত মা তার ছেলেকে তুলে দিলো ঘাতকের হাতে। সিপাহি বিদ্রোহে যার আরম্ভ আই-এন-এতে যার চরম আক্রমণ সেই স্বার্থত্যাগে সজীব, আত্মাহুতিতে অমর, নেতাজীর অন্তর্ধানে রোমাঞ্চকর ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের শেষ মুহূর্তে জাতির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা কার অক্ষয়কৃষ্ণ কীর্তি। কংগ্রেস ছাড়া আর কার! যে গান্ধী চৌরীচৌরায় ফিনিয়ে দিয়েছিলেন ঘড়ির কাঁটা, যিনি কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রের চলে যাবার মূল চক্রান্ত, যিনি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এই হীন উক্তি করেছিলেন : 'Afterall Subhas was not an enemy of the country' সেই গান্ধীর দুই নন্দীভৃঙ্গী, নেহেরু-প্যাটেল পেছনের দরজা দিয়ে দেশভাগ মেনে নিয়ে স্বাধীনতা ক্রয় করলেন কেন? না, যাতে গদা হাতে গদীতে বসা যায় জীবনের শেষ কটা বছর!

কখন এই দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা স্বীকার করা হলো যখন আই-এন-এতে হিন্দুমুসলমান ভেদবুদ্ধি নষ্ট করে এক পতাকাতলে খণ্ডবিচ্ছিন্ন ভারতকে বেঁধে তুলছিলেন নেতাজী। সৈন্যদের মধ্যে যখন হিন্দুমুসলমান ভেদ চলে গেছে, তখনই ইংরেজ বুঝেছে, এ স্বাধীনতা আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তখন বিশ্বপরিস্থিতিই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিকূলে চলে গেছে। ঠিক সেই সময়েই পেছনের দরজা দিয়ে মাউন্টব্যাটনের গুঁতোয়, নেহেরু-প্যাটেল মেনে নিলেন দেশভাগ। সুভাষচন্দ্রের সাধনাকে ব্যর্থ করে দেবার, ক্ষুদিরামের স্বপ্নকে চুরমার করে দেবার অভূতপূর্ব কালো কীর্তিতে কংগ্রেস মুসলিম লিগের চেয়েও জঘন্য নরকের কীট হয়ে বেঁচে রইল স্বাধীন ভারতবর্ষে। ভারতের জনসাধারণ তাকে তিনটি নির্বাচন-বৈতরণী পার করে দিয়েছে কেবল অতীতের স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতায়। সেই কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে কংগ্রেস দেশকে উপহার দিয়েছে কাশ্মীর-সমস্যা, বেরুবাড়ি উপঢৌকন পাকিস্তানকে, আসামে বংগনারী ধর্ষণের পুরস্কার,—আসামীদেরই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে, কালোবাজার, কর্ণেল ভট্টাচার্য লাঞ্ছনা, শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক তিরোধান, বিশ্বাসঘাতক মেননের হাতে চৈনিক আক্রমণের মুখে ভারতের চরম অপ্রস্তুতি। শেষ উপহার দেবে,—কম্যুনিষ্টদের হাতে দেশকে তুলে দিয়ে।

এ সবের জন্যেই কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশী দায়ী আমরা। আমরা যারা এর পরেও কংগ্রেসকে দিয়েছি অদ্বিতীয় ও কম্যুনিষ্টকে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলগঠনের অধিকার! আমাদের মাথায় বিধাতার বজ্রপাত আসন্ন হয়ে এলো।

পুত্রেষ্টি

সোমেন্দ্রনাথ রায়

তহবিল তছরুপের কেস। আইনের আওতায় পড়ে।

পুলিশেই দিতেন প্রোপ্রাইটার গজানন বিশ্বাস। নেহাৎ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে হয়, তাই দিলেন না। তাছাড়া বাঘে ছুঁলে যেখানে আঠারো ঘা, সেখানে পুলিশে ছুঁলে আটান্তর। যে দেয় এবং যাকে দেওয়া হয়, দুজনেরই হয়রানি। তার চেয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে ও পাপ চুকিয়ে দেওয়াই ভালো।

পুলিশে দেওয়ার কথায় আতঙ্ক হয়েছিল ঠিকই। তবু ভরসা ছিল, সহজভাবে সব কিছু কবুল করলে হয়ত রেহাই পাওয়া যাবে। পঞ্চাশটা টাকার তো মামলা। মাসের মাইনে থেকে কেটে নিলেই চুকে যায়।

কিন্তু চাকরি যাওয়ার কথা শুনে চোখে অন্ধকার দেখল অনাদি। ছ'ফিট লম্বা, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির লোকটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। চাটুজ্যে বামুন হয়ে নিচ জাতের মালিকের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "চাকরি গেলে সপরিবারে মারা যাব স্যার। সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বৃহৎ পরিবার।

"ক্যাশ ভেঙে টাকা নেবার সময়ে সে কথা মনে ছিল না?" খিঁচিয়ে উঠলেন বিশ্বাস সায়েব। "পা ছেড়ে দিন। ওসব নাকে কান্নায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না। যত সব ব্যাড এলিমেণ্ট ঢুকিয়ে গেছেন বাবা।"

"ছোট ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছিল, আপনি তো জানেন স্যার। হাতে একটি পয়সা ছিল না। কোথাও ধার পেলাম না—"

"তাই বলে চুরি করবেন, চোরকে প্রশ্রয় দিতে পারব না আমি।"

"আসছে মাসে মাইনে পেয়েই টাকাটা রেখে দেব ভেবেছিলাম।"

"ফের কথা বলছেন? আপিসের ক্যাশ কি আপনার বাবার সম্পত্তি? যখন খুশি টাকা নেবেন, যখন খুশি রাখবেন, খুব সুবিধে না? বেরিয়ে যান ঘর থেকে। আসছে মাসে এসে পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়ে যা পাওনা হয় নিয়ে যাবেন।"

"দয়া করুন স্যার।" অশ্রুকলঙ্কিত মুখে অনুনয় করল অনাদি। সাতটা ছেলেমেয়েকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে মাথার ঠিক ছিল না।"

"আমি তার কি করব? খেতে দিতে পারেন না তো বাপ হবার সাধ হয় কেন? লজ্জা করে না সাতটা ছেলে-মেয়ের কথা বলতে? যত সব বরন্ ক্রিমিন্যাল। আর তো কোন গুণ নেই, শুধু জানোয়ারের মত বাচ্ছার জন্ম দিতে আছে! কোন মায়া দয়া নেই আপনাদের সম্পর্কে।"

"ভগবানের হাত স্যার!" কান্নায় বিকৃত কণ্ঠে হাত কচলাতে লাগল অনাদি।

"আবার তর্ক করছেন? ভগবানের হাত! ঠুঁটো করে দিতে পারেন নি হাতখানা? যান, যান, কাজের সময় বিরক্ত করবেন না।" বেয়ারাকে ডাক দিলেন বিশ্বাস সায়েব ঘন্টির ওপর অসহিষ্ণু থাবড়া মেরে।

"বাবুকো বাহার লে যাও", গম্ভীর গলায় বেয়ারাকে নির্দেশ দিয়ে কাজে মন দিলেন সায়েব।

মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল অনাদি। "একটি বার মাপ করুন স্যার, আর কখন হবে না। চাকরি গেলে রাস্তায় ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ভিক্ষে করতে বেরুতে হবে।"

জরুরি চিঠির ওপর থেকে চোখ না তুলে বিশ্বাস সায়েব বললেন, "তাই বেরুবেন।"

আরও কিছু অনুনয় করত অনাদি, বেয়ারা রামরতন জোর করে ধরে বাইরে নিয়ে এল।

বাইরে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে তিরিশ বত্রিশ জন লোক কাজ করে, একেবারে এক ধারে বড়বাবুর টেবিল। তার বাঁদিকে লোহার খাঁচায় বসেন ক্যাশিয়ার কাশীনাথবাবু। পাশের টেবিলে ছোট ক্যাশ বাক্স সামনে রেখে বসে অনাদি চাটুজ্যে। পেটি ক্যাশ সরকার। দুশো টাকা থাকে বাক্সে। খান কয়েক দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট, কিছু দু টাকা, এক টাকা। বাকি সব খুচরো। রোজ ঘণ্টাখানেক যায় হিসেব মিলিয়ে রেজগি গুণে গেঁথে তুলে রাখতে। আপিসের প্রাত্যহিক ছুটকো ছাটকা খরচ অনাদির বাক্স থেকে দেওয়া হয় ছোট ছোট চিট্-এর বিনিময়ে। খালি চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে হু হু করে উঠল বুকটা। টাকা নেবার সময়ে এক মুহূর্তের জন্যেও অন্যায় মনে হয়নি। একবারও অপরাধ বোধ পীড়িত করেনি মনকে। কতবারই তো এমন হয়েছে। ক্যাশ থেকে দু-চার টাকা নিয়ে সংসারের অভাবের ফুটো ফাটায় সাময়িক তালি লাগিয়েছে। তারপর মাস কাবার হলে আবার রেখে দিয়েছে টাকা। টের পায়নি কেউ।

এবারে অবশ্য টাকার অঙ্কটা বেশি হয়ে গিয়েছিল। এক সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা। তাছাড়া কপালটা নিতান্ত খারাপ। ঝুপ্ ঝাপ্ করে দু-দিনে আপিসে মোটামোটা পেমেণ্ট করতে হল। ফলে তবিল ফাঁকা। হিসেব মিলিয়ে না দিলে আবার টাকা দেবেন না কাশীনাথ বাবু। কড়া মানুষ। ষাটের ওপর বয়েস। ছোট ছোট কদম ছাঁট চুল একেবারে সাদা। দু-বেলা আহ্নিক না করে জল খান না। বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে ভরি দুয়েক নস্যির রসদ লাগে দৈনিক। গোঁজামিল পছন্দ করেন না। তাহলেও ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে টের পেলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতেন। শুধু তিনি কেন, অনেকেই তো বলছে, ঘটনাটা সায়েবের গোচরে আসবার আগে তারা জানতে পারলে গোটা পঞ্চাশ টাকা যেখান থেকে হোক জোগাড় করে দিত। অবশ্য সকলেই পরে এত কথা বলছে, এত সহানুভূতি জানাচ্ছে। ধারের জন্যে সে সময়ে, মানে ক্যাশ থেকে অত টাকা নেবার আগে, কারো কাছে হাত পাততে বাকি রাখেনি, বাবু থেকে দরওয়ান অবধি।

কপালে হাত দিয়ে মুখ নিচু করে বসেছিলেন কাশীনাথ বাবু। অনাদির বাবার বন্ধুস্থানীয়। চাকরিতে তিনিই ঢুকিয়েছিলেন প্রায় বছর ষোল আগে, বিশ্বাস সায়েবের বাবা বুড়ো কর্তার আমলে। মুখ তুলে অন্যদিকে দেখে ডাক দিলেন হাত নেড়ে।

"কি বললো সায়েব? ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

চোখের জল সামলে হতাশ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল অনাদি।

গুম হয়ে রইলেন কাশীনাথ বাবু কয়েক মিনিট। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।"

খাঁচার দরজায় তালা দিয়ে, পাঞ্জাবীর পকেটে ঝনাৎ করে ফেলে দিলেন চাবি। দু-হাত জোড় করে প্রণাম করলেন মা ব্রহ্মময়ীকে। তারপর ক্লান্ত পায়ে সায়েবের ঘরের দিকে এগুলেন।

ভিড় করে এল কয়েকজন ছোকরা বাবু, "কি বলল সায়েব?" একটাই প্রশ্ন সকলের।

"নেই। চাকরি নেই। কোন কথা শুনতে চাইল না।"

যত সময় যাচ্ছিল, চাকরি নেই, এই অনুভূতিটা ততই চেপে বসছিল মনে। বুকের ভেতরে যেখানে ঘড়ির লিভারের মত একটা যন্ত্র অনবরত ধুপ্ ধুপ্ করে, সেটা যেন কোনো একচোখো মিস্ত্রী ফরসেপ দিয়ে বার করে নিয়েছে। তীব্র বেদনা বোধ অসাড় করে

দিয়েছে মনকে।

ভাল করে ধরলেন না? চাকরি গেলে খেতে পাবেন না, বললেন না? আপনার এতগুলো কাচ্চা বাচ্চা, সে কথা জানালেন না?"

কারো মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিল না অনাদি। বলল, "সব বলেছি ভাই। বললে, 'জানোয়ারের মত বাচ্ছার জন্ম কেন দিয়েছি? ভগবানের হাত ঠুঁটো করে দিতে পারিনি কেন।"

"বললো একথা?" অবাক হয়ে গেল সকলে।

"শালা আঁটকুড়ো। নিজে যে ঠুঁটো জগন্নাথ। বাপ হবার ক্ষমতা নেই, পরকে গাল দিয়ে ঝাল মেটায়!" নিচু গলায় বিদ্বেষ উদ্‌গীরণ করল সকলে।

"মেম সায়েব বাঁজা নাকি?" অপেক্ষাকৃত নতুন একটি ছেলে প্রশ্ন করল।

"না তো কি? দেখনি, ব্লাউজের নিচে তিন হাত খোলা জমি। ‿দের পেট দেখাবার জন্যে, ছেলেপুলে হবার জন্যে নয়।"

"না না, তুই জানিস না। মিসেস বিশ্বাস ঠিক সে টাইপের নয়। ছেলেপুলে ভয়ানক ভালবাসে। সায়েব নিজে স্টেরাইল। আমি ওর মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখেছি। আমার হাতে এ্যাকসিডেণ্টালি পড়ে গিয়েছিল। অনেক খরচ করেছে, কিচ্ছু হবার নয়।"

"আরে, ওসব লম্পটদের ওই তো পরিণতি। মদ্-মেয়েমানুষ-জুয়া, এ ছাড়া জীবনের আর কি জানে বল না? আমরা শালা মুখে রক্ত তুলে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াব, আর উনি ফূর্তি মেরে নষ্ট করবেন টাকা।"

বয়স্ক একজন ধমক দিয়ে উঠল, "কি হচ্ছে তোমাদের? মনিবের সম্পর্কে এই ধরনের আলোচনা আপিসের মধ্যে করতে সঙ্কোচ হয় না একটুও? নিমক খাও মনে রেখ। তার প্রাইভেট লাইফ সম্পর্কে কেন কথা বলবে? এ কি অন্যায় কথা?

"থামুন দাদা। ওসব লেকচার ঢের শুনেছি। আমাদের তো গালাগালি দিতে সায়েবের বাধে না।"

"জানোয়ারের মত বাচ্চার জন্ম দেওয়ার কথা বলে কোন্ বিবেচনায়?"

"আরে ভাই, ওরা হচ্ছে মনিব। খেতে পরতে দিচ্ছে। ওরা দু-কথা বললে গায়ে মাখলে চলে না।"

"খেতে পরতে দিচ্ছে মাগ্না নাকি?" চড়া গলায় জবাব দিল একটি ছেলে।

"চুপ, চুপ, গোলমাল করো না।" বড়বাবু দূর থেকে ধমকে উঠলেন, "সিটে বসগে সব।"

অনিচ্ছার সঙ্গে যে যার জায়গায় চলে গেল।

কাশীনাথ বাবু বেরিয়ে এলেন একটু পরে। এগিয়ে গেল অনাদি। দুটি বয়স্ক বাবু, বিল সেক্‌সনের হেরম্ব বাবু আর লেবারের মিত্তির মশাই, এগিয়ে এলেন জানতে। হতাশ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন কাশীনাথ বাবু। "না, কিছু হবার নয়।"

"সাতটা ছেলেমেয়ে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে শেষকালে?"

"সেকথা কত করে বোঝাতে চাইলাম, সায়েব আরও জ্বলে গেল।"

"আশ্চর্য। মানুষ যে কি রকম করে এত নির্দয় হতে পারে!"

"ছেলেপুলে তো নেই, স্নেহ মায়া কাকে বলে কোথা থেকে জানবে!"

"মেম্ সায়েব কিন্তু খুব স্নেহ-প্রবণ! একটা কাজ করো অনাদি। ছেলেপুলেদের নিয়ে তুমি একবার মেম্ সায়েবকে গিয়ে ধর।"

কাশীনাথ বাবু চিন্তান্বিত মুখে বললেন, "তাতেও খুব সুবিধে হবে না। অনাদির ওপর সায়েব এমনিতেই কেমন একটু খাপ্পা। কারণটা যে কি তা ঠিক করে বলতে পারি না।

অনেক সময় দেখেছি, সামান্য কারণে ওর চেহারা নিয়ে কি রকম ঠোঁট বেঁকিয়ে মন্তব্য করেন। ওঁর বিয়ের সময়ে মনে নেই? কর্তা আমাদের সকলকে নেমন্তন্ন করেছিলেন ; সামনে দাঁড়িয়ে খাইয়েছিলেন, কি কাণ্ড হল সে সময়ে?"

হেরম্ব বাবু সে সময়ে সবে ঢুকেছেন আপিসে। সুতরাং নিমন্ত্রিতদের দলে পড়েননি। শুনেছিলেন কি একটা কেলেঙ্কারী হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছিল কাশীনাথ বাবু?"

"অনাদি একটু বেশি খায়, জানতো? ওর খাওয়া দেখবার জন্যেই আরও বিশেষ করে কর্তাবাবু সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। খান চল্লিশেক লুচি শেষ করে সবে গোটা তিরিশেক রসগোল্লা খেয়েছে অনাদি। কর্তা মশাই বার বার তাগাদা দিচ্ছেন রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে আসতে। ছোট বাবু বার দুই দেখে গেছেন ওর খাওয়া। বাবার চড়া গলায় বিরক্ত হয়ে নিজেই এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনে ওর পাতে উপুড় করে দিলেন। কতক গায়ে পড়ল, কতক মাটিতে পড়ল, সে এক বিশ্রী কাণ্ড। কর্তা মশাই খুব রেগে গেলেন।"

মিত্তির মশাই সংক্ষেপে মন্তব্য করলেন, "আসলে জাতে কৈবর্ত তো! যাকে চলতি কথায় বলে কেওট।"

কাশীনাথ বাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ও কথা বোলো না মিত্তির। কর্তামশাই ওঁরই বাবা। তিনি যে কত বড় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন, আমার চেয়ে বেশি কে জানে। পালে পার্বণে, আপদে বিপদে মানুষকে কত সাহায্য করেছেন, তার হিসেব আছে? কত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছেন একা হাতে। প্রথম দিকে, শুনেছি, কি সামান্য মূলধন নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন কারবার। ছোট বাবুর আমলে, আজ দশ বার বছর আগে যা ছিল, তার থেকে খারাপ হয়েছে অবস্থা।"

"সে কথা ছেড়ে দিন কাশীনাথ বাবু। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন অনাদির জন্যে কি করা যায়, তাই বলুন।"

কি বলব বল? ছোট বাবুকে অনুরোধ করতে তো বাকি রাখলাম না। কেন যে ওঁর এত রাগ? ছেলেপুলের কথা তুললে যেন আরও রেগে যায়। যা মুখে আসে তাই বলে। আমি কর্মচারী হতে পারি। কিন্তু ওঁর বাবা শেষদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বলে, বয়স হয়েছে বলে যথেষ্ট সম্মান করেছেন। অতবড় অসুখে ডান দিকটা পক্ষাঘাত হয়ে গেল। প্রায়শ্চিত্তির করার সময়ে বাঁ হাত দিয়ে শুয়ে শুয়ে পায়ের ধূলো নিতে চেয়েছেন। চোখের জলে আমাদেরই বুক ভেসে গেছে। তাঁর ছেলে, কি বলব ভাই,—"

"তাহলে কি করতে বলেন শেষ পর্যন্ত?"

"দেখুন একবার মেম সায়েবের কাছে গিয়ে। তবে আমি বলি কি, অতগুলো এ্যাণ্ডা গণ্ডা, ছেলে মেয়ে না নিয়ে গিয়ে, ওর ছোট ছেলেটাকে নিয়ে যাক। বাপের মত রঙ পেয়েছে ছেলেটা। মায়ের মত মুখ। দেখলেই মায়া হয়। মেম সায়েবের মনে ধরলে ওকেই ধরবে। বেশি কতকগুলো বাচ্চা ভীড় করে নিয়ে গেলে বিরক্ত হতে পারে।"

"সেটা ঠিক বলেছেন।" সায় দিলেন মিত্তির মশাই। "তাই করো অনাদি। কালই সকাল বেলা 'দুর্গা' বলে ধরে পড় মেম সায়েবকে।"

হেরম্ব বাবু একটু হেসে বললেন, "হাজার হলেও মেম সায়েব তো। অপাত্রে মায়া দয়া না দেখাতেও পারেন। তুমিও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেও অনাদি। পছন্দ না হলে শেষ কালে?"

চলে গেলেন যে যার জায়গায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনাদি, নির্জীব, নিঃসাড়, অথর্বের মত। চওড়া কাঁধ, দীর্ঘ-সবল চেহারা, টকটকে ফর্সা রঙ। মুখের আদল একটু বেমানান। পেছন থেকে যাকে সুপুরুষ ভাবতে একটুও ইতস্ততঃ করতে হয় না, সামনে

তাকে দেখে ততটা ভাল লাগে না। শিক্ষা, রুচি কিম্বা সংস্কৃতির ছাপ নেই মুখে। বড়বাবু ডেকে পাঠালেন। "কাশীনাথ বাবুকে সায়েব কি বললেন?"

"কি বললেন শুনিনি। ভাবে বুঝলাম, কিছু হবার নয়।"

"গোড়া কেটে এখন আগায় জল ঢেলে লাভ কি? উনি যদি ক্যাশ সর্ট নিয়ে হাঙ্গামা না করতেন, সায়েবের কানে যেত না। মুস্কিল হয়েছে ওঁদের নিয়ে। কাজের মানুষ, সচ্চরিত্র, মিথ্যে কথা, অন্যায় কাজ আদপে পছন্দ করেন না, সবই ঠিক। তবু একটু ট্যাক্ট দরকার। মনিবের সঙ্গে একটু লুকোছাপা, একটু এদিক ওদিক করলে কোন দোষ হয় না। যাক গে, এখন কি করবে ঠিক করলে?

কাল একবার মেম সায়েবের কাছে যাব সকাল বেলা। ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছি।"

"দেখ চেষ্টা করে। এখন সায়েবের রাগ হয়েছে, এখন আর কোন কথা তুলব না। পরে আমি যথাসাধ্য নরম করবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে তুমি এদিকে সেদিকে চেষ্টা করে দেখ। যদি অন্য কোথাও চাকরি জুটে যায় তো ভালই। না হলে, আমরা আছি, দু-একমাসের মধ্যে একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।"

২

অসময়ে স্বামীকে ফিরতে দেখে সবই বুঝে গিয়েছিল নীরজা। সব কথা তাকে বলেছিল অনাদি। পঞ্চাশ টাকা যেদিন ক্যাশ থেকে নিয়েছিল, সেদিনও কিছু গোপন করেনি স্ত্রীর কাছে। শুনেই বুকে ঘা লেগেছিল নীরজার। এতো ধার নয় যে শোধ দিলেই চলবে। এ যে চুরি! ধরা পড়লে চাকরি নিয়ে টানাটানি। বেশি লেখাপড়া শিখবার সুযোগ হয়নি তার। তবু দীর্ঘদিন স্বামীর ঘর করতে করতে, ক্যাশ সর্ট হওয়া মানেই যে চাকরির ঝুঁকি, সেটা ভাল মতই বুঝে নিয়েছিল। আর এ তো জেনেশুনে ক্যাশ থেকে টাকা সরানো!

মা মঙ্গলময়ীর কাছে মানত করেছে গতকাল। উপোষ করে, বুক চিরে রক্ত দেবে মায়ের কাছে, প্রতিজ্ঞা করেছে। কিন্তু মা মুখ রাখলেন না। এখন এই চুরির শাস্তি কি দুর্বহ হয়ে নামল সংসারের মাথায়?

বড় দুটি মেয়ে। একটি পনের, আর একটি তেরোয় পা দিয়েছে, স্কুল ছাড়াতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। বিয়ের চেষ্টার ছুতো করে, আসলে মেয়েকে পড়াবার বিলাসিতা অনাদির সাজে না। তৃতীয়টি ছেলে, বছর এগার বয়েস। স্কুলে গেছে। তারপর আবার দুটি মেয়ে। আট আর পাঁচ বছর বয়েস। স্কুলে দেওয়া হয়নি এখনো, তারপর ছোট ছেলে নন্তু। তিন পূর্ণ হবে বোশেখ মাসে। টাইফয়েড হয়েছিল। ক্লোরোমাইসিটিনের কৃপায় সুস্থ হয়েছে কিছুদিন হল। কিন্তু দুষ্ট রোগ রোগীর কোন অঙ্গহানি না করলেও বাপের চাকরি অন্ত করিয়েছে। যেমন রঙ, তেমনি নাক, মুখ, চোখ ; খেতে পায় না পেট ভরে, এই সবে উঠেছে এতবড় রোগ থেকে, তবু যেন প্রাণ কেড়ে নেয় অবাক চোখের চাউনি দিয়ে। মেয়েরাও সব বাপের রঙ পেয়েছে। শুধু ডালভাত খেয়েই স্বাস্থ্য। ন্যায়রত্ন বংশের রূপের খ্যাতি অম্লান রেখেছে বংশধরেরা। তবু সবার সেরা নন্তু। রাজার ঘরেই মানায় এ ছেলেকে, অথচ কি দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে।

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল নীরজার বুক চিরে। খাওয়া দাওয়া সেরে নন্তু আর কোলের মেয়েটিকে নিয়ে শুয়েছিল সে। উঠে বসেছিল স্বামীকে দেখে। ছোট মেয়ে দুটি পুতুল খেলছিল এক কোণে। বড় মেজ র‍্যাশানের গম বাছতে বাছতে গল্প করছিল মৃদুস্বরে।

কাঠের সিন্দুকের ওপরে বিছানা পাট করে রাখা। পাড়ের তৈরী সুজনি দিয়ে যত্ন করে

ঢাকা। দেওয়াল আলমারীর একটা কাচ কয়েক বছর যাবৎ ভাঙা। ওপরের তাকে শ্বশুর ন্যায়রত্ন মশাইয়ের পুঁথি পত্তর গোছ করে রাখা। সব ধরেনি। জানলার ওপরে কাঠের তাক করে বেঁধে বেঁধে রেখে দিয়েছে অনাদি, বাপের পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্যগুলি।

কত নাম ডাক ছিল এককালে পিনাকী ভূষণ ন্যায়রত্নের। বিখ্যাত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। কত ছাত্র ওঁর টোল থেকে বেরিয়ে কত নাম করেছে। কিন্তু অভাব ঘোচেনি অধ্যাপকের। ছাত্রস্থানীয় কাশীনাথকে ধরে ছেলেকে বিশ্বাস মশায়ের আপিসে তাই ঢুকিয়েছিলেন ন্যায়রত্ন মশাই। কিন্তু বৃত্তি পালটালেই কি ভাগ্য ফেরে? নিত্য অভাব, নিত্য অনটন। অথচ তার মধ্যেও মা ষষ্ঠির কৃপা আঠার মত লেগে আছে কপালে। এই দুর্মূল্যের বাজারে সাতটি ছেলে মেয়ে নিয়ে অল্প মাইনের সংসার চালানো কি সোজা কথা? এবার সেটুকুও ঘুচল।

লংক্লথের পাঞ্জাবী ঘামে ভিজে গেছে। সাবধানে জামা ছাড়ল অনাদি। বড় মেয়ে বাপের হাত থেকে নিয়ে ভাল করে হাওয়ায় মেলে দিয়ে এল বারান্দায়। গামছা দিয়ে বুক পিঠে মুছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল অনাদি।

জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছিল না নীরজা। স্তনবৃন্তের আশায় লুব্ধ শিশু কোলের মধ্যে ছট্‌ফট্ করছিল। তাকে বিরক্ত হয়ে চাপড় মেরে ঘুম পাড়াতে চাইল। বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা। প্রাণপণে সংযত রেখেছে মনকে।

"কোন সুবিধে হল না।" নিচের ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল অনাদির।

চুপ করে রইল নীরজা।

"সায়েবের পায়ে ধরলাম পর্যন্ত। কাশীনাথ বাবু বলতে গেলেন আমার জন্যে। কিছু না। আমাকে তো বেয়ারা দিয়ে বার করে দিলে ঘর থেকে।" গোঙানির মত শব্দ বেরুল অনাদির গলা থেকে।

বড় মেয়ের গলা থেকে অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল। চমকে সেদিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল নীরজা।

"এই বুড়ো বয়সে কোথায় যে কি কাজ পাব! লেখাপড়াও ভাল শিখিনি। ম্যাট্রিকটাও যদি পাশ করে রাখতাম।"

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে রইল অনাদি। ছোট মেয়ে দুটি পুতুল খেলা ভুলে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে রইল বাবার দিকে। বড় মেয়ে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে। মেজ মেয়ে ভাঙা-কাচ-আলমারীর দিকে চেয়ে এই ঘাড়ের উপর এসে পড়া বিপদটাকে কোন্ মন্ত্রবলে এড়ানো যায়, সেকথাই ভাবতে লাগল অপটু মনে। নন্তুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অপরূপ দুটি কাজল কালো চোখ মেলে জানলার বাইরে লাইট-পোস্টের গায়ে আটকানো ছেঁড়া ঘুড়িটার বাতাসের ধাক্কায় দুলতে থাকা দেখছিল নিশ্চুপে। মেজ মেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "আমরা তো ঠোঙা তৈরী করতে জানি।"

মা-বাবা দুজনেই তার দিকে ফিরে তাকালো। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল।

এ প্রস্তাব সম্ভবতঃ ওঁদের মনঃপূত হয়নি ; এই ভেবে দ্বিতীয় দফায় সন্ধ্যা বলল, "নির্মলার মা আলুর পাঁপড় তৈরী করে বড় বাজারে দিয়ে আসবে। দিদি বেশ ভাল শিখে গেছে। আমি, ছন্দা, দুজনেই দিদির সঙ্গে তৈরী করতে পারব।"

এবার সত্যি চমকে গেল অনাদি। কতদূর ভেবে রেখেছে মেয়েরা। ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবার কি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। অনাদির কাছে যখন চতুর্দিক অন্ধকার, এরা তারই মধ্যে পথ চিনে চলবার চেষ্টায় প্রাণপণে লেগে গিয়েছে!

নীরজা বলল, "তুমি অত ভেব না। উপায় একটা হবেই।"

সত্যি সত্যি যেন বুকে বল পেল অনাদি। বলল, "কাল সকালবেলা নন্তুকে নিয়ে একবার সায়েবের বাড়ি যাব। মেমসায়েবকে ধরতে বলে দিল সকলে। ওঁর তো ছেলেপুলে

নেই। খুব স্নেহপ্রবণ। ওঁর মনে দয়া হলে, সায়েব না করতে পারবেন না।"

"বেশ তো যেয়ো।" বলে নন্তুর কপালের চুলগুলো অকারণে সরিয়ে দিল নীরজা। মনে মনে সওয়া পাঁচআনার মানত করল। বুকের রক্তের কোন দাম নেই। সম্ভবতঃ মা তাই মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। এই প্রচণ্ড অভাবের সংসারের লোলুপ থাবা থেকে সওয়া পাঁচ আনা কেড়ে নিয়ে মায়ের পূজো দিতে পারলেও কি সন্তুষ্ট হবেন না মা?

দুপুরের প্রহরগুলো মূর্ছিতের মত পড়ে রইল ঘরের ভেতরে। পুরানো বাড়ি। অনাদির ঠাকুর্দার আমলের। শুধু ভদ্রাসন ছাড়া সব জমি অভাবে পড়ে বিক্রি করেছেন ন্যায়রত্ন মশাই ও তাঁর ছেলে। কাঠা দুই অবশিষ্ট আছে মাত্র। দু-খানি ঘর, কোলে দালান, একটুখানি উঠোন আর একটা কাঁঠাল গাছ। এখন বিক্রি করলে এটুকুতেই হাজার পনের টাকা স্বচ্ছন্দে দেবে যে কোন ক্রেতা। কিন্তু তারপর? বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে বাড়ি হস্তান্তরিত করার কল্পনায়। চারপুরুষ কাটল কলকাতায়। গ্রামের কিছু কিছু আত্মীয় স্বজন আছেন। কিন্তু নতুন করে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকা আত্মহত্যার সমতুল্য।

কাঁঠাল গাছের পাতায় মুছে গেল রোদের জেল্লা। গলির মোড়ে তিনকড়ির তেলেভাজার দোকানে একটু একটু করে ভিড় জমতে থাকল। বড় রাস্তায় দাঁড়ালে হঠাৎ বিভ্রম জাগে। সোনার গহনার দোকানে হাজার পাওয়ারের ইলেকট্রিক আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে লক্ষ পাওয়ারের জৌলুশ দিয়েছে। জামাকাপড়ের দোকান, রেস্তোরাঁ, মিষ্টির দোকান, স্টেশনারি জিনিস পত্রের দোকান, সিনেমা, অগণিত সুবেশ নর-নারীর মিছিল, আর এক আশ্চর্য জগৎ। ন্যায়রত্ন বাড়ির উঁচু পাঁচিলের ভেতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার অনড় হয়ে রইল সন্ধ্যা থেকে।

৩

শেষ চৈত্রের বাতাসে দুলছিল শুকিয়ে আসা ডালিয়া ফুলের পাপড়ি। কাঁধ কাটা ব্লাউজের উপর থেকে খসে যাচ্ছিল সিফনের আঁচল। অনাবৃত করে দিচ্ছিল মঞ্জু বিশ্বাসের অপরূপ বাহুমূল। লেক-টেরেসের বিশ্বাস লজের বাগানে সকাল বেলা বেড়াচ্ছিলেন মিসেস বিশ্বাস। মস্ত এ্যালসেসিয়ানটা লাফিয়ে লাফিয়ে অনুসরণ করছিল কর্ত্রীকে।

গেট খোলার ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজে তেড়ে গেল কুকুর। ভয়ে চিৎকার করে সিঁটিয়ে গেল নন্তু বাপের কোলে। ছুটে এলেন মেম সায়েব। ধমক দিলেন কুকুরকে। সরে এল পশুটা।

"কাকে চাই?"

"আপনার কাছেই এসেছিলাম মেম সায়েব।" রোগা ছেলের বিকৃত বিবর্ণ মুখ দেখে ভীত হয়ে পড়ছিল অনাদি।

"আমার কাছে?" এগিয়ে এলেন মেম সায়েব। "ইস্, বড় ভয় পেয়ে গেছে বেচারা। না বলে কয়ে হঠাৎ এরকম গেট্ খুলে ঢোকেন কেন?"

"আপনাকে বাগানে দেখতে পেলাম তাই—"

"তাহলেও সাড়া দেবেন তো? দেখুন দেখি, সাদা হয়ে গেছে ভয়ে। দিন, আমার কাছে দিন। আসুন আমার সঙ্গে।" নিপুণ হাতে কোলে তুলে নিলেন মেম সায়েব শিশুটিকে।

"আপনার ছেলে বুঝি?"

"আজ্ঞে! সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছে কি না—"

"বলেন কি? রোগা ছেলে! না, না, বাবা, কিছু ভয় নেই। জিম্ গেট আউট, যাও। প্যারীলাল!"

"জি মেম্‌সাব।"

"জিমকো লে যাও ইঁহাসে! আয়াকো বোলাও জলদি।"

আয়াকে দিয়ে কাচের জগে জল, তোয়ালে, আনিয়ে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সযত্নে মুছিয়ে দিলেন শিশুর মুখ। কেঁদে উঠল নন্তু। বুকে চেপে আদর করতে করতে ভেতরে নিয়ে গেলেন মেম সায়েব।

বারান্দার এক ধারে কাঠের বেঞ্চে বসে রইল অনাদি। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে যাচ্ছিল তার। চাকরি যদি ফিরে পায় সে, পাবে নন্তুর কল্যাণেই।

একটু পরেই ফিরে এলেন মেম সায়েব। কোলে নন্তু। তার হাতে বিস্কুট। বললেন, "ভারি সুন্দর ছেলে আপনার। কি নাম রেখেছেন?"

"আঁজ্ঞে বাড়িতে ডাকি নন্তু বলে। ভাল নাম এখনও ঠিক হয়নি। ইস্কুলে দেওয়ার সময়ে দেখে শুনে একটা ঠিক করা যাবে।"

"ভাল।" সুন্দর দন্তপংক্তি বার করে হাসলেন মিসেস বিশ্বাস। "আমার কাছে কি জন্যে এসেছিলেন?"

"আমি আপনাদের আপিসের পেটি ক্যাশ সরকার।" লজ্জায় মাথা নিচু করে হাত কচলে শুরু করল অনাদি। "গত মাসে ওই খোকার টাইফয়েড হয়েছিল। আজকাল চিকিৎসাপত্তরে কি রকম খরচ জানেন তো? তাই অভাবে পড়ে অন্যায় করে ফেলেছিলাম। আপিসের ক্যাশ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছিলাম। সেটা আর ফেরৎ দেওয়ার সময় পাইনি। এ মাসে মাইনে পেয়ে টাকা রেখে দিতাম। কিন্তু তার আগেই সায়েবের হুকুমে চাকরি গেল। সাতটি ছেলে মেয়ে। সব চেয়ে ছোট মেয়ে, এই বছর খানেক বয়েস। তার ওপরে এই খোকা। এই বাজারে চাকরি গেলে সপরিবারে না খেয়ে মরব।"

"কিন্তু আপিসের ক্যাশ ভেঙে টাকা নেওয়া—"

"অভাবে পড়ে মাথার ঠিক ছিল না মেম সায়েব। আপিসের বাবুদের থেকে সুরু করে দরওয়ানের কাছে পর্যন্ত ধারের জন্যে হাত পেতেছি। মাসের শেষে কেউ টাকা দিতে পারেনি। হাতে কাঁচা টাকা নাড়াচাড়া করছি অনবরত। এই ছেলে চিকিৎসার অভাবে, পথ্যির অভাবে, চোখের সামনে মারা পড়বে আর বাপ হয়ে তাই দেখব, কত আর পারি বলুন? অন্যায় করেছি, তার শাস্তি মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে এই নিষ্পাপ শিশুগুলো অনাহারে মরবে, এমন শাস্তির বিধান কি আপনি দেবেন মেম সায়েব?"

"দেখুন, আপিসের ব্যাপারে আমি কখনও মাথা গলাই না। আপনাদের সায়েবের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা পছন্দ করি না আমি।"

ম্লান হাসল অনাদি! "সায়েব অন্নদাতা, আজ সতের বছর চাকরি করছি, খেয়ে পরে বাঁচিয়ে রেখেছি ছেলে-মেয়েদের আপনাদের দয়ায়। আপনি মায়ের মত। এই ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম, যদি এদের মুখ দেখে আমাকে মাপ করেন। এদের বাঁচাবার জন্যেও যদি একটু বলেন সায়েবকে।"

"বললাম তো, আপিসের ব্যাপারে ইন্‌টারফিয়ার করা আমি আদপে পছন্দ করি না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল অনাদি। "আমার দুর্ভাগ্য! চোখের সামনে ওরা তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে, এই দেখা যদি ভাগ্যে থাকে, খণ্ডাবে কে বলুন? তার চেয়ে ওই ছেলেটার রোগে মারা যাওয়াও বোধহয় ভাল ছিল। মায়ায় অন্ধ হয়ে একটাকে বাঁচাতে গিয়ে সব কটাকে মারলাম।"

চুপ চাপ দাঁড়িয়ে শুনলেন মেম সায়েব। বিস্কুট হাতে নিয়ে বড় বড় চোখ মেলে, শান্ত মুখে তাকিয়ে আছে শিশু। বুকের মধ্যে দলে পিষে আদর করতে সাধ যায়। কচি, নরম, ফোলা ফোলা গালে ঠোঁট চেপে ধরতে ইচ্ছে যায়। "কটি ছেলেমেয়ে আপনার?"

'আঁজ্ঞে সাতটি। পাঁচ মেয়ে, দুই ছেলে।"

"সব কটিই এই রকম সুন্দর?"

"আঁজ্ঞে রায় বাগানের ন্যায়রত্ন বংশের রূপের খ্যাতি ছিল এক কালে।"

"রায় বাগান? বিডন স্ট্রীটের কাছে, না?"

"আঁজ্ঞে হ্যাঁ, হেদোর ধারেই প্রায়।"

"ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন তো। গিয়ে একদিন দেখে আসব।"

হাসল অনাদি। "তাহলে একটু তাড়াতাড়িই যাবেন মেম সায়েব। এ মাসটা চলার মত সংস্থান আছে, মিথ্যে বলব না। কিন্তু তারপর ভিক্ষে ভরসা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি বসুন।" রাগ করে নন্তুকে নিয়ে চলে গেলেন মেম সায়েব ভেতরের দিকে।

অনেকক্ষণ চুপ চাপ বসেছিল অনাদি। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলছিল বুক। আয়া ডিসে করে কেক, সন্দেশ আর চা নিয়ে এল! এক গ্লাস জল চাইল অনাদি। খেয়ে দেয়ে আবার অপেক্ষা করতে লাগল সে।

একটু পরে আয়া এসে ডাক দিল। তার পেছু পেছু ভেতরে গেল অনাদি। জানলা দরজায় মোটা ভারি পর্দা দেওয়া ঘরখানা। মেম সায়েব বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন নন্তুকে নিয়ে। চুপি চুপি বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি ডাকলে আসবেন।" পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেলেন তিনি।

মেম সায়েবের গলা কানে এল। "একে চিনতে পার?"

"ওটাকে আবার কোত্থেকে জোটালে?" সায়েবের ভারি গলা কানে এল। "মিসেস সরখেলের বাচ্চা বুঝি?"

"হল না, হল না।" মেম সায়েবের গলায় জলতরঙ্গ বাজল। "কি সুন্দর বাচ্ছাটা নয়? একটু ভাল ড্রেস করালে এক্সকুইজিট্ লাগবে। এর বাবাকে তুমি চেন।"

"মে বি। আই নো লট্স্ অব মেন, হু হ্যাভ লাভলিয়ার চিলড্রেন। আই ডোণ্ট গ্রাজ দেম এভার।"

"সম্রাট মহানুভব! আমি কিন্তু সুন্দর বাচ্ছা দেখলে তাদের মা-বাবাকে ঈর্ষা করি।"

"ঈর্ষা মেয়েদের সহজাত প্রবৃত্তি!"

"যেমন পুরুষদের প্রবৃত্তি চুরি।"

"এটা মেনে নিতে পারি না। চুরি করা ছাড়াও অন্য কাজ আছে পুরুষের।"

"আছে বই কি! মিথ্যে কথা বলাটাও একটা রেয়ার কম্‌প্লিমেণ্ট পুরুষদের পক্ষে।"

'ব্যাপারটা কি বলত? হঠাৎ আজ সকাল থেকে এ রকম মেজাজ খিঁচড়ে দিল কে? তোমাকে তো কত বার বলেছি, যখন সন্তান হবার নয় তখন তা নিয়ে মিথ্যে মন খারাপ করো কেন? কই, আমি তো দুঃখ করি না?"

"তুমি করবে কেন? নিজের সম্পর্কে তুমি যে সব কিছু জেনে বসে আছ। আমি তো এই বঞ্চনাটা সহজে পরিপাক করতে পারি না।"

খানিকটা থেমে আবার শুরু করলেন মেম সায়েব, "শোন, এই বাচ্ছার বাবা এসে আমাকে ধরেছেন। তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছ তুমি চুরির দায়ে। আমি কখনো তোমার ব্যাপারে ইণ্টারফিয়ার করতে চাই না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে না করে পারলাম না। এই সুন্দর শিশু আর এর আরও ছটি ভাইবোন না খেয়ে মরবে, ভদ্রলোকের চাকরি না থাকলে। অন্যায়ের শাস্তি অনেক বেশি হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাকে ডিসিসান রি-কনসিডার করতে হবে।"

"অনাদি এসে ধরেছে তোমাকে?" বিরক্তি প্রকাশ পেল সায়েবের কণ্ঠে।

"ভদ্রলোকের নাম তো জানি না। দাঁড় করিয়ে রেখেছি বাইরে।" পর্দা সরিয়ে ডাক দিলেন মেম সায়েব। "ভেতরে আসুন আপনি।"

হাত জোড় করে ভেতরে ঢুকল অনাদি।

ফেটে পড়লেন সায়েব। "খুব চালাকি শিখেছেন, না? ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এসে ধরেছেন? ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না। চোরকে আমি আপিসে রাখব না।"

"যে সারকমস্ট্যান্সে পড়ে ক্যাশ থেকে টাকা নিয়েছিলেন ভদ্রলোক—"

"ভদ্রলোক? গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চার জন্ম দেয় যারা আর চুরি করে ছেলে মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখতে চায় যারা, তারা কোন পুরুষে ভদ্রলোক নয়।"

দপ্ করে ব্রহ্মতেজ জ্বলে উঠল টুলো পণ্ডিতের ছেলের মগজে। বলল, "আমি চোর, আমাকে গালাগালি করুন স্যার, জুতো মারুন, কোন আপত্তি করব না। কিন্তু আমার বাবা বহুদিন গত হয়েছেন। তবু আজও আমাদের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে পিনাকী ন্যায়রত্নের নাম করতে লোকে মাথা নোয়ায়।"

ঠোঁট বেঁকিয়ে শ্রাগ্ করলেন সায়েব। "ন্যায়রত্নের ছেলে অন্যায়রত্ন!"

"একশো বার স্বীকার করি স্যার।"

"স্বীকার করেন না করেন, হু কেয়ারস্ ফর দ্যাট্?"

"যাই হোক, শোন", মেম সায়েব মিষ্টি করে বললেন, "আমি শুনেছি ওঁর কাছ থেকে সব। এবারের মত মাপ করো তুমি। আমি কথা দিয়েছি।"

"কেন তুমি এ ধরনের কথা দাও?"

"দিয়েছি এর মুখ চেয়ে।" আদর করে নন্তুর নরম গাল টিপে দিলেন মেম সায়েব।

"বেশ করেছ। ইউ নো ভেরি ওয়েল, আই ডোণ্ট লাইক সাচ্ ইন্টারফিয়ারেন্স।"

"জানি আমি। কখনই তো এসব ব্যাপারে আমি কথা বলি না। জানো, ভারি শান্ত ছেলেটি। জিম তেড়ে গিয়েছিল সকালবেলা। রোগা ছেলে ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটুতেই ভুলে গেল। কি সুন্দর চোখ দুটি দেখ। ওর সব ভাইবোনই নাকি সুন্দর। একদিন তাদের দেখতে যাব বলেছি। আপনার ঠিকানাটা লিখে দিয়েছেন তো? কলম নেই? আচ্ছা দাঁড়ান, আমি লিখে নিচ্ছি।" টেবিলের একধারে নন্তুকে বসিয়ে কলম আর প্যাড তুলে নিয়ে অনাদির কাছ থেকে ঠিকানা লিখে নিলেন মেম সায়েব। তারপর নন্তুকে আবার কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। এবারের মত সায়েব আপনাকে মাপ করলেন। কিন্তু মনে রাখবেন, দ্বিতীয়বার এ রকম যেন না হয়। তখন আমি আপনাকে বাঁচাতে পারব না।"

"আঁজ্ঞে আর কখনো এ রকম হবে না।"

"হ্যাঁ, মনে রাখবেন। আসুন আমার সঙ্গে।" বেরিয়ে এলেন মেম সায়েব ঘর থেকে। গেট পর্যন্ত এসে শিশুর গালে ঠোঁট চেপে ধরলেন একবার। তারপর বাপের কাছে ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "রবিবার সকালের দিকে আপনার বাড়ি যাব। বুঝলেন? যেমন আপিস যাচ্ছিলেন, তেমনই যাবেন কাল থেকে।

চোখে জল এসে গিয়েছিল অনাদির। বলল, "অনেক সৌভাগ্য করেছিল খোকা।"

৪

শনিবার থেকে ঘর ঝাড়া মোছা সুরু হয়েছিল। রবিবার সকালেও মন খুঁত-খুঁতুনি যাচ্ছিল না নীরজার। সত্তর বছরের পুরোনো বাড়ি, কিছু কিছু সারানো হয়েছিল তার বিয়ের সময়ে, তারই বাপের টাকায় তারপর থেকে আর হাত পড়েনি।

আসবাবপত্রের বালাই নেই। গুটি দুই জলচৌকি, একটা কাঠের সিন্ধুক আর একটি

পুরোনো আমলের কাঠের আলনা। গুছোবার বিশেষ কিছু ছিল না। তবু সাতবার ঝাড়ামোছা করেছে মেয়েরা।

বেলা নটা আন্দাজ গলির মোড়ে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। ঠিক প্রস্তুত ছিল না অনাদি। বাবার পুঁথি পত্তরগুলো নামিয়ে, ধুলো ঝেড়ে জায়গায় তুলে রাখছিল। ইতিমধ্যে বড় ছেলে এসে খবর দিল, বাবা, তিনি এসে গেছেন।

কোন রকমে বইগুলো ঠেলে রেখে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বাইরে বেরিয়ে এল অনাদি। আধ-ময়লা ধুতিখানা দু-ভাঁজ করে কোমরে গোঁজা। মোটা পৈতে গুচ্ছ অনাবৃত বুকে ঝুলছে। ধুতির চেয়ে তাদের রঙ পরিষ্কার। মসৃণ চামড়া ; টকটকে ফরসা গায়ের রঙ ; বেশ চওড়া কাঁধ ; শুধু চোয়াল বার করা মুখে এখানে সেখানে গুচ্ছ গুচ্ছ দাড়ি বেমানান লাগে।

মস্ত বড় একটা নতুন ঝুড়ি নিয়ে তকমা আঁটা ড্রাইভার ছোট দরজা ঠেলে ঢুকল উঠোনে। দরজার তুলনায় ঝুড়িটা বড়। কাজেই, পাশ করে, সাবধানে ঢুকতে ঢুকতে ড্রাইভারের মুখ থেকে দু-একটা অস্ফুট অশ্লীল শপথ উচ্চারিত হল। দালানে জুতো শুদ্ধ ঢুকে ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে নেমে গেল সে সায়েবের মতই গম্ভীর চালে। সম্ভবতঃ দরজার বাইরে মেম সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেখানে কি সব নির্দেশ দিলেন তিনি, শোনা গেল, বোঝা গেল না। কলহাস্যে কথা বলতে বলতে দরজা দিয়ে ঢুকলেন মেমসায়েব ; পিছনে তাঁরই মত, কিম্বা তাঁর থেকেও বেশি আধুনিক পোশাক পরা, সঙ্গিনীকে নিয়ে। উঠোনে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে বিস্মিত চোখে দেখলেন চোখ তুলে। ঝাঁকড়া গাছটাকে কাঁঠাল গাছ বলে চিনতে পেরে খুশি হয়ে উঠলেন খুব। তারপর সুদৃশ্য চটি দালানের বাইরে খুলে, হাত দিয়ে শাড়ি তুলে, ঝকঝকে সাটিনের সায়া দেখিয়ে, ঘরে ঢুকলেন দুজনে। গলিতে নেমে প্রায় তিরিশ গজ হেঁটে আসতে পরিশ্রম হয়েছিল খুব। রুমাল বার করে কপালের ঘাম অল্প মুছে, নাকের কাছে ধরে রইলেন। ঘরের পুরোনো, সোঁদা গন্ধটা বিশ্রী লাগছিল নিশ্চয়ই।

"কই, আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়? আপনার গিন্নীকে ডাকুন!" কলকণ্ঠে বললেন মেমসায়েব।

দালানে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেমেয়েরা। পশের ঘর থেকে পুরোনো গালচেটা নিয়ে এল নীরজা। সাবধানে পেতে বলল, "বসুন।"

পশমের গালচে। অনেক পুরোনো। বহু ব্যবহারে রঙ উঠে গেছে। তবু পরিষ্কার। সঙ্কোচ ত্যাগ করে ঝুপ করে বসে পড়লেন মেমসায়েব। সিল্কের শাড়ির আঁচল ছড়িয়ে গেল অনেকখানি জায়গায়। ঘোমটা খসে মোমের মত সুন্দর ঘাড় আর পিঠের অনেকটা অংশ বেরিয়ে পড়ল। ডাক দিলেন সঙ্গিনীকে, "বস মাধবী।"

তিনিও বসলেন। বললেন, "বড় গরম।"

পাড়ের ঝালর দেওয়া ছোট ছোট দুটি পাখা নিয় এগিয়ে এল দুই বোন, সেজ আর ন-মেয়ে। দুদিকে দাঁড়িয়ে রবি-বর্মার ছবির সখীর মত পাখা দোলাতে লাগল।

"ঝুড়িটা একটু নিয়ে আসুন না?" অনুরোধ করলেন মেমসায়েব অনাদিকে।

একে একে সব কটি ছেলেমেয়েকে দেখলেন তিনি, কাছে ডাকিয়ে, গায়ে মুখে হাত দিয়ে। নাম নিয়ে রসিকতা করলেন। তারপর ঝুড়ি থেকে দু-খানি ভাল সিল্কের শাড়ি আর একটি স্যুট বার করে বললেন, "আপনার বড় দুই মেয়ের জন্যে আর ছোট ছেলেটির জন্যে নিয়ে এসেছি। বাকি সকলের তো মাপ জানি না। আমি টাকা দিয়ে যাচ্ছি। ওদের জন্যে ভাল জামা কাপড় কিনে দেবেন," সুন্দর ভেলভেটের পার্স খুলে একশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরলেন মেমসায়েব।

সঙ্কোচে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছিল অনাদি। "এত দিলেন, আবার টাকা কেন?"

"ধরুন। কেনর কৈফিয়ৎ দিতে পারব না। ওদের কিছু নিয়ে এলাম না বলে আমি কোথায় সঙ্কোচে মরে যাচ্ছি!"

ধমক খেয়ে টাকাটা নিল অনাদি।

ঝুড়ি থেকে সন্দেশের মস্ত প্যাকেট, মিষ্টির হাঁড়ি, চারটে আনারস, অনেকগুলো কমলালেবু, একগাদা নানা রকমের পুতুল, খেলনা, এক এক করে হাতে হাতে দিলেন সকলকে। বাকি মিষ্টি নীরজার হাতে ধরে দিলেন। বললেন, "কর্তাকে বলবেন, টাকা থেকে আপনার একখানা শাড়ি যেন হয়।"

অনাদি বলে উঠল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। একশ টাকা বলে কথা।"

"এবার তাহলে আমরা উঠব।"

"একটুখানি বসুন," ফিসফিসিয়ে বলল নীরজা। "একটু চা করে দিই।"

"না, না, এই গরমে আর চা নয়।"

"তাহলে একটুখানি লেবুর সরবৎ।"

"বেশ, কিছু না খাইয়ে ছাড়বেন না, এই তো? তাহলে আনুন। কিন্তু সামান্য একটু সরবৎ। তার বেশি কিছু নয়।"

নীরজা বেরিয়ে যাবার সময় ডাকল, "শুনে যাও একবার।"

ইংরেজিতে আলাপ করছিলেন মেমসায়েব বান্ধবীর সঙ্গে। সত্যি, ছেলেমেয়েগুলি সুন্দর। অভাবের সংসার, থাকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনটনের মধ্যে। এরাই যদি সচ্ছলতার মধ্যে বেড়ে উঠত, দেখতে শুনতে সত্যি খুব সুন্দর হত। এরা ন্যায়রত্নের বংশ। এদের রূপের খ্যাতি নাকি অনেক পুরুষ ধরে।

সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন মেমসায়েব। ছোটখাট প্রশ্ন করছিলেন মেয়েগুলিকে। ওঁর বান্ধবী মাধবীকে অনেক চোখা এবং বুদ্ধিমতী মনে হয়--ছোটখাট মন্তব্যগুলি থেকে! যেন তদন্ত করতে এসেছেন দুঁদে পুলিশ অফিসার, সঙ্গে তীক্ষ্ণ-ধী প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভকে নিয়ে।

নীরজা আসতে প্রশ্ন করলেন, "ওই সব বইগুলো ওই রকম ঠেলেগুঁজে রেখেছেন, নষ্ট হয়ে যাবে না?"

সেদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে হেসে ফেলল নীরজা। বলল, "ওগুলো উনি খুব যত্ন করে সাবধানে রাখেন। পৈতৃক সম্পত্তি বলতে ওই সব পুঁথিগুলো আর এই বাড়ি। আমার শ্বশুর খুব নামকরা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কত পুথি বড় বড় লাইব্রেরী থেকে চেয়ে নিয়ে গেছে। ঐগুলো উনি দিতে চাননি। কি সব যাগযজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র সব নাকি লেখা আছে। আপনি আসবার আগেই তো ধুলো ঝেড়ে গুছিয়ে রাখছিলেন। বোধহয় তাড়াতাড়ি রেখেছেন ওইভাবে।"

"আপনি কিছু পড়ে দেখেননি?"

"আমি?" হাসল নীরজা। 'সম্‌স্কৃত আমি বুঝব কোত্থেকে? আমার যদি পেটে একটু বিদ্যে থাকত, তাহলে কি আর এই অবস্থা হয়?"

"কেন, আপনার অবস্থা খারাপ কিসে? "সংসার চালাবার ভার তো আপনার ওপরে নেই, সে আপনার কর্তার ব্যাপার। ছেলেমেয়েগুলি কেমন সুন্দর হয়েছে বলুন দেখি।"

"সুন্দর আর বলবেন না। বিয়ে হওয়া ইস্তক একটি মিনিটের জন্যে স্বস্তি পাইনি। দেখতে পাচ্ছেন তো কতগুলি। একেকটিকে মানুষ করে তোলা যে কত ঝঞ্ঝাটের, কি বলব!"

চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন মাধবী। বড় মেজ মেয়েদুটি অনেক আগে চলে গেছে। সেজ-ন দুজনে পুতুল খেলছে বারান্দায়। ছেলেটি সম্ভবতঃ বাপের সঙ্গে কোথাও গেছে। মায়ের কাছে বসে আছে সেই সুন্দর ছোট ছেলেটি ডাগর ডাগর চোখ তুলে।

আর একেবারে কোলের মেয়েটি মায়ের কোলে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছে। তার গালে অল্প চিমটি কেটে মাধবী বললেন, "এবারে বন্ধ করে নিলেই পারেন।"

"সে কথা ভেবেছিলাম। আমার দিক থেকে করতে গেলে নাকি অনেক খরচ। তাছাড়া হাসপাতালে থাকতে হবে অনেকদিন। ওঁকে বলি, তুমি করিয়ে নাও। কি জানি, বোধহয় ভয় হয়। বলেন হ্যাঁ, করিয়ে নেব। তারপর আর মনে থাকে না।"

"ওঁদের আর মনে থাকবে কেন?" ঠোঁট টিপে মন্তব্য করলেন মাধবী। চোখ তুলে নজর করল নীরজা। ঘন চুল, সিঁথির ভেতরে অল্প একটু সিঁদুরের আভাস। হ্যাঁ, এসব আলোচনা করার অধিকার আছে। "ওঁদের তো আর কষ্টটা সহ্য করতে হয় না। আপনি শক্ত হলেই পারেন।"

"সে কি আর হই না ভাবছেন? উনি ওঘরে শোন বড় ছেলেকে নিয়ে। আমি মেয়েদের নিয়ে এঘরে শুই। "নস্তু হবার পর" ছোট ছেলেকে দেখিয়ে বলল নীরজা, "দু-বছর একসঙ্গে শুইনি। তারপর একদিন ওঁর শরীরটা খারাপ হয়েছিল। মাথা ধরেছিল খুব। বললেন টিপে দিতে। রাতে শোবার আগে টিপে দিতে গেলুম। কি করে জানব, শরীরের ওই রকম অবস্থাতেও ওঁর মনে কু-মতলব। আর ভাগ্যকেও বলিহারী যাই! কত লোক কত চেষ্টা করে, মানত করে, একটি সন্তানের মুখ দেখতে পায় না। আর আমাদের একটি দিনের গরমিলে কোল জুড়ে মা-ষষ্ঠি আর একটিকে পাঠিয়ে দিলেন।

খুব গম্ভীর ভাবে কথা বলছিল নীরজা। কিন্তু গম্ভীর মুখে শুনতে শুনতে আর থাকতে পারলেন না মাধবী। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন মেমসায়েবের গায়ে। হাসির ছোঁওয়া তাঁর ঠোঁটেও লাগল। অপ্রস্তুত হয়ে গেল নীরজা।

"আপনার কর্তাটিকে খুব করিৎকর্মাপুরুষ বলতে হয়।" হাসতে হাসতে মাধবী বললেন।

"তা বলতে পারেন। আর তো কোন গুণ নেই! ওই যে আসছেন উনি। আমি একটু যাচ্ছি।"

স্ত্রীর সঙ্গে কি কয়েকটা কথা বলে ঘরে ঢুকল অনাদি। মেমসায়েব বলল, "ওগুলো সব কিসের পুঁথি পড়ে দেখেছেন নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়েছি বইকি। খুব দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। বড় বড় সব যাগ-যজ্ঞের বিধিনিয়ম লেখা আছে ওই পুঁথিতে। পুরাকালে রাজারা সব যজ্ঞ করতেন, শুনেছেন নিশ্চয়ই।"

"কি, সেই জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ না রামচন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ?" মাধবী জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে রাজসূয় যজ্ঞ না হলেও পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কথা লেখা আছে। রাজা দশরথ ঐ যজ্ঞ করে রামচন্দ্রের মত পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন।"

"আপনি সে কথা বিশ্বাস করেন?"

"করি বই কি! রামায়ণ মহাভারত তো মিথ্যে হবার নয়।"

"আজকাল তাহলে কেউ করে না কেন?"

"এর হাঙ্গামা অনেক। তাছাড়া এসব পুঁথি পত্তর পাবে কোথায় লোকে? সেই জন্যে তো যত্ন করে রাখি। এর দাম দিতে পারে, এমন লোক আছে কোথায় বলুন না?"

"আপনি নিজে এ যজ্ঞ করতে পারেন?"

"আঁজ্ঞে করিনি তো কখনো। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"কেন বলছি বুঝতে পারছেন তো?"

"আঁজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারছি। নিজে থেকেই তো কত সময়ে বলব ভেবেছি। কিন্তু সাহস করে ছোট সায়েবের কাছে এ সব কথা তুলতে পারিনি। উনি তো বিশ্বাস করেন না।"

"সায়েব নিজেই তো বিশ্বাস।" হাসলেন মাধবী। "আর বেশি বিশ্বাস না করলেও চলবে। কি বল মঞ্জু?"

হেসে সায় দিলেন মেম সায়েব।

মাধবী আবার বললেন, "পুঁথিটুঁথিগুলো নামিয়ে একবার দেখবেন দেখি। যদি আপনার কপালগুণে তুক-তাক লেগে যায়। মোটা প্রণামী পাবেন।"

"আঁজ্ঞে প্রণামীর লোভ করব কেন। যদি সত্যি ওঁর কোলে সন্তান আসে, সে আনন্দটাই কি কম? তাছাড়া বাবার এতবড় সংগ্রহ সার্থক হবে। এই তো যথেষ্ট।"

নীরজা প্লেটে করে মিষ্টি আর গ্লাসে সরবৎ নিয়ে এল। খাবার দেখে দুজনেই আঁতকে উঠলেন। অনেক সাধাসাধির পর মিষ্টি ভেঙে দুজনেই একটু একটু মুখে দিলেন। সরবতের গ্লাসে চুমুক দিলেন একটু। তারপর উঠে পড়লেন। যাবার আগে মাধবী মনে করিয়ে দিলেন, "তাহলে পড়ে শুনে দেখবেন একটু, কেমন? আসছে রবিবার বিকেলে সায়েবের বাড়ি যাবেন, দেখা হবে।"

মঞ্জু বিশ্বাস বললেন, "আপনার ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন কিন্তু!"

বাপ ছেলে দুজনের মনেই কুকুরের ভয় ছিল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিল অনাদি। মালি কিম্বা বেয়ারা কাকে যেন দেখতে পেয়ে ডাক দিল, "ও ভাই, শুনছ। আমরা একটু ভেতরে যাব।"

"কাহে, কেয়া দরকার?" এগিয়ে এল লোকটি।

"মেম সায়েব ডেকেছেন, একটু খবর দাও। বলবে, অনাদি চাটুয্যে এসেছে।"

গেট খুলে ভেতরে ডাকল লোকটি। সেই কাঠের বেঞ্চে বসতে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে আয়া এসে ডাকল, "ভেতরে আসুন।"

সুদৃশ্য বসবার ঘরে কৌচের ওপরে আধশোয়া হয়ে রসেছিলেন মাধবী। মঞ্জু দাঁড়িয়ে ছিলেন ওদের অপেক্ষায়। নন্তুকে দেখে কোলে টেনে নিলেন। চুমো খেলেন নরম গালে। বললেন, "বসুন আপনি। আমি আসছি এখনি।"

উনি চলে যেতে মাধবী জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই সব পুঁথি পত্তর পড়েছিলেন?"

"আঁজ্ঞে হ্যাঁ, পড়েছি বইকি! যদি মনস্থ করেন, তাই কিছু কিছু টুকে এনেছি। "পকেট থেকে মস্ত একটা ফর্দ বার করে দেখতে লাগল অনাদি।

"টাকা পয়সা কি রকম খরচ হবে?"

"আজ্ঞে খুব বেশি একটা নয় ; হিসেব করে দেখেছি, শ-পাঁচেক টাকা হলে হয়ে যাবে।"

"তাহলে আপনি দিন ক্ষণ দেখুন।"

"তাও দেখে রেখেছি। একুশে ফাল্‌গুন, শুক্লা ত্রয়োদশী, পূর্বফাল্‌গুনী নক্ষত্র, দিবা এগারটা ষোলতে মাহেন্দ্রযোগ পড়ছে। যজ্ঞ আরম্ভের প্রশস্ত সময়। আর জনা দুই পণ্ডিত লাগবে। সে আমি ভাটপাড়া থেকে নিয়ে আসব। যজ্ঞের জিনিস-পত্রও সংগ্রহ করে আনতে পারব। এখন সায়েবের মত হলেই হয়।"

"সায়েবের মতের জন্যে ভাবতে হবে না। যজ্ঞ শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?"

"ঘণ্টা আষ্টেক লাগবার কথা। রাত আটটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, ধরে নিতে পারেন।"

নন্তুকে নিয়ে ফিরে এলেন মঞ্জু। পাউডার দিয়ে, চোখে কাজল দিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে নতুন করে এনেছেন। ওঁর দেওয়া সেই দামী স্যুট ছেলের গায়ে মানিয়েছে চমৎকার। শুধু অনাদি নয়, মাধবীও তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

"আপনার ছেলেটিকে আমায় দিন। আমি মানুষ করব।"

"সে তো আমাদের সৌভাগ্য মেমসায়েব। আমাদের ঘরে বাঁচিয়ে রাখাই শক্ত। আপনার দয়ায়, আপনার আশ্রয়ে সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে।"

"পরের শিশু মানুষ করে লাভ নেই মঞ্জু। চাটুয্যে মশাই ব্যবস্থা করছেন। তোমার

নিজের কোলে যাতে ওই রকম একটি আসে, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটু ধৈর্য ধর। ফাল্‌গুন মাসের কত তারিখ যেন বললেন?"

"আজ্ঞে একুশ তারিখ, ইংরেজি সাতই মার্চ।"

"তাহলে তো আর পনেরটা দিনও নেই।"

"তুমি কি সত্যিই সীরিয়াস?"

"নিশ্চয়ই। তোমার নিজের মনে কোন স্ক্রুপ্‌লস্‌-এর বালাই নেই আশা করি। আর মিষ্টার বিশ্বাসের কথা? তিনি না বিশ্বাস করেন, বয়ে গেল। ইউ রিকোয়্যার এ চাইল্ড অব ইওর ওন। এ দেশে, ওদেশে, সব দেশেই এর স্কোপ আছে। হোয়াই নট্‌ ট্রাই ইওর লাক?"

"আমি কিন্তু ঠিক মনস্থির করতে পারছি না।"

"সারা জীবনেও তুমি পারবে না। টেক ইট এ্যাস ইনভ্রভিটেবল্‌। শ-পাঁচেক টাকা খরচ লাগবে। তুমি আগে সেইটের ব্যবস্থা কর দেখি। তোমার ওরি করার কিছু নেই। আমি থাকছি তোমার কাছে সব সময়।"

আয়া খাবার দাবার নিয়ে এল। বিরাট থালায় করে নানা রকমের ফল, মিষ্টি খাবার। দেখে খুব অপ্রস্তুত হল অনাদি। "এত কি দিলেন বলুন তো? এত কি খেতে পারি?"

লজ্জা ও সঙ্কোচের নির্মোক খসে গেল মঞ্জুর মুখের ওপর থেকে। কর্ত্রীর কণ্ঠ ফুটে উঠল। "পারেন কি না পারেন ভাবতে হবে না। বসুন দেখি আগে। বাথরুমে চলে যান। হাত মুখ ধুয়ে আসুন।" বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন আয়াকে।

দুধ আর সন্দেশ নন্তুকে নিজে খাইয়ে দিলেন মঞ্জু। মাধবী গল্প করছিলেন অনাদির সঙ্গে। কথায় কথায় খাবাবের প্লেট শেষ হয়ে গেল। মঞ্জু উঠে গিয়ে আয়াকে নির্দেশ দিলেন! আরও খাবার নিয়ে এল সে।

"হাঁ হাঁ" করে প্লেটে দু-হাত চাপা দিল অনাদি। আয়া কি করবে ভেবে না পেয়ে কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। মঞ্জু উঠে পড়ে বললেন, "হাত সরান দেখি। আর দুটো সন্দেশ খুব খেতে পারবেন।" দুটোর বদলে বড় বড় চারটে সন্দেশ পাতে দিলেন তিনি।

খাওয়ার শেষে ওঠবার মুখে মাধবী বললেন, "আপনি একটু বসুন। মঞ্জু, শুনে যাও তো।" চলে গেলেন দুজনে ঘর ছেড়ে। নন্তু বাপের কাছে চলে এল।

ফিরে এসে গুনে গুনে পাঁচখানা একশো টাকার নোট দিলেন মাধবী অনাদির প্রসারিত হাতে, বললেন, "আপনি সব ব্যবস্থা করুন। দিন ক্ষণ সব ঠিক আছে। আর কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে আমাকে এইখানে ফোন করবেন।" নিজের ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটি কার্ড বার করে দিলেন তিনি অনাদিকে। "এদের আর বিরক্ত করার দরকার নেই। তাছাড়া আমি হয়ত আর একদিন ইতিমধ্যে আপনার ওখানে যেতে পারিও বা। আচ্ছা, আজ রাত হয়ে যাচ্ছে। আসুন আপনি।"

দুর্মূল্য দামী খাবারে পেট ভরা থাকলেও ঠিক পরিতৃপ্ত মনে ফিরতে পারল না অনাদি। পকেটে পাঁচশো টাকা। কিন্তু মনে দুশ্চিন্তার অবধি নেই। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা করা কি সোজা কথা? প্রাণ গেলেও মেমসায়েবকে ঠকাতে পারবে না সে। আজকের দিনে সব উপকরণ জোগাড় করা কি সহজ কথা? কত জিনিস চেনে না সে। ভাট্‌পাড়ায় তার শ্বশুরকুলের ঘনিষ্ঠ জন দুই নাম করা পণ্ডিত আছেন। তাঁদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেতে পারবে সে। টাকাও যথেষ্ট দিয়েছেন উনি। তবু সবই ভগবানের হাতে। নারায়ণ নিজে প্রসন্ন না হলে সাধ্য কি তার সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ সমাধা করে?

হে ঈশ্বর! হে মা ষষ্টি! হে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী! আমি অর্বাচীন গরীব ব্রাহ্মণ। পেটেব দায়ে, লোভে পড়ে, অন্নদাত্রী মেমসায়েবকে সন্তানের আশা দিয়েছি। আমার

অপরাধের সীমা নেই। কিন্তু ওই মেয়েটির তো কোন দোষ নেই। মা হবার জন্য তার আকুলতার কি শেষ আছে? তাকে তোমরা দয়া কর। নীরজা মূর্খ মেয়েমানুষ। স্বামীর ওপরে তার অনেক ভরসা। ধারণা, স্বামী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করলেই মেমসায়েব সন্তানবতী হতে পারবে। সে তো জানে না, কি অন্যায়ভাবে ওঁদের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে অনাদি!

৬

দিন কয়েক পরে অনাদির ডাক পড়ল সায়েবের ঘরে। মা কালীকে মনে মনে সহস্র প্রণাম জানিয়ে সায়েবের ঘরে গেল সে।

"আপনি মেমসায়েবকে কি সব ভুজুং ভাজুং দিয়েছেন?"

"আজ্ঞে", কথা শেষ করতে পারল না অনাদি।

"কি সব যজ্ঞ টজ্ঞ করার নাকি ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম? চুরিতে তো হাত পাকিয়েছেন। এবারে কি জোচ্চুরির ব্যবসা ধরেছেন? জানেন, চিট্ করার জন্যে জেলে দিতে পারি আপনাকে?"

বলির পাঁঠার মত কাঁপতে থাকল অনাদি।

"আমি অনেক সহ্য করেছি মনে রাখবেন। কিন্তু আর নয়। আজই গিয়ে বলে আসবেন, ওসব যজ্ঞ টজ্ঞ করা চলবে না। ডাক্তারের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করে যা সম্ভব হল না, উনি বুজরুকি করে তাই সম্ভব করবেন। আজই গিয়ে বলে আসবেন। বুঝেছেন?"

মাথা নিচু করে সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচল অনাদি।

ডিপার্টমেন্টে অনেকেই উৎসুক হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা কি।

যতটা সম্ভব সংক্ষেপে, টাকার প্রসঙ্গ না তুলে, ব্যাপারটা বলতে হল। সকলে আর একদফা গালাগালি করল তাকে। মিত্তির মশাই বললেন, "তাঁত বুনে খাচ্ছ, এই ঢের। আবার এঁড়ে গরুর বায়না ধরতে যাচ্ছ কোন্ আক্কেলে? তারপর সামলাবে কিসে শুনি? সায়েবের বাপ হবার ক্ষমতা নেই। মনে রেখ।"

সন্ধ্যাবেলা সায়েবের বাড়ি গিয়ে টাকা ফিরিয়ে দিতে চাইল অনাদি।

সমস্ত শুনে মাধবীকে ফোন করলেন মেমসায়েব।

কথাবার্তা শেষ করে বললেন, "আপনি সব যোগাড় যন্ত্র করতে থাকুন। টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে না। সায়েবের সঙ্গে যা কথা বলার আমরা বলব।"

ছুঁচো গেলা সাপের মত অস্বস্তিতে দিন কাটতে থাকল অনাদির।

আরও কয়েকদিন পরে সন্ধ্যের দিকে এলেন মেমসায়েব তাদের বাড়ি। সঙ্গে নিয়ে এলেন বান্ধবীকে। বললেন, "আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। যাতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ঠিকমত হয় সেই দিকটা আপনি দেখুন। যদি কয়েকদিনের জন্যে ছুটির দরকার হয়, বলুন। সায়েবকে দিয়ে ছুটি স্যাঙ্কসান করিয়ে দিই।"

"আজ্ঞে, ছুটি না পেলে তো সব সংগ্রহ করা খুবই মুস্কিল। কিন্তু সায়েব যে রকম রেগে আছেন--"

"সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না! কদিন ছুটি দরকার আপনার?"

"আজ্ঞে দিন চারেক হলেই যথেষ্ট। একুশে ফাল্গুন শনিবার যজ্ঞ হচ্ছে। তাহলে বুধবার থেকে ছুটি পেলেই যথেষ্ট হবে।"

'আচ্ছা, তাই হবে। আপনি মাধবীর সঙ্গে গল্প করুন। আমি আপনার গিন্নীর সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি।"

মেমসায়েব রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। মাধবী এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায়

বললেন, "আপনি কিছু ভয় পাবেন না। ব্যবস্থা যতটা সম্ভব করে যান, তারপর ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেবেন। শুধু মনে বিশ্বাস রাখবেন, মেমসায়েবের একটি সন্তান যদি ভগবান দেন, সে হবে আপনারই দান। আপনার ওপরেই ভরসা রেখে অপেক্ষা করে আছি আমরা। আর, এই নিয়ে কারো সঙ্গে, এমনকি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পর্যন্ত, কোন কথা বলবেন না। আমাদের সঙ্গে যে কথাবার্তা হচ্ছে, যা কিছু আপনি করছেন বা করবেন, এ শুধু আমাদের তিনজনের মধ্যেই থাক। বাইরের কারো জানার দরকার নেই। আপনার যজ্ঞ যদি সার্থক হয়, যদি সত্যি ছেলেপুলে হয় মঞ্জুর, মোটা টাকা বকশিশ পাবেন আপনি। না হলে আপনার কোন দায় নেই। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এসব কথা তৃতীয় ব্যক্তির কানে গেলে আপনার চাকরি রাখা দুষ্কর হবে। এমনকি আপনাকে আরও শাস্তি পেতে হতেও পারে। মনে রাখবেন, আপনার মেম সায়েবের সম্মান, সম্ভ্রম, সব নির্ভর করছে গোপনতার উপরে। আপনি যজ্ঞ করতে যাচ্ছেন, এটা সবাই জানে। সেটা কিছু গোপন কথা নয়। কিন্তু তার বেশি কিছু যেন কেউ না জানে। বুঝলেন?

অনাদি ঠিক বুঝল না ব্যাপারটা। বলল, "এর মধ্যে গোপন করার তো কিছু নেই। আগেকার কালে রাজা রাজড়ারা তো অনেকই এই ধরনের যজ্ঞ করতেন।"

"দেখুন, আগেকার কালে কে কি করত, তা নিয়ে আজকের দিনের লোক মাথা ঘামায় না। এসব ব্যাপারে লোকের বিশ্বাস নেই, বোঝেন তো? আপনাদের সায়েব তো বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেন। যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্রের ওপরে হাড়ে চটা। কাজেই, দরকার কি এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার?"

"আজ্ঞে সে তো বটেই।" সায় দিল অনাদি।

"ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তো? হ্যাঁ, ভাল কথা। আর আপনার কিছু টাকাকড়ির দরকার নেই তো? মনে রাখবেন, যজ্ঞের ব্যবস্থার যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

"আজ্ঞে সে আমাকে বলতে হবে না। ইতিমধ্যে আমি ভাট্‌পাড়ায় চিঠি দিয়ে দিয়েছি। দু-এক দিনের মধ্যেই উত্তর পেয়ে যাব বলে মনে হয়। বুধবার ছুটি পেলে সকালেই যাব ওখানে।"

"হ্যাঁ, ছুটির ব্যবস্থা হয়ে যাবেখন। সে জন্যে চিন্তা নেই।"

৭

সত্যি ছুটি নিয়ে কোন হাঙ্গামা হল না।

কাশীনাথ বাবু ডেকে বললেন, "তুমি সায়েবের কাছে ছুটির দরখাস্ত দিয়েছিলে নাকি হে অনাদি?"

কাজ করতে করতে সায়েবের কথা কানে যেতে ঘাবড়ে গেল অনাদি। বলল, "কেন বলুন তো?"

"তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। সায়েব আমাকে ডেকে বললেন, অনাদি বাবু যদি ছুটি চায়, দিন চারেক ছুটি দেবেন। ছুটি নিচ্ছ কেন হে?"

"একটু দরকার আছে দাদা। তাহলে ছুটি মঞ্জুর করেছেন সায়েব?"

"করেছেন বলেই তো বলছি। কবে থেকে ছুটি নেবে?"

"পরশু বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত।"

"আচ্ছা। আবার দেখি, বড়বাবুকে বলি, কাকেও তোমার জায়গায় পাওয়া যায় কি না!"

ছুটি পেয়ে ভাটপাড়া ছুটল অনাদি। ওর মামাশ্বশুর বুড়ো মানুষ। পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তো শুনে থেকেই অস্থির। "বল কি হে বাবাজি! পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে যাচ্ছ? বলি, নিজেকে

কি হঠাৎ বশিষ্ঠ মুনি ঠাউরে বসেছ নাকি?"

ব্যাপারটার সম্পূর্ণ না হলেও খানিকটা আভাস দিল অনাদি।

ভদ্রলোক চোখ বুঁজে বললেন, "বড় লোকের পয়সা খসাতে চাও সে আলাদা কথা। আজকাল সবাই জোচ্চুরি ব্যবসা ধরেছে। তাই বলে একেবারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ! এ যে আমরা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না বাবাজি। আমি বাপু বুড়ো মানুষ। ওসব হাঙ্গামা পোষাবে না। তাছাড়া, তোমার বাবা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কোথা থেকে কি যজ্ঞপদ্ধতি সংগ্রহ করে গেছেন, বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন। আমরা নেহাৎ গরীব ব্রাহ্মণ। সাধারণ পূজো-আর্চা করে পেট চালাই। ওসব ঘোড়া রোগের বালাই কি আমাদের সাজে?"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল অনাদি। মামাশ্বশুরের ওপরেই বিশেষ ভরসা ছিল তার। এখন ওঁর কথা শুনে চোখে অন্ধকার দেখল সে।

মামতো শালা রাজীব আচার্যি একেলে মানুষ। সব শুনে টুনে বলল, "আপনি ঘাবড়াবেন না দাদাবাবু। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ তো কোন্ ছার, পয়সা খরচ করতে পারলে রাজসূয় যজ্ঞঅবধি করে দিতে পারি। কি রকম খরচ করবে আপনার যজমান?"

"পাঁচশো টাকা দিয়েছেন। বলেছেন লাগলে আরো দেবেন।"

"আরে দূর! পাঁচশো টাকায় বারোয়ারী দুগ্‌গা পূজো হয় না, আপনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে চাইছেন? ওই জন্যেই তো কিছু হল না আপনার। টাকাটা হাজারে তুলুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"না, ভাই। ওঁদের সঙ্গে আমার ওরকম টানামানির সম্পর্ক নয়।"

"তাহলে আর কি করা যাবে। ওই টাকাতেই ব্যবস্থা করতে হয়। তবে একটু খাটো হবে বলে রাখছি।"

"যজ্ঞের ব্যবস্থা নিয়ে ওঁরা মাথা ঘামাবেন না। ওঁদের চাই একটি সন্তান।"

"সে তো দত্তক নিলেই চুকে যায়।"

"নিজের সন্তান আর দত্তক কি একই হল? টাকা পয়সার অভাব নেই, অভাব শুধু ভোগ করবার লোকের।"

"তালই মশায়ের পুঁথি পত্তর সব এনেছেন?"

"পুরোনো পুঁথি টানাটানি করতে গেলে গুঁড়িয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, শুধু পুঁথিগত বিদ্যে হলেই তো হবে না! ব্যবস্থা তো করতে হবে?"

"সেই জন্যেই তো আসা। তুমি চল ভাই আমার ওখানে। ক'টা দিন থাকবে। এই দায় থেকে উদ্ধার করে দাও ভাই, তোমাকে খুশি করে দেব।"

"চলুন। দেখা যাক কতদূর কি করা যায়।"

কথাটা চাপা থাকবার বদলে কি করে যে এমন চাউর হয়ে গেল কে জানে। সকাল থেকে টেলিফোন বেজে বেজে সারা। কলকাতায় কেউ আর জানতে বাকি নেই বোধ হল। গজানন বিশ্বাস কখনো বিরক্ত, কখনো অপমানিত কখনো প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন। আফিসে ফোন, বাড়িতে ফোন, সকল সময় সব জায়গায় থেকে জিজ্ঞাসা। ইতিমধ্যে এক কাগজের রিপোর্টার মজার খবর হিসেবে ছোট কয়েক লাইনের একটি সংবাদ কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিল। তারই গন্ধে মাছির মত অন্যান্য কাগজের রিপোর্টাররা বাড়ি এসে সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকল।

রাজিব, অনাদি এবং অনাদির আরও দুইশালা বিচিত্র সব উপকরণ সংগ্রহ করতে লাগল যজ্ঞের জন্য। প্রকাণ্ড হল ঘর হোমের জন্য, যজ্ঞের আহুতির জন্য ফায়ার ব্রিকস্ লাইনিং দিয়ে যজ্ঞকুণ্ড তৈরী হল। চারিধারে গ্যালারি সাজিয়ে দিয়ে গেল ডেকরেটর। পরিচিত ও মাননীয় অতিথিরা যজ্ঞ দেখবেন। উৎসবে রাজপুরুষ ও বিখ্যাত ব্যক্তি কাদের নিমন্ত্রণ

করতে হবে, সেই নিয়ে বিশ্বাস দম্পতির মধ্যে কলহ হয়ে গেল। গজানন বিশ্বাস প্রথমে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষে লোক মুখে, খবরের কাগজে এবং আরও নানা ভাবে জিনিসটা এতখানি প্রাধান্য পেয়ে গেল যে হঠাৎ যেন নিজেকে রাজা দশরথ বলে মনে হতে থাকল তাঁর। ওঁদের ক্লাবের ধনকুবের বন্ধুরা পানীয়ের আসরে এই নিয়ে তামাসা করলে তিনি সনাতন ধর্ম ও প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের স্বপক্ষে এমনই এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন যে বন্ধুরা হাঁ করে রইলেন। নেশাগ্রস্ত মাথায় হঠাৎ তাঁদের মনে হল, যে গজু বিশ্বাসকে তাঁরা ফুর্তির আসরে কোন বিশেষ মূল্য এতদিন দেননি, তিনি আসলে শাপভ্রষ্ট দৈব প্রেরিত পুরুষ। ওঁর যে সন্তান হয়নি, সেটা শুধু পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রত্যক্ষ ফলাফল বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করার প্রয়োজনেই।

অবশেষে শুভদিনে মহাধুমধাম করে যজ্ঞ শুরু হল। বিশ্বাস লজের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল গাড়ির সারি। নহবৎ বাজল সকাল থেকে। মঞ্জু বিশ্বাসের বান্ধবীরা এলেন বিচিত্র সজ্জায় ভূষিত হয়ে তামাসা দেখতে। কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এলেন, অফিসের বাবুরা এলেন, এলেন বিশ্বাসদের আত্মীয়-স্বজন। দীয়তাং ভুজ্যতাং খুব সমারোহের সঙ্গেই হল। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা হলঘরে পট্টবস্ত্রভূষিত বিশ্বাসদম্পতির যজ্ঞে আহুতি দানের ছবি নিলেন ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বালিয়ে। তারপর একসময়ে শেষ হল যজ্ঞ। চরু প্রস্তুত হল। স্ত্রীকে সেই চরু খাইয়ে ঝামেলা থেকে মুক্তি পেলেন গজানন বিশ্বাস।

ব্রাহ্মণদের পরিতৃপ্ত করে ভোজন করালেন মঞ্জু বিশ্বাস। গরদের জোড় উপহার দিলেন প্রত্যেককে। গিনি দিয়ে প্রণাম করলেন। বললেন, "আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

খুশি মনে আশীর্বাদ করে যাওয়ার পথে পা বাড়ালেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা। মাধবী ডাক দিলেন অনাদিকে। "আগামী কাল সন্ধ্যেবেলা একবার আসবেন অনাদিবাবু। কি রকম কি খরচ-টরচ হল, একটু হিসেব রাখা দরকার না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমি কাল সন্ধ্যেবেলায় সব বুঝিয়ে দিয়ে যাবখন?"

"আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন আপনারা। মঞ্জু বড় পরিশ্রান্ত। ওর একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" বলে পুঁটলি গুছিয়ে উঠে পড়লেন তাঁরা।

৮

হিসেব মত শ-চারেক টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু এদিকে ওদিকে খরচ হয়েছিল বাকি টাকার মোটা অংশ। দুই শালাকে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল। আর সব পাওনা গণ্ডা মিলিয়ে একরকম সন্তুষ্ট হয়েই চলে গেছে তারা। নিজে এক ভাগ দক্ষিণা ধরলে হিসেবটা প্রায় মিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সঙ্কোচ লাগে অত্যন্ত। অনেক টাকা দিয়েছেন ওঁরা এযাবৎ। প্রচণ্ড অভাবের গর্ত থেকে টেনে তুলেছেন সচ্ছলতার শক্ত মাটিতে। হাসি ফুটছে ছেলেমেয়েদের মুখে, গায়ে উঠেছে নতুন জামা-কাপড়। সুখাদ্যে তৃপ্ত হয়েছে রসনা। এখন অন্যায় ভাবে যদি ওঁদের টাকায় ভাগ বসায় সে, ভগবান বিরূপ হবেন।

সুতরাং ঘাটতিটা পূরণ করবে কি করে, সেই দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না অনাদির চোখে।

মেয়েদের কাছে গল্প শুনছিল নীরজা। শিশু মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতে ছিল সে। বিপুল সমারোহের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনছিল সে। একসময়ে খেয়াল হল, পাশের ঘরে মানুষটা যেন উশখুশ করছে। মেয়েদের বলল, "তোরা ঘুমো আমি একটু ওঁকে দেখে আসি। সারাদিন এত পরিশ্রম গেল, একটু গা-হাত পা টিপে না দিলে ঘুমোতে পারবে না।

কিন্তু সেবা যত্নের প্রয়োজন অনুভব করছিল না অনাদি। মনের উদ্বেগ সুস্থির থাকতে দিচ্ছিল না তাকে। স্ত্রীকে কাছে পেয়ে মনের ভার লাঘব করতে চেষ্টা করল সে।

সব শুনে অভয় দিল নীরজা। বলল, "কিছু ভেব না তুমি। আমি যতটা বুঝেছি, সামান্য কটা টাকার জন্যে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে যাবেন না তিনি। আসল কাজ যদি হয়, তাহলেই সব সার্থক হবে।"

হাসল অনাদি। বলল, "ভগবানের হাত বলতে গেলেই ছোট সায়েবের কথা মনে পড়ে যায়। আমার ওপরে রাগ করে বলেছিলেন, ভগবানের হাত ঠুঁটো করে দিতে পারেন নি? ভগবানের হাত ঠুঁটো হলে কত যে দুঃখ, সে উনি জানবেন কি করে? ওঁকে তো আর মেমসায়েবের মত পুড়তে হচ্ছে না।"

নীরজা বলল, "ডাক্তার দেখিয়ে ছিলেন কত খরচ করে। মেমসায়েবের কোন খুঁত নেই। হয়ত দোষ আছে সায়েবের। বড় লোকের ছেলে। কত রকম দোষ থাকতে পারে। এখন যাগ-যজ্ঞ করে যদি দোষ ধুয়ে যায় তো তোমারই কৃতিত্ব। হয়ত তোমার ওপরে প্রসন্ন হতেও পারেন।"

"সবই তাঁর ইচ্ছা।" বলে পাশ ফিরে ঘুমোতে চেষ্টা করল অনাদি।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা দুরু দুরু বুকে সায়েবের বাড়ি গেল অনাদি। উৎসব শেষে হতশ্রী রূপ সারা বাড়ির। লনের ওপরে প্যাণ্ডাল খাটানো হয়েছিল। খাঁখাঁ করছিল সেটা। ঘর দুয়োর তখনো পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি।

খবর দিতে ডেকে পাঠালেন মেমসায়েব। দোতালার ঘরে গল্প করছিলেন বান্ধবী মাধবীর সঙ্গে। ওকে দেখে চোখে চোখে ইসারা হল দুজনের। হেসে উঠলেন মাধবী। রাঙা হয়ে গেলেন মঞ্জু বিশ্বাস।

"কি? কাজ কর্ম তো সব চুকে বুকে গেল।" বললেন মাধবী। "এখন বুঝছেন কি রকম? আপনার যজ্ঞের কাজ কিরকম হবে আশা করেন?"

"আঁজ্ঞে, শাস্ত্রে আছে ফলেন পরিচীয়তে।"

"সে তো বটেই। ফলের আশাতেই এত ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পোহানো গেল। আপনার টাকাকড়ি কম পড়েনি তো?"

"সে কি কথা! বরং বেশিই দিয়েছেন আপনারা। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কিসের?"

"আজ্ঞে হিসেব একটা করে এনেছি। দেখা যাচ্ছে আমার কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা থাকবার কথা। কিন্তু কিসে যে খরচ হয়ে গেল—"

"আবার তহবিল তছরূপ? নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। একবার এই কাণ্ড করে চাকরি খোয়াতে বসেছিলেন—"

"যাকগে," বাধা দিলেন মেমসায়েব। "হিসেব আর আপনাকে দিতে হবে না। ওই কটা টাকা আপনার দক্ষিণে বলে ধরে নেবেন।"

"আজ্ঞে আপনার দয়া।" হাত কচলাতে থাকল অনাদি।

"সেকথা মনে রাখবেন।" মাধবীর কথায় রহস্যের সুর বাজলেও ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না অনাদি। "সব কিছু আপনার যজ্ঞের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে।"

"আজ্ঞে, জ্ঞান বিশ্বাস মত অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি রাখিনি। এখন ভগবানের হাত।"

"আবার ভগবানের হাত কেন? আপনি নিজেই তো করিৎকর্মা পুরুষ!"

"আমি সামান্য মানুষ। আমার কতটুকু ক্ষমতা।"

"আপনার সেই সামান্য ক্ষমতাটুকুই কাজে লাগান এবার। চোখের সামনে দেখলেন *তো, হাজারে হাজারে টাকা খরচ হয়ে গেল, কোন ব্যাপারে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি মঞ্জু।*

সবাই অবাক হয়ে গেছে। আপনার ওপরে কতখানি বিশ্বাস থাকলে তবে এতটা করতে পারে ভাবুন দেখি? এখন সব যদি ভস্মে ঘি ঢালা হয়, লোকে হাসবে। ওর অবস্থাটা তখন কি হবে বলুন? আপনাদের সায়েব আর কি আপনাকে ক্ষমা করবেন?"

"আজ্ঞে আমি দিন রাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—"

"আজকাল আর শুধু প্রার্থনায় কিছু হয় না অনাদিবাবু। সব জায়গাতেই ঘুষ দিতে হয়। কলি-যুগে সন্তানের জন্যে কেবল যাগ যজ্ঞের ওপরে নির্ভর করলে চলে না। তুক্‌তাক্ দরকার হয় বুঝলেন?"

"আজ্ঞে, তুকতাকের ব্যাপার তো আমি ঠিক জানি না। তবে আমার স্ত্রী হয়ত কিছু জানলেও জানতে পারে। কিন্তু সেও তো শুনি সব সময়ে খাটে না।"

"তাহলে যা খাটে, যা একেবারে অব্যর্থ, এই রকম কিছুর ব্যবস্থা করুন। অনেক পেয়েছেন আপনি। ভবিষ্যতে আরও পাবেন। এবারে ও যাতে একটি সন্তান পায়, তার ব্যবস্থা করুন।"

"আজ্ঞে সেই জন্যেই তো এতবড় পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হল।"

"ছাই হল। বললাম তো, আজকাল আর শুধু যাগ যজ্ঞে কাজ হয় না। আপনি তো আচ্ছা মানুষ দেখি। এতখানি বয়স হল, সাত সাতটা ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছেন। এখনো আপনাকে শেখাতে হবে, কিসে কি হয়?"

উঠে পড়লেন মাধবী। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাবার সময়ে বললেন, "আমি অনাদিবাবুর খাবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও মঞ্জু।"

[পূজো সংখ্যা নয়' : ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩]



—না, আজ চকোলেট চাই না, আজ আমি তোমাদের গল্প শুনবো-

অম্ল মধুর

শ্রীহীন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমীপেষু–

সম্প্রতি একটি সাপ্তাহিকের ১৬ই আগস্টের (স্মরণীয় ১৬ই আগষ্ট!) সংখ্যায় চিঠির বয়ানে আপনার একটি প্রবন্ধ নজরে এলো। আপনি হয়তো বলবেন, এ-টা প্রবন্ধ নয়, চিঠিই। এ-টা আপনার পক্ষে বলা খুব-ই স্বাভাবিক। কারণ আমার মতো আপনিও জানেন যে, আপনার কলমে প্রবন্ধ তেমন আসে না। এবং প্রবন্ধের কাঠামো সম্বন্ধে আপনার তেমন কোনো ধারণা নেই। 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হিসেবী অর্থাৎ সমালোচক আমি নই'—এ-টা যে বিন্দুমাত্র আপনার বিনয় নয়, বরং স্বীকৃতি এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আপনিও জানেন সমালোচনা কাজটা খুব সহজ নয়। চিঠিতে একজনের নিন্দে বা ব্যাজস্তুতি এবং আর একজনের পিঠচোলকানো খুব সহজ এবং কম দায়িত্বপূর্ণ। আপনি সহজ পথটাকেই বেছে নিয়েছেন, কারণ পদটা নিরাপদও বটে! তবে যার উদ্দেশ্যে চিঠিটি আপনি অস্থির মস্তিষ্কে রচনা করেছেন, সেই 'মণীন্দ্র' ব্যক্তিটি কে, সাধারণ পাঠকের অবজ্ঞাতার্থে (বিশেষ করে পাঠিকাদের। কারণ নবকল্লোল এবং আপনার বর্তমান লেখার পাঠকের তুলনায় পাঠিকার সংখ্যা-ই বেশী। এবং আপনার অধুনাকালে রচিত বই-এর মলাটে অর্থাৎ প্রকাশকদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ললাটে এবং নবকল্লোলের ছাপাখানার আদিযুগের ইম্প্রেসন বহনকারী কভারে 'লেডিস ওনলি' কথাগুলো লিখে দিলে ও দুটির কাটতি বাড়বে বই কমবে না) সম্পাদকের উচিত ছিলো তাঁর পরিচয় ফুট নোটে প্রকাশ করা। কারণ সাধারণ পাঠক ভাবতে পারেন, অনায়াসেই ভাবতে পারেন যে, কে একজন 'মণীন্দ্র'কে লেখা আপনার প্রলাপোক্তি অমৃতে প্রকাশ করার জন্যে—সম্পাদকের এতো মাথা-ব্যথা কেন! সম্পাদক যদি মনে ভেবে থাকেন যে 'মণীন্দ্র' বলতে লোকে সদ্য পশ্চিম জার্মানী ফেরৎ কবি মণীন্দ্র রায়কেই বোঝে ; তবে বলবো তিনি ভুল করেছেন। কারণ সাধারণ পাঠক অনেক খবরই রাখনে না। ক'জন লোক জানে যে জার্মানী ফেরৎ কবি মণীন্দ্র রায় পশ্চিম জার্মানী থেকে দুটি ভালো কলম এনেছিলেন, যার একটিকে নিবেদন করেছেন সাপ্তাহিক অমৃতের লায়ন্স্ শেয়ার হোল্ডার তুষার কান্তি বাবুর করকমলে, অপরটি সুধীর সরকার মশায়ের করকমলে [অবিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ]। অন্ততঃ আমি তো জানি না মশাই।

অবশ্য প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, অমৃতে আমার অরুচি। সাপ্তাহিক অমৃতেও।

আপনি বলেছেন, আপনি নিজে একজন চাষী (সাহিত্যের ক্ষেত্রে)? "এ কাজ আমার নয়। তবু মনে মনে কিছু কিছু হিসেব করি বইকি। বারো মাস-ই করি। ১৫ই আগষ্ট বেশী করে করি। শুধু সাহিত্য নিয়েই করি না, সব কিছু নিয়েই করি।"

বেশ কথা শোনালেন তারাশঙ্করবাবু! হিসেব সকলেই কষে। দাঁড়ে বসে হিসেব করে এমন বহু বুদ্ধি লোচন ময়নার খবর আমার জানা আছে। জিবে তুলসী পাতা রেখে গলায় রক্ত ঢালে এমন হরিনাম ভক্ত কুমীরের কথাও অজানা নেই। কিন্তু আপনি তো গ্রামের লোক তারাশঙ্করবাবু, গ্রামের সংগে আপনার নাড়ীর যোগ রয়েছে। আপনি তো ভালো করেই জানেন যে, একজন সচ্চাষী প্রথমে নিজের খামারের হিসেব করে। কিন্তু যেহেতু

জমিদারী উঠে গেছে (তাই বলে জমিদাররা উঠে যায়নি। সাহিত্যকে নিজেদের জমিদারী ভেবে অনেকেই এখনও প্রকাশ্য দিবালোকে নায়েব-গোমস্তা মার্কা কাগজের সম্পাদক এবং প্রকাশকদের ওপর যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা করছে), এবং 'সুমার' বলে যে পর্ব ছিল তা-ও উঠে গেছে ; সুতরাং চাষীদের আর নিজের উৎপন্ন ফসলের হিসেব করতে হয় না বলে তো শুনিনি মশাই!

তবু হিসেব আপনি করেন, বারো মাস-ই করেন। কারণ হিসেব আপনাকে করতেই হয়। হিসেব আপনাকে করতেই হবে। ওপরে ওঠার সিঁড়ির নাগাল আপনি পেয়েছেন, চার পাশের অনেককে পাশ কাটিয়ে, অনেককে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে দূরে সরিয়ে, হিসেব করে আপনাকে পা ফেলতে হবে বৈ কি। আর সে হিসেব শুধু সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে কেন! সে হিসেব করবে তারা,—আপনার ভাষায় যারা সাহিত্যের চাষী নিতান্তই সচ্চাষী। আপনাকে সমস্ত কিছু নিয়েই হিসেব করতে হবে—খেতাব থেকে পুরস্কার ; পুরস্কার থেকে প্রতিপত্তি ; বাংলা থেকে দিল্লী ; অনেক দূর পাল্লার পথের হিসেব আপনাকে করতে হবে বৈ কি! চাষের ভূমি যার অনুর্বর, সার্থক উৎপাদন যেখানে অপ্রচুর ; অথচ জীবনের সীমাহীন পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার উদগ্র বাসনা যেখানে সক্রিয়, সেখানে সাহিত্য ছাড়াও অন্য অনেক কিছুর হিসেব করাটা যে অনিবার্য হয়ে পড়বে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই প্রসংগে আর একজনের কথা ভয়ানক বেশী করে মনে পড়ছে আমার। যে ভদ্রলোক জীবনে সাহিত্য ছাড়া আর কিছু ভাবেন নি, সাহিত্যের সেবা করার জন্যে জীবনের অনেক ক্ষয়, অনেক ক্ষতিকে যিনি হাসি মুখে বরণ করলেন, সেই বিভূতিভূষণের কথা ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে না হয়ে পারছে না। অথচ ইচ্ছে করলেই যিনি জীবনের অন্য অনেক পথের বিচিত্রতর হিসেব করে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন সরস্বতীর একনিষ্ঠ পূজারী। সাহিত্যিকের স্বধর্ম থেকে একদিনের জন্যেও তিনি বিচ্যুত হননি। বাংলা সাহিত্য যতোদিন থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পর যে নামটি প্রথমেই উচ্চারিত হবে তন্নিষ্ঠ সাহিত্য পাঠকের কণ্ঠে, সে-নাম বিভূতিভূষণের। জীবনে সাহিত্য ছাড়া আর কিছু করার প্রয়োজন বোধ করেন নি যিনি।

এ লেখা পড়ে যদি কোনো পাঠকের মনে হয় ধান ভানতে শিবের গাজন অর্থাৎ তারাশঙ্করের প্রসংগে আমি বিভূতিভূষণকে আনলুম কেন, তবে তার উত্তর আমি বারান্তরে দেবো। আত্মপ্রচার বিমুখ বিভূতিভূষণকে আমি অপ্রয়োজনে আনিনি এখানে।

তারপর-ই আপনার প্রবন্ধে, না প্রবন্ধে নয় চিঠিতে, এ কালের সার্থক গ্রন্থের উল্লেখ এবং প্রয়োজন বোধে তাদের বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করেছেন। আপনার কলমে প্রথম উল্লিখিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন প্রমথনাথ বিশী। সম্প্রতি যিনি কংগ্রেসী এম এল সি হয়েছেন। বিশী মশাই একাধারে কবি ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, ছোট গল্পকার, সমালোচক, অধ্যাপক, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত সমস্ত বই-এর অথরিটি এবং এম এল সি। এর পরেও তিনি যা, তা হলেন আনন্দবাজারীয় কালামিস্ট্। আমার বিশ্বাস একসঙ্গে এতগুলো দিকের নজর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি যা হলেন,—কখনও তিনি তা হতে চান নি। কিন্তু থাক, বিশী প্রসঙ্গ থাক, বিশীর সংগে আপনার অন্য সম্পর্ক যে সম্পর্ক যুগান্তর এবং আনন্দবাজার এই দুই কাগজের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক কলহের ঊর্ধ্বে। আপনারা দুজনেই কংগ্রেসের অনুকম্পায় নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

এর পরেই আপনি দৃষ্টি দিয়েছেন বিমল মিত্রের ওপর। বিমল মিত্রের বর্তমান জনপ্রিয়তা আপনার চেয়ে অনেক বেশী। এ কথা আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন, কালের কষ্টি পাথরে ঘষিত হয়ে কোন্ সাহিত্য চিরন্তন সাহিতের মর্যাদায় ভূষিত হবে, সে বিচার করবে

কাল। মহাকাল। যে কাল চটকদারী বিজ্ঞাপন কিম্বা সোচ্চার আত্মপ্রচারে কর্ণপাত করে না। গ্রাহ্য করে না বয়োজ্যেষ্ঠ বলেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর শূন্যগর্ভ অহংকারকে। এ প্রসংগে একটা কথা আমি স্বীকার করছি আপনার অবগতির জন্যে। আপনার 'কবি' এবং 'পঞ্চগ্রাম' আমি পড়েছি যথাক্রমে ৬২ বার এবং ৪৯৪ বার। এবং যতবার পড়েছি, ততোবারই এ দুটি বই-এর লেখকের উদ্দেশ্যে জানিয়েছি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। আমার এ স্বতঃস্ফূর্ত সশ্রদ্ধ নমস্কারের মূল্য যে কতোখানি তা' আজ আপনি বুঝতে পারবেন না। আর এ কথাও ঠিক যে ব্যবসায়ী গজেন মিত্তির কোনো রচনাকে 'ক্লাসিক' বলে বিজ্ঞাপিত করলেই সে জিনিস ক্লাসিক হবে না। ক্লাসিক সাহিত্য কেউ রচনা করে না, কালের বিচারে তা ক্লাসিকে পরিণত হয়। সেক্সপীয়র বা শরৎচন্দ্র যখন লিখছিলেন তখন তাঁরা কেউই জানতেন না যে, তাঁদের সাহিত্য ক্লাসিক সাহিত্যের মর্য্যাদায় ভূষিত হবে। বিজ্ঞাপন একটা আর্ট হতে পারে, কিন্তু নির্বুদ্ধিতা কোনো মতেই নয়, এই সাধারণ কথাটা লেখক-কাম-প্রকাশকদের নিরেট মাথায় কেন ঢুকছে না বুঝছি না। আর, কোনো পুরস্কার দিয়ে কারোকে সম্মানিত করা হলে এবং সেই লেখককে যদি 'অমুক' পুরস্কার বিজয়ী বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়, তাহলে যে লেখককে প্রকৃতপক্ষে ছোট করা হয়—এই সামান্য কথাটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে স্থূল মস্তিষ্কের প্রকাশকদের। থাক প্রসংগে ফিরে আসি।

কড়ি দিয়ে কিনলাম-এর নামের প্রতি আপনার একটা স্পষ্ট বিরাগ রয়েছে দেখলুম। কিন্তু এই যুগে, এই ক্ষমতার আত্মম্ভরিতার যুগে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য এবং সতীর সতীত্ব কি কড়ির কাছে আত্ম বিক্রয় করছে না? একটা উদাহরণ দিই। কদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল নামে একটা বিল এনেছিলেন। দেশের শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা দল মত নির্বিশেষে বিলটির প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন মুক্তকণ্ঠে। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি অনেকেই। উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে একজন সাহিত্যিকের কাছে যখন যাওয়া হ'লো প্রতিবাদকারীদের মধ্যে তাঁর নাম দেয়ার অনুমতি নেবার জন্যে তখন তিনি বললেন, বিলটির প্রতিবাদ হোক তিনিও চান, তবে প্রকাশ্যে তাঁর নাম প্রচার করতে দেবেন না তিনি। কারণ, ইত্যাদি ইত্যাদি...। এর পরেও কি আপনি বলবেন, কড়ি দিয়ে সব কিছু কেনা যায় না এ যুগে? আমার তো মনে হয় সরকারী কড়ির চরণে তথাকথিত বহু চিন্তাবিদ-ই বেণীর সংগে মাথা পর্যন্ত বিকিয়ে বসে আছেন। পরে জনমতের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিলটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এতে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ছোট হতে হয়নি। কারণ ভুল করা স্বাভাবিক এবং ভুল ধরা পড়ার পর তা' স্বীকার করাই হচ্ছে মহত্ত্ব।

এর পর আপনি যা বলেছেন, সে-টা পড়ে আমার সব কিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনি বলেছেন, একাল বিক্ষুব্ধ কাল ; একালে লেখক পড়েছেন স্লোগানের মোহে। যদি ধরেই নিই যে, এটা বিক্ষুব্ধ কাল, তাহলেও তো নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাহিত্য হচ্ছে, সময়, সমাজ এবং জীবনের দর্পণ। তবে এই বিক্ষুব্ধ কালকে আশ্রয় করেই বা সাহিত্য রচিত হবে না কেন? 'মহৎ সত্য বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন বুঝতে পারলুম না, কারণ, আপনি বলেছেন, 'তিনি (বিমল মিত্র) মহৎ সত্যকে পরিস্ফুট করতে পারতেন যদি কাল হতো অতীত কাল অর্থাৎ অতীত কালাশ্রয়ী উপন্যাস হলেই তার মধ্যে দিয়ে মহৎ সত্যের পরিস্ফুটন সম্ভব। আপনার এ সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য করলে, মহৎ সত্যের পরিস্ফুটনের জন্যে সকল লেখককেই মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার কালকেই উপন্যাসের কাল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আপনি নিজেও তো মশাই, জগৎ সত্যের পরিস্ফুটনের জন্যে (আপনার ভাষায়) অতীত কালকেই আপনার উপন্যাসের কাল হিসেবে গ্রহণ করেননি কোথাও। আপনার 'ধাত্রী দেবতা' 'দুই পুরুষ', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'আরোগ্য নিকেতন' মায়

আপনার সমস্ত রচনার-ই কাল তো বিক্ষুব্ধ সমকাল। তাহলে কি ধরে নেবো, আপনার রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে আপনি নিজেও মহৎ সত্যের পরিস্ফুটনের চেষ্টা করেন নি? বিমল মিত্রের প্রসংগে আপনাকে যেন একটু আনব্যালান্সড্ মনে হচ্ছে তারাশঙ্কর বাবু। সত্যিই কি তাই? আমার এক বন্ধু একদিন আমার কাছে একটা শোনা গল্প করেছিলেন। গল্পটা হচ্ছে এই ঃ গজেন বাবু যখন বিমল মিত্রের কড়ি দিয়ে কিনলাম উপন্যাসটি দু খণ্ডে প্রকাশ করার উদ্যোগ করছিলেন, তখন একজন লেখক গজেন বাবুকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলেছিলেন, 'গজেন এ বই চারশো কপিও বিক্রী হবে না। পঁচিশ বছর ধরে বই-এর ব্যবসা করে যা লাভ করেছো, এই একটি মাত্র বইতে তোমাকে তা খোয়াতে হবে!' বর্তমানে উপন্যাসটি দুখণ্ডের-ই বোধ হয় পঞ্চম মুদ্রণ চলছে। উপন্যাসের ঘটনাস্রোতে লেখকের অক্ষুব্ধ হৃদয়ের নির্লিপ্ততাই যদি হৃদয়গ্রাহী সাহিত্যরচনার অবলম্বন হয়, তাহলে 'কড়ি দিয়ে কিনলামের' লেখককণ্ঠ কখনো সোচ্চার হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। যাক গজেনবাবু আপনার প্রকাশক, (তাই বলে সাহিত্যিক গজেনবাবুকে, আমি কিছুমাত্র ছোট করে দেখছি না। সাহিত্যিক গজেন বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে) গজেন বাবুর সম্বন্ধে আপনার কিছু বলা দরকার। কিন্তু মিত্র ঘোষের মালিক তো গজেনবাবু একা নন। সুমথ ঘোষের প্রতি একটু অবিচার করলেন না? সম্প্রতি ভদ্রলোক বেনারসী বিজুর সাহায্যে ডায়ালগগুলি উর্দুতে তর্জমা করিয়ে রোশনাই নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন। এটিও একটি অতীত কালাশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথম দু ফর্মার উর্দু ডায়ালগগুলির অর্থ বুঝতে বহু উর্দ্দুভাষীকেও হিমসিম খেতে হচ্ছে! মিত্র-ঘোষের ব্যবসা গজেনবাবুর চেয়ে সুমথবাবু-ই বেশী দেখেন, এঁর সম্বন্ধে একছত্র না লিখে আপনি ভালো করলেন না মশাই। কিন্তু গত পনের বছরের মধ্যে প্রমথ বিশী এবং গজেন মিত্র ছাড়া আর কারুর উল্লেখযোগ্য রচনা আপনার চোখে পড়েনি? না-কি এ প্রসংগে এ-টি আপনার স্বেচ্ছানীরবতা? আপনি বলবেন যে, আমি তো আগেই বলেছি যে, আমি একজন চাষী মাত্র। তাই যদি হয়, তাহলে এই একজন মণীন্দ্রকে বাধিত করার জন্যে--চিঠির বয়ানে এ প্রবন্ধ প্রকাশের ধৃষ্টতা আপনার হলো কি করে? গত পনেরো বছরের মধ্যে প্রকাশিত দুটি বই-এর উল্লেখ আমি করবো, যে দুটি বই সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, যে কোনো সাহিত্য পাঠকের পক্ষে অপরাধ। একটি বই বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' অপর বইটি সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁরাই চরিত মানস'।

অবশ্যই আপনি বলেছেন, কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করাই আপনার উদ্দেশ্য নয়। আপনার বক্তব্য, স্বাধীন ভারতবর্ষের এই যোলো বৎসরের পটভূমি, বর্তমান কালের জীবন বেদনার পরম সত্যটুকুকে ধরতে না পারা। আচ্ছা তারাশঙ্করবাবু, এটা কি ব্যুমেরাং হয়ে গেলো না? স্বাধীন ভারতের যোলো বছরও তো 'একাল' আর সেই বিক্ষুব্ধ 'একালের' মাধ্যমে যে মহৎ সত্যকে প্রকাশ করা যায় না, এ রায় তো আপনি আগেই দিয়েছেন। বর্তমান কালের ছোঁয়া লাগলেই তো সেই স্লোগানের মোহ আশ্রয় করবে।

একটা ঘটনা এই প্রসংগে মনে পড়লো আমার। ১৯৪৭-৪৮ সালের কথা। বেহালা-ক্লাব আয়োজিত গাবতলায় আপনি প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আপনার পাশে বসেছিলেন ভবানী মুখুজ্জে ও অখিল নিয়োগী। কালের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তুলসীদাসের কোটেশনের সাহায্য নিয়ে আপনি বললেন, অসতী নারীর দেহেই এখন সিল্কের কাপড় উঠেছে, সতী আজ ছিন্নবস্ত্রা। যে গোয়ালা দুধে জল মেশাচ্ছে, তার-ই আজ গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদি...। এর পরেই টালায় আপনার নতুন বাড়ী উঠলো, তারপরেই আপনার গাড়ী হলো। আপনার আজকের চিঠিটা পড়ে, সেদিনের গাবতলার বক্তৃতাটা বড় বেশী করে মনে পড়ছে আমার।

যাক আপনার প্রবন্ধে, না চিঠিতে ফিরে আসি।

সমরেশের সম্বন্ধে আপনি বলেছেন, 'লেখার চেয়ে লেখক হিসেবে তিনি অধিক প্রতিষ্ঠিত।' এ কথাটার অর্থ কি তারাশঙ্করবাবু? সমরেশ কি না লিখেই লেখক? না লিখে লেখক হওয়া যায়? লিখতে না পারলেও ছেলেকে, জামাইকে লেখক করানো যায় বলে শুনেছি, কিন্তু না লিখে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় বলে শুনিনি মশাই।

শঙ্করের সম্বন্ধে আপনার যুক্তি মানতে হলে ধরে নিতে হবে লেখক হবার একমাত্র যোগ্যতা নামের মধ্যে একটা 'শঙ্কর' রাখতে হবে। শঙ্কর তার কোন্ রচনায় অতীত থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন? অন্ততঃ যাকে অতীত কাল বলে ধরে নেওয়া যায়? শঙ্কর সম্বন্ধে আপনার এ দুর্বলতা অত্যন্ত অশোভন ঠেকলো আমার কাছে।

এবার আমি থামবো তারাশঙ্করবাবু।

আচ্ছা তারাশঙ্করবাবু, আপনার সেই প্লেটটা কি হারিয়ে গেছে? লেখা আনতে গিয়ে যে প্লেটের বার্তা শুনে সাগরময় বাবু মুখে গররাজী হয়েও মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। লেখা আনতে গিয়ে সাধারণতঃ প্লেট আসে না। বড় জোর চায়ের প্লেট পর্যন্ত। কিন্তু সনৎকে দিয়ে যে এক্সরে প্লেট আনিয়ে লেখা দেবার অক্ষমতা জানালেন, সেই প্লেটটা কি হারিয়ে গেছে তারাশঙ্করবাবু? যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে প্লেট করিয়ে নিন। মণীন্দ্রমার্কা সম্পাদকের দাবী প্রত্যাখ্যান করার জন্যে আর একখানা প্লেট করিয়ে নিন তারাশঙ্করবাবু! তাহলে আরও অনেকদিন বাঁচবেন আপনি। অনেকদিন বাঁচবেন পাঠকের মনে। 'কবি'র স্রষ্টার এই পরিণতি আমি কল্পনা করতে পারি না।

আপনার একদা ভক্ত পাঠিকা
গীতা বসু

[৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩]



—চলো কণা, কালকে ট্রেনে করে বেড়িয়ে আসি।
—যাঃ, কালকে যে আমার বিয়ে, তার চেয়ে পরশু চলো।

তিনটে, ছুটো, নটায়

মহানগর......সত্যজিৎ রায়

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

পাঁচজন চাষা যখন কাঁধে ভার নিয়ে আল ধরে শহরে যাবে বলে ষ্টেশনের পথ ধরে তখন দেখা যাবে তাদের ভার বওয়ার ভঙ্গীটি এক। গায়ের জামাকাপড় একই ধরনের, যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে সে সব বাড়ীও এক ধাঁচের। দাঁড়িয়ে যদি কেউ দেখে, সহজেই একটি ছন্দ খুঁজে পাবে। এইভাবে চাষা আল বেয়ে হেঁটেছে বহুকাল ; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সুখদুঃখ, তার চিন্তা উদ্বেগ, আশা আকাঙ্ক্ষা। প্রায় যা কিছুই সে করে তার মধ্যে একটা প্রাচীনতা আছে। কৃষিপ্রধান দেশে আরো শতসহস্র লোকের সঙ্গে তার গভীর মিল। আজকের গ্রামজীবনে অনেক ভাঙন ধরেছে, পরিবর্তনের ঢেউ পৌঁচেছে। তবু তার মধ্যে যে একটি নিজস্ব ছন্দ আছে, কী যামিনী রায়ের পটে কী বিভূতিভূষণের উপন্যাসে, জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'য়, সত্যজিৎ রায়ের অপুকাহিনীতে সেই ছন্দ জেগে ওঠে এবং এই সমস্ত শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত সংহতি আমাদের মুগ্ধ করে। হয়তো পরিবর্তন অমোঘ বলেই আরো বেশি মুগ্ধ করে, সূর্যাস্তের বেদনার মতো।

আমাদের শহুরে জীবনের কোনো নিজস্ব সংহত রূপ বা ছন্দ নেই, প্রাচীনতা বোধ নেই। প্রতিপদে কেবল বৈষম্যই চোখে পড়ে। জীবনযাত্রার ধাঁচে সর্বত্রই মিলের অভাব। সংহতির চেয়ে সংঘাত বেশি, মিলের চেয়ে বৈসাদৃশ্য। শহর বলতে কলকাতা। আপিসের সাহেব স্যুট পরে গাড়ী থেকে নামেন, কেরাণীরা বাসট্রামের যুদ্ধ সেরে নামেন তাদের মধ্যেও অনেক ভাগ। কারুর পরণে শার্ট প্যাণ্ট, কারুর ধুতি শার্ট বা ধুতি পাঞ্জাবী, বয়স্ক লোকে এখনো কেউ কেউ ধুতির মধ্যে শার্ট গুঁজে কোট পরে থাকেন। ঠেলাওয়ালা ফুটপাথে লোটা মাজে, থুথু ফেলে। পথে চলাফেরা এলোমেলো, যার জন্যে কলকাতার Jay-walke-এর বিরুদ্ধে জেহাদ। অধ্যাপক হয়ত ক্লাসে চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝিয়ে এসে গঙ্গাস্নানে যান ; রেস্তোরাঁয় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বাড়ীতে বিধবা পিসীমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে ঢোকেন। পাশের ফ্ল্যাটের রেডিওতে দক্ষিণী গান বাজে, হিন্দি সিনেমার গানে দুর্গাপূজা মুখরিত হয়, প্রতিমা প্রায়ই দেখতে হন ফিল্মতারকার মতো। আবার এর মধ্যে ডাকের সাজও দেখতে পাওয়া যায় সাহেবী বাড়ীতে। বস্তির সামনেই সাহেবী বাড়ীতে ফ্যান্সি-ড্রেস পার্টি হয়, জীন্‌স্ পরে মেয়েরা টুইস্ট নাচে। বাঙালী-অবাঙালী, ইংরিজীনবীশ, বাঙাল-ভাষাভাষী, গরীব-বড়লোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাবেকী-আধুনিক বিভিন্ন পোশাকে বিভিন্ন ধাঁচের বিচিত্র মানুষ জগাখিচুড়ী পাকিয়ে থাকে, ক্যাডিলাকের গা ঘেঁষে চলে ঠেলা-

ওয়ালা, এরোপ্লেনের বাসের পথ জুড়ে থাকে মোষের গাড়ী। গোটা জিনিসটাই বিশৃঙ্খল, বেসুরো অনৈক্যতান যার মধ্যে কোনো একটি স্পষ্ট ছন্দ বা রূপের সুষমা নেই। অনেকগুলি আলাদা জগৎ সম্পর্কহীন ভাবে যেন যে যার ঘেঁষাঘেঁষি করে নিজের বৃত্ত ধরে চলেছে।

এই বিভিন্ন জগতের একটিকে দেখা যায় সত্যজিৎ রায়-এর 'মহানগর'-এ। মাঝে মাঝে এ জগৎ অন্যান্য জগতের যেমন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাড়ীর বা সওদাগরী আপিসের, বড়লোক মহলের—সম্পর্কে আসে। মহানগর কথাটিতে যে বিরাট কোলাহল মুখর বৈপরীত্যবহুল চাঞ্চল্যের রূপ জাগায়, তার অনেকটা বিপরীত। শহরের বাহ্যরূপ এখানে প্রায় নেই, তার বিভিন্ন জগতের মধ্যে একটিকে নিয়ে তারই অন্তর্নিহিত বৈষম্য ও অন্যজগতের ওপর নির্ভরশীলতা সূচিত হয়। সত্যজিৎ রায়ের ছবির সঙ্গীতময় ধর্ম একটি জগৎকে বেছে নিয়ে তার মধ্যে সুর ও ছন্দ খোঁজে, যে সুর ও ছন্দকে গভীর ভাবে পাওয়া গিয়েছিল 'পথের পাঁচালী'র গ্রামজীবনের ঐক্যে। 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, এবার পার করো আমারে' গানের সুরে বাংলার গ্রামজীবনের বিষণ্ণ ছন্দ জেগে উঠেছিল। মাঝখানে বিয়ের দৃশ্যে 'Its a long way to Tipperary'-র ইংরিজী বাদ্যে সেই সুরকে বাধা দেয়নি, আরো ঘনীভূতই করেছিল। শহরে অনেক পরস্পরবিরোধী সুরের ছন্দহীন কোলাহলের মধ্যে একটি সুরকে মনোনিবেশ করে কান পেতে শুনতে হয়, জোর করে অন্যগুলিকে মন থেকে সরিয়ে রেখে।

'মহানগর'-এর পরিবারটিকে দেখলে মনে হয় যে 'পথের পাঁচালী'র চরিত্রেরা একদিন এইখানে পৌঁছতে পারতো। তাদের জীবনের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ছন্দ আছে, তাদের পশ্চাতে রয়েছে বাঙালী জীবনের চিরাচরিত রূপ। তুলনায় 'অভিযান'-এর চরিত্রদের কোনো পশ্চাদ্‌পট নেই, একেবারে স্বয়ম্ভু যেন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' সংগঠনের নৈপুণ্যে মুগ্ধ হই, পরিচালক-চিত্রনাট্যকারকে বাহবা দিই, কিন্তু কোনো এমন সুরকে খুঁজে পাই না যা আমাদের অতীতের মধ্য থেকে জেগে উঠে বর্তমান-ভবিষ্যতের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। 'পরশ-পাথর'-এর পরেশবাবু যতক্ষণ গরীব ততক্ষণ তাঁকে সত্যি বলে মনে হয়। যখন বড়লোক হলেন তখন তাঁর বাস্তবতা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কক্‌টেল-পার্টিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আর কোনো যোগসূত্রই খুঁজে পাই না। অপরপক্ষে 'মহানগর'-এর চরিত্রেরা কখনো কখনো আমাদের সচেতন করে দিলেও শেষ পর্যন্ত তাদের বাস্তবতা হারিয়ে যায় না। সুরের ঐক্য বজায় রাখার জন্য একটি জগৎকে আশ্রয় করেও সত্যজিৎ রায় এ্যাংলোইণ্ডিয়ান বাড়ী বা মিঃ মুখার্জির আপিসের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ রচনা করেন তাকেও সত্য বলে গ্রহণ করি। ইংরেজ সওদাগরী আপিস হলে হয়ত সেই বৈষম্যের ধাক্কা সামলানো কঠিন হতো। মিঃ মুখার্জী পাইপ খান বটে, জানলা দিয়ে আপিসপাড়ার অনবরত পরিবর্তনশীল অথচ এক চেহারাও চোখে পড়ে, কিন্তু তাঁর বাড়ী পাবনা জেলায়, এবং বাইরে সাহেব হলেও ভেতরে বাঙালী। অর্থাৎ শহুরে বৈষম্যের দিকগুলি সত্যজিৎ খুব সাবধানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন, সুর কেটে যাওয়ার ভয়ে তার মধ্যে বেশিদূর প্রবেশ করেননি। এক ইডিথ্ সিমন্‌স্-এর বেলা ছাড়া। সেখানেও পুরুষ চরিত্র বাদ দিয়ে গিয়েছেন, কেননা মেয়েদের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ বেশি। এই ঐক্যবোধের জন্যই আরতির সংসারের রূপটি অত্যন্ত সংহত, ছোটখাট ত্রুটি—যেমন শ্বশুরের জন্মদিনে টাকা দিতে আসা, বা একেবারে প্রথম দিনেই বৌ-এর এঁটো শ্বাশুড়ীর পরিষ্কার করা সত্ত্বেও একটি মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের রূপ ফুটে উঠেছে। সেটা কেবল সেট-রচনার নৈপুণ্যের জন্যে নয়, এই স্তরের জীবনের আবদ্ধতা, প্রায় claustrophobia-কে মমতার সঙ্গে রূপায়িত করার জন্য বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কগুলি বাস্তব—শ্বশুর-শাশুড়ী, ছেলে-ননদ বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রী। এই সংসারের ক্ষুদ্র চৌহদ্দির মধ্যেই শহুরে জীবনের বৈষম্যগুলি

প্রতিবিম্বের মতো দেখা দেয়। বৌমার চাকরি নেওয়াতে বাপের নীতগত আপত্তি, অথচ সেই কর্মহীন বাপেরই ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা তোলা। আত্মাভিমান, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং উঞ্ছবৃত্তি এখানে একত্র মিশেছে। যদিও অভিনয়ের দুর্বলতায় এই চরিত্রের সুষ্ঠু কল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তবতা পায়নি, অলঙ্কার প্রয়োগের (decorative) ভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেনি। ননদের চরিত্রটি অনবদ্য, এত অল্পটানে এত চরিত্রদ্যোতনা কম ছবিতেই দেখতে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এ জগৎটি নিটোল।

ছবির দ্বিতীয়ার্ধে এই মধ্যবিত্ত জগৎ নাটকীয় কারণে বহির্জগতের আরো কাছাকাছি চলে আসে। সংঘাতের প্রয়োজন হয়। শুধু একটি সুরের রেখায় আর জীবনের পরিপূর্ণতা ফোটে না। পরিবর্তনের টানাপোড়েন 'পথের পাঁচালী'তেও আছে, কিন্তু সেগুলি জলের স্রোতের মধ্যে উপলখণ্ডের মতো একমুখীন গতিকেই আন্দোলিত করে, বিক্ষিপ্ত বহুমুখীনতার সিম্‌ফনি বাজায় না। সেটুকু দোলা আরতির সংসারের নানা দ্বন্দ্বতেও আনে। কিন্তু যখন এই মধ্যবিত্ত জগৎ বাইরের জগতের সংঘাতে আসে তখন সত্যজিতের স্বভাবোচিত কাব্য পথসৃষ্টি করতে কিছুটা বেগ পায়। মিঃ মুখার্জির চরিত্রের নতুন দিক সহজেই উদ্ভাবিত, আরতির চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার অনভিজ্ঞ প্রতিবাদও বিশ্বাসের কোঠায় থেকে যায়। কিন্তু তার স্বামীর যে কর্মজীবনের যথেষ্ট অভিব্যক্তি ও পশ্চাদ্‌পট আমরা দেখিনি, হঠাৎ তার ব্যাঙ্কফেল এবং রাস্তায় মার খাওয়া আকস্মিকতায় এবং বৈসাদৃশ্যে আরোপিত, বোধবিশ্লিষ্ট খবরে পরিণত হয়। শেষে সিঁড়ির তলার দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধুরতায় আমরা সামান্য মোহগ্রস্ত হই বটে—বিশেষতঃ যখন মাধবীর মুখ অন্ধকারের থেকে আলোর দিকে ফেরে এবং অতি কঠিন সংলাপকে তার মুখের সরল বিশ্বাস উত্তীর্ণ করে দেয়—কিন্তু মনে একটা দ্বিধার ভাব কাটে না। সুকঠিন সমস্যার যেন অতিসরল পরিণতি।

অর্থাৎ যতক্ষণ সত্যজিৎ রায় একটি মূলতঃ ঐক্যময় জগতের মধ্যে থেকে অন্যজগতের সন্ধান ও স্পর্শ এনে দিয়েছেন ততক্ষণ তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। কিন্তু দুই জগতের সংঘাত রচনা করতে গিয়ে তাঁকে খবরের মতো ব্যাঙ্কফেলের সহজ আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে যার সঙ্গে নিজের অতএব আমাদের বোধকেও তিনি মেলাতে পারেননি। শহুরে জীবনের বিচ্ছিন্নতাকে যতদূর তিনি গ্রথিত করেছেন তা বিস্ময়কর এবং আর কেউ পেরেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মানুষের মনের ঘটনাকে বিবৃত করাই চলচ্চিত্রের মতো বাস্তবনির্ভর শিল্পের সবচেয়ে কঠিন কাজ। সে কাজে যাঁর দক্ষতা এত আশ্চর্য, বাহ্য নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়ে স্বধর্মত্যাগে তাঁর প্রয়োজন কী? মাষ্টার-মশাই-এর চোখ পরীক্ষার আলোকবিন্দুতে যে চোখের জল আবিষ্কৃত হয়, দেশলাই-এর আভায় উজ্জ্বল অর্পণার মৃত্যুপূর্ব মুখ তার সঙ্গে তুলনীয়। এ পথে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথিবীতে বিরল। বিশুদ্ধ নাটকও তো বাহ্য ঘটনাকে মঞ্চের বাইরে ঘটিয়ে শুধু জীবনের ঢেউ-এ মানুষের মনের আন্দোলনকেই আমাদের মনে ব্যাপ্ত করে কথার সংকেতের মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্র যদি মনের ঘটনাস্রোতকে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবিতেই উদ্ভাসিত করতে পারে তবে ঘটনা সংঘাতের নাটককে নিয়ে বিব্রত হয়ে তার কাজ কী? লঘুতর স্রষ্টার জন্যই না হয় সে কাজ মুলতুবী থাক।

[৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩]

'বাঙালী একটি স্বতন্ত্র জাতি'!

আরও দুশো বছর যদি ভারতবর্ষ পরাধীন থাকত তবুও পার্টিশন মেনে না নিত তাহলে ভারতের যা অবস্থা হত, ভারতবর্ষে বাঙালীর দুরবস্থা আজ গত ১৭ বছরে তার চেয়েও বেশি হয়েছে। গোখলে সেদিন বলেছিলেন ঃ What Bengal thinks today, India thinks tomorrow ঃ আজ গোখলে বেঁচে থাকলে বলতেন ঃ Bengal suffers to-day for what India did yesterday. ১৭ বছরে মার খেয়েছে কেবল বাঙালী। হিন্দুস্তানে নয় কেবল ; পাকিস্তানেও বাঙালী হচ্ছে দুয়োরাণীর পুত্র। এই দুই বঙ্গ যদি ভাগ না হতো,--ভারত ভাগ হলেও, তাহলেও বাঙালীর এ দুরবস্থা হত না। সেকথা যিনি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সেই ধুরন্ধর ব্যবহারজীবী শরৎচন্দ্র বসুর কথাই আজ সবচেয়ে বেশী করে বুকে বাজল। স্বর্গত শরৎচন্দ্র কেবল 'সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বিভাবতী ছাড়া সুভাষচন্দ্রের নেতাজী হওয়া শক্ত ছিল। শরৎচন্দ্র বসুর যা প্রাপ্য ছিলো দেশবাসীর কাছে তিনি তা পাননি। নেতাজীর গ্ল্যামারাচ্ছন্ন দেশ নেতাজীর সব চেয়ে বড় সহায় শরৎচন্দ্র বসুর দানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি কখনই। আজও বোঝেনি যে সেদিন শরৎচন্দ্র বসু যে ইউনাইটেড বেঙ্গল-এর কথা বলেছিলেন, আজ তার চেয়ে বাস্তবতর ভিত্তি দুই বঙ্গের বাঁচবার জন্যে আর একটিও নেই। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এই দূরদর্শিতার জন্যে সেদিন নিন্দিত হয়েছিলেন বাংলা দেশে। নন্দিত হয়েছিল—তারা যারা বাংলা দেশকে ভাগ করে নেবার পক্ষে ছিল। শরৎচন্দ্র বসু এই প্রস্তাব নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সঙ্গে। জিন্নাহ্‌ বুঝেছিলেন যে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যেই অবাঙালী মুসলমানের নেতৃত্বের মৃত্যুবাণ। কিন্তু সে কথা বুঝতে না দেবার জন্যে দম্ভের মুখোস মুখে এঁটে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ বলেছিলেন ঃ I don't discuss these things with a provincial leader. শরৎচন্দ্র বসুর বক্তব্যের মধ্যে কেবল অবাঙালী পাকিস্তানীর নেতৃত্বের নয়, অবাঙালী হিন্দুস্তানের নেতৃত্বেরও মৃত্যুবাণ আত্মগোপন করে ছিল। কংগ্রেস জানত যে অদ্য, কল্য, পরশু, দেশ স্বাধীন হবেই। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ইংরেজরা ঠেকাতে পারবে না আর। মণিপুরের প্রান্তরে নেতাজীর আঘাতের চেয়েও বড় কথা ছিল হিন্দু মুসলমান ভেদ ঘুচিয়ে I.N.A গড়া। সৈন্যদের মধ্যে যেদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল সেদিনই জানত সাহেবরা যে, আর বেশিদিন নয়। এ ছাড়াও--বিশ্ব পরিস্থিতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম পর্বের ভূমিকা তৈরী করছিল। তাই জাতির জনক গান্ধীর কথা অগ্রাহ্য করে বিপজ্জনক মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভাগ করা হল দেশ। যে নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী ছিল নেতাজীর তা করতলগত হল নেহেরুর। শরৎচন্দ্র বসুর সত্যভাষণ তাঁকে সাময়িক অজনপ্রিয় করল। তারপর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব থেকে তিনি আস্তে আস্তে সরে যেতে বাধ্য হলেন। মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে সরানো হল যে মুহূর্তে তাঁর প্রয়োজন ফুরল।

কিন্তু সত্য যা তা যে কখনও মরে না তার প্রমাণ শরৎচন্দ্রের 'ইউনাইটেড বেঙ্গল' ক্রাই। সেদিন ডিক্রাই করলেও আজ বোঝা গেছে, হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে অপমানকর অবস্থিতির থেকে বাঁচবার পথ, 'ইউনাইটেড বেঙ্গল'-এর জন্যে সংগ্রাম। কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট বাদে তৃতীয় একটি দলের নেতৃত্বে বাঙালীর হিন্দু-মুসলমান মিলিত বঙ্গের পুনরুজ্জীবন-মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে ঃ WE WANT UNITED

BENGAL।

পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের বুঝতে হবে যে বাঙালী মুসলমানদের গায়ে এর পরেই হাত পড়বে। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু বাঙালী আর একজনও যখন থাকবে না তখন পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণের লক্ষ্য হবে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান। এবং তাদেরও ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে পশ্চিমবঙ্গে। আজ অথবা কাল।

তাই এখনই কংগ্রেস এবং কমুনিষ্ট বাদ দিয়ে চাই তৃতীয় একটি দল। সে দলের কাজ কেবল বাংলা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এখন। বাঙালীর প্রতি সর্বভারতীয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্টদের নেই। তার প্রমাণ আসামে বাঙালী খেদা আন্দোলনের সময় পেয়েছি। আজ পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পাশবিক অত্যাচারের সময়েও দেখছি। এর কারণ, ভোট। আসামীকে ভেট না দিলে ভোট পাওয়া যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোট চাই। তাই অন্যায় হোক যত বাঙালীর ওপর, দেশের চেয়ে যেহেতু দল বড় সেই হেতু বিচারের বাণীকে কাঁদতে দাও নীরবে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে।

দলের চেয়ে দেশ বড়,--এই কথা বলবার জন্যে চাই তৃতীয় দল। ইউনাইটেড বেঙ্গল হবে এই দলের দাবী। ফিলসফি হবে ঃ 'বাঙালী একটি স্বতন্ত্র জাতি।'

[বর্ষ ৩, সংখ্যা ২২, ৬ মার্চ, ১৯৬৪]



--হাতীবাগান কোথায় জানেন?
--হাতীবাগান? বাদুরবাগানের পাশ দিয়ে..

তিনটে, দুটো, নটায়

রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় নয় সত্যজিতের চারুলতা........

মান্ধাতার আমলের গল্প নষ্টনীড় নিয়ে ১৯৬৪তে ছবি, জেট এজেও আমরা যে বলদচালিত শকটে বসে আছি, সত্যজিতের চারুলতা তাই চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একদিন হাল্লা হয়েছিল ; আজ, সত্যজিতের চারুলতা নিয়েও সেই হুলুস্থুল। দুই-ই চায়ের কাপে তুফান। কেউ মনেও রাখবে না যে চারুলতা নামে একটি বাংলা ছবি একদা তৈরি হয়েছিল! নষ্টনীড় নিয়ে হাল্লা হবার কারণ রবীন্দ্রনাথের আগে, বিবাহিত চারুলতার স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে ভালবাসার ইংগিত কোনও বাংলা গল্পে কেউ দেয়নি। নষ্টনীড় গল্পের বুনন, প্লট, চরিত্রচিত্রণ কিছু নিয়েই আলোচনা হয়নি। এক বালতি দুধে, ওই এক ফোঁটা চোনা,—অমলের প্রতি চারুর প্রচ্ছন্ন অনুরাগ,—ওইতেই নষ্টনীড় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বাংলা গল্পের আদিযুগে রবীন্দ্রনাথ নষ্টনীড় লিখে দুঃসাহস দেখিয়েছেন, কেউ কেউ এই কারণে গল্পটিকে আজও উল্লেখ করেন। সাহিত্যের বিচারে কালের দোহাই পাড়া নাচতে না জানলে উঠোন বেঁকার মতো অগ্রহণীয়। রবীন্দ্রনাথের ঢের আগে সেক্সপীয়ার যা লিখে গেছেন তার বিচার করতে বসে কেউ একথা বলবে না যে হ্যামলেটের ত্রুটি কালোচিত। কোনও লেখাই অমুক কালে লিখিত হয়েছে বলে ক্ষমার্হ, এ যুক্তি মাইনর লেখকদের বেলায় চলে। রবীন্দ্রনাথ বা সেক্সপীয়ার, বিশ্বের দুজন মাত্র যথার্থ লেখকের ক্ষেত্রে কাল্ কোনও ফ্যাক্টর নয়। রবীন্দ্রনাথ ও সেক্সপীয়ার দুজনেই কালোত্তীর্ণ।

বরং আরেকটু এগিয়ে বলা যায় অনায়াসেই যে, রবীন্দ্রনাথের বলাকা, রবীন্দ্রনাথের বেস্ট, গতিরাগের কাব্য। এই গতির তত্ত্ব যদি আগামী কোনও কালে বাতিল হয়ে যায় তাহলেও বলাকার মূল্য সহৃদয় হৃদয়সংবাদীর কাছে এতটুকু কমবে না। কারণ, বলাকার কাব্যরূপ তত্ত্ব-অতিরিক্ত অপরূপ আনন্দের সুগভীর বেদনার আলোছায়ার আলাপন। যদি কোনও কালে কোনও নবতর নিউটান এসে প্রমাণ করে দেয় যে জগতে কিছুই চলছে না, সব দাঁড়িয়ে আছে, তবুও 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ',—এর বেদনা তার এক কণা রঙও হারাবে না রসিকচিত্তে।

আসলে, মার্চেন্ট ওভ ভেনিস সেক্সপীয়ারের, নষ্টনীড় রবীন্দ্রনাথের কোনও পরিচয় নয়। কোনও লেখককে চলচ্চিত্রে, মঞ্চে, বেতারে, আলোচনায় উপস্থিত করতে হলে তাঁর যা শ্রেষ্ঠ ধন যা পলকে ঝলকে মেলায় না তারই নাগাল পেতে হয়। নাহলে তাঁকে ছোঁয়াই উচিত নয়। নষ্টনীড়ের অব্যক্ত প্রণয় আজকে হাস্যোদ্রেক করে তার কারণ এ নয় যে আজকে আমরা অনেক দুঃসাহসী হয়েছি। তার কারণ ওতে একটি পরিচ্ছেদ, বা অনুচ্ছেদ,

পংক্তি অথবা এমন একটি শব্দও নেই যা কালজয়ী। যদি থাকতো তাহলে নষ্টনীড়ের থীম যতই অচল হোক এ যুগে, তার আনন্দ অথবা বেদনা আমাদের মনে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের মতো মনোহরতম মিথ্যে হয়েও হোতো অন্তরতম সত্য।

এবং নষ্টনীড় কোথাও এমন একটি কথাও বলতে পারেনি বলেই, নষ্টনীড়ের ক্ষেত্রে, কালের কথা, বাংলা সাহিত্যে প্রথম দুঃসাহসের কথা ওঠে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের পদ্যের মতোই নষ্টনীড় রবীন্দ্রনাথের লেখা বলেই পাঠ্য ; অন্য কোনও লেখকের হলে, আমরা নষ্টনীড়ের নামোল্লেখও করতাম না, যেমন করি না, হরিদাসের গুপ্তকথার কি মডেল ভগিনীর, কিংবা রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি, নসীরামের লেখা মোহনবাগানের মোহনবাগানে, যাতে নসীরাম নাকি বংকিমকে মাটি করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনে দুঃসাহসে দীপ্ত হয়েছিলেন একবার। তার ফলে লেখা হয়েছিল চতুরংগ। সত্যজিতের নষ্টনীড় ফিক্সেসান কেটে গেলে, মেচিয়ড সাহিত্যবোধ জাগ্রত হলে তিনি হাত বাড়াতেন ওই বইটির দিকে। চতুরংগর ভাষা, বক্তব্য, চরিত্র, ক্র্যাফ্ট,—চেনা রবীন্দ্রনাথের নয়, অচেনা রবীন্দ্রনাথের। লেবরেটরি গল্পে ওর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন আরেকবার পাওয়া যায়। চতুরংগের মতো লেখা রবীন্দ্রনাথ আর লেখেন নি। বাংলা সাহিত্যে ও বইয়ের কনক্লুসান অকথিত রয়ে গেল।

সত্যজিৎ রায় এযাবৎ যত গল্প ছবি করেছেন তাতে আর্ট ফ' আর্টস্ সেক,—এই মরীচিকার পেছনে তিনি ঘুরে মরেছেন। জীবন থেকে এসকেপ করে কেউ জীবনের চিত্ররূপ দিতে পারে না। ফ্লাট ফ ফ্লাট্স্ সেকের মতোই আর্ট ফ আর্ট্স্ সেক অসার, বাহুল্য, আইডিয়াল টিয়ার্স।

রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় থেকে সত্যজিতের চারুলতা, বন্ধ্যা নারীর গর্ভ থেকে জাত নেকড়ার পুতুল মাত্র। খুব সুন্দর কিন্তু প্রাণহীন।

এক

নষ্টনীড় গল্পের প্রধান পাত্রপাত্রী তিনজন। চারু, ভূপতি, অমল। ফোর্থ সাবজেক্টের মতো শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দেবার ফালতু ক্যারেক্টার মন্দাকিনী। চারু যৌবনেও উপেক্ষিতা। স্বামী ভূপতি সম্পাদনায় ব্যতিব্যস্ত। ভূপতি চারুর নিঃসংগতা দূর করতে মন্দাকিনীকে সংসারে আনলো। চারুর সে হবে সখী। কিন্তু যৌবনে নারী সখীতে মজে না ; তার প্রয়োজন সখার। উড়ে এসে জুড়ে বসল অমল। ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল এলো চারুলতাকে পড়ানোর উপলক্ষ্য করে। পড়ার পর অমল লেখাও সুরু করলো। তারপর প্রেমে পড়ার পালা এলো চারুলতার। তার প্রথম প্রণয়ের আভাস পাওয়া গেল লেখকের একটি কথায় ঃ ভূপতির মনে অমলের প্রতি সম্মানের একটি ভাব জাগিয়া উঠে, ইহা চারুর একান্ত ইচ্ছা [গল্প-গুচ্ছ ঃ পৃঃ ৪৪০ ঃ রবীন্দ্ররচনাবলী ঃ জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ ঃ ৭-ম খণ্ড]

তারপর চারুলতাও লিখতে আরম্ভ করলো। এবং অমলের প্রতি চারুর প্রণয়ের দ্বিতীয় আভাস পাওয়া গেল, মন্দার প্রতি চারুর বিষোদ্‌গারে। স্বামীকে চারু বলল স্পষ্ট ঃ অমলের সংগে ও এমনভাবে চলে যে সে দেখলে লজ্জা হয়।... আমি এ সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।

অমল ভূপতির কাছে জানতে চাইলো বৌঠান তার চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ করেছেন কিনা!

অমলের বিয়ের সম্বন্ধ আসার খবরে চারু বলল স্বামীকে ঃ কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না।

তারপর অমলের বিয়ে ও বিলেত যাত্রা ঠিক হলো। ভূপতি কাগজ তুলে দিল। বিয়ের পর অমলকে বিলেত পাঠিয়ে দিয়ে এলো ভূপতি। কাগজ তুলে দিয়ে মহীশূরে চলল ভূপতি, বেতনভূক সম্পাদক হিসেবে।

একলা যাবার মুহূর্তে চারু ছুটে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরে বললো : আমাকে সংগে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেও না।

তখন ভূপতির মনের ছবি রবীন্দ্রনাথের কলমে এই রকম : আমি কোথায় পালাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না।

ভূপতি যখন শেষ মুহূর্তে বললো চারুকে সংগে যেতে, তখন "চারু বলিল, না' থাক!"

এই গল্পে চারুর মনে অমলের জন্যে যে প্রেম আধো আলো আধো অন্ধকারে দেখা না দেখায় মেশা বিদ্যুল্লতার মতো অনতিব্যক্ত, সত্যজিতের চারুলতা চিত্রে তা অতিরিক্ত স্থূলতার সংগে সাংঘাতিক স্পষ্ট। সত্যজিতের চারুলতা, রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ের ওপর স্টিমরোলার চালিয়েছে।

[বর্ষ ৩, ৩২ সংখ্যা, ১৪ মে, ১৯৬৪]

দুই

গাছে যেভাবে ঝোলে পাতে এঁচড় সেভাবে পরিবেষিত হয় না। তাকে টুকরো টুকরো করে, মশলার সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণ নতুন চেহারায় উপস্থিত করতে হয় যে, একথা অস্বীকার করবে কে? চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সেকথাই স্বীকার করতে হয়। উপন্যাস আর তার চলচ্চিত্ররূপ এক নয়। ৫০০ পাতার গোরাকে, ২৫০০ পাতার ওয়ার এণ্ড পিসকে ২।। ঘণ্টার মধ্যে চিত্রায়িত করবার কাজ উপন্যাসকে আক্ষরিক উপস্থিত করা নয়। তা সম্ভব নয় প্রথমত ; দ্বিতীয় তা মোশান পিকচারের স্বধর্ম নয়। উপন্যাসের মতো চলচ্চিত্রের ধর্ম আছে, ভাষা আছে, রীতি আছে। নাহলে উপন্যাসটি শিল্পীরা পড়ে গেলেই গড়গড় করে তা চলচ্চিত্র হতো। তা হয় না। উপন্যাসকে চলচ্চিত্র করতে গেলে তার কিছু বাদ দেওয়া কখনও কখনও কিছু যোগ করাও তাতে অনিবার্য হয়। চলচ্চিত্রের ইতিহাস যাঁরা তৈরী করেছেন তাঁরা এ সত্য জানতেন যে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় ; পরধর্মো ভয়াবহ। উপন্যাসের ডকুমেন্টেসান মোশানপিকচার নয়। উপন্যাসের কথাকে চিত্রায়িত করাই মোসানপিচারের আর্ট।

কিন্তু। কিন্তু আছে একটা এর সংগেই। কতটা কমানো কতটা বাড়ানো অর্থাৎ কতটা স্বাধীনতা চলচ্চিত্র উপন্যাসনিরপেক্ষ নিতে পারে তা নিয়ে বিতর্ক শেষ হবার নয়। একটি কথা সবাই বলেছেন। উপন্যাসের স্পিরিট চলচ্চিত্রে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এই স্পিরিট বস্তুটি কি? গল্পের প্রাণধর্ম। একটা ইলাস্ট্রেশানই যথেষ্ট হবে। গোরার প্রাণধর্ম হচ্ছে যে হিন্দুর মা, মুসলমানের মা, খ্রীশ্চানের মায়ের চেয়ে বড় এক মা আছেন যার নাম ভারতবর্ষ, হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান সকলেরই যিনি মা। আকস্মিকভাবে নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানবার পর গোরা এই আনন্দময়ী মা-কে খুঁজে পেয়েছে। সংকীর্ণতার সীমাহীন ঊর্ধ্বে বিশ্বজনীনতার পথে গোরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রাণতার প্রথম পদক্ষেপ। এই মূল বক্তব্য যদি চলচ্চিত্রে স্পষ্ট না হয় তাহলে তা আক্ষেপ করবার মতো দুর্ঘটনা।

তাছাড়াও কথা আছে। সাধারণ লেখকের বেলায় যা চলে অসাধারণ লেখকের ক্ষেত্রে তা চলে না। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ নন শুধু ; অনন্য লেখক। এই পৃথিবীতে কোনও কালে কোনও দেশে সেক্সপীয়ার ছাড়া তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর কখনও দেখা দেয়নি। আর

কখনও দেখা দেবে না। রবীন্দ্রনাথের রচনার চলচ্চিত্রায়ণেও পান থেকে চুণ খসবার উপায় নেই। তা অমর্যাদাসূচক তা কেবল রবীন্দ্রনাথের নয়, বাঙালীর এবং বাঙলা দেশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের তুল্য। যত ফেমাস লোকই এ কাজ করুক, আসলে তা 'ব্ল্যাস-ফেমাস'।

রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় থেকে সত্যজিৎ চারুলতা তৈরী করতে গিয়ে কেবল নাম বদলাননি, গল্পে যা সূক্ষ্ম কারুকার্য ছিলো ছবিতে তাকে লাউড ও ভালগার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে মরমে মরে যেতেন, চারুকে অমলের প্রতি উচ্চারিত, 'কথা দাও তুমি যাবে না' এই কথা শুনে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও মনোধর্ম থেকে এ স্পিরিট যত দূরে সত্যজিৎ থেকে সত্য নয় তত অভিন্ন। গানের সুরের অবিকল প্রতিলিপি গায়কের কণ্ঠে খুঁজে না পেয়ে কবি দুঃখ করেছিলেন ঃ আমার গানের সুরের ওপর ষ্টিম রোলার চালিও না। সত্যজিতের চারুলতা দেখলে তিনি কি বলতেন?

একথা বলা যাবে না রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি যথাযথ অনুসরণ না করার স্বপক্ষে যে ইমপ্রুভমেণ্টের জন্যেই এ পরিবর্তন অপরিহার্য। না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ধর্মান্তর মান্য নয়। রবীন্দ্রনাথ ষ্টিমরোলারের কথা যে গায়ককে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তিনি রবীন্দ্র সংগীতকে জনপ্রিয় করবার পথে পথিকৃৎ। তাতে কী? কারুর অধিকার নেই, জনপ্রিয়তার জন্যে শুনতে বা শিখতে ভালো লাগার অজুহাতে রবীন্দ্র-সংগীত অথবা রবীন্দ্র-সাহিত্যের রং বদলানোর।

দেবী দুর্গা সিংহাসনা। কেউ যদি বলে সিংহের বদলে রয়্যাল বেংগলের ওপর দুর্গাকে বসালে পিক্‌চারেস্‌ক্ হয় ব্যাপারটা তাহলে তা কি গ্রাহ্য। না। মন্ত্রময়ী ঐ মূর্তি হিন্দুদের স্বপ্নে মিশে আছে। তার পান থেকে চুন খসলে যেমন এখন খসতে আরম্ভ করেছে তা যথার্থ হিন্দুকে এমন যায়গায় আঘাত করে যার বেদনাকে মুখে ব্যক্ত করা যায় না। মা-কে সিনে-মায় পরিণত করা যে অপরিণত বুদ্ধির অপকর্ম, রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়কে সত্যজিতের চারুলতায় নামানো সেই একই ওজনের কালাপাহাড়ী কীর্তি। সত্যজিৎ অবশ্যই তাঁর কীর্তির চেয়ে মহৎ।

বেশ কয়েক বছর আগে। বংকিমের চন্দ্রশেখরের চলচ্চিত্ররূপে অদলবদল করার জন্যে জনৈক চিত্রপরিচালক সেনসার্ড হয়েছিলেন। সত্যজিৎ তার থেকে গুরুতর অপরাধ করেও তা হবেন না। একথা সব চেয়ে আগে যিনি জানেন তিনিই চারুলতার স্রষ্টা। বিশ্বপুরস্কারই সব চেয়ে বড় বাধা। সত্যজিৎ সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে চায় না ভয়ে, কারণ, কি জানি বাবা, যদি এ ছবিও বাজি মেরে দেয় ক্যানে অথবা বের্লিনে কিংবা মস্কোয়। সত্যজিৎ তাই যা ইচ্ছে তাই করেন। এবং আমরা যা ইচ্ছা তা করি না। একটি মানুষও যদি আজ এদেশে থাকতো সবাই যদি মেয়েমানুষ না হয়ে যেত তাহলে সত্যজিৎ নষ্টনীড়কে চারুলতা করবার আগে বেটার সেন্স প্রিভেল করত। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়কে হিন্দি জাল জালায় অপরূপান্তরিত হতে বাধা দেননি। এখন চারুলতা সম্পর্কে একটি কথাও বলবে, এ আশা তামাসা ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বভারতী আজ নিঃস্বভারতীতে পরিণত।

সত্যজিৎ তাঁর সাকসেসের সিক্রেট খুঁজে পেয়েছেন সেই দর্জির গল্প থেকে। সেই বুদ্ধিমান দর্জি রাজাকে ল্যাংটো করে দিয়ে বলেছিলো যে রাজার গায়ে পোশাক যে দেখতে পাবে না সে নির্বোধ! চারুলতার সত্যজিৎ নষ্টনীড়ের রবীন্দ্রনাথকে ছবির পর্দায় উলংগ করে ছেড়ে দিয়েছেন। চারুলতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র একথা যার মনে হবে না সেও একথা বলতে সাহস করবে না। কারণ যদি এ ছবিও প্রাইজ পায়।

সুচিত্রা সেন সাত পাকে বাঁধা ছবিতে বিশ্বের সেরা চিত্রাভিনেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সুচিত্রার যারা সব চেয়ে অন্ধ অনুরাগী তারাই বলুন শ্রীমতী সেনের অভিনয় বহু ছবিতেই কি ওব চেয়ে বহুগুণ ভালো হয়নি। হয়েছে। সে ছবি র‍্যাশ্যায় যায়নি। গেলে সে

ছবির অভিনয়ও নন্দিত হতো, একথা বলা হবে, জানি। কিন্তু সেই সংগে এও জানি যে, সাত পাকে বাঁধা ছবিতে তাঁর অভিনয় বিশ্বের সেরা অভিনয় নয়। যদি সাত পাকে বাঁধা ছবিতে সুচিত্রা সেনের অভিনয় জগতের শ্রেষ্ঠ পারফরমেন্স হয় তাহলে সত্যজিতের চারুলতা জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাইজ পেলে সারপ্রাইজ নেই তাতে। ঠিক আছে!

সত্যজিতের ছবি প্রাইজ পায় কেন? কালিয়া পোলোয়া খেয়ে খেয়ে চোঁয়া ঢেকুর তোলার দিনে শুকতো, ডাঁটা-চচ্চড়ি, বড়ি ভাজাকে অমৃত মনে হয় যেকারণে, ঠিক সেই কারণেই জেট-এজে সত্যজিতের পথের পাঁচালীতে ট্রেন আসার শব্দ কান পেতে শোনার সারল্য বিস্ময়জনক বলে মনে হয় বিদেশে। সেই সারপ্রাইজই প্রাইজের মূলে।

সত্যজিৎ 'যুগ' নয় ; হুজুগ মাত্র। আবার কালিয়া পোলোয়াতর কোনও গুরুতর ভোজের দিনে এই ননসোফেস্টিকেশানের আওয়াজ মিলিয়ে যাবে শূন্যে। শরতের লঘুপক্ষ মেঘের ফাঁকা কুচকাওয়াজ মনে হবে তাকে। আকাশের কোথাও তার দাগ থাকবে না।

সত্যজিতের চারুলতা আর রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ে জমীন ও আসমান, দক্ষিণ ও উত্তর মেরু, নরক ও স্বর্গের ব্যবধান। বস্তুত, ২৫শে বৈশাখ থেকে ২২শে শ্রাবণ নয় ততদূরে, যতদূরে রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় থেকে সত্যজিতের কি যেন নাম ছবিটার?—হ্যাঁ,—চারুলতা!

[বর্ষ ৩, ৩৩ সংখ্যা, ২২ মে, ১৯৬৪]

তিন

চারুলতা ছবির সুরুতে 'চারুর দিন কাটে না' বোঝাতে যে চিত্ররীতি প্রয়োগ করেছেন পরিচালক তাতে দর্শকদেরও সময় যে কাটে না এ কাণ্ডজ্ঞান অনুপস্থিত। সত্যজিৎ বলে ভয়ে দর্শক বুড়বাক হয়ে বসে থাকে। সত্যজিৎ না হয়ে আর যে কেউ হোলে হলে মার কাটারি সুরু হয়ে যেত। এ অভিজ্ঞতা সত্যজিতের প্রতি কমপ্লিমেন্ট নয়; দর্শকদের প্রাইজ-স্লেভারির পরিচয় মাত্র। চ্যাপলিন এই নায়িকার ক্লান্তি বোঝাবার জন্যে দর্শকদের ক্লান্ত করতেন না। এবং চ্যাপলিন না হয়েও তা করা যায়। চারু বারান্দায় এসে দাঁড়াবে। কলের মুখে প্রথম জলের ফোঁটা পড়বে ঘড়ায়। তারপর ক্যামেরা সারা শহর প্যান করে আসবে। ইতোমধ্যে ঘড়া টইটুম্বুর করবে জলে। এবং দেখা যাবে চারু তখনও একভাবে দাঁড়িয়ে। যে সময়ের গল্প তখন কলের মুখ না দেখাতে পারলে ইঁদারায় বসানো একগাদা বালতির জলে ভরার ছবি অনেক পিকচারেস্ক হতো।

সেতু নাটক দেখে লোকে বেরিয়ে এসে নাটকের কথা বলত না। অভিনয় বলত না। বলত ইঞ্জিন দেখে এলাম। সত্যজিতের চারুলতা দেখে এসে স্ত্রীলোকেও বলছে বাইনাকুলার দেখে এলাম। সমস্ত ছবির চেয়ে বাইনাকুলারের ছবি বড় হয়ে থাকলে তা সত্যজিতের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। স্টেজে আলোকসম্পাতের আর ফিলমে আলোকচিত্রের অকারণ অবারণ বাহাদুরী দুর্বলতার পরিচয়। চারুলতায় বাইনাকুলার দৃশ্য থেকে সুরু করে রাস্তার দৃশ্য, ঘোড়ায় চড়া ভূপতির দৃশ্য, শুধুই ক্যামেরাম্যানের বাহাদুরী দেখানোর জন্যে দীর্ঘ, প্রলম্বিত বাহুল্যে পীড়াদায়ক। ক্যামেরা ফ ক্যামেরাস সেক সেন্সলেস। এবং এই জন্যেই সত্যজিতের ছবি নিদারুণ বোরিং। দুঘন্টার ছবি, তাও সময় কাটতে চায় না দর্শকের। চারুর চেয়েও ক্লান্তিকর মনে হয় ছবির সময়টুকু।

পাঞ্জায় হারিয়ে দেওয়া, অমলকে ভূপতির, ভালো পরিকল্পনা। সিম্বলিক ও সাটল।

ভূপতির ভূমিকায় শৈলেন মুখুজ্যেকে নিয়েছেন সত্যজিৎ শুধু এইটুকু দেখাবার জন্যে যে তিনি কাঠের বেড়াল দিয়ে ইঁদুর ধরতে পারেন। শৈলেন মুখুজ্যে বেশীর ভাগ ছবিতে ডাক্তারের ব্যাগ বহন করেন। এ ছবিতে নায়কের রোল দেওয়া তাঁকে, সত্যজিতের,

ভবিষ্যতে গোরা পরিচালনা করলে ভানু ব্যানার্জীকে দিয়ে গোরার এবং সুলতা চৌধুরীকে দিয়ে সুচরিতার রোল করার পূর্বাভাস মাত্র অসাধু সাবধান।

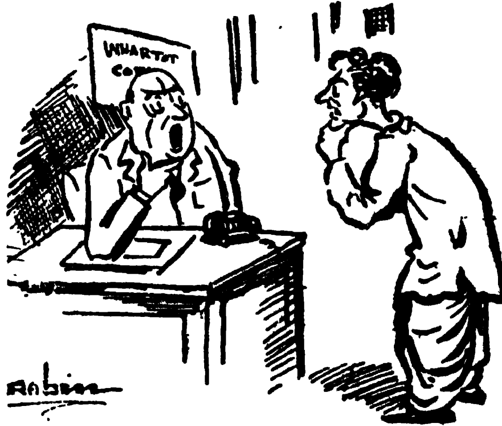
শৈলেন মুখুজ্যেকে ভূপতির রোলে নির্বাচনের বিস্ময়ে হতবাক শৈলেন মুখুজ্যে কেমন করেছে রোলটা ভাবতে বিব্রত বোধ করেছে। ঘোর কেটে গেলে লোকে ত বটেই স্ত্রীলোকেরও মনে হবে, শৈলেনের কিছু হয়নি। ঘোড়াগাড়ীতে দাড়িওলা একটা দামড়া যখন কাঁদবার চেষ্টা করেছে তখন আমার দারুণ হাসি পেয়েছে। এ্যামেচার অভিনয়ের অন্তে রিজিয়ার চাপ দাড়ি দেখে যে হাস্য সংবরণ করা শক্ত হয়, সেই হাসি। শৈলেনের যে হয়নি ভূপতি, তার কারণ, কাঠের বেড়াল দিয়ে আর সত্যি কিছু ইঁদুর ধরা যায় না। যে পারে, যদি কেউ পারে সে সত্যজিৎ নয়; তার নাম, পি-সি সোরকার।

চারুলতার ভূমিকায়, সৌমিত্র থাকতে মাধবীকে নেবার মানে কি? সৌমিত্র মাধবীর চেয়ে খারাপ করত না য়্যাটলিস্ট এটুকু সত্যজিৎ জানেন না বললে, রবীন্দ্রনাথ ছন্দপতনের কিছু রহস্য জানতেন না বলতে হয়।

দুটি জায়গা আমার ভালো লেগেছে। এক,—ভূপতি চারুকে বলছে, তোমার লেখা আমার এত ভালো লাগে কেন জানো? আমি বুঝি না বলে! সত্যজিৎ-এর ছবি সম্পর্কে দর্শক-ভাবনার এই সিম্বলিক ইনটারপ্রিটেশান চমৎকার। দুই,—ছবির শেষে ভূপতি আর চারুর হাতের মধ্যে ব্যবধান-দৃশ্য। নষ্টনীড় এবং চারুলতার মধ্যে, নবজাতকের জন্মস্থান মেটার্নিটি ওয়াড আর গোরস্থানের মধ্যে ব্যবধানের, এই সিম্বল চমৎকার।

—দী

[বর্ষ ৩, ৩৪ সংখ্যা, ২৯ মে, ১৯৬৪]



—স্যার দু বছর ধরে তিনজনের কাজ একা করছি...একটু যদি মাইনে বাড়ান।...
—যে তিনজনের কাজ করেছো তাদের নাম বল কিন্তু মাইনে বাড়াতে পারবো না।..

অন্ধকার

নিবারণ চক্রবর্তী

ফুল তারা পাখি গান চাঁদ
সব কিছু দারুণ বিস্বাদ।
'একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'
ভীষণ ভালগার
রক্ত স্বেদ স্পর্শহীন স্তব শূন্যতার।
খাওয়া, শোয়া, লজ্জা ঘেন্না ভয়
কিছুক্ষণ কাটানো সময়।
তারপর একদিন চিৎ
সত্য মিথ্যা ফাঁকি আর অনুচিত উচিৎ
কে করে কেয়ার,
প্রজাপতি ব্রহ্মার পন্ডশ্রম 'ভ্যানিটি ফেয়ার'।
রূপ যশ রূপো দিয়ে চুড়ো
গড়ে তোলা যে পারো বিমূঢ়।
রক্ত মাংস মেদ মজ্জা হাড়
বেচে কিনে টাকার পাহাড়
বানাবার পর জেনো সব
নির্বোধের স্বর্গে নিজ বজ্রাঘাত জনারি বাসব।
কিংবা ত্যাগ শুদ্ধাভক্তি বৈরাগ্যের সূচি
মৃতস্পর্শে শেষ তক আবাব অশুচি।
তৈমুর চেংগিস, বুদ্ধ
যে করে প্রলুব্ধ,
তার—
আদি অন্তে সত্য জানি শুধু অন্ধকার।

[বর্ষ ৪. ৩য় সংখ্যা, ২০ নভেম্বর, ১৯৬৪]

হিল দাইসেলফ্!

বিখ্যাত ডাক্তার। চিকিৎসার জন্যে বিখ্যাত নয় ; খারাপ হাতের লেখার জন্যে নামকরা। একজন রোগীকে লিখে পাঠায় একবার দেখা করবার জন্যে। পেসেণ্ট আসে না। ইমপেসেণ্ট ডাক্তার নিজেই যায় রোগীর কাছে। গিয়ে জিজ্ঞেস করে : আমার চিরকুট পাওনি? আজ্ঞে হ্যাঁ, অম্লানবদনে জানায় রোগী : তক্ষুনি ওই চিরকূটে যা লেখা ছিলো সেই ওষুধ আনিয়ে খেয়ে নিয়েছি তো!

তিনটে, দুটো, নটায়

মিনার্ভায় কম্যুনিষ্ট ক্যানেস্তারা

ঃ প্রোফেসর মামলক্ ঃ

* আমার ১½ ঘণ্টা সময় নষ্ট *

ভ্রান্ত উদভ্রান্ত উৎপল দত্তের স্মরণীয় অভিনয়!

বৃহস্পতিবারের বারবেলা কতক্ষণ চলে আমি জানিনা তবে সেদিন ৫ই নভেম্বর রাত আটটার পরেও লেগেছিলো জানি। মিনার্ভায় ছিলাম সাড়ে ছটা থেকে আটটা। সিগারেট না খেয়ে দেড় ঘণ্টা সময় আমি নষ্ট করেছি, বারবেলায় বিপরীত বুদ্ধি হবার কারণেই। লিটল থিয়েটারের শোভাবর্ধনকারী অভিনেতা, পরিচালক, ইদানীং লেখক শ্রীমান উৎপল দত্তকে আমি সভয়ে এড়িয়ে চলি। সেদিন মরতে কেন উৎপাতে জড়াতে গেলাম এ জিজ্ঞাসার জবাব ওই,—বারবেলার ফাঁড়া। নাটকারম্ভের আগেই এক ভদ্রলোক ষ্টেজের ওপর থেকে তিনবার ভুল বাংলায় বললেন নাটক শেষ না হওয়া তক না উঠতে। কেন? না, নাটকের শেষে জনতার শিল্পী পল্ রোবসনের ইহুদী প্রতিরোধের গান আছে।

নাটক দেখতে দেখতে যে উঠে যেতে হবে, এসব সদিচ্ছা যে না হয়ে পারে না, এ জ্ঞান একমাত্র জ্ঞানপাপী লিটল থিয়েটারের পক্ষেই সম্ভব। তা না হয় হলো? জনতার শিল্পী বস্তুটা কী মশাই! আমি তো জানি শিল্পীর, যথার্থ শিল্পীর দুটি পরিচয় ; এক,--সে স্বধর্মে নিধন শ্রেয়জ্ঞান করে। দুই,--সে কখনই জনতার নয়, নির্জনতার। আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন ঃ বক্সিং চ্যাম্পিয়নের মতো জনতা আমাকে কাঁধে তুলবার চেষ্টা করলে, আমি আত্মহত্যা করতাম।

কোন্ জনতার কথা বলেছেন উৎপল বাবু? জনতা সিনেমা হলে তার শিল্পী.--মহেন্দ্র গুপ্ত ; আর জনতা সাপ্তাহিকের কথা বলে থাকলে তার অজ্ঞাত শিল্পী যতদূর জানি, অশোক সেন।

যিনি লিটল থিয়েটারের হয়ে তাদের নতুন প্রচেষ্টার—দর্শকসদস্য সূচির কথা থেমে থেমে কোঁৎ পেড়ে বললেন তাঁর তিনবার ভুল বাংলা থেকে বুঝলাম, এরকম আরও ৭টি মারাত্মক অভিনয় হবে। আমার নিবেদন,—আমাকে আর নিমন্ত্রণ করতে হবে না। এত গুরুভার আমার সইবে না, মাফ করবেন।

প্রসংগত, যার অন্ধ অনুকরণ কারণে ছবি দেখার জগৎ থেকে ক'বছর শত হস্ত দূরে থাকি, নাটক দেখতে এসেও, এই দর্শকসদস্য জাতীয় কারবারের যিনি গণেশ, তাঁর নাম

অপ্রসংগতও শুনলাম। আজ্ঞে হ্যাঁ,—১০৮ চলচ্চিত্র 'শ্রী' সত্যজিৎ রায়ের কথাই বলছি। লেটেষ্ট জার্মান নাট্য যুগের জন্মদাতা, বাংলা অক্ষরে নাম উচ্চারণ প্রায় অসম্ভব, 'BRECHT' নাট্য সংস্থার প্রবর্তনার ঘোষণায় শোনা গেল চলচ্চিত্র (হু) যুগাবতার সত্যজিৎ রায়ের নাম।

এই ঘোষণার সংগে হাতে গুঁজে দেওয়া হলো ইষ্ট জার্মানীর ইস্তাহার ঃ information bulletin ভারতের সংগে জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের দশবছর সৌহার্দ্যের স্মৃতিচিত্র।

বুঝলাম, সমস্ত ব্যাপারটাই রুশ প্রোপাগাণ্ডা। 'প্রোফেসার মামলক' নাটকও আসলে ওই একই উদ্দেশ্যে ক্যানেস্তারা পেটানো। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আমার নিমন্ত্রণ পত্রে ইংরাজীতে লেখা "প্রোফেসার মামলক" ;—প্রোফেসার বানানটাই ভুল ছিলো। অবশ্য, থিয়েটারওয়ালারা তো বানানের জন্যে নয়, বানানোর জন্যেই বিখ্যাত, তাই ওকথা তোলা বোধ হয়, বোধ হয় কেন আমারই ভুল হলো নিশ্চয়ই।

দুই

হিটলারের জার্মানীতে ইহুদিদের ওপর অত্যাচার নিয়ে লেখা নাটক প্রোফেসার মামলক্। সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু হিটলারের ইহুদি পীড়ন সত্য হলে রাশ্যার হাংগারি-নিপীড়ন মিথ্যে হবে কেন? হিটলার ফাসিষ্ট হয়ে কম্যুনিষ্ট মেরে ছিলেন। স্তালিন তো কম্যুনিষ্ট হয়ে কম কম্যুনিষ্টকে সরাননি এই ধরা থেকে। ট্রটস্কিকে তো মেক্সিকোয় হাতুড়ি পিটিয়ে মারা হলো! এই সেদিনও তো বেরিয়া মরে সাইবেরিয়ার হাত থেকে বাঁচলেন। হিটলার দানব হলে স্তালিন মানব হবেন কেন? এর কারণ তোজো বলেছিলেন ঃ আমরা পরাজিত তাই আমরা ক্রিমিন্যাল ; জিতলে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ হতো, পেট্রিয়টিক!

হিটলারের সংগে স্তালিনের সম্পর্ক যে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,—লিটল থিয়েটারের গোবর ভরা মাথায় তা কবে প্রবেশ করবে? কিংবা এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স তা জানে ; তবুও রাশ্যান ক্যানেস্তারা পেটানোর কারণ বুঝি কোনও নেপথ্য নাটক হবে। কারণ, নবনাট্য আন্দোলনের পোস অনেক, PURPOSE তো সেই এক, আদি ও অকৃত্রিম বহু RUPEE!

তিন

তবুও এ নাটক নিন্দিত না হয়ে নন্দিত হতে পারতো যদি এ নাটক হতো। এ না টক না মিষ্টি কিছুই হয়নি। নাটকের প্রাণ সংঘর্ষে। এর কোথাও তা দানা বাঁধেনি। একতরফা হিটলারী অত্যাচার, আর অন্যপক্ষে একতরফা ইহুদি হাহাকার, এ নিয়ে ডক্যুমেণ্টারি হয়, ড্রামা হয় না। উদ্দেশ্য সাধু হলেই সৃষ্টি হয় না। উদ্দেশ্য যদি নাটকত্বকে অতিক্রম করে তাহলেই তখন তা আর নাটক নয়, অসাধু প্রোপাগাণ্ডায় পর্যবসিত। আর্ট ফ আর্টস্ সেক যেমন গুড ফ নাথিং, তেমনই ড্রামা ফ ডকুমেণ্টারিস্ সেক এ আরও খারাপ, কারণ এ হচ্ছে ব্যাড ফ নাথিং! নাৎসিসমের পক্ষে যে ডাক্তার বলবার চেষ্টা করেছে, তার মুখ দিয়ে বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে ঃ এ যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝানো যাবে না। অর্থাৎ, যে ভিলেনকে শেষ দৃশ্যে শুইয়ে ফেলা হবে তাকে আগে থেকেই পা-য়ে ঘা করে রাখা। এতেই প্রোপাগাণ্ডার ফ্যাকচুয়াল ভ্যালুও নষ্ট হয়। যিনি এ তথ্য জানতেন তিনি হচ্ছেন শ'। তাই তাঁর প্রোপাগাণ্ডা নাটক হয়েছে এবং প্রোফেসার মামলক নাটক অতি অকিঞ্চিৎকর

প্রোপাগাণ্ডা হয়েছে। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই। তাই বলছি, এহ বাহ্য!

তার বদলে শ্রীমান উৎপল দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞেস করি : নেড়া বেলতলায় কবার যায়? অংগার নাটক চলবার সময় চীনাক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে একবার দর্শকরা কেমন ভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলো কম্যুনিষ্টপন্থী প্রচারের প্রচেষ্টা তা কী মনে নেই এই লিটল থিয়েটারোলাদের? তারপরেও আবার এই প্রোফেসার মামলক-এর সিঁদুরে মেঘ দেখে ঘরপোড়াদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো না? চীনাক্রমণ যে কোনও মুহূর্তে আবার শুরু হতে পারে, তখন? তখন লিটল থিয়েটার সরে পড়তে পাববে, কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটার? ওই রংগমঞ্চে যে মঞ্চরংগ সুরু হবে তা ঠেকাবে কোন্ অর্বাচীনপন্থীদের সপ্তম (কা) পুরুষ!

কিংবা উৎপলরা চিরকাল Rush in where angels fear to tread!

তবুও। তবুও, প্রোফেসার মামলকের কখনও ভ্রান্ত কখনও উদ্‌ভ্রান্ত ইহুদী ভূমিকায় উৎপলের স্মরণীয় অভিনয়ের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর সম্প্রদায়ের নয় কেবল, বাংলা দেশের যে কোনও মঞ্চ শিল্পীর তুলনায় উৎপল দত্তের অভিনয় ক্ষমতা এত উঁচুদরের যে 'দ্রাক্ষাফল অতি টক' বলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাঁর মঞ্চে প্রবেশ, প্রস্থান, সংলাপ উচ্চারণ, অভিব্যক্তি এমন একটি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে যাতে সম্মোহিত না হয়ে উপায় থাকে না।

হতভাগ্য এই শিল্পীর এমন কোনও বন্ধু নেই যে একে বোঝায় যে নাটক লেখা তাঁর কাজ নয়। অভিনয় করা তাঁব পক্ষে অনেক বড়, একমাত্র কর্তব্য। এই নাটকের যে অনুবাদ তিনি করেছেন তা শুনে আমার মনে হয়েছে হয় আমি বাঙালী নই, নয় উৎপল ডাট্ খাঁটি জার্মান!

তবুও। তবুও, নাটক লিখতে ইচ্ছে করে যে আমার কখনও কখনও, তা কেবল এই উৎপলের কথা মনে করেই। উৎপল অভিনয় করলে, নাটক লিখে MONEY হয় কিনা জানি না, কিন্তু মানে হয় যে নাটক লেখার তা জানি।

দী-কু-সা

[বর্ষ ৪, ৩য় সংখ্যা, ২০ নভেম্বর, ১৯৬৪]



—ও কিছু না! পাশের বাড়ির বিজনদা বোধহয় একটু আপসেট হয়েছেন...।

আশাবরী

নীলকণ্ঠ

এক

খোয়াতলা বাই লেন, কে নাম রেখেছিলো, কে আর মনে রেখেছে তা। কিন্তু লোকটা সব জানতো। গত ক'মাসের মধ্যে এই গলিটায় জলজ্যান্ত ছ'টা লোক মরে গেলো। দুটো লোক, একজন বেটাছেলে আরেকজন মাঝবয়সী মহিলা মারা গেলো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। একজন ভোর রাতে, আরেকজন সন্ধ্যায়। এর মধ্যে কলকাতায় ট্রামভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে ছাত্র এবং পুলিশে নিদারুণ মারপিট হয়ে গেছে। মোহনবাগান লীগ পেয়েছে। এলিটে মাই ফেয়ার লেডি বক্স-অফিস হিট করে বসে আছে হপ্তার পর হপ্তা। 'বাসের পা দানিতে ঝুলে যাবেন না' এই শ্লোগান কখনও তারস্বরে, কখনও মিওনো কণ্ঠে বার কয়েক উচ্চারিত হয়ে মুলতুবি রইলো সাইন্ ডাই। হরিণঘাটাকে বাঁচাবার জন্যে সন্দেশ শহীদ হলো, সেও এই সময়ের মধ্যেই। কেবল খোয়াতলা বাই লেনে এতটুকুও কাটলো না দুঃসময়। কোনও উত্তেজনা, কোনও উন্মাদনা, কোলকাতার ছোট-বড় কোনও কোলাহল এসে পৌঁছলো না এই একফালি গলিতে। খোয়াতলায় কেবল থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠলো মরা-কান্না : বল হরি হরি বোল্। কখনও আবার নিঃশব্দে সম্পন্ন হলো সতীদাহ। যেমন সিংহানিয়ার বউ মারা গেলো, গায়ে আগুন ধরিয়ে। যে কারণে এই অসম দুঃসাহসিক কাজ সে করলো সে কারণ গত দশ বছর ধরেই বর্তমান ছিলো। কিন্তু ঠিক এই সময়টাই সে উপযুক্ত মনে করলো, হঠাৎ স্বেচ্ছায় কেটে পড়বার এই তাগিদ তাকে কে দিলো, খোয়াতলা বাই লেনের নামকরণ করেছিলো কে, এ প্রশ্নের মতো তাও অজ্ঞাত রইলো।

সিংহানিয়ার বউটা আত্মহত্যা করবার পরই প্রথম খেয়াল হলো খোয়াতালাবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার যে এই গলির কুষ্টি বেজুত হয়ে গেছে। একটার পর একটা ফাঁড়া তার আগে থেকেই চলছে, হিসেবে ধরা পড়লো। সতের নম্বর বাড়িতে প্রায় সত্তর বছরের ফণী কাঞ্জিলাল এ ঘটনার কয়েক বছর আগে কড়িকাঠে ঝুলছিলো, এখন তার মৃত্যুকেও টেনে আনা হলো গুণতির মধ্যে। গলির মুখটায় দাঁড়িয়ে বসে সন্ধ্যেরাতে যে জটলা হয় সেখানে চোঙা প্যান্টের একটা বললো : কাঞ্জিলালজ্যাঠা তো তিন বছর আগে আত্মহত্যা করেছে, তার কথা এখন উঠছে কেন?

উঠছে এই জন্যে, পণ্ডিত মশাই অনেকক্ষণ হাতের টিপে ধরা পুরো নস্যিটা নাকের গর্তের মধ্যে ঠেসে দিয়ে বললো : তখন থেকে বলছি যে এ পাড়ার একটা শান্তিস্বস্তয়ন করা প্রয়োজন [প্রো না বলে প্র বলেন তিনি] তারপর পাশের ফ্ল্যাটের ছোকরা বড়বাবু ক্ষিতিভূষণকে উদ্দেশ্য করে ক্রেডিটটা পুরোপুরি নিলেন নিজে : বলেছি কিনা তোমাকে যে, সত্তর বছরের বৃদ্ধের আত্মহত্যা বিরল ঘটনা। এ স্থান কোনও কারণে কপিত হয়েছে--

তখনও অবশ্য পণ্ডিত মশাই জানতেন না যে তিনি এই গলির সব চেয়ে পুরোনো ঘুঘুদের একজন হলেও, সৌভাগ্যবান। কারণ কয়েকদিনের মধ্যে তার বউ বলা নেই কওয়া নেই, ওঠ বুড়ি তোর ছুটি-র কায়দায় চার জনের কাঁধে উঠলেন। এমনকি যে জলটুকু চেয়েছিলেন তাও খাবার সময় পেলেন না। মরবার পর জানা গেলো পণ্ডিতপত্নীর ব্লাড প্রেসার ছিলো।

সিংহানিয়ার বউ সারা গায়ে কেরোসিন-সিক্ত নেকড়া জড়িয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে মারা

যাবার পর, একদিন দুপুরে এগলির সবচেয়ে ঈর্ষাযোগ্য ইয়াংম্যান সন্দীপন মজুমদার অফিসের গাড়িতে বাড়ি ফিরে দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে দরজা ভেঙে ফেলবার উপক্রম করতেও যখন সাড়া পাওয়া গেলো না ভেতর থেকে তখন সমস্ত খোয়াতলা বাই লেন এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। সকলের মুখেই অনুচ্চারিত সিদ্ধান্ত মুদ্রিত ঃ আর একটা—। অর্থাৎ আর একটা গেলো। এবং সুইসাইড করেই গেলো যে, সেবিষয়েও মতভেদ প্রকাশ করলো যে সে বেচারা সাংঘাতিক একলা পড়ে গেলো। যেমন চৌধুরীদের বউ বললো ঃ হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে অরুণা। অরুণা হচ্ছে সন্দীপনের সুন্দরী স্ত্রী। একটা বাচ্চা হয়েছে সবে। বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী থাকে না দুপুরে।

চৌধুরী-বউ-এর শাশুড়ি খেঁকিয়ে উঠলো ঃ তুমি থামো বউমা। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিতে যেও না। প্রেম ক'রে বেজাতে বিয়ে, হবে না?

এর মধ্যে কখন্ একজন পাশের বাড়ির ছাদের কার্নিস দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে সন্দীপনের ছাদে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে নাম ধরে ডেকেছে অরুণার। ধড়মড় করে উঠে বসেছে। দরজা খুলে দেবার পর লজ্জায়, লাল টুকটুকে লজ্জায় তার ফর্সা মুখ সন্ধ্যেবেলার আকাশ হয়ে গেছে সেই দ্বিপ্রহরেই।

সবাই হাঁফ ছেড়েছে। শুধু চৌধুরী-কর্ত্রী ছাড়া। কী বলেছিলাম,—কলকলিয়ে উঠেছে মুখরা চৌধুরী-বউ। শ্বাশুড়ি চলে যেতে যেতে ঠোঁট বেঁকিয়েছেন ঃ ঢঙ্!

দুই

জাপানী বোমার হিড়িকে যা হয়নি খোয়াতলা বাই লেনে এবার তাও হলো। সন্দীপনের সুন্দরী স্ত্রী অরুণার কমিক রিলিফের পর, ছাদ থেকে পড়ে মারা গেলো বোসেদের সতের বছর বয়েসের চাকর কাঞ্চন। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে তিনতলার ছাদ থেকে রাস্তার ওপর। তখন খাঁ খাঁ করছে রাস্তা। চায়ের দোকানের লছছিরাম প্রথম টের পেয়েই গগনভেদী আর্তনাদে পাড়ার ঘুম ভাঙালো। কিন্তু হাসপাতালে মাস পেরোলো না, চার কাঁধে চেপে চললো দত্ত মশায়ের শালী। স্কুলের হেডমিসট্রেস দত্তের শালী মারা গেলো অবশ্য খোয়াতলায় নয়, শিমূলতলায়। জানাও গেলো খবরকাগজ থেকে তার রহস্যজনক মৃত্যুর খবর প্রথম। খবর কাগজ থেকেই জানা গেলো আরও যে, স্কুলের টাকার হিসেব মেলাতে না পেরে ক্যাসিয়ার পুলিশের কাছে সেক্রেটারি এবং হেডমিসট্রেসের নাম করেছে। এবং একদিন ঘুম থেকে আর সকালে ছুটি উপভোগরত দত্তর শালী মঞ্জু সরকার উঠলো না। দরজা ভেংগে সদলবলে ডাক্তার ঢুকে রায় দিলো, ঘুমের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে কমলাক্ষ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের হেডমিসট্রেস। তার ডেডবডি শিমূলতলাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলো বটে, তবে খোয়াতলায় কেউ কেউ সেই ছাই উড়িয়ে দেখতে লাগলো কেচ্ছার অমূল্যরতন মেলে কিনা।

রঘুবীরের চায়ের দোকানে সবে প্রথম কেটলি উনুনে বসেছে। সদ্য বিপত্নীক পণ্ডিত মশাই বরফ ভাঙলেন জানি জানি, ওই দত্তর বজ্জাতির জন্যই অকালে মোলো—

কিছুই জানেন না আপনি,—পাড়ার সব চেয়ে মুখফোঁড় ছোকরা, কেষ্টধন ফস করে বলে বসল, এই দেখুন—একটা খবরকাগজ পণ্ডিত মশায়ের অপ্রসন্ন চোখের ওপর মেলে ধরে কন্টিনু করলো কেষ্ট ; স্কুলের ক্যাশ নিয়ে কেলেংকারি এড়াতেই ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন—

পণ্ডিত মশাই ভাঙেন কিন্তু মচকান না ; তাতে দত্তর বজ্জাতির কথাটি মিথ্যে হবে কেন?

এইজন্যে যে নিজে বজ্জাত না হলে কেউ মরে না—

সকাল সাড়ে পাঁচটার প্রহসন সাড়ে আটটা পর্যন্ত নন্-ষ্টপ চললো। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় খোয়াতলায় পুলিশফাঁড়ির সামনে খাটিয়া পেতে যখন চৌকিদার বসলো ওয়াচ করতে ঠিক উল্টো দিকের কালো কাঠের বাড়ীর নেপালী দারোয়ানের বউ-এর খুনের কিনারা করবার কারণে তখন সব চেয়ে ঠাণ্ডা মানুষ এই গলির, তবলার মাষ্টার ভূষণ তরফদার পর্যন্ত নড়ে চড়ে বসলো।

একটা ভয়ংকর অশুভ কিছুর ছায়া সত্যি সত্যি জাপটে ধরেছে যে খোয়াতলা সেকেণ্ড বাই লেনকে, এখন আর তা ঘরে-বাইরে জানতে বাকী রইলো না কারও। যারা এসব কল্পনাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়েছে এখন তাদের গলাতেও আর সে জোর নেই। সন্ধ্যে হতে না হতেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে খোয়াতলা। আজ রাতে আবার কে যায়। একটু জ্বর হলে কোনও বাচ্চার বুক কাঁপে এই গলির। রাত কখন সকাল হবে, তার অপেক্ষায় যমে মানুষে যেন অদৃশ্য যুদ্ধ চলে। দিন হলে, কোনও কারণ নেই নির্ভয় হবার কারণ দিনের বেলাতেই সিংহানিয়ার বউ গায়ে আগুন দিয়েছিল, তবু যেন মনে হয় একটা রাত ভালোয় ভালোয় কাটলো।

অমাবস্যার রাতের চেয়েও কালো একটা বেড়াল পাড়ায় আসতো, এখন তাকে দেখলেই তেড়ে যায় সবাই, তবু ফাঁড়ির পাঁচিলে হঠাৎ মাঝ রাতে কান্না মধ্যরাত্রির মেঝের ওপর দিয়ে যেন টিন ঘষে নিয়ে যায়। দাঁতগুলো পর্যন্ত শিরশির করে যেন খোয়াতলার। তার সংগে ডুয়েটে কাঁদে রঘুবীরের চায়ের দোকানের কুকুর। মৃত্যুর গন্ধে মাতাল হয়ে উঠলো খোয়াতলা।

এই সংগে যোগ দিতেই বুঝি সেদিন কারেণ্ট ফেল করলো এই গলিতে ঠিক সন্ধ্যের পরেই। মোমবাতির আলোয় সর্বনাশের স্ফুলিংগ গলে গলে পড়তে লাগলো ঘরময়। রাত বাড়লো কিন্তু বাতি জ্বললো না, ঘুরলো না একটা পাখাও। নিঃশব্দ অন্ধকারে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলো খোয়াতলা বাই লেন। রাত বারোটায় প্রচণ্ড কোলাহল পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো কান্তি মিত্তিরের বাড়ির দিকে। হরিমোহন লাঠি হাতে না করেই বেরিয়ে পড়লেন উত্তেজনার মুখে। নিছক গোঁয়ার্তুমির জন্যে সার্জনের আরেকটা প্রাণ বলি হবে খোয়াতলায় সুনিশ্চিত। ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন তিনি ; তাঁর কথা যেন সত্যি না হয়।

তখন ভেংগে পড়েছে কান্তি মিত্তিরের বাড়ীতে প্রচণ্ড সংখ্যায় আবালবৃদ্ধবণিতা। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করেন হরিমোহন ; কেউ জবাব দেয় না। চীৎকার করে ওঠেন হরিমোহন ; তোরা কি কালা? কানে শুনতে পাস না? না বোবা? কথা বলিস না কেন? কী হয়েছে?

উত্তর আসে, কান্তি মিত্তিরের ভুতুড়ে বাড়িব দোতলা থেকে। মধ্য রাত্রির অন্ধকার ফেঁড়ে ফেলে দেয় এই পৃথিবীতে বুঝি প্রথম কান্না ; ওঁয়া! ওঁয়া! ওঁয়া! শাঁখ বেজে ওঠে ঠাকুর ঘরে। বলে ওঠে কে ঃ ছেলে, ছেলে হয়েছে বৌমার!

হরিমোহন তাকান আকাশে। হঠাৎ মনে হয় তাঁর, অন্ধকার আকাশে যেন জবাকুসুমের আভাস।

মাঝরাতেই সূর্য উঠে পড়বে নাকি!

[বর্ষ ৪, 'পূজা সংখ্যা নয়', সংখ্যা ৪৩]

বই-ঠকখানা

বিচিত্র গুপ্ত

পৃথিবীর সবচেয়ে কিছু নিকৃষ্ট সাহিত্যরচনা আসন্ন, যা নিয়ে খুব শিগগিরই বাংলা দেশের বৈঠকখানা থেকে শয়ন ঘর পর্যন্ত বিচলিত হবে তার বিষয় অচল পত্রের [পা] ঠগদের সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করেই মহাপ্রলয়ায় কলম ধরেছি। যাতে না মহালয়ায় ঠকতে হয়।

মহালয়ার সময়ে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পচামাল চালাবার গুদাম খোলা হয়। এই গুদাম হল পূজাসংখ্যা নামক ভয়ানক সাহিত্যসংখ্যা। এরা এক বা দুই নয়, শত শত। বাংলা দেশের দিকপাল লেখকরা তাই মহালয়ার দুমাস আগে থেকেই ডন বৈঠক দিয়ে দুরস্ত হতে থাকে তাদের পাঠক ঠকাবার জন্য। এক একজন পাঁচ থেকে অনায়াসে পঞ্চাশ পর্যন্ত অপাঠ্য রচনা লিখে কৃতার্থ হন। তারপর ব্ল্যাকমার্কেটে মাল বিক্রীর মতো গোপনে পত্রিকা মালিকদের হাতে সেই দাক্ষিণ্যের দান প্রচুর মুদ্রার বিনিময়ে তুলে দেন।

তাঁদের ধারণা, যা দিলাম তার তুলনা নেই। পূজা সংখ্যার পাঠক ঘণ্টা বাজিয়ে ড্যাং ড্যাং করে এসব রচনা পাঠ করে নিজেদের তারিফ করবে। আর সাহিত্যের জয়ধ্বজা বহন করে তাঁরা পুনরায় শীর্ষভূমিতে সমারূঢ় থাকবেন।

বাংলা দেশে পূজা সংখ্যা পত্রিকা এখন দু-রকম। এক রকম সিনেমা ও অন্য রকম সাংস্কৃতিক। কিন্তু নামের এই নামাবলী বাদে উভয় জাতীয় পত্রিকার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। শুধু শরীরে মেদবৃদ্ধির মতো দু-তরফেরই অকারণ কলেবর বৃদ্ধিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। ফলে দুতরফের প্রতিযোগিতা চলে উপন্যাসের সংখ্যা নিয়ে।

আগে পূজা সংখ্যা পত্রিকাতে কিছু গল্প ও প্রবন্ধ ও একখানা ভাল উপন্যাস ছাপা হত। সে রামও নেই সে রাজত্বও নেই। ভেজালের দেশে সবই জাল। এখন সব পত্রিকাতে প্রকাশিত উপন্যাসগুলি জাল। নামে উপন্যাস, আসলে কিছু প্যারাগ্রাফের ও বিজ্ঞাপনের বিন্যাস মাত্র। যাঁরা উপন্যাস লেখেন, তাঁরা বছরে ছটা উপন্যাস লিখবেন, সুতরাং পঞ্চাশ পাতার বেশি উপন্যাস এপিক হয়ে যায়। আর যারা উপন্যাস ছাপবে তাদের লক্ষ্য সংখ্যায় কত উপন্যাস ছাপছি। কত পাতার উপন্যাস বা আদৌ উপন্যাস কিনা এসব কোনো লক্ষ্যবস্তু নয়। এক একজনের কম করে পাঁচটি উপন্যাস ছাপা চাই।

পাঁচটির উপরেও আবার গোপন আছে। যেমন ধরুন, একই ধরনের দুটো পত্রিকা পাঁচটি করে উপন্যাসের বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছে। দু'তরফই নিশ্চিন্ত ওরও যা, আমারও তাই। হঠাৎ তারই মধ্যে একজন ঠিক প্রকাশের আগের দিন, আর কি অন্যপক্ষের নাভিশ্বাসের সময় শেষ বিজ্ঞাপন ছুঁড়লেন, পাঁচটি উপন্যাস ছাড়া আরো একখানি বিশেষ ধরনের বিরাট রচনা লিখেছেন অমুক...

ব্যস্ প্রতিপক্ষ কাত। সে তো আর সময় পাবে না এই ষষ্ঠ বিশেষ বস্তু ছাপবার। তা হলে ষষ্ঠীতেও কুলবে না। এর প্রতিশোধ হয়তো সেই পত্রিকা নেবে পরের বছর! এ ভাবেই বছরের পর বছর ধোঁকাবাজির প্রতিযোগিতা চলবে।

তার মানেই এই দেশের সকল লেখকরাই পূজা সংখ্যার নামে পাঠকের পকেটে হাত দিয়ে পকেটমার হন। তাঁদের সহযোগিতার জন্য হাজির সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিকের

মালিকরা। তাঁরা পূজা স্পেশালের বহু পূর্ব থেকে লেখকদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দাদন দিতে থাকেন। ফলে লেখকরা উৎসাহিত বোধ করে যা খুশি মালকে সামাল সামাল রবে পূজায় ছাড়তে থাকেন।

পনেরো পাতারও উপন্যাস আপনি এ দেশে পাবেন, আধ পাতার গল্প! যেসব লেখকরা বেশি মুজরো নিয়ে ফেলেন, সময়কালে উপন্যাস বা গল্প দিতে পারেন না, তাঁরা তখন কবিতার আশীর্বাদ বৃষ্টি করতে থাকেন। অনেকে অপাঠ্য চিঠিও দেন। যেন তাঁর এই রচনা পাঠ করেই পাঠক কৃতার্থ হয়ে থাকবে।

আগেকার দিনে প্রবন্ধ ছিল বিশেষ সংখ্যা পত্রিকার এক সম্পদ। এখন প্রবন্ধের কোনো মূল্য নেই। পাগলে লেখে আর ছাগলে পড়ে বলে প্রবন্ধ লেখকরা কোনো পুরস্কারও পান না। (কয়েকজন বিশেষ পরিচিত ব্যতিরেকে) নেহাৎ যদি চল্লিশ ফর্মার কাগজ ভরতে তামাম বাংলা দেশে গল্প উপন্যাস ইত্যাদি না পাওয়া যায়, তাহলে দু-চারটে প্রবন্ধ ছাপা হয়ে যায়! প্রবন্ধ লেখক কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই পত্রিকা মালিকের বা সম্পাদকের বশংবদ হয়ে থাকেন।

কবিতার অবস্থা আরো মারাত্মক। নেহাৎ পাদপূরণের কাজ চলে তা দিয়ে। পাঁচ সাতজন নামকরা কবির সঙ্গে পঁচিশজন উঠতি কবির কবিতা মিলিয়ে সমস্ত পুস্তকের এধারে ওধারে জায়গা ভরানো। এ বিষয়ে আবার সিনেমা পত্রিকা কোম্পানীরা অনেক বেশি সচেতন, তারা কবিতার বদলে তাদের মূল্যবান কাগজের পৃষ্ঠা নষ্ট করতে রাজী নন। ওই স্থানে কিছু বিজ্ঞাপন ছাপলে পত্রিকার লাভ অনেক বেশি। তার ওপর দেশী বিলেতী আধা বিলেতী বিজ্ঞাপন কোম্পানীও একবার আড়চোখে দেখে উপন্যাস কে কে লিখছে। কবিকুলের দিকে তাদের নজর দেওয়ার সময় নেই। আর কবিদের চেনার চেয়ে কপিদের চেনা অনেক সহজ। সুতরাং কবিতার বাজার দর শূন্যের অঙ্কের নিচে। যদি তার নিচে কোনো মহৎ লেখকের সই থাকে, যিনি গদ্য দিয়ে কৃতার্থ করতে না পারার জন্য পদ্য দেন।

পূজার বিশেষ সংখ্যার আকর্ষণ একমাত্র হরেক রকম বিজ্ঞাপন দর্শন। ধাপ্পা দিয়ে পাঠকের কাঁধে পা তুলে নানা ধরনের সামগ্রীর বিজ্ঞাপনই হল বর্তমান বাংলা দেশের পূজা স্পেশাল। পাঠক হয়তো সেসব বিজ্ঞাপনের জালে দিশেহারা হয়ে নাজেহাল হবেন! চেতনা হারিয়ে চৈতন্য লাভ করবেন এবং এর নাম কেন বিজ্ঞাপন সংখ্যা নয় বলে নিজেদের বৈঠকখানায় থানা-পুলিশ করবেন, তাঁরাই কিন্তু কেনবার সময় ভুলে যাবেন এসব কথা।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকম, লেখক তার পাঠককে ঠকাচ্ছে। পত্রিকা ব্যবসায়ীকে ঠকাচ্ছেন, নিজে লাভ করছেন মনে করে ঠকছেন। পত্রিকা পাঠক ঠকাচ্ছেন, লেখককে ঠকছেন, নিজেরা লাভবান হতে হতে বাংলা সাহিত্যেব শেষ করে ছাড়ছেন। পাঠক নিজে ঠকে লেখককে ঠগ হতে দিচ্ছেন এবং পত্রিকাগুলোকে ঠগের আড্ডায় পরিণত করছেন।

এভাবে বাংলা দেশের পূজো সংখ্যার হিড়িকে সাহিত্য ক্রমশঃ সৎ পথ থেকে পা হড়কে অসৎ পথের ভূযিমালে পরিণত হচ্ছে। তামাম মহালয়া থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত জাল আর ভেজাল লেখার অতি বৃষ্টিতে সাহিত্যের মাঠ হেজে মরে মহামারীতে পরিণত হচ্ছে।

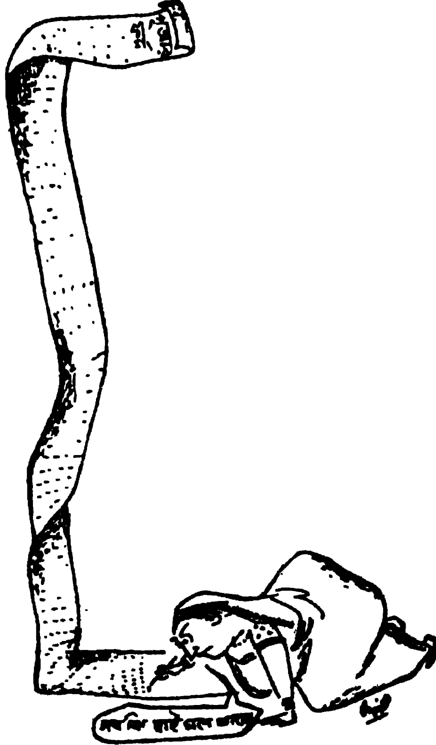
বই-ঠকখানায় বই বাদে আর সব কিছুরই প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। পূজোর হিড়িকে আবার বহু মৃত লেখক জ্যান্ত হয়ে পূজো সংখ্যার দোলায় চেপে ভূতের নৃত্য দেখাতে শুরু করে। তাদের বৈঠকে পাঠকদের ত্রাহি ত্রাহি ডাক শোনা যায়। এইসব মৃত লেখকদের নামাবলীর দরকার নেই, এদের নামের বিজ্ঞাপনেই পাঠকরা ভুল করে হুড়োহুড়িতে যা পাচ্ছে তাই কিনে নিয়ে নিজেরাই ডন বৈঠকে সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করছেন।

আসলে পূজো সংখ্যা বাংলা সাহিত্যের আদ্যশ্রাদ্ধ আর কিছুই নয়। কোনো রকমে দিস্তা পাঁচেকের কাগজকে কালি মাখিয়ে ওপরে একটা প্রচ্ছদের জামা পরিয়ে দিতে পারলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করেন সম্পাদকরা! যা নিয়ে পাতা উলটে বত্রিশ ভাজা খাবার স্বাদ

নিয়ে ভাবা যায় দেশ থেকে যখন সন্দেশ উঠে গেছে তখন (সঙ) দেশ পড়েই আত্মহারা হতে হয়।

তাই বলছিলাম, বই-ঠকখানার ঠক বাছা (পা)ঠকের কর্ম না, তারা শুধু সাবধান হয়ে পূজো সংখ্যা পরিহার করে চলেন। এই সাবধান বাণী ভাল না লাগলে গ্যাঁটগচ্ছা দিতেই হবে। অনেকের কানে জল ঢোকে না, যখন ঢোকে তখন কান. না পেকে নিস্তার নেই, সুতরাং এই লেখা পাঠের পরও যারা পূজো সংখ্যা নামক এই সর্বনাশা পাঞ্জিকা কিনতে দৌড়াবেন তাঁরা ফলেন পরিচীয়তে হবেন এ আর বেশি কথা কি? অলমিতি বিস্তরেণ।।

['পূজা সংখ্যা নয়' ঃ বর্ষ ৪, , সংখ্যা ৪৩]



পূজার ফর্দ করা সহজ নয়..

হিন্দুস্থান না হিন্দীস্থান

নামে সেক্যুলার, আসলে পেক্যুলার স্টেট ইণ্ডিয়া দ্যাট ইস ভারতে নিজেকে হিন্দু বললে রক্ষে নেই ; কিন্তু হিন্দি বললে তার পোয়াবারো। হিন্দি হচ্ছে দিল্লীকা লাড্ডু। হিন্দি বললে হায় হায় করতে হবে, না বললেও হায় হায় করতে হবে। এ বছরে ২৬শে জানুয়ারীর উপহার এই দিল্লী কা লাড্ডু। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ যেদিন ভারত ভাগ হয়েছিল, সেদিন পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালীদের পক্ষে দিনটা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্দিন। ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের দায়িত্ব ভারত সরকারের। সে প্রতিশ্রুতি সরকার পালন করেনি। ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ভিখিরির জীবন যাপনে কখনও বাধ্য হয়েছে শরণার্থীরা ; কখনও বা বধ্য হয়েছে পাকিস্তানীদের হাতে। আজ ১৯৬৫-র ২৬শে জানুয়ারী, তাদের সবচেয়ে বড় দুর্দিন বাংলা যাদের মাতৃভাষা। মায়ের থেকে মাসির দরদ ওই দিন থেকে বেশী হবে। দক্ষিণের লোকেরা গায়ের জোরে দিল্লীর বাদশাহর কাছ থেকে কিছু সুবিধে আদায় করে নেবে। যে পারবে না সে হচ্ছে বাঙ্গালী। বাংলা দেশে যে সব তরুণেরা আজ আছেন, জাতীয় আন্দোলনের চেয়ে টুইস্ট্ নাচের কোমর দোলান তাদের কাছে আজ অনেক বেশী আদরের। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন যেদিন খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন সেদিন বাঙ্গলা দেশের ছাত্ররা শেষ আন্দোলন করেছিল। আজ হিন্দী ছবি, হিন্দী গান বাঙ্গালীর ছেলেদের কাছে সবচেয়ে নয়নলোভন ও শ্রুতিশোভন। তৃতীয় শ্রেণীর কতকগুলি বিদেশী জলছবি দেখবার জন্যে তাদের যে পরিমাণ আকুলতা, তার কণা মাত্র ব্যাকুলতা মাতৃভাষার প্রতি থাকলে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ স্রোতের মুখে তৃণের মত বরবাদ হয়ে যেত।

বলা হয়েছে যে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হবে এটাই সংবিধান-সম্মত। আমাদের বক্তব্য এই যে কতকগুলি সংদের বিধান আর সংবিধান এক বস্তু নয়। সংবিধানের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশান। অহিন্দিভাষীদের হিন্দি বলতে বাধ্য করানো মানে ফ্রিডাম নয়, ফ্রিডুম অফ এক্সপ্রেশান। একটি বেশী ভোট পেয়ে সেই বিল এখন কার্যকরী হতে চলেছে যে বিল অচিরেই খাল হয়ে দেখা দেবে ; যে খাল কেটে কুমীর দ্বিধা বিভক্ত ভারতবর্ষকে শতধা বিদীর্ণ করবে। যে সংহতির জন্যে ভারত সরকারের এত চেষ্টা সেই সংহতির ডালেই হিন্দীর কুঠার মারছেন তাঁরা। পরশুরামের কুঠারে মাতৃবধ হয়েছিল ; রামরাজত্বে হিন্দির কুঠারে আজ অহিন্দিভাষীদের মাতৃভাষা বলি হতে চলেছে।

অথচ কত সহজেই এই ভাষা বিরোধ মেটানো যেত। প্রত্যেক প্রদেশ যদি মাতৃভাষা এবং ইংরেজি শিখত তাহলে কারুর সঙ্গে কারুর ভাবের আদান প্রদানে অভাবের চিহ্ন থাকত না। কিন্তু যেহেতু ইংরিজি বিদেশের ভাষা সেহেতু সবাইকে বিদেশীতর ভাষা হিন্দি গিলতে হবে। লড়াইটা ছিল ইংরেজের সঙ্গে ; ইংরিজির সংগে নয়। ইংরিজি না জানলে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম কাকে বলে, নেশান কি বস্তু, তাই জানতাম না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঐক্য এক ইংরেজ রাজত্বেই হয়েছিল। আজ ইংরেজ নেই ; স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য হিন্দির মাধ্যমে আসবে না। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেছেন, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করলে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতি কুমার সাহিত্যসম্মেলনে বলেছেন হিন্দির এ অধিকার নেই। আমরা বলতে পারি যে সংবিধান সংশোধন করা দরকার। স্বয়ং নেহরুও বলেছিলেন যে ঃ

'Nevertheless, let it not be said that every part, every chapter and every work of that Constitution is so sacrosanct that it cannot be

changed even if the needs of the country or the nation so demand.'

হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হবে, ২৬শে জানুয়ারীর পর এটা যদি সেটেলড্ ফ্যাক্ট, তবে আজ সুরেন ব্যানার্জি বেঁচে থাকলে বলতেন, "We shall unsettle the Settled fact"। সুরেন্দ্রনাথ নামে এবং কাজে ছিলেন : SURRENDER NOT! অতুল্য ঘোষের বাংলা আরম্ভেই বলে বসে আছে : SURRENDER নাথ...

[বর্ষ ৪, ১৪ সংখ্যা, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫]

ভাষা বিভ্রাট

[নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণের অংশ]

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সুফল যাহা বাঙ্গালার জনগণের মধ্যে দেখা দিল, তাহা হইতেছে তাহার মাতৃভাষার প্রতি বাঙ্গালী সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর অনুরাগ, এবং কি ইংরেজী কি সংস্কৃত শিক্ষিত জনের প্রয়াস হইল, কি করিয়া মাতৃভাষাতে সৎসাহিত্য রচনা করা যায়। ইংরেজ ও ইউরোপীয় অন্য জাতির অনুসরণে এই যে মাতৃভাষার প্রতি দরদ, মাতৃভাষাকে নবীন সাহিত্যসম্ভার পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহা ছিল আধুনিক ভারতের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের সবচেয়ে বড় কথা ; বাঙ্গালী তথা ভারতীয় জনগণের মনকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করার অন্যতম মুখ্য সাধন ছিল—আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে ইংরেজীর দৃষ্টান্তে এই নবীন সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা।

হিন্দী হবে না—

হিন্দি কথা বলব না, হিন্দি ছবি দেখব না, হিন্দি গান শুনব না, হিন্দি শিখব না,—আজকের বাংগালীর রক্ত দিয়ে এই কথা লিখতে হবে, জীবন দিয়ে বলতে হবে এ-কথা। একথা বলতে গিয়ে যদি ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মুছে যেতে হয় তবুও করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। বিয়াল্লিশে সাহেবদের বলেছিলাম কুইট ইণ্ডিয়া। মোসাহেবদের বলব কুইট বেংগল। সংবিধান যদি বলে যে হিন্দিই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে এটা ঠিক হয়ে গেছে তাহলে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করে আমরা বলব Surrender not...We shall unsettle the settled fact! হিন্দি আর কখনই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় আপাততঃ ইংরেজীকে রেখে পরে হিন্দিকে চালু করার যে ঘৃণ্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। এখনই হিন্দির পথ যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে হিন্দুস্থান হিন্দিস্থান হয়ে যাবে। হয় এখনই আর নয় কখনই নয়! হিন্দিওলারা এখন চেষ্টা করবে দক্ষিণের মুখ চেয়ে কিছুদিন চুপ করে থাকতে তারপর সময় বুঝে আবার ফণা তুলতে। দুধকলা দিয়ে গত সতের বছর ধরে যে কালসাপকে আমরা পুষেছি সেই কংগ্রেস যদি হিন্দি আমাদের ওপর জোর করে চাপাতে চায় তাহলে ক্ষুদিরামের কণ্ঠে

আরেকবার গাইতে হবে ; একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

পূর্ববঙ্গ বাংলাভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল; শিলচরে এগারটি প্রাণ বলি হয়েছিল মাতৃভাষার সম্মান রক্ষায়। প্রাণ রক্ষার চেয়ে মান রক্ষা বড়! সেইসব শহিদরা ফাঁসির মঞ্চে যারা জীবনের জয় গান করেছিল, ক্ষুদিরাম থেকে মাতঙ্গিনী হাজরা, আজ তারা অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে ঃ দিবে কোন বলিদান হে!

পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে বাংগালী যদি ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পেরে থাকে তাহলে আজও বাংগালী পারবে মাতৃভাষার অপমান নিজের সর্বস্ব দিয়ে মোচন করতে। প্রাণ ধারণের দিন যাপনের গ্লানি থেকে জাগো বাংগালী। মহান মৃত্যুর মুখোমুখি হও একবার। আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে তৈরী কর দধিচীর বজ্র। রাগো বাংগালী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড় তুমি, বিস্ফারিত হও বিক্ষোভে! সাম্যবাদ, সমাজবাদ, প্রীতিবাদের দিন নয় আজ, প্রতিবাদের রক্ত রাঙা দিন। ভাগো অবাংগালীর ভাষা হিন্দি, বাংলা দেশ থেকে।

জাগো বাঙালী রাগো বাঙালী
ভাগো অবাঙালীর ভাষা হিন্দী।

[বর্ষ ৪, ১৬ সংখ্যা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫]

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার

প্রদীপ বলে একটি ছেলের ওপর এবার একটি স্কুলের অনেকখানি আশা ছিল যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ভালো ফল করে তার নিজের ও স্কুলের নাম উজ্জ্বল করবে। কিন্তু সে ছেলেটিকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গুম করে রাখে। গুণ্ডাদের পেছনে বোঝাই যাচ্ছে এমন কোনো লোক আছে যাদের স্বার্থ এই ছেলেটির ভালো ফল করায় বাধা পেত। গরীব, প্রতিভাবান, মাতুলালয়ে মানুষ এ বালকের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার পেছনে এই সমাজে যারা প্রতাপশালী বলে প্রতিষ্ঠিত, প্রদীপের নিচে অন্ধকার তাদেরই কীর্তি। এরকম দুর্ঘটনা এবার এ দেশেও শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ এখন থেকে পরীক্ষায় প্রথম হবার প্রচেষ্টাও প্রাণভয়ে পীড়িত হতে থাকবে। জানি, কোনো প্রতিবাদই আজ গ্রাহ্য নয়। ছলে বলে কৌশলে জীবনের বাজি জেতাই আজকের একমাত্র আদর্শ। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, পৌর সভায়, বিচারালয়ে, কোথায় নয়? বাড়িতেও যে ছেলে রোজগার বেশি করে, যেভাবেই করুক তার অবস্থাই সবচেয়ে ভালো। মাতাল-দুশ্চরিত্র-কালোবাজারীর দাম আজকে মায়ের কাছে সৎ চরিত্রবান অল্প রোজগেরে ছেলের চেয়ে বেশি। এত অসৎ যাদের বর্তমান তাদের ভবিষ্যৎ কোথায়,—এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম অনাথ দেব লেনের মাষ্টার মশাইকে।

দী-কু-সা

[বর্ষ ৪, ২১ সংখ্যা, ৩ মার্চ, ১৯৬৫]



'গো'-বুঝের অভিযান

ওরে 'গো'-বুঝ, ওরে আমার ওঁচা,
বাপ-দাদাদের নামটারে তুই ঘোচা!
ছুঁচলো জুতো ড্রেন-প্যান্টে
ঝোঁটা চুলের নয়া স্টান্টে
কিম্বা শ্রীহীন তৈলবিহীন
ক্রপড চুল তোর দাঁড়াক খোঁচা খোঁচা

গলির মোড়ে পথের ধারে
ঘুনে ধরুক তোদের হাড়ে
কাঁঠাল ভেঙে পরের ঘাড়ে
দেখলে বিপদ দ্বিপদ দ্বিপদ
দুজন করে চার পায়ে তুই দৌড় দেরে চোঁচা,
ওরে 'গো'বুঝ ওরে আমার ওঁচা!
কলার খানা খাড়া ঘাড়ের পরে
ঘুঘু যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়ের পরে
পথের ধারে গলির মোড়ে
বক্না বক্ম্ চলছে জোড়ে
মহাবীরের চায়ের দোকান ধারের গুণে কাটছে দো-'কান'
দেনার দায় বিকোয় কাছা-কোঁচা!
ওরে 'গো'-বুঝ, ওরে আমার ওঁচা!
আড়াল থেকে কমেণ্ট করা,
তিলকে তাল ফোমেণ্ট করা
মোমেণ্ট খানেক উত্তেজনায়
চেঁচিয়ে মরা দু'চার জনায়
বিটলে-গাজন ধন্য রাজন
এক নরুনেই সব তরুণেই মুড়ো মাথার মোচা
ওরে 'গো'-বুঝ, ওরে আমার ওঁচা!

এ দেশ,—এক যতীন দাসেই নিঃশেষ

—মা. ম.।

কোলকাতা ১৩ই মার্চ '৬৫, অনাথ দেব লেন থেকে মাষ্টার মহাশয় লিখছেন ঃ

'শহরের রাজপথ আটক করে, ছাত্রদের বঞ্চিত করে, অভিভাবকদের বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করে দাবি আদায়ের চেষ্টা ক্লীবত্বের পরিচয়। পার্টি সর্বস্ব অপদার্থ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু বিকল্প পথ নেই? কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা আমরণ অনশন করুক না কেন। তার চাইতে কার্যকরী উপায় আর কিছু আছে কি? কিন্তু সে চরিত্র কোথা? শতকরা ৯০ জন শিক্ষক কলেজে ঢুকে পড়ায় (?) কিন্তু নিজেরা পড়ে না। শতকরা ৯৫ জন স্কুল-শিক্ষক অশিক্ষিত, এমন কি কুশিক্ষিত। এবং সর্বস্তরের শতকরা ৯৭ জন শিক্ষক অসাধু ব্রাত্য। অশিক্ষার, অনিষ্ঠার হেতু দারিদ্র্য এ যুক্তি বারংবার শুনি। ঠিক। কিন্তু যখন দারিদ্র্য ছিল আরও বেশি তখন ফাঁকি ছিল অনেক কম। এখন দারিদ্র্য যত কমছে ফাঁকি তত বাড়ছে। শহরে এমন কি গ্রামাঞ্চলে তাকিয়ে দেখুন, মূল কারণ sordid cupidity—অর্থাৎ নিদারুণ spiritual poverty!...

এ দেশ একটি যতীন দাশেই নিঃশেষিত!'

এই চিঠি যিনি লিখেছেন তাঁর চেয়ে আদর্শ শিক্ষক আজকের ভারতবর্ষে কোথাও আছেন বলে আমি স্বীকার করিনে। মাস্টার মহাশয়ের কাছে যাঁরা পড়েছেন, এখন পড়ছেন, তাঁরা জানেন তিনি কি এবং কে। তাঁর কথাকে আমি কেবল মূল্যবান জ্ঞান করি না, কোনো কোনো কথা অমূল্য বলে মনে করি। তাঁর এই চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর রক্ত দিয়ে লেখা। এই চিঠির লেখককে আমি বলতে পারি যে যতীন দাসের মতো একাধিক কেউ আত্মত্যাগ করলেও আজকের অন্যায়ের প্রতিবাদে বাঙালীকে উদ্দীপিত করা যাবে না। তার কারণ পুরুষকে উদ্দেশ্য করেই বলা ঃ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত!' কাপুরুষের কাছে ও বাণী অর্থহীন।

স্বর্ণকারদের যখন মৃত্যু মুখে ঠেলে দিলেন সরকার, তখনও কয়েকজন স্বর্ণকারী মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাত্রির তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু তাতে নতুন কোনো দিন আসেনি। আজ একশো যতীন দাস যদি কারাগারের অন্তরালে নিঃশেষে প্রাণ করিবেক দান তাহলেও তা ব্যর্থ হবে। সেই উদ্দীপনায় এই বাংলা দেশে 'আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান তাবি লাগি কাড়াকাড়ি' পড়বে না। বরং খবর কাগজে সেই খবর যারা পড়বে সেই ঝোঁটা চুল, চোঙা প্যান্ট, সিনে-মা'র বরপুত্ররা বলবে সমস্ত ব্যাপারটা সেন্টিমেণ্টাল ফুলিশনেস!

আজ বিদ্যাসাগর যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে এই কাঙালী সমাজে তিনি একঘরে হতেন। সিনেটে সিণ্ডিকেটে কোথাও তাঁর জায়গা হতো না ; কারণ পার্টি পলিটিক্সের নোংরা রাস্তায় ভোট জাল করে নির্বাচিত হবার পথ তিনি মাড়াতেন না। ক্ষুদিরাম থেকে সুভাষচন্দ্র, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ আজকের বাঙালীর কাছে সবচেয়ে দূরের মানুষ। যে বাঙালীকে উদ্দেশ্য করে গোখ্‌লে বলেছিলেন, 'বাঙালী আজ যা ভাবে সারা ভারত তা ভাবে আগামীকাল', সে বাঙালী আজ কাঙালীতে পরিণত।

টিচিং বনাম চিটিং-এর সমগ্রামে তাই চিটিংই আজ বিজয়ী হয়ে বলছে ঃ সত্যমেব জয়তে!

কারেন্ট - ফোরকাষ্ট

[কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক]

২১শে মে ঃ সন্ধ্যার দিকে ঘন্টা দুয়েকের জন্যে উত্তর, মধ্য কলিকাতা ও হাওড়ায় বিদ্যুত বিকল হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সকালেব দিকে দক্ষিণ কলকাতায় পাখা না ঘুরতে পারে!

২২শে মে ঃ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ব্যতিরেকেই আলো-হাওয়াব ঘাটতির সম্ভাবনা, কাশীপুর, যাদবপুর, ও বেহালায় ম্যাটিনি শো ব্যাহত হতে হবে না!

২৩শে মে ঃ প্রচুর ঝোড়ো হাওয়া বইবার ফলে, পাখা খোলার অপ্রয়োজন বোধে লোড-শেডিং হলেও বলবার থাকবে না কিছু।

২৪শে মে ঃ ১০০ পাওয়ারের আলো ২৫ পাওয়ারের এবং ৫ পয়েন্টে ঘুরন্ত পাখা ১ পয়েন্টের কাজ দেবে!

২৫শে মে ঃ 'আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে' গানটি চালাতে পারেন!

২৬শে মে ঃ Light! More LIGHT...!

গ্যয়টে!

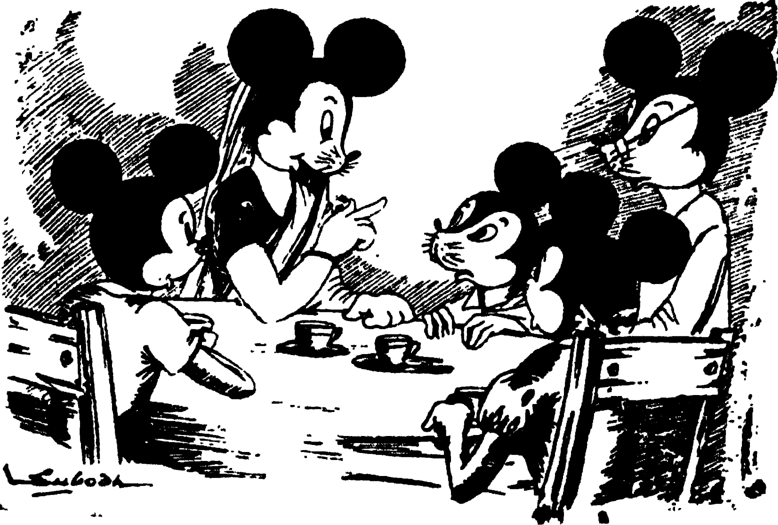
২৭শে মে ঃ সাদার বদলে রংগীন, অর্থাৎ লাল বাতির মতো দেখবার সম্ভাবনা!

by [dis] order

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশান, ওয়েষ্ট বেংগল [গাভামেন্ট]

ইলেকট্রিসিটি বোর্ড

[বর্ষ ৪, সংখ্যা ২৯, ২৯ মে, ১৯৬৫]



অচলপত্র যাদের দয়ায় কাটছে..

অমৃত মহুর

House of Sri Haren Bose
271/B, Babubazar Kharida
P. O. KHARAGPUR Dt. Midnapore,

অচলপত্র
সম্পাদক মহাশয় সমীপে
"মান্যবরেষু",

বিষয়—সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতিদের
নামের তালিকা এবং বঙ্গদেশের
খ্যাতনামা প্রকাশনী সংস্থার কার্যক্রম

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত 'Hindustan Year Book & Who's Who–1963' নামক পুস্তকের ১৬ এবং ১৭ পৃষ্ঠায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতিদের নামের তালিকা মুদ্রিত আছে। ১৮৮৫ ইংরেজি সনের সভাপতি Sri W. C. Banerji হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৬১ ইংরেজি সনের কংগ্রেস সভাপতি Sri Sanjiva Reddy মহাশয়ের নামও আছে। ১৯৩৪ ইংরেজী হইতে ১৯৪৫ ইংরেজী পর্যন্ত কোন কংগ্রেস সভাপতির নাম নাই। আমরা এতকাল জানিতাম যে বঙ্গদেশের বিশিষ্ট সন্তান শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ও কংগ্রেস সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম তালিকা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। বইটিতে মুদ্রাকর প্রমাদ বা বাঁধাইয়ের জন্য পৃষ্ঠার গরমিল নাই। এই বিষয়ে প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। অন্যান্য পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠাইলেও হয়তো স্থান লাভ করিবে না। আপনি সুভাষ-অনুরাগী জানিয়া এইরূপ ইচ্ছাকৃত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

নমস্কারান্তে
সুশীল মজুমদার

[বর্ষ ৪, সংখ্যা ২৯, ২১ মে, ১৯৬৫]

লজিক্যাল

চার্লি চ্যাপলিন তাঁর নির্মাণরত চিত্রের মহড়া দিচ্ছেন পাত্র-পাত্রী, স্ক্রিপ্ট সমেত ; একটি মাছি থেকে থেকে উড়ে এসে বিরক্ত করছে। কিছুতেই চ্যাপলিন তাকে বাগে আনতে পারছেন না। অবশেষে তিনি একটা ঝাঁটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। মাছিটাও আবার এসে বসল টেবিলের ধারে। চার্লি অনেকক্ষণ দেখে দেখে তারপর মারতে গিয়ে ঝাঁটা সরিয়ে আনলেন, মারলেন না। সবাই জিজ্ঞেস করল, কি হল মারলেন না?

চার্লি গম্ভীর-মুখে জবাব দিলেন : এটা সে মাছিটা নয়!